



গল্প-ভারতী

ত্রয়োবিশতিতম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। আখ্যায়িক ১৩৭৪

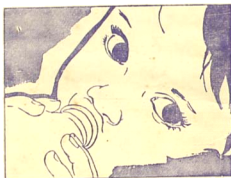
এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ :

খ্যাত সঙ্ঘটনের সমাখ্যানে বিকল্প খণ্ড

চিত্র অগতির গাড়ীকর ওয়ান্ট হিসনে

ছোট বড় ছাটি গল্প

২.



শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য

লিলি ব্রাও **বার্লি**

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত



সুস্থ, অসুস্থ
সব অবস্থাতেই
সমান
উপকারী

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-৩

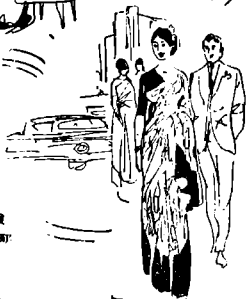
ঘরে বাইরে যেখানেই

বেশভূষাই আপনার
মর্যাদার পরিচায়ক



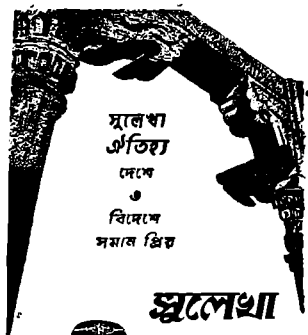
ভারতের সিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অঙ্গভরণ।

আমাদের রূপবন্ধ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অকুলনীয় হয়।



ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা



সুলেখা
ঐতিহ্য
দেশে
ও
বিদেশে
সমান খিঁচ

সুলেখা

ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব কাজে পাবেন :

ই. হুসাইন • মহাদেব • হুসাইন

বের • জীন • জাহাঙ্গীর

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

ব্রহ্মা পার্ক, কলিকাতা-৩২



Programme SW-318

শেফা কাটা শোকার কলহ

এই সব আকস্মিক

দুর্ঘটনায়



শিতবের কোমল স্বকর
পক্ষেও নিরাপদ
হাস লসেন বা



কানের কাছে
হাল্ধ

এ্যাক্রিমেন্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যাক্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সুচর আত্মায়ামৃত

বেঙ্গল ইন্ডিস্ট্রিজ লিমিটেড





কোলে

▲ ডেনিস

▲ অ্যাসটেড

লজেন্ড ও টফি

হুব ও হুচেলেস টেবলী উচ্চমানের
লজেন্ড ও টফিও জমা পূরক
হালাস ও কফা দেওয়া গিয়া
উপহার ও পছন্দেব পক্ষে অসমর্থ।

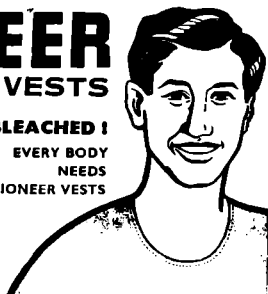


কোলে বিক্রী কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১০

PIONEER VESTS

ARE
HYGIENICALLY BLEACHED !

EVERY BODY
NEEDS
PIONEER VESTS



PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS, CALCUTTA-2 Phone : 56-2993

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী ব্যবহার করুন

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন—পাইওনিয়ার নিটিং মিলের ফ্যাক্টরী

পরিদর্শন করিয়া শ্রীত হইলাম। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহাদের হোসিয়ারী

এবং দোত করিবার বিরাট আবারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য.....

আয়ন এন্ডচেঞ্জঃ স্তরের মধ্য দিয়া চালিত গুল বিস্তৃত

হইয়া আবারগুলি পূর্ণ করিয়া থাকে।

পাইওনিয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনিয়ার বিল্ডিংস্, কলিকাতা

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

দুর্গত মহানগরী (কার্টুন)

বজ্রা কছা (উপহাস)—অভিহুতুমার সেনগুপ্ত

গুণ্ডার কাহিনী

মাতাহারির চেয়েও বড়ো—গৌরীশংকর দে

কেদা (গল্প)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য

কাজল গ্রহর (গল্প)—সন্তোষ কুমার অধিকারী

করাগৌরবে সাহিত্য সাধনা—নীলজি সেন



আনন্দ ডায়ের
ক, হোডের
সর্বজন সমগ্রী

ক, হোড ২৩ কাং • কলিকাতা • ১৪



serla

শীতল পানীয়



- দোড়া
- অবেজ
- রাউনিকোলা
- জিহ্বার বিরাত
- পাইকওপল
- সেমবেড
- অ-ইস্ক্রীম দোড়া
- লাইম জুস
- টোনোভিন

ADRACINIST

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে পণ্ডিত। যার



এই সংখ্যায়

একুশা কঠোর (গল্প)—শচীন রায়	৩৪
এ ঘর ও ঘর —মানবেন্দ্র পাল	৫৮
বহুবাহু " —ডঃ হরেন্দ্র নাথ রায়	৭৬
অভয়চরণ (গল্প নয় সত্য)—মলয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩০
ভারতের মূল্যবান উপাখ্যান সাহিত্য—কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৭
চলতি ছবি	২০৮
বেলাহুলা—ঐক্যোত্তম	২২২
জায়াবাঈ—	
ওয়ান্ট ডিস্টেন্স—মৃণাল রায়	২৩৬
মোটক—রত্নাকর	২৪৩

বিশ্বমানব-তত্ত্বের নিত্য পরিচর্যা

হিমালী ত্রিসারিত সাবান

নির্ধৃত ও মঙ্গল স্বক সৌন্দর্যের
মাশকাঠি। বছরের প্রতিটি দিনেই
এর পরিচর্যা করা উচিত। উপযুক্ত
উপাসনে প্রস্তুত হিমালী
ত্রিসারিত সাবান স্বকের লাভ
ও মঙ্গলতা বাড়ায়।



হিমালী

• এইতেউ গি:
কলিকাতা-২





আপনার কেশগুলি
দীর্ঘ অক্ষর করে
আপনাকে রূপ-লাভে
উজ্জ্বল করাব
বেঙ্গল কেমিক্যালের
স্বাদিত
তিল তৈল

বেঙ্গল
কেমিক্যাল

কলিকাতা - বোম্বাই
ভাদ্রাবাদ - দিল্লী



My day long companion

Lovely Lord's Sweets. Filled with
Jelly, Chocolate, Cream...that get
into your mouth and tickle.... make
you want to eat a jar a day.



Lord's

Sweets & Toffees

JAMES LORD & SONS LTD. CALCUTTA-1.

এই সংখ্যায়



ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি

মেয়ে-মজলিশ

বিকল্প খাওয়া—বেলা দে

কি খাব—মীমা সেন

যারা মোটা তাদের কিনা কষ্ট—মাভা পাকড়াণী

রাণী বিবিদের জন্তু—মালবিকা ঘোষ

ভাববার কথা



উত্তরের চাঁদবিরা
রক্ত বাতাসে
স্বাভাবিক জাবে মনে পড়ে

সুসমা

ট্রান্সপ্যারেন্ট
মিলাবিন সানান

পি, শেট এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

॥ বাংলা দেশকে জানুন ॥

জেনারেল প্রিন্টার্স চ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

'ভারতবর্ষ-ভাষ্য' আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত

বাংলা দেশের ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ) ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত (মধ্য যুগ) ১৯০০]

অন্যান্য চিত্রসম্বলিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য ইতিহাস

: কয়েকটি অভিমত :

- ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "All these things make your book one of the most important publications for the study of the history and culture of Bengal..."
- লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক-প্রধান ডঃ কালিকরজ্ঞান কাকুলগো বলেন, "....এই ইতিহাস কেবলমাত্র চাহদের রক্ত নির্মিত হয় নাই; চাহদের শিক্ত এবং পিতা-পিতামহ তথা শিক্ত বাঙালীরাহেই এই ইতিহাস পড়িয়া লাভবান হইবেন; মাতৃশ শরণার্থের স্বাক্ষর ইহার মধ্যে গবেষণার নূতন আলো পাইরাছে। ..."
- পাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের হীডার ডঃ লি. পি. মজুমদার "Searchlight" পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "....The publisher is to be congratulated for the excellent printing, beautiful reproduction of photographs and above all for publishing the finest re-assessment of the medieval history of Bengal in modern times..."

জেনারেল বুকস্

৫-৬৬, কলকাতা স্ট্রিট মার্কেট

কলিকাতা-১২



**NATIONAL RUBBER
MANUFACTURERS LTD.**

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED
AUTOMOBILE TYRE COMPANY

**THE HOUSE OF
NRM**

THE LARGEST MANUFACTURERS
OF INDUSTRIAL RUBBER
PRODUCTS IN INDIA



**Inohok Tyres
Limited**

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India



আমি 'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করে দেখেছি
সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করে দেখেছি এটা ভাল
জিনিস।

ঐতিহাসিক যোষ

সম্পাদক—অনুভবাম্বার পত্রিকা।

'লক্ষী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ এই-
ছিল। ব্যবহারে পরিভূক্ত এই-
ছিল। একালের বাজারে একটা বাটী ও প্রস্তুত
পাওয়া নৌকায়ের ব্যাপার।

ঐতিহাসিক যোষ

আমি 'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করি। দেখি-
এই ঘি বাজারে স্বেচ্ছা বৃত্তের অন্তর্গত,
অনুভবাম্বার মধ্যে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

ঐতিহাসিক যোষ

সম্পাদক—অনুভবাম্বার

'লক্ষী ঘৃত' ব্যবহার করি। দেখি-
এই ঘি বাজারে স্বেচ্ছা বৃত্তের অন্তর্গত,
অনুভবাম্বার মধ্যে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।
দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত এই-
আমি কখনো ঘি।

ঐতিহাসিক যোষ

'লক্ষী ঘৃত' ব্যবহার করি। দেখি-
এই ঘি বাজারে স্বেচ্ছা বৃত্তের অন্তর্গত,
অনুভবাম্বার মধ্যে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

ঐতিহাসিক যোষ

'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করি। দেখি-
এই ঘি বাজারে স্বেচ্ছা বৃত্তের অন্তর্গত,
অনুভবাম্বার মধ্যে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

ঐতিহাসিক যোষ

॥ মিত্র-ঘোষের নতুন বই ॥

প্রথমদাশ বিনীত অনবঙ্গ সমালোচনা সাহিত্য।

রবীন্দ্র-সরণী

১০/-

বন্ধিম-সরণী

১০/-

অভ্যুদয় মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস

বনগল্পপায়ে রূপবনগল্প ১৮/-

আত্মপূর্ণা দেবীর উপন্যাস—প্রথম প্রতিভূতির
প্ৰৱৰ্ত্তী কাহিনী

সুবর্ণলতা ১৩/-

শিবচন্দ্র চন্দ্রকান্ত চৌধুরীর আত্মকৃত

কষ্ট বাফলাগু মোড় ৮/-

মৌহাররতন গুপ্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস

স্মৃতিম প্রদীপ জ্বালি ৯/-

বন্ধিগারজন বহুর আত্মজীবনিক পটভূমিতে রচিত উপন্যাস

এক আকাশে অনেক তারা ৬/-

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের রোমাঞ্চিক উপন্যাস

একদা কী করিয়া ১৩/-

বিমল মিত্রের ১০-খ্যাশোচিত নতুন উপন্যাস

সখীসম্যাচায় ৬/-

অভিযাত্রিক বহুর (অ-১-১) চাকলাকর উপন্যাস

ম্যামিনা ক্যান্টিন ১০/-

অভিযাত্রিকের সেনাপতির নতুন উপন্যাস

মৃগমদ ৮/১০

বরাক মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

অমৃতসমান ৪/১০

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম ভ্রমণকাহিনী

গঙ্গাবতরণ (বিগুন পরিবহিত) ৫/-

মিত্র ও ঘোষ : ১০, দামাচরণ কে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৫-৩৪২২ : ৩৪-৮৭২২

ইংরেজীতে কথা বলার
সুবর্ণ সুযোগ

Nimbus PUBLICATION
A POCKET BOOK
OF SPOKEN ENGLISH
By N. S. CHAKRA



Nimbus PUBLICATIONS
22, LATAPAT POKHARI LANE, CAL-10

॥ সাহিত্যের খবর ॥

পদ্ম-ভাষ্যভীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হওয়ায় কালে যে-লেখা
পাঠক-পাঠিকা মহলে সত্যিকারের চাহিদার সৃষ্টি করেছিলো—
এসেও পর মাস ধরে যে-লেখাকে সম্বন্ধিত করে বাংলা সাহিত্যের
পাঠকগুলি অনেক অনেক চিঠি পত্রের আদান-প্রদান করেছিলেন
হুমায়ুন সাহিত্যিক এবং সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পর্কিত সেই স্মৃতি-স্ববর্তিত কাহিনী :

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

একজন আর কয়েকজন

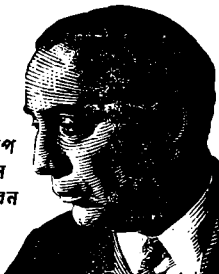
শ্রীহাই প্রকাশিত হচ্ছে ।

আপনার লাইব্রেরীর জন্য আজই অর্ডার দিন ।

॥ ডি. এম. লাইব্রেরী ॥

৪২নং বিধান সরনি, কলিকাতা-৬

হোমি ভাবা ফেলোশিপ পাওয়া ছাত্রেরা একদিন পুরোভাগে দাঁড়াবেন



ভারতের ইস্পাতনিষ্কাশন ক্ষেত্রে ডাঃ হোমি ভাবার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই তিনি ইস্পাত ও অক্সিজেন যান্ত্রিক উৎপাদন, প্রণালীর বিভিন্ন পর্যায়ে নিগমিত করার ক্ষেত্রে রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপস ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁরই সম্মানে টাটের পারমাণবিক কেন্দ্রের নাম 'ডাঃ গাংমা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র' রাখা হয়েছে।

ডাঃ ভাবার প্রতিভা ও অসামর্থ্যবাহিতা উন্নয়নের উৎকর্ষ অর্জনে রতী হতে চম্পুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে। এই মহান প্রতিভাকে অগ্রসর করে রাখবার ক্ষেত্রে টাটা স্টীল কোর্ড ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ডাঃ হোমি ভাবার বিশ্ব প্রবর্তন করেছে। ২৪ থেকে ৩৮ বছর বয়সের সীমিত স্বকল্পবৃত্তীরা যাতে জ্ঞানবিস্তার ও নিজেকে নাকলোব চূড়ান্ত পৌঁছাতে পারেন তাঁরই সহায়তা করবার ক্ষেত্রে এই ফেলোশিপের প্রবর্তন। এই ফেলোশিপ বিভিন্ন মেয়াদে দু'বছর

পর্যন্ত হতে পারে। যারা ভারতের বাক্য করছেন টাটের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বা মাদিক দু'কোণের টাকায় ভারতের বাহিরে কাজ করলে প্রয়োজন হতে পারবে কখনো হবে। প্রতিবছরে যোগ্যতাসম্পন্ন বিশ্বের সম্মতিত আবেদন পাঠানোয় ফিকানা: মধ্যমিক ডি. সি. কার্ডে, এন্ট্রি উত্তীর্ণ হাইস্কুলের, হোমি ভাবা ফেলোশিপ কাউন্সিল, ১ বঙ্গলহাস রোড, মুম্বাই-১।

হোমি ভাবা ফেলোশিপ পাওয়া ছাত্রেরা একদিন বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষি বিশেষজ্ঞ, কলতি, শিক্ষাবিশ্ব, লেখক ও প্রশাসক হবেন। আমাদের জাতীয় জীবনের এগর ক্ষেত্রে যেরূপের নেতৃত্বের প্রয়োজন একদিন তা এরাই যোগাবেন।

টাটা স্টীল

বর্ষার পথে সাবধান!

जाता बंदी कता हउत बाबो एउकाका दौत
 एउठोदण्ड बूढा भित बाबु। एउ वन हउतव दित
 एउ ठाउत एउत बाबो नुका। बा बाबु नाक हउतव ना

[illegible]

ଦିନିକା ସଞ୍ଚ ଓ ବିବିଧ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବରପତ୍ର
 ଉପରେ, ଆମର ନିକଟରେ ଯେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ସେବାୟତ
 ଶାନ୍ତି ସାଧନ : ଆମର, ଆମର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
 ଉପରେ, ଉପରେ ଉପରେ ଉପରେ ।



Bata

বর্ধার ক্ষেত্রেও নিশ্চিত নির্ভরতা



ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এ পৃথিবীতে বাবা নতুন এসেছে তারা বেশ ভালই আছে দেখছি। জন্মাবি প্যাট্‌ পরছে, দুপল্ট পরছে, কাকেই ওইটেই হচ্ছে তাহের জাপতাল জেন্স। খুঁটি-পাঞ্জাবী তারা পরতে পারে না। সব লম্বেরই কেমন যেন খুলে বাবে খুলে বাবে মনে হয়। পুরনো মাহুর বাবা খুঁটি-পাঞ্জাবী পরে, তাহের একটু কপায় ঢকে দেবে এইসব অতি-আনুশিঙ্ক্য।

হে-মেশের যেমন আবহাওয়া সে-মেশের ম'জবের লাক-পোষাক হয় তেমন। আমাদের ঐচ্ছন্ন্যন মেশ, লাক-পোষাকের বাড়াকাড়ি ছিল না, প্রয়োজনও হয়নি। খুঁটি-চামির আর পারে পাহুকালাতীর খড়র কিংবা চটি—বা হোক একটা কিছু হলেই চলতো।

তারপর মুললমানেতা বেশের শালনকর্জী হয়ে যখন এলেন তখন চাকরির বাতিরের এবং আরও নানাবিধ প্রয়োজনে কেউ কেউ চোপা-আচকান্ এবং শিওরাণ পরতে আরম্ভ করলেন।

তারপরই এলো ইংরেজ।

তখন থেকেই সব-কিছু বদলাতে লাগলো।

কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব খ্রীতির সম্পর্ক ছিল না। কাকেই নিজেদের বাবেশিকতা বকায় দ্বাবহার করে আমরা খুঁটি-চামিরটাকে ছোর করে বেবে মিলায়।

তারপর এলো মুন্ড, এলো স্বাধীনতা।

খুব ভাড়াভাড়ি বেশ এগিয়ে যেতে লাগলো। অন্যান্যের কল্যাণে লাক পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো। যে দেশগুলো ছিল বহু যুগে, সে-সব দেশ হাতের কাছে এসিয়ে এলো।

মাহুরের পোষাক-পরিচ্ছন্ন থেকে আরম্ভ হবে আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি সবকিছু বদলাতে লাগলো।

এখানেই টান পড়লো কাপড়। খুঁটির হাম বেড়ে গেল। একঝোকা খুঁটির দামের চেয়ে কিছু বেশি দিয়ে যদি একঝোকা প্যাট কেনা যায়, তাহলে টেকে অনেকদিন। পরশাও কম লাগে লাহেব লাকাত চলে। হেল-ছোকরার হল প্যাট পরতে আরম্ভ করল।

মেয়েদের লজ্জা একটু বেশি। কাকেই মা-বাসীরা দাঁতন পর্বতে পারলেন না। তাঁদের পরণে লাড়ুই বইলো। কিন্তু কমবয়সী মেয়েরা—অর্থাৎ বে-বয়সে আদ্যবের দেশের মেয়েদের হোসেমেরে হর সেই বয়স পর্যন্ত ছাট পড়তে লাগলো।

আলক্যল আবার কিছু কিছু বাঙ্গালীর মেয়ে সাপোহার-পাভারী পর্বতে আটক করেছে।

‘মা গো মা, কি লজ্জার কথা! কী ঘোরা কথা!’

মা-বাসীদের মূখে এমন কথাও পোনা যাচ্ছে। কিন্তু কে কান বেধে ও-সব কথাই শুনা তো নেপথ্য-পদধারিনী—ওদের কথা কে শোনে?

কাকেই বে-বকর স্তম্ভভিত্তে দেশের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, অতিরিক্তভিত্তে কি যে হবে কিছুই বলা যায় না।

তবে কিছুদিন বাবে আদ্যবের দেশে যে অভিবাসন দেখা হবে তার কিছু কিছু অব-বয়ল একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

যেমন এখন—

হুড়ি—যেতবেরি একপ্রকার বস্ত্রবন্ধ। ভারতীয়েরা এখন অলভ্য ছিল তখন তাই পরিধান করে পুরুষেরা তাদের লজ্জা নিবারণ করতো।

বস্ত্র—কাটনিমিত্ত পাছক। ঐতবেরি বাঙ্গালীরা চর্চনিমিত্ত পাছকার পরিবর্তে ব্যবহার করতো।

পিঁড়ি—হাটিতে গেতে এসবার অস্ত্র কাটনিমিত্ত আলস। প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা এতে বলে আত্মরক্ষা করতো।

হুত, খি—হুথ থেকে তৈরি একপ্রকার অস্ট্রা বস্ত্র। ভারতবাসীরা উপাধের বাড়ুরণে বিবেচিত হতো।

হুড়ি—একপ্রকার বিশেষ পছত্বিত্তে ভাঙা চাল। পট্টব বাঙ্গালীর বাস্তব।

বিধবা—স্বামীর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ না করতেন তাঁদের বলা হতো বিধবা।

সতী—যে একনিষ্ঠা স্ত্রী একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গের্থে না আসতেন তাঁকেই বলা হতো সতী।

পরিবর্তন হবে না শুধু চরিত্রের।

কারণ বেরকর দীর্ঘ পোতা হবে পাছক হবে তেমনি, তার কলও কলবে তেমনি। হাইয়ের রঙে বতই ঘোরালা তত থাকবে তেতরটা হবে ততই ঠাণা। বাসগছবীন থাকাল কলের মত।

সাকাল কল বেধতে কেমন আনি না।

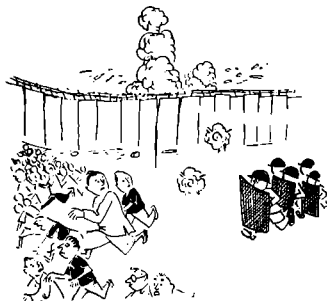
আশাকরি এখার তা বেধতে পাবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

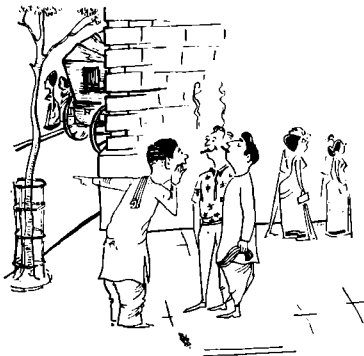
দুর্গতি মহানগরী



বর্ষাকালে
প্রতিদিনের গ্রহসন ।



আবার বলে দিতে হবে ?
—খেলার ঘাট



রাজপথের আব্বান—
কিটন ইজ্ রেডি স্তার।

বন্যা কন্যা

অষ্টকুসুমার স্মরণ

[পূর্বকথা : সরসিঙ্গ সম্মুখদ্বারের মেয়ে বনছায়া। বাণ বড়লোক বড়ো। লড়েও বনছায়া চাকরি করে, পল্ল উপভোগ দেখে। বড় সাহিত্যিক হবার অগ্র বেষে। কখনও বা তাহে জার্মানিষ্ট হই বেহেতু আন্তকাল সাহিত্যের চেরে জার্মানিছন্দেই বেশি প্রাণার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই বহুদয়-বহুদয় করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে পরিবর্তে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাসে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপভাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সন্তানের মত উদ্ভাস, সন্দীপ পাণ্ডাডের মতই গীরবির। সন্দীপও জুঃ কিন্তু আত্মনিঃ। দারিদ্র্য বেন তার আত্মপক্ষে হ্রাস করতে না পারে সে লম্বা সর্বা লম্বাপ। সরসিঙ্গ মেয়ের ভক্ত হিমাংগে বোপ নামে এক কুতী এলিনিয়র টিক করেছে, কিন্তু বনছায়া ভাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিরে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেব পণ্ডে হিমাংগেকেই বরণ করবে? হিমাংগের বন্ধু আর দুকলি বেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অকস্মে বনছায়ার হল, তার দুটিও না কোন বনছায়ার মিকে। বনছায়া প্রেমের ভক্তে কেরিরর মাটি করতে, না কেরিররের ভক্তে প্রেম।]

অতঃপর সরসিঙ্গের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংগে। বনছায়াকে পাণ্ডী হিসাবে মনোবীত করল। তার কার্যে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে প্রণামিত করতে। সে প্রণামিত গ্রহণ করল হিমাংগে, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেননি এমন অবটন ঘটতে প্যুয়ে। আর সুবীরের চাকরি বধার পর তার লবে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংগে অন্ধকারে।]

নয়

এখন কী করে জানানো যায়—মনে মনে বনছায়া পথ খুঁজতে চাইল। বাবাকে জানাতে হবে, নতুও বাবাদের জানাতে হবে, নতুও বৌদিদিদের। কিংবা, স্ত্রীরের দিকে তাকাল বনছায়া, হিমাংগকে।

আর জানাবার লগ্নে-লগ্নেই লাগল। চারদিক থেকে রণধ্বনি।

স্ত্রীর তো আর হিমাংগের ব্যাপার কিছু জানে না, সে মানুষি লগ্নেবর্ষে কখাই তাবছে। এটা তো প্রথম থেকেই জানা। বাপের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বনছায়া তো এখনি স্ত্রীরের হয়ে অতিথি হতে প্রস্তুত। দুঃলাভলে বাব এতখানি বিশ্বাস তার লগ্নেবর্ষে তার কিলের? 'কর কে করে? তার নয়—' বনছায়া হুঁপ রেবার হাসল, 'মানে, জানাই কী তাহে?'

'এখনি তো লেকখা উঠছে না। এখন তো তুু নোটিশ। আগে শাকা দিলি লই করি। স্ত্রীর তুটির হাসি হাসল।

'দিলি লই করবার পরেও এই প্রস্ন থেকে যাবে, জানাই কী তাহে?'

'তখন আর আমি কার পরোয়া করি?' স্ত্রীর গ্রাহ লাড়িয়ে উঠল: 'তখন না হয় তোমাদের বাড়ির পেটের সামনে বাড়িয়ে বুধে ডোডা লাড়িয়ে জিন্দাবাদ করে আসব। বনছায়া জিন্দাবাদ। স্ত্রীরকুমার জিন্দাবাদ।' কিংবা, হুক হয়ে বন-বীর জিন্দাবাদ।'

বিষয় রেবার হাসল বনছায়া। বললে, 'সেটা খু তুজোচিত হবে না।'

'তাহলে এক কাজ করা যাবে।' স্ত্রীর খাড়া হয়ে পাড়াল সাহসে। বললে, 'দিয়ে পর একদিন তুমি আমাকে তোমার বাবার কাছে এনে হাতির করবে। আমি তাঁকে আত্মীয় প্রণাম করব। প্রণাম সেহেই তাঁর পিছনে গিয়ে পাড়াব। তোমাকে তিনি জিজ্ঞেস করবেন, একে? তুমি বলবে, ইনিই আমার খাণী—পতি পরম শুক।'

'পিছনে গিয়ে পাড়াবে কেন?'

'যেন তুনেই বুধের উপর না পটান খুঁ দারতে পারেন। আর শোনামাত্রই যদি উনি মুছিত হয়ে পড়ে বাবার উপক্রম করেন, পিছন থেকে হাতে ঝুঁকে চট করে ঘরে ফেলতে পারি।' স্ত্রীরের বলার মধ্যে কেনন একটা কুজু করার লম্বুতা ফুটে উঠল।

'সেটাও যথেষ্ট নাটকীয়তা থেকে যাবে।' বনছায়া লাড় দিল না।

'তা হলে ওলব ছাড়ো। তোমার বাবার বিবিা সেই লনাতন লাল লড়ক বানিয়ে দেব।'

'লাল লড়ক।' পর মুহূর্তেই বুধে দিল বনছায়া: 'মানে সিঁহুরের রেবা?'

'বেশ ঘোটা করে বন করে টেনে দেব। যেভাবে আমায়ই একটা হকিম করুধনির মত।' স্ত্রীর আনন্দ করে উঠল: 'তাহলেই আর ভরকের বা লগ্নেবর্ষের অবকাশ থাকবে না। এক কখাইই লম্বা মামলার নিশ্চিতি হবে যাবে।'

'সেই লগ্নে হুহাতে শা'বা আর লোহার খেঁড়ি পরিবে দেবেন।'

'অতটা বরকার হবে না।' স্ত্রীর হাসল: 'নির্লজ সিঁহুরই যথেষ্ট আনুপ্রসার।'

'আমরা তো ওলব প্রতীকে, হালকের ডিহে বিবাল করি।'

‘করিই না তো। তবে আনাহার পথ কী জানতে চাইছিলে তাই বলছিলাম। তার চেয়ে আরেকটা কাল করি এস। কালকে বিজ্ঞাপন দিই।’ স্ববাবিকারের পর্বে স্ত্রীর উৎসাহ থেকে উৎসাহে ছড়িয়ে পড়ছিল : ‘তারপর একটা কিস্ট লাগাই। সত্বলকে নেমন্ত্রণ করি, তোমার বাৎসরিক দানকে—তোমার বসুন্ধে, আমার বসুন্ধে—’

‘ওরে বাবাঃ!’ হালস বটে বনছায়া কিন্তু আলসে সেটা সুস্থি আন্তরিক হাদি।

‘কেন, কী হল?’ স্ত্রীর এক নিখাল স্তম্ভ হয়ে বনছায়া চোখের মধ্যে তাকাল : ‘কীভাবে কইতালে মাঠে জিতে টকি পেলাম, সেটা সেলিজেট করবনা? বিউসল বাজাব না? বাজি পোড়াবনা?’

‘সে উৎসব তুমি তোমার-আমার।’ পাকের পাচজনকে, যানে সমাজকে জানান যিহে দরকার নেই।’

‘তার যানে? তুমি কী রকম চাও?’

‘আমি বলছি কি, আমরা এখন যেমনি আছি বিয়ের পরেও তেমনি থাকব।’

‘তার যানে?’

‘আমি আমার থাকিতে থাকব, তুমি তোমার থাকিতে থাকবে। আমার চাকরিতে আমি, তোমার চাকরিতে তুমি।’

‘আমাদের বেধা হবে না?’

‘বেধা হবে বৈকি। বেধা হবে না, কখনো হতে পারে?’

‘কখন বেধা হবে?’

‘আগিল থেকে কিরে, সন্ধ্যায়। তোমার এখানে।’ টলটলে চোখে আলো কেনল বনছায়া।

‘দিনের বেলা থাকবনা একসঙ্গে?’

‘এমনিতে একসঙ্গে থাকলেও দিনের বেলা পরস্পরকে কতকণ্ড পার? নটার মধ্যেই দুজনকে চাকরিতে বেরিয়ে পড়তে হবে। চাকুরে স্বামী-স্ত্রীর সত্যিকার বেধা, আগিল থেকে কিরে, সন্ধ্যায়।’

‘আর রাত?’ স্ত্রীর প্রায় চৈতন্যে উঠল।

‘ভর সময় পর্বত এখানে কাটিয়ে যাব। বরো বনটা, এগারোটা।’

‘বিয়ের পরেও আমার রাতকে ভর করে রাখতে হবে না কি?’

‘একসঙ্গে থাকলেও প্রথমটা তো আমাদের কিছু সতর্কই থাকতে হবে—’

‘সতর্ক, ভর, সঙ্গে থেকে রাত বনটা এগারোটা—এসব তুমি কী বলছ?’ হু’বাত্তে বনছায়ায় দু কীধ বয়ে স্ত্রীর স্বাক্ষর মিল : ‘তোমার ঘরের মধ্যে ফিলের ভাবনা চুকেছে?’

‘ভাবনা নয়। শুধু ভাবছিলাম এখুনি হৈ-ঠে করে পাচ কান করি কেন? বছর বাকেন আরো চলুক এমনি।’ তক্তপোশের বায়ে-বসা বনছায়া সুবটা সামলে ঠাকানো স্ত্রীরের মুকের নিচে তুলে বসল : ‘এর মধ্যে তুমি তোমার চাকরিতে পাচা হও, আমিও আমার মেস্ট ইনজিনিয়ারিং আগার হবে নি।’

‘সে তো চাকরি করতে করতেই হয়ে বাবে।’ স্ত্রীর তার দু বাতবনছায়ায় বাধার উপর হাবল।

কী যে হয়ে বাবে স্ত্রীর আসে না, কিছু বনছায়া জানে। বিয়ে হওয়া মাইই স্ত্রীরের নতুন চাকরিটা বলে বাবে আর বিদ্যাতে বেধাযোক্তির বন্ধ বলে বেধাযোক্তি বনছায়ায়কও অগম্য না করে ছাড়বে না।

এ লজ্জা প্রতিনিধিত্বের চিত্রটা হ্রদীর কী করে আশ্রয় করবে ?

তার চেয়ে বিয়েটাও হত অথচ কেউ জানতে পেত না, কোথায়, ক'র লগ্নে, তা হলে হয়তো সব লগ্নে হয়ে যেত। বিয়ে হয়ে আছে বা হয়ে গেছে—এটুকু বলেই ঠিকানো যেত হিমাত্তকে, হ্রদীরকে দেখিয়ে না দিলেই হ্রদীরের চাকরিতে তাত লড়ত না। বনছায়ায় হত ভাবনা তো এখন হ্রদীরের অন্তে। তাকে সে কী অবস্থায় এনে ফেলবে না জানি! তার আগের চাকরিটা সে ছেড়ে এসে আর এ নতুন চাকরিটাও টেকসই হল না।

যদি কিছু সময় পাওয়া যেত তা হলে এ নতুন চাকরিতে কিছুটা শেফকু গল্পে নিতে পারত যাক বুকের কথারই তাকে তখন জড়িয়ে রেওয়া লগ্নে হত না।

কিছুটা সময়! কিছুটা পুরোনো হবার সুযোগ।

এ যে একেবারে লম্বা-লম্বা ভেঙে এনে লম্বা-লম্বা দেয় করে দেবে। ওর অন্তে সবঃস্বপ্নিত করবার বস্তু তো পাবে না হারের কাছে। কাক লগ্নে বস্তুতঃ কথারই তো সময় পেল না বেচারী!

বাড়ির বিয়ের বা বিয়োগের কথা শুত তাহে না বনছায়া, তাবলেও তার অন্তে সে টটরি ছিল। কিন্তু বাড়িতে বিয়ের কথা জানলে ঘরের কথাও জানবে—তা জানুক, কিন্তু ঘরের কথাটা যদি ওরা হিমাত্তের কানে জুলে না যেত তা হলেই শোভন হয়। বিয়ে হয়ে গেছে তবু এতেই তো হিমাত্তে নিবাসিত, ক'র লগ্নে হয়েছে এ কৌতূহলে তার কান কী। এ তার কাছে অস্বস্তির বিষয়, হয়তো বা অসম্মত। কিন্তু, না, উপায় নেই, হিমাত্তে নিশ্চয়ই তার কৌতূহল চরিতার্থ করতে চাইবে, ক'র অন্তে বনছায়া তাকে ভাণ করল, তে সে পুঙ্খবুদ্বয় হার কাছে সে পরাজিত। এ জানতে চাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক এবং জানবার পর অপর্যায়ের প্রতিশোধে উত্তর হওয়াই যৌথের পুঙ্খবুদ্বয়।

তাই বনছায়া তাবছিল, তার বিয়ের বিষয় জানলেও কেউ যদি তার ঘরের বিষয় না জানত, অন্তত হিমাত্তে না জানত, তা হলেই হয়তো হলে বেলে দিন যেত অন্যায়সে।

‘তুমি তখন কী যে বলো না, বুকে উঠতে পারি না।’ বনছায়ায় বুকে বুকের কাছে চেপে ধরল হ্রদীর, উত্তর কঠোর বললে, ‘একবার বলো বিয়ে না করাই পুরোপুরি আমার আল্পের এসে থাকবে, আমার বলো বিয়ে করে থাকবে হাক সেওই হবে, অর্ধঃপ্রবে, লগ্নে থেকে রাত বসটা এসেগেটা। কেন, কোন সংঘর্ষকে আমি তার করি? তুমিই তো আমার জীবনে সৌভাগ্য, তোমাকে পেয়ে আমার লগ্নে গরম হয়ে উঠেছে। যেহেতু না তোমার অন্তে কেমন চাকরি পেয়ে সেলাম, সেহেতু তোমার অন্তেই কেমন উত্তাপ করব। বনে-বাগে তরে জুলব নশ্বিক।’

তুষ্টিতে চোখ জ্বল বনছায়া। বললে, ‘কিন্তু বিপরীত যদি কিছু হতে?’

‘বিপরীত!’ আরো নিবিড় করে আকর্ষণ করল হ্রদীর, বুকে হাত বুপ্তে বুপ্তে বললে, ‘তুমি আমি শাস্যশাসি বাড়িয়ে লুৎ করব, সাব্য নেই তেউ কিছু বিপরীত ঘটায়! যেহেতু লগ্নে প্রতিজ্ঞা অঙ্কন হয়ে গেছে। আমরা তো তবু বাঁচব না, সখীও হয়ে বাঁচব। ভালোবাসাই তো আমাদের লজ্জাভার মন্ত।’

মহৎ এক করির মতই লাগল এখন হ্রদীরকে। পতীর সমর্পণে বনছায়া তার হৃৎকাত লতার মত করে হ্রদীরের শিঠের বিকে জুলে দিল। বললে, ‘আর তবে তার নেই। যেখানিমা তুমি যুগে বদলিকর কিনা—’

‘এখন তো পরিকর শুধু বড় নর, বাহুবল।’ মুকুট হাতে স্থবীর বনছাত্রকে প্রস্তুত আদর করল বললে, ‘এখন আমি তোমাকে বন্ধা করব কুমি আমাকে বন্ধা করবে। চিত্রবিন আমরা বাক্য এখন দুইজন দুর্গের মধ্যে। কাক নাকি নেই আমাদের দেখালে কাট বরার, তেতরে স্বভেদ কপট। পাঠিয়ে আলোকে হু’ দেয়—’

‘উঃ, তখনে কী ভালো লাগছে।’

‘তা হলে, অর্ধাঙ্গর, মানে অর্ধাঙ্গন নয় তো?’

‘না।’

‘অতীতীয়র না যেহে বস্ত্র সীমার পৌছনো বাবে।’

‘হাবে।’

‘আর লতকুতা?’

‘তর্কের বাইরে গিয়ে চূপচাপ বলে থাকবে।’

বলেই সমস্ত বেটন-বন্ধন মোচন করে উঠে পড়ল বনছাত্র। বললে, ‘লাঞ্চে ম’টা বলে। এবার হাফি হাই।’

‘চলো তোমাকে এসিয়ে দিই।’

‘শেষে আবার আমার তোমাকে এসিয়ে দিতে ইচ্ছে করবে।’

কিছু সরসিক আর বনছাত্রকে এগুতে দিতে চাইলেন না। বললেন, ‘আগছে উনিশ তারিখেই বিয়ের দিন ঠিক করেছি।’

বনছাত্র বুদ্ধের ভিতরে ঝিক করে উঠল। তারিখটা একমাস পার করে নয়। শুধু সুবের বন্ধতা বজায় রেখে বললে, ‘চাকরিটা কী করব ঠিক করতে পারছি না। হাবব না ছেড়ে দেব?’

‘এর আবার ঠিক করার কী আছে? ছেড়ে দিবি।’

হাঙ্গামা একবাক্যে পারি দিল।

হাঙ্গা মেয়ের হস্ত বনছাত্র। সিদ্ধান্ত যেন নিল। বললে, ‘তাহলে আগিলে এক মাসের নোটিশ দিই।’

একমাস যদি কোনোদিকমে রাখা যায় হসিত করে।

‘নোটিশ। নোটিশ কিসের? স্ট্রেইট রেমিগনেশন দিয়ে আসবি।’ সরসিক চাকরিটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন : ‘তারি তো আড়াই শো টাকা।’

‘কিন্তু আকিসের নানা কাণ্ডে আনার বেশ কিছু পাওনা হয়েছে। তা হাফি কেন? রেগুলার নোটিশ দিয়ে চাকরি ছাড়লেই সে সব পাওনা হাবে। নইলে হট করে রেমিগনেশন দিতে গেলে সব নষ্ট হাবে।’

‘সে কত টাকা?’

‘হাই হোক, ভাব্য পাওনা ছেড়ে দেবার কোঁনো দানেন হয়না।’

এই ব্যাপারে বনছাত্র বনছাত্রের পক্ষে গেল। পারান্ন হোক, তবু তা অকিত বিদ্ধ, এ কেসে আসবে কেন? তবে এক কাজ কর। তোর সব ফিল্টার তৌমিককে ভিজেন কর। তিনি তো হিমাণ্ডে বোসের বন্ধ। তিনিই ঠিক পরামর্শ দেবেন।

একটা নিতিবিলি সময় খুঁজে নিয়ে আছিলে বেবখ্যোতির সঙ্গে দেখা করল বনছায়া।

আজ আর যেন সেই ছিন্নছিন্ন বটখটে বেয়ে-কোরানি নয়, কোথেকে যেন একটু স্ত্রীতার আত্মতা এসে দিশেছে।

‘বহন।’ একটু নতুন চোখে দেখল তাকে বেবখ্যোতি। অজেন করলে, ‘কী ব্যাপার?’

‘ওরা সবাই ঢাকরি ছেকে দিতে বলছে।’

‘ওরা কারা?’

‘অভিতাবকেয়া।’

‘পাগল হয়েছেন! বিয়ে হবে বলে ঢাকরি ছাড়বেন?’ বেবখ্যোতি বিবক্ত মুখে বললে, ‘আলকালকার বাজারে বিয়ের রাম কী, আজ আছে কাল নেই। একটা ভাগলে আরেকটা পাওয়া যাবে। কিন্তু ঢাকরি? গেল তো গেল—’

‘কিছু বাবা দামাভা বলছেন।’

‘বাবা দামাসের কথায় কী হবে? বোদ মালিক কি বলে? দাঁড়ান, তিমাভেজই কোন করি।’ কনেকশান পেয়ে গেল চট করে।

বেবখ্যোতির কাটাকাটা কথান্তলি শুনেও কানে নিল না বনছায়া। হালির লম্বগুলি বিধ মনে হল। বোদ মালিক! ওর ইচ্ছেতেই বনছায়ার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে! ত কে? রিসিতার না বেবে উদার প্রলর কর্তে বেবখ্যোতি বললে, ‘চন্দকার বলেছে।’

আনত চোখ জুলে বলল বনছায়া।

‘বেশ তো আপনিই তহন না স্বকর্বে।’ রিসিতার মুখের কাছে এনে বেবখ্যোতি শুবানের বতাকে উদ্দেশ্য করলে: ‘মিস মল্লমহার এখানে আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।’

‘.ফ, বনছায়া?’ ওপার বিশ্বগ্রহর।

‘হ্যাঁ, বনছায়া।’ বলেই বেবখ্যোতি রিসিতারটো বনছায়ার নিকে বাড়িয়ে বলল: ‘মিস, বহন। যতামতটা নিজেই খেনে মিন।’

‘আপনিই তো খেনে নিয়েছেন।’ বনছায়া মুষ্টি আঘাত নত করল।

‘তহু নিখেরা পরিভার করে মিন। মিন, বহন—’

লগীয়ে কাঠ হয়ে গেল বনছায়া। কাঠের চেয়েও কঠিন সলাহ বললে, না।

মুহুর্তের একটা ভগ্নাংশে তছ বইল বেবখ্যোতি। তারপর রিসিতার জুলে নিয়ে নিজেই বললে ওপারকে, ‘উনি তোমার সঙ্গে পরে কথা বলবেন। হ্যাঁ, নিভুতে বলবেন। বুঝতেই পাছ এটা অক্লিঙ্গ—আমার কামরা—এখানে হয় না।’

ওপার লম্বায়েই বুঝতে পারল।

‘কী, টিক বলিবি?’ প্রজরমেয়ে হালল বেবখ্যোতি।

‘উনি ও’র মতামতটা কী বললেন?’ কর্তব্যর থেকে জালা মুছে দিতে চাইল বনছায়া।

‘চন্দকার বলেছে। একেবারে টিকঠাক বলেছে।’ বলতে বলছেন বেবখ্যোতি।

‘সেটা কী?’

‘তাই তো বলছিলাম আপনাকে, স্বকর্বে তহন। কান সার্থক করুন। কিন্তু, আজ্ঞা—’

সেখোয়াতি জ্বর বলল : ‘আজ্ঞা আপনাকে আমি আপনি বলি অথচ বিয়াক্তকে বলি তুহি—এটা কেমন হল ?’

‘কেমন হল তা বনছায়া কী বলবে !’

‘কিছু বিয়ের পর আপনাকে আর আপনি বলব না।’

‘বলবেন না।’ কিছু ব্যাকবাহই আশ্রয় চেষ্টা করল বনছায়া : ‘কিছু তাঁর মতামতটা তো বললেন না।’

‘অশুভ বললে। বললে বনছায়া যেমনটি চাইবে তেমনটি হবে। বনছায়া যদি চাকরি করে যেতে চায় করবে, যদি ছেড়ে দিতে চায় বেবে, সবতাকেই তার সমর্থন আছে। সর্বকক্ষে আপনার ইচ্ছাই বলবৎ হবে।’

‘তবু এইটুকু’ বেন এতে পুণ্যে দুশি হওয়া যাচ্ছে না এমনি আড়ষ্ট ভাবি করল বনছায়া। একটা হাস-মাইনে কোমলি মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি নই এমনি একটা স্থপার কথা তখনলই বুঝি বোল আনা আনন্দ হত।

‘না, আরো বলছে। বলছে, বোলসার বা মাইনের টাকটা ঐর নর। বনছায়া যদি চাকরি করে বহুসনের লংশর্শে এলে তার অভিজ্ঞতা ব্যাকবাহর জুয়োল পেতে চায় তাকেও সে রাজি ; নরতো ব্যক্তিগত বলে অব্যাহিত বিজ্ঞানে বই লিখতে চায়, লাবিত্যে বোল-টাইয়ার হতে চায়, তাকেও সে রাজি। বপুন চমৎকার বলেনি।’

একমুহুর্তে কোনো কথা কইতে পারল না বনছায়া। চুপকরে উঠল।

‘তবে আর কথা কী। সমস্ত সমস্তার সমাধান হয়ে গেল। আমি বললাম, তবে আনিয়েন্ট তারিখেই ততকাষটা হয়ে যাক। ও-ও তাকে হ্যাঁ করলে, বললে, আপনার বাবাহত নাকি তাই ইচ্ছে। তারিখ নাকি ঠিক।’

নিজের গুহতটো একপিণ্ড মূর্খতার মত মনে হল বনছায়ায়। ক্রততার ভাবি করে উঠে বললে, ‘চাকরিটা ছেড়ে দিতে হলে এক মাসের নোটিশ লাগবে ?’

‘তার আর বরকার কী। মনে এগুনি বরকার কী ! বিয়ের হুতে আগ্নে-পিছে কদিন ছুটি নিব। তারপর ডেউটা কেটে গেলে বিবেচনা করে বেখুন চাকরিটা চালাবেন কি না। যদি লাহিত্যটা বেশি এবল হয় লকল হয়, চাকরি ছেড়ে বেবেন। তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে।’

‘কিছু যদি আকই ছেড়ে দিই ?’

‘কেন আকই তো। আপনার বিয়ে হচ্ছে না। একেবারে তব লইছে না মনে হচ্ছে। আর আনিয়ার ডেট নেই ?’ বরদ আন্তে বেপে উঠল সেখোয়াতি।

‘আজ্ঞা আসি নরকার।’ একটু বেলে না গেলে কেমন বিশৃঙ্খল হয় তাই মুহুর্তে একটু হানল বনছায়া।

‘আর ভরদ। বিয়াক্তকে একটা কোম করবেন। ও নাকি আকিসে জুয়ার কোন করেছিল, আপনাকে পারনি। আর চাকরি ? চাকরি পরিতণকে ছাড়বেন না। নিজের দু-টাকাই দু-টাকা।’

কী আশ্চর্য, চাকরি ছাড়বার কথাটা তার মূখে এসেছিল কী করে ?

ও বরদ কথাও যাকে যাকে মূখে আনতে হয়। অভিনয়ের লজ্জা। রাগ সেখানে চেয়েছিল—

ভালোকার কোটাতে পারেনি বোধহয়—বেবেছাতি অস্থানে বেবল। যেন হিমালয়ের পলায় মালা
হেবার অস্ত্র আঁকই সে ছল বুড়োতে বসে গিয়েছে।

সমস্ত বাড়ি হিমালয়ের বন্দনার মূগ্ধ হয়ে উঠল। এত উদার এত আনুগত্য! এত প্রগতিশীল।
কতীয়ে ইচ্ছার কণ। চাকরি চাইলে চাকরি, সাহিত্য চাইলে সাহিত্য। চাকরি করে সাহিত্য
কিংবা সাহিত্য করে চাকরি। গায়ে কন মনে করলে প্রয়োজন, প্রসাধন মনে করলে প্রসাধন।

এবন কী কথা! কী করে জানানো যাবে! হটানো যাবে! আবার বিচানো যাবে। পালানো

‘কে?’

‘চিনতে পাচ্ছেন না?’

‘তোমার তো বেবেছে পাঞ্জিনা, তাই, ঠিক—’

‘পলায় স্বর শুনে চিনতে পাচ্ছেন না?’

‘পলায় স্বর শুনে মনে হচ্ছে কোনো মধুকী, ন্যহ—’

‘নাথের আগের অক্ষর বা?’

‘বনছায়া! তুমি?’

‘আমি ছায়া কোন করেছিলাম,’ নিবিয়া ধানিয়ে বলতে পারল বনছায়া : ‘সাত্বাণ পলায় না।’

‘সে কি, কবে, কখন?’

‘মানে, কোনটা বাজছে শুনে পাঞ্জি অথচ কেউ বহল না।’

‘সেটা তো আমার কথা।’ হিমালয়েরও হুঁকি করিয়ে দেওয়ায় লাগল : ‘তোমার বাজছে অথচ
বাইরে কেউ শুনে পাচ্ছে না।’

দুপুরে একটা নিবিবিলা যোতান বেছে নিয়ে হিমালয়ের কোন করছে বনছায়া। এ কোন
বাড়িতে বলে কথা যায় না—আঁকিলে তো আরো কঠিন।

‘তুমি আপনায় কাছে আবার একটা আবেদন আছে।’

‘কী আছে?’

আবেদন বোধহয় বুড়োতে পারেনি। তাই আরেকটু সহজ করল বনছায়া : ‘অনুগ্রহ আছে।’

‘বলো কী করতে হবে?’

‘বললে বাবেদন তো?’ লাগ লাগ কাত করে দিব চালে, বনছায়া পাল কাত করে মধু ঢালল।

‘সে কী, নিত্য বাবেদন?’

‘আমাদের দিন তো ঠিক হয়ে গেছে—’

‘হ্যাঁ, তাই তো শুনিছি।’

‘সেটাকে আরেকটু পিছিয়ে দিতে হবে আপনাকে।’ বনছায়া বিশেষ করে বেবেছে, আরো
দশ দিন পোলেই মোটামুটি তিরিশ দিন পরিত্যক্ত পার করা যাবে। তাই স্তম্ভের বললে, ‘বহন,
আরো দশ-বাঘো দিন পরে।’

‘কেন বলো তো?’

‘কারণটা আমার বাড়িতে বসবেন না।’

‘তুমি ব্যয়ণ করে বিলে নিশ্চয়ই বলব না।’

‘যে তারিখটা ঠিক হয়েছে তার তিনদিন পরেই একটা সিটাচারি কনকারেল হবে কটক—
সাতদিন পরে চলবে কনকারেল—’

‘সে কনকারেলে তুমি যাবে?’

‘হ্যাঁ, সেখানে বর্তমান কথা-সাহিত্যের উপর আমি একটা পেপার পড়ব। পেপারটা তৈরি করতে বেশ পরিশ্রম করতে হবে। ঊৎসবের সোলমালের মধ্যে পড়ে গেলে ভালো করে পড়াশোনা করতে পারব না, বাঙালীরাই না বাতিল করতে চায়।’

‘না, না, যাবে বৈকি। নিশ্চয়ই পেপার পড়বে। এর আগে তারিখ নিশ্চয়ই একটেকে করা কোনো ভাবনা নেই।’

‘বাড়িতে বাবাকে একথা বলতে পারিনি। সিটাচারি কনকারেলে পেপার পড়ার ক্ষেত্রে বিয়ে স্থগিত রাখার কথা তিনি বরখাস্ত করতে পারবেন না। সাহিত্যের চেয়েও বিয়ে তাঁর কাছে বেশি ইন্টারেস্ট।’

বিমাতে হেসে উঠল : ‘এখানে বিয়ে তো আর বন্ধ হচ্ছে না, স্থগিত থাকছে। এ ম্যাটার অব টেন ডেক অর দো। এটা তো ভাষা কায়দা।’

‘হ্যাঁ, স্থগিতের প্রত্যয়টা আপনাদের দিক থেকে আপনি করবেন, আপনাদের ব্যক্তিগত কারণে—’

‘তোমাদের কারণই তো আমার কারণ।’

‘কিন্তু সেই কারণটা আমার বাবাকে বলবেন না।’

‘তা কী করে বলব? কারণটা তো আমাদের ব্যক্তিগত।’

‘বন্ধ থাক। এবার তবে ছাড়ি।’

‘ছাড়বে?’

বনছায়া ছেকে দিল।

দুদিন পরে চিহ্নিত ঘুণে সরসিধ বনছায়ার ঘরে বেণী সিনেমন।

‘বিমাতে বেশি বিয়ের তারিখটা আরো দিন বেশেক পিছিয়ে দিতে বলল।’

‘কেন?’ উদ্বিগ্ন স্বরায় তার করল বনছায়া।

‘কেন তা তো বলল না।’

‘সে কী, কথা বিয়ে করার বেলাপ করছে, কারণ বললে না?’

‘না, ভাঙলে না। বললে, ব্যক্তিগত।’

‘তার মানেই, ষলমল করে উঠে পড়ল বনছায়া : ‘সত বরশেছে নিশ্চয়। এ বিয়ে তবে তেজে

‘না, তা নয়। তবে পরের তারিখ তো সেই কাঠামোই।’

তাখিল পাত্রমত বিয়ে, লখা মূলমুখি পাতলা দেল। বড় দেবী পরিক। বড় শাপলাস ঠাকুর।
এগারো তারিখেই স্রবীর বনছায়ার চুড়ান্ত হলিল। হুজু থাকব।



যাতাহারির চেয়েও বড়ো

গৌরীশঙ্কর দে

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী গুপ্তচরের রহস্য-ঘন সত্য কাহিনী

যাতাহারি আর যাতাহারি। যেহে গুপ্তচর সম্পর্কে কোনো কথা উঠলেই পোনা ঘাবে যাতাহারির নাম। যেসেলে ছাড়া আর কোনো নারী গুপ্তচর কল্পনাকালেও ছিলো না, কিংবা যেহে গুপ্তচরদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বড়ো, অধিকারী। একেবারে জুল ধারণা। নারী গুপ্তচরদের মধ্যে সব চাইতে বড়ো যাতাহারি মার্খা রিচার। যাতাহারি তেমন সুন্দরী ছিলো না; মার্খা ছিলো রূপে অলস! তার কাছে জ্বালের ধন অপরিণীম।

মার্খারের শিশুকাল কাটে জ্বাল আর কার্খানীর শীমান্তবর্তী লোভের অঞ্চলে। ওই বেপের জায়া রপ্ত ক'রে কলে আর বরলে।

উচ্চ মহাবিশ্ব পরিবারের মেয়ে। কোনো কিছুই অসম্ভব নেই। যৌবনে মার্খা উজ্জ্বলিতা, বুদ্ধিমত্তা আর ভীষ্ম মেয়েজগে সকলের প্রাণসংগে পাএই হয়ে ওঠে। তার উপরে ওর সুবন্দোবিনী রূপ। চোখের বিকলিতে লবঙ্গের তিলিক।

আরওকটা কারণও মার্খা সুপরিচিত হয়ে ওঠে। যে স্বপ্ন-লব্ধক মেয়ে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে প্রথম বৈমানিকের কাক নেয়, মার্খা তাহেই একজন। ১৯১৪ সালের আগস্টের যুরোপে বৈমানিক হওয়া, বিশেষ ক'রে মেয়েদের পক্ষে, বিরাট কৃতিত্বের বিষয় ছিলো। যাতাহারি তাহেই মার্খা ছিলো সেদিনের চিরোইন। একালের নারী মহাকাব্য হাজার মতো তার তখন মার্খা।

মার্খারের বিয়ে হয়েছিলো ক্রাসী সরকারের এক উজ্জ্বল কর্মচারীর সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অস্বস্তি ছিলো পতীর। কিন্তু ১৯১৬ সালে লড়াই করতে গিয়ে ততলাক যাত্রা হান। এই আঘাতে মার্খার বুক তেড়ে বেলে। ঠিকই কিছু চুপচাপ ঘরের কোণে থ'লে শুধু চোখের জল কেলবে এ-বকস মেয়ে নয় মার্খা। কাল ছাড়া ও থাকতে পারে না; নিশ্চিন্ততা ওর অভাবে নেই। ঘির করে কেললে। স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ গ্রহণের যে দায়িত্ব সে নিলে তা পাবারও নয়।

ক্রাসী কর্তৃপক্ষ বোম্বে মার্খা অসাধারণ মেয়ে। ওর বৈদগ্ধ্য-বল্লভ্য আর প্রতিশোধ স্পৃহাতে ওয়া আরো ভাতিয়ে তোলে। ওকে প্ররোচিত করে গুপ্তচর হতে। বোম্বেয় তাহলেই সে প্রতিশোধ

নিতে পাববে আশীর মৃত্যুর, জার্মানদের লব্ধাশ করবে। তখনই ওর মনে বেরে। তাকি করে হাঠ সতে লক্ষ্যে। ক্ষত-বিক্ষত-দুঃখিত মাথামে গুপ্তচর্য্যভিত্তিতে তালিম দিতে গুকে পাঠানো হয় স্পেনে।

হাজা ত্রেহোফ আলফনসো এবং তার ইংরেজ স্ত্রী তখন স্ত্রীস্বাধিকার য়গম করছিলেন স্পেনের উত্তর উপকূলস্থ সৌখিন পল্লর লাম সেবাষ্টিয়ানে। নীল সূর্য্যাসাগরেই অশান্ত ডেউ বারবার ডুটে এসে অধঃত গড়তে লাগে সৈকতে। স্বর্ধার-স্বর্ধাতে মারাকী সৌন্দর্য্যে অলস্তে হুঙ্কে লম্বত। সবু সবু হাটু-ধর, সঙ্গিত ধুই নেই। এতদল হাটু-ধর লিপ্ত পতীর হৃদয়ত্রে। সৈকত-সংঘরে নিরন্তর তৎপর, দেশ-বিদেশের অলঙ্কার গুপ্তচর। এখানে যে জার্মান গুপ্তচরেরা বেশ একটা খাটি দাঁড়ে তুলেছে। ইংরেজ এবং কংগ্রেসী সে সন্মার্কে প্রর্য্যকিৎসে। জার্মান গুপ্তচরদের ঘাই শের কতার তার পড়লো মর্ধার উপরে। মর্ধা উঠলো গিরে নাম করা এক হোটেলের। একমাত্র কোটিপতি লোকেরাই উই হোটেলের থাকতে পারে। সবাই জানলো কংগ্রেসী এক বনী মহিলা এসে উঠেছে হোটেলের। বুকের খুট-খামেলা এড়িয়ে নিরিবিলা থাকবার অজ্ঞ। তার কংগ্রেসী জানা-কাপড়ের বাহার বেধে ওখানকার মেয়েরা ভো-কিন্দার নীল হয়ে পেলো। আর মনের সংক্লিষ্ট গোলাক-পরা মর্ধাকে দেখে পুঙ্খের হুঙ্ক চকল হয়ে উঠলো।

জার্মানরা মর্ধাকে প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারলো না। হোটেলের দু এক হল্লা ত্যাগীয়ার পরেই হের ভট্টর এসে আলাপ করলো ওর সঙ্গে। হার দুই ডিম্বির খেলো একসঙ্গে। একসঙ্গে বেড়িয়ে পেলো কালিনোতে। কথার-কথার মর্ধা জানালো ও খুব আর্থিক অগ্রবিহার আছে। অথচ আশীর পরিবারকে ও এত অগ্রহণ করে যে সেখানে কিয়ং যেতেও মন চাচ্ছে না।

পরের হার, বখা হতেই হের ভট্টর বললেন মর্ধা যদি জার্মানদের হারে কাজ করে তবে তার আর্থিক সমস্তর সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে।

"কী কাজ করতে হবে?" তবার মর্ধা। হের ভট্টর তত্ত্বাত্বেই জানায় কাজটা গুপ্তচরের।

মাতঃমরিচাক প্রথমটায় তাকি হলো না। সে হলো মামকরা একজন মহিলা। তার সঙ্গে গুপ্তচর হুঙ্কা কি লম্বত! লম্বত যদিই বা হয় মর্ধা তা নিয়ে হের ভট্টরের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক নয়, সে আলাপ করতে তার জার্মান গুপ্তচর বিভাগের বড়ো কর্তার সঙ্গে।

"কিছু বড়ো কর্তা তো এখানে থাকেন না। তিনি থাকেন মাজ্রিনে" জানায় হের ভট্টর।

"তাকে সান সেবাষ্টিয়ান-এ আসতে বসুন, অবশ্য যদি আশাকে আপনারা গুপ্তচর হিসেবে পেতে চান।" বাস্তবিক মূঢ় লগায় জানায় মর্ধা।

দিন কয়েক পরে বখা বননী এক জার্মান তত্ত্বলোক এসেন মর্ধার সঙ্গে দেখা করতে। চেবায় এবং গোলাক-পরিচ্ছর বেধেই বোঝা যায় তিনি উই মেরের একজন কর্মচারী। হের ভট্টর তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো মর্ধার। তিনি মর্ধার হাতে চুম্বো খেলেন। মাক্কির রয়কা বুনে মর্ধাকে আক্সান জানালেন তার সঙ্গে একই বেরিয়ে আসবার লক্ষ্য। মাক্কিতে যেতে যেতে জানালেন তিনি ইম্পিরিয়েল জার্মান নেতির অধ্যক্ষ। বর্তমানে মাজ্রিনের জার্মান বুজবালে কাজ করছেন। অধ্যক্ষ দীতিমতো অতিষ্ঠ লোক। দু এক কথার পরেই উকিতে জানালেন মর্ধার প্রতি তার আকর্ষণ দুই কারণে।

মর্ধাও কদ লাহ মেয়ে নয়। সে এর মধ্যেই কেনে গেছে সত্যীত দল্লার বেধে আশ ঘাই করা।

যাক না কেন, গুপ্তচর হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে কোনো বিবহার পক্ষে। অধ্যক্ষের ইচ্ছিত গুনে যেন তার মুখ্য বাবার উপক্রম করছে, প্রথমে এ-রকমই জান করলো মার্খ। তবে জানালো অর্ধাঙ্গ অধ্যক্ষকে সে ব্যক্তিগত ভাবে গৃহস্থ করে। আরো বার করেও মের সাক্ষাতের পর মার্খ তাকি করে গেলো অধ্যক্ষের প্রণয়িনী এবং গুপ্তচর হতে। অধ্যক্ষ বোম্বার তখন করনা করতঃ পারেন নি ওই হুম্বর মুখের পেছনে কী ভাবাব প্রতিনিহিত্য বিকট অট্টহালি হাসছে।

মার্খান অধ্যক্ষ মার্খকে নিয়ে গেলেন মার্জিমে। ওর সঙ্গে পরিচিত হবার কিছু আগেই অধ্যক্ষ বিয়ে করেছেন। স্ত্রী বেশ সুন্দরী; যত্নস্বল্প। স্ত্রীর সঙ্গে তিনি মার্খারের আলাপ কতিয়ে ছিলেন। কিন্তু মনে তার কাছ করছিলো অপরোক্ষভাবে। স্ত্রীকে জানালেন মার্খ হাজে মার্খান গুপ্তচর বিভাগের নবতম কর্মী। স্ত্রীর চোখে কিছু পুরোপুরি ধূলা দিতে পারলেন না।

মার্খারের প্রথম উদ্দেশ্য লক্ষ্য হয়েছে। মার্খান গুপ্তচর বিভাগের ব্যক্তিত্ব সে করেছে। এবার তাকে আরো বাক্যাত্মী কাজ করতে হবে। সে সুযোগও এলো।

বিখ্যাত করাসী বন্দে না হাবিয়ার—এ কী বব্বের তৎপরতা চালেছে ত জানবার জন্য উদ্ভ্রত হয়ে উঠলো মার্খান নৌবাহিনী। মার্খানরা আশঙ্ক করছিলো আমেরিকা ঈশানিই মুখে যোগ দেবে। তাই ববি বর তবে মাকিও লৈত নিশ্চয়ই অবতরণ করবে ওই করাসী বন্দরে। তাছাড়া, দুঃখো জাতিও এবং নৌ-বৃহত্তর অভ্যন্তর সাম-সহকারীও নিশ্চয়ই তৈরী হাজে ওখানে।

ঠিক হলো মার্খান গুপ্তচর রূপে মার্খা কিয়ে যাবে জালে; সংগ্রহ করবে সে না মার্খান বন্দরের বব্ব। বব্বারবব্বর আদান-প্রদানের সুবিধার মত ওকে বেওয়া হলো মার্খানীর আবিষ্কৃত মতুন একটা 'অবুত কালি'। কালির বড়িগুলো এক ছোট বোতলের মত একটু বড়ো বাকলে তার আড়ালেই লুকিয়ে রাখা যায়। যেন ছুটির শেষে বাড়ি কিরছে এমন মেজাজে মার্খা প্যারিস হয়ে হাবিয়ার হলো না হাবিয়ার বন্দরে।

মার্খার অসাধারণ সাক্ষ্যে করাসী কর্তৃপক্ষ শুধু উন্নতিত বললে তুলে দেন, সীতিমতো উদ্বেজিত। মতুন 'অবুত কালি' কোথুৎলী ক'রে তুললো করাসী বিশেষজ্ঞদের। তারা পরীক্ষা কর ক'রে গেলেন।

মার্খাকে তো সবাই বাবার তুলে মার্জিমে। তবে তারের তাৎকালিক ঘটলো বব্বন তারা তখনলো মার্খানদের উপরে গুপ্তচরগিরি চালাতে দিবে তাকে মার্খান অধ্যক্ষের নর্দ-লুকিনী হতে হয়েছে। অসমেক ভো বিবাল করতাই চাইলো না। কারো কারো মনে এমন সন্দেহও আসলো মার্খানিত্য-নিত্য মার্খান গুপ্তচর হয়ে গড়েনি ভো? এই সন্দেহ বেশ কিছুকাল তারের মনে ছিলো। তা কেনে মার্খা ব্যক্তিগত ভাবেই মনে দুঃখ পেয়েছিলো।

কেন, পরবর্তীকালে যিনি ওর দুঃসাহসিক কার্যকলাপ নিয়ে বই লিখেছিলেন সেই ক্যান্টেন লেভল এক দুহুত্তের ভদ্রও মার্খার উপরে বিবাল হারাননি। তিনি জানতেন মার্খার মুখে হাউ-হাউ ক'রে আসলেছে প্রতিনিহিত্যের আগুন। নিজের বের-মন নিয়েও বতই ছিলিযিনি বেলুক জালের ভদ্র সে বা ক'বে হাজে তার তুলনা নেই। ক্যান্টেন লেভল লটিক ভাবেই বুঝেছিলেন মার্খা লক্ষ্যে মার্খানদের মনে সন্দেহের উজ্জ্বল হতে পারে এমন কিছু করা ঠিক হবে না। কামেই তিনি মার্খান গুপ্তচর রূপে কাজ করবার ক্ষমতাই ওকে না হাবিয়ার বন্দরে যেতে বললেন। তিনি যোগদে রাখা

করলেন যাতে করাশীদের কিছু পোশাক তথাও মার্চার হস্তগত হয়। অবশ্য, ক্রান্তির বিপদ হতে পারে এমন কোনো কথা নিশ্চয়ই জানতে মিলেন না।

কয়েক বস্তা পরে মার্চা আবার কিংরে গেলো মার্সিমে। ওর কর্তা এবং প্রেমিক কার্ভান অধ্যক্ষ তো ভীষণ খুশি।

কার্ভান নৌবাহিনীর গুপ্তচর বিভাগের বড়ো কর্তার পছন্দসিদ্ধি মার্চা। পরম বিশ্বাসভাজিনী। তাই কার্ভান নৌবাহিনীর তৎপরতার সবরকম খবর ওর নথিপত্রের।

আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন ক'রে কার্ভানরা তখন স্পেনের বিভিন্ন বন্দরে ইউ-বোট বোহাগত এবং রপসজ্জার সম্ভিত ক'রে চলেছে।

কবার-কবার মার্চা জানতে পারলো স্পেনের একটা বন্দরে দু' একদিনের মধ্যেই একটা কার্ভান ইউ-বোট আগলছে। মার্চা পোশানে করাশী কর্তৃপক্ষকে খবরটা পৌঁছে দিলো। কিন্তু যে প্রীলোক কার্ভান অধ্যক্ষের অভ্যর্থানী তার কথা প্যারিসের কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করতে পারলো না। ইউ-বোটটাকে অনাহুত বরা এবং আটক করা যেতো। কিন্তু তারা সুযোগটা নষ্ট করলো। যখন কর্তাদের হুঁশ হলো তখন ইউ-বোট বন্দর ভেড়ে চ'লে গেছে। ওরা বাগে- ফোতে হাত কানড়াতে কানড়াতে উগলতি করলো মার্চার কবার অভিযান করা মোটেই ঠিক হয়নি।

লা হারিয়ার বন্দরে মার্চার অসাধারণ সাক্ষ্যের খবর উত্থানে বালিনে পৌঁছেছে। কার্ভান কর্তৃপক্ষ ওর উপরে নতুন এক দায়িত্ব দিলো। এবার ওকে যেতে হবে দক্ষিণ আমেরিকায়। ব্রেজিল এবং আরজেন্টিনে বহু কার্ভান গুপ্তচর নানকতাসূলক কাজের জন্ত রয়েছে। পোশানে তাদের নির্ণেয় দিয়ে আসতে হবে। নতুন অস্ত্র কামিতে দেখা নির্ণেয়গুলি নিয়ে মার্চা পাড়ি দিলো দক্ষিণ আমেরিকার বিকে।

আগে থেকে সতর্ক ক'রে দিলো ক্যান্টন লেডজকে।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মার্সিমে ফিরে আসার পর কাকের পারিভ্রমিক হিসাবে মার্চা কার্ভানদের কাছ থেকে গেলো প্রচুর অর্থ। কিন্তু ব্যক্তিগত সুযোগের জন্ত সে অর্থ ব্যয় করতে ওর প্রবৃত্তি হল না; উদ্বেগ দিহির জন্ত সে কার্ভান অধ্যক্ষের সঙ্গে শোর; তা ব'লে অর্থের দানসা ওর নেই। কার্ভানদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ সে হান ক'রে দিলে প্যারিসে অবস্থিত করাশী গুপ্তচরসংস্থাকে এই অর্থ সংগ্রহটি আরো শক্তিশালী করে উঠুক এই মার্চার ইচ্ছা।

পরের বছর মার্চা আরো নানা কাজ করলো। ক্রান্তির হুঁচকি আরোহন তত্বল করার জন্ত কার্ভানরা যে পথে বিস্তারিত গম্যার্ণ ও অজ্ঞাত নানকতাসূলক সহজান ক্রান্তে পাঠায় করতো সেই পোশান সতর্ক অবিকার করলো মার্চা। এই অবিকারই ওই বছরে ওর সব চাইতে বড়ো কৃতিত্ব।

একদিন ও ব'লে আছে মার্সিমে ওর কার্ভান প্রেমিকের সঙ্গে; হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এলো। ক্রান্তে ওর মা ওকতর রোগে শয্যাপারী। মার্চা কীহতে ওক করলো। বললো নিশ্চয়ই করাশীরা ওকে সম্বোধ করতে ওক ক'রে বিয়েছে। সোচ্চা, স্বাভাবিক পথে ক্রান্তে বাবার চোঁটা করলেই ওকে করাশী পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। কাজেই ওকে যেন পোশানে ক্রান্তের দীঘল পার ক'রে দেয়া হয়। সুস্থদীর চোঁবে, অল পথে কার্ভান অধ্যক্ষ তো তখন গলে অল হয়ে গেছেন। লেদ-সকে হালি হয়ে গেলেন ওকে সাহায্য করতে। পাহাড়ের মাথ দিয়ে যে স্তম্ভপথ চলে গেছে ক্রান্তের

দিকে সে পথের গ্রহরীকের আগে থেকে জানিয়ে রাখা হলো। সীমান্ত পর্বত মার্খা পেলো টেমো। তারপর শীরেনিখ পর্বতমালায় অনুমানবহীন এক অকালের দুর্গম পথ দিয়ে জার্মান প্রহরীরা তাকে পৌঁছে দিলো। জ্বালে। মার্খা মৃত্যুতে পারলো জার্মানরা এই পথেই সামরিকতামূলক অব্যাহি জ্বালে পড়ার ক'রে। গ্যারিসে পৌঁছেই ফরাসী গুপ্তচর বিভাগে ভই পথের বনর জানিয়ে দিলো।

তিরতীকনের মতো থাকবে ব'লে মার্খা যখন জ্বালে চ'লে এসে। তখন ফরাসী গুপ্তচরবিভাগ মহাবুদ্ধির সব্বশেষে ঘেরে গুপ্তচর রূপে মার্খাকে সর্বোচ্চ সন্মানে ভূষিত করতে চাইলো। শ্রব পদক দানে গুপ্তচরদের এই সন্মানিত করার প্রথা চ'লে আসছিলো নেপোলিয়নের সময় থেকে। ফরাসী মন্ত্রীলতার অনেক সমস্ত মার্খাকে সন্মান দেবার প্রস্তাবে প্রথমে নাকচ ক'রে দিলেন। মুছেই সময় মার্খা একজন জার্মান অব্যাক্যকে নিরমিত বেরমান করেছে এ কথা কিছুতেই তারা গুলতে পারছিলেন না। সন্মান পাওয়া তো বুঝে বাবুজ, এক সময়ে জ্বালে মার্খার জীবন পর্বত বিপন্ন হয়ে ওঠে। সালটা ১৯৪৪, মুছেই উত্তেজনা অনেকখানি বিভিন্ন এসেছে তাই বলা; এইলে বহুতো মার্খার বিরুদ্ধে দেশত্যাগিত্যর অতিযোগনই উপাণিত হতো। শেহ-পর্বত অবন্ত সমস্ত ফরাসী কেটে যায়। মার্খাকে অর্পণ করা হয় নীজিরন অব অনার।

এর পরে ম্যাডাম রিচারের জীবন অস্ত পাচজন সাধারণ নারীর মতো। আবেদিকার ম্যাকোস্টোয়ানী এক ভক্তলোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তাকে সে দিয়ে করে। এর জীবনের বাকি সব বছর কেটে যায় সুখে শান্তিতে।

বিভিন্ন মুছে গুপ্তচর অনেক দেখা গেছে, ভবিষ্যতেও দেখা হবে। কিন্তু মার্খার মতো যেমনটি দেখা গেছে সে বহন গু:সাংহিকতা, উপবিতমুষ্টি, আর আত্মত্যাগ-স্পৃহা আর কারো মধ্যে দেখা যাবে কি?

—

প্রসিদ্ধ বুদ্ধিযোদ্ধা কমলনকে একবার একব্যক্তি প্রশ্ন করেন! আজ্ঞা সূঁচাযাত করবার সময় আপনার মনে কি একটুকু বহা আসেনা।

কমলন বলেন : আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু বহন তাবি আমি বহা দেখালেও প্রতিপক্ষ বহা দেখাবেন না, তবনি আমার মনে আর বহুর আধিপত্য থাকেনা।

কেয়া

অমিল কুমার তীর্থাচার্য

জগদ্বন্দ্বীঃ এ অকল তখন সান্দা-রাত্রিঃ হুয়েসেট চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত ছিল না।

ইতঃপুত বিকিশ্র জু'চায়খানি বাড়ি ;—তাইতেই আভিষেকের ছাপ। অংশপাশে বন-
ঝলের শব্দ। এককালে এখানে কেয়াবন ছিল। তখনো নাকি কেয়াফুলের সুগন্ধ সুবাস বকিণের
বাতেলে যেনে আসত। তাই এর নাম কেয়াতলা।

জাঙ্গিন বছরের বুঝা মাষ্টারবা এইখানেই কী সূত্রে একদিন এসেছিলেন। লম্বা ছিপছিপে
দড়ন—কালো দেবের রূপ। চেহারা আর কোন উল্লেখযোগ্য আকর্ষণই ছিল না। শুধু একঝোড়া
বারাশো চোখ। সেই চোখের দিকে তাকালে নাকি সন্মোহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই চোখের
বারাশো দুটি দিকেই তিনি পাঠ্য বিষয় বস্তুকে মননের মধ্যে লস্কারিত করতেন। অশিতি মাষ্টারবা
নিজেই একথা সর্বদা বলতেন আবারে।

আর প্রমাণ যত্ন খানকতক বিবর্ণ লম্বা চোঁট দেবারতেন—বার তাব'র সবুজ মনের ছাপ—
একঝোড়া বারাশো চোখের প্রতি সঙ্গের অস্ত্রাঙ্গের অকপট বীভূতি। কোন এক তরুণীর আরত-মিশি।
জাঙ্গিন বছর থেকে বয়েস এখন ছাপায়।

চিরদিন বছর ধরে বকিণ কলকাতার এই কেয়াতলা পল্লীতে মাষ্টারবা আছেন। কয়েকজন
ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে তাঁর কারবার। পড়ান খুব ভালো। প্রাইভেট টিউটর হিসাবে বেশ দাঁড় ভাক।
এককালে ভালো বোমবারও করেছেন। এখনো করেন। এই মাস্কি সত্তার দিনেও তাঁর আয়তের
অভাব নেই।

কেয়াতলার মোতলা এই বাড়িটির অনেক লম্বায়ে সাবিত হয়েছে। এ-বাড়ির পূর্ব দালিত
দ্বিবি ছিলেন তাঁর সুবাসেই মাষ্টারবা এখনো এসেছিলেন। তিনি কিংবা তাঁর পরিবারই এখন আর
কেউ নেই। তাঁরা চলে গেছেন আতো বকিণে। কিন্তু মাষ্টারবা আছেন। নিতের তলার দকিণদুখী
একখানি অপরিসর ঘরে সকাল-সন্ধ্যায় আঝে অনকয়েক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে পাকুয়ে তাঁর দিন কাটে।

মাষ্টারবা কে ?—কী তাঁর লম্বাক পরিচয়—আমরা এ-পাড়ার ইসানী-কালের অধিবাসী তা
জানিনে ;—শুধু এই দাঁদি মাষ্টারবার আপনজন বলতে আর কেউ নেই। শীর্ষকাল ধরে তিনি লম্বু
প্রাইভেট টিউশনি করে নির্মাতিপাত করেন। এখন সেই যোগা ছিপছিপে চেহারা বয়েসের তায়ে

হয়ে পড়েছে কিছুটা। যা আত্মা ক'লে। হয়ে গেছে। চোখ দুটি অবিশ্রান্ত থেকে থেকে জলজল করে। পাড়ার লকলেরই তিনি মাষ্টারেরা—সমাজের নিমিত্ত সংস্কারের ভ্রমলোক।

তিনিই বহুবার যেন এ-পাড়ার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সেখানেই পড় এখন আর পাওয়া যায় না। কলিকাতার চাকরি এলেও কমে। বড় বড় বাড়ি,—বাড়ানী বাড়ি, পাড়ানী বাড়ি, বাড়ানী কলমোপলিটন পড়। এখন এ-পাড়ার প্রবৃত্তি হোতল। বাড়ির বাকিগুলি এতদূর থেকে আর মাষ্টারের মতন একজন লোকের এতদূর বলালের অবিকার আর নেই; কিন্তু মাষ্টারেরা আছেন।

এ বাড়ির নতুন মালিক প্রথমে বিবর্তন চেষ্টাছিলেন; কিন্তু হিন্দুর মাষ্টিক ফেল করা তাঁর মেয়েকে মাষ্টারেরা বলা চলেছিল। আর এ-এ পণ্ড পড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রি পাইয়ে দিলেন তখন কলকাতা বলা মাষ্টারেরা একে এই অবিকারটুকু গৃহস্থানীকে বলা করতাই হল। মাষ্টারেরা অবিশ্রান্ত বলাবার ভাষা ভাড়াই নিয়ে থাকেন।

বলাবার দুটি লকলে মাষ্টারেরা কোন কালকর্য নেই। এদিন আর তিনি ছাত্র-ছাত্রী পড়ান না। এদিন তাঁরো অকাল মাপনের লাল।

আমি আলি মাষ্টারেরা যেন।

লাহিরা, লম্বা, রাশানীতি নিয়ে মাষ্টারেরা লকলে আড়া জমাই। প্রবৃত্তি জ্ঞান মাষ্টারেরা। লাকিয়ার লকলে বিজ্ঞান এমন কি অলকালকরে ব'ই এবং বাকিলাহিরা পণ্ড তাঁর নব-বর্ণণে। অলক মাষ্টারেরা অলকটে বাকি কলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রি বাকি তাঁর নেই।

ইলেক্ট্রিক স্টোটা মেলে নিজেই কলির লল চাপিয়েছিলেন মাষ্টারেরা। বলালেন, লকলে নেই। য় হর কলির প্রবাসই আলাপ করা বাক।

আমি বলালেন, 'লতিই কী কলার লকলে পেতেন এখানে?'

'হ্যাঁ, পেতাম। আর সেই আলাপের লতিটুকু নিয়েই এখানে লাকিলাহর কলিমে কলকলার অলকলার।'

কলিয়ার মধ্যে কিছু বেন ইতি ছিল। কিন্তু আর অলকল বলা লেল না। মাষ্টারেরা বলা লালেন অলকলি মেটর এলে বাকাল।

অলকল জৌড় ভ্রমলোক লাকি থেকে লাললেন; লকলে তাঁর একটি ছুট ছুটে তলী মেয়ে।

মাষ্টারেরা যেন হঠাৎ কলেন বেন পরিবর্তন লকল করলাম। তিনি কলেন বেন বিবর্তন বলাল।

আমিই লাললেন লু'লানি চেয়ার এলিয়ে লিলাম অলকলকলের প্রতি। কিন্তু তাঁর লেলিক লকল না করে ললালি মাষ্টারেরা লিক এলিয়ে লেলেন।

'আপনার কলিই এলি।'

'বলাল।'

জৌড়ভ্রমলোক মেয়েটির লিক অললি লকলে করে বলালেন, 'আমার মেয়ে কলকল লেন। ইকলিমে অনান' লিমে ডিগ্রি কলেন। অনান' লেল বিবর্তি কলিলাই লিক

পারি। পাঁচের পড়াভনার প্রতি বজ্র বেশি অহুয়াস। আমি আমি পড়ানোর ব্যাপারে আপনার অসামান্য হকত।'

মাস্টারমা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরকম বিবর্তা তাঁর মধ্যে এর আগে আমি আর কখনো দেখি নি।

'আমি অবশ্যই আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক নেব।'

তত্ত্বলোকের এ-কথাতো মাস্টারমার মধ্যে কোন প্রলোভনের আগ্রহ দেখা গেল না। বললেন, 'কিন্তু আমার সময় কই?'

তত্ত্বলোক মাস্টারমার হাতছোটা জড়িতে বেরে অহুয়াস বিনয় করলেন, আপনি আমার বাড়ি যেতে না পারলে না হয় শু এখানে এলেই পড়বে।'

মাস্টারমা কিছু কিছু করছিলেন। তত্ত্বলোক কিছু নাছোড়বান্দা।

কিন্তু তাতেও কোন সুফল ফলল না।

মাস্টারমা বললেন, 'ইকসমিঙ্গ আমার লাভকেই নয়। আপনি বরক কোন ডটরেট অব্যাপকের সঙ্গে কনট্রাক্ট করুন। পরমা বখন বরক করবেন তখন আমার মতন কোরাক—'

মাস্টারমার কথাটি শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটি এবার বললে, 'আমি কানি আপনার মেরিট।'

মাস্টারমা আবার তাকালেন মেয়েটির দিকে।

'একটি পণ্ডে আমি খানি হতে পারি।'

মাস্টারমার এ-কথার তত্ত্বলোক এবং মেয়েটি যেন আকাশের ঠান হাতে গেল।

মেয়েটিই বললে, 'বলুন।'

'রবিবার আমার বিজ্ঞানের দিন। এই দিন আর সপ্তাহে যে-কোন একদিন আমার এখানে শু তোমাকে পড়তে আসতে হবে।'

এ-আর এমন কী?—মেয়েটির কণ্ঠে উৎসাহের জ্বর উপ্চে উঠল।

'আর একটি শর্ত।'

'বলুন।'

'এরকম কোন পারিশ্রমিক নিতে পারব না আমি।'

মাস্টারমার এ-কথার মেয়েটির বাণ হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'সে কি করে হয়?'

'তা হলে অল্পই চেষ্টা যেখুন।' মাস্টারমা আর কোন কথা না বলে স্টোতে চাপানো কেবলির হাক এসিয়ে গেলেন।

বিমুগ্ধ তত্ত্বলোক কিছু কিছু করে বললেন, 'কিন্তু আপনায় গেলাম।'

মাস্টারমা বিরক্তিতা কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমার গেলাম থেকে নেবা অনেক বড় মিস্টার লেন।' কেবলির লল নামিয়ে মাস্টারমা ককির গুঁড়ো ঢেলে দিলেন ককি পটে। মাস্তাজান হারিয়ে কেলছেন তিনি। বয়সের উৎকট ককির গুঁড় হড়িয়ে গড়ল।

মিস্টার লেন এবং তাঁর মেয়ে কেতকী লেন মোটের চোপে বললেন। হাজার গুঁড়ের মোটেরের স্টোরে পথ পাওয়া গেল।

আনি বিম্বিত হয়ে ভাবছিলেন।

মাস্টারবা। সেই বিবর্ভ সখ্য হকের খানকয়েক চিঠি আবার বার করেছেন ; আর একপানি কটো। যেটি আমার তাঁর অন্তরঙ্গখনও এতদিন বেবিনি।

মাস্টারবা। টলতে টলতে এগিয়ে এলেন। তাঁর দেহ-মনে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা। আমার হিকে কটোটা মেলে বং বললেন 'বেখোতো তথা এই মেয়েটির সঙ্গে ছবিখানির কোন মিল আছে কিনা ?'

মিল আছে কিনা খোঁজা পক্ষ। হঠাৎ মাস্টারবার চোখই তুল। কিন্তু সে কথা না বলে মিছাল করলান 'মেয়েটি কে ?'

আমার প্রাণের উত্তরে মাস্টারবা। কীপা দসার বললেন, 'ও খোবচর কেহাং মেয়ে কেতকী।'

'কেহা কে ?'

'কেহা আমার ভূতপুৰী ছাড়া।' ইকনবিলে এহ. এ পরীকায় হারার লেকেও ফাল পেয়েছিল।

তার সৌন্দর্যেই আমার এ-বাড়িতে আসা।'

'লে কতদিন আগেকায় কথা মাস্টারবা ?'

আমার কথা বৃষ্টি তিনি শুনতেই গেলেন না।

তদন্তর অতলতার ভুবেছিলেন তিনি। হঠাৎ উদীপ্ত কণ্ঠে বণে উঠলেন, 'হ্যা, কেতকীকে পড়াব আমি।' অ'র কেহাং মতন বোঝান্টই করাব।'

কবি-পাভার সঙ্গে বরখানি চরে উঠেছে। মাস্টারবার কিন্তু দেখিকে ক্রক্ষেপই নেই,—তাঁর চোখ হুটিতে শুধু এক কঠিন সক্রের প্রত্যাশার দৃষ্টি—যে দৃষ্টি তিরিশ বছর আগে ছায়াশিখ বছরের গুরুন মুবকের ছুঁচোবে উদীপ্ত ছিল।

হোটেলের কোণের ঘরটার লামনে এসে এক তরঙ্গী বললেন—কেতরে আলতে পারি ?

নিশ্চয়ই—পর্দার ওপাশ থেকে উজ্জ্বল।

তরঙ্গী ঘরের মধ্যে ঢুকেই রাগতবরে বললেন—আপনিই কি মি: লমারলেট মনু ?

—আপনি কি ভাকেই খুঁজছেন ?

—হ্যাঁ। লোকটাকে আমি চাখ্কে দিতে এসেছি।

—কেন বলুন তো ?

—কারণ যা লতিয়া নয়, এমন সব অপবায় নারীকাতির উপর কেন ?

—আপনি কি নারীকাতির প্রেম লম্বন্ধে বলছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি সত্যিকারের নারী বেখেন নি ?

—এই মাজই বেখছি—আপনার মত নারীর বেখা পেয়ে সত্যিই আমি বড়—আপনার

হাতের চাখ্কে বেতেও আমার আপজি নেই।

একপাল বেলে জ্বলন্তী তখন ঘরের পাশে এসে বললেন।

কাজল গ্রহর

সঙ্ঘামহুয়ার অধিকারী

বসিয়া গার হ'তেই রাত্তার ভীড় করে গেল। লাগের মত লম্বা বেহটা এনিরে পড়ে আছে ডায়মণ্ডহারবার রোড। তেলের মত মৃদু তার বৃক্ষ। দীর্ঘ রক্ত রঙে ডায়মণ্ড-হারবার গিরে পৌছেছে। না, ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়ে আরও দূরে, কাকদ্বীপের দিকে দূর বাড়িয়েছে গর। দুপাশের সবুজ তরুণের মতো গিরে এঁকে বেঁকে এসিয়েছে রাত।

গ্রিহকৃষণ এ্যাক্সিলেরটের চাপ দিল। পাশে লম্বিনীর চোখের দিকে চেয়ে সাহায্য একটু হাসলো, তারপর হু'রাত্তে ঠিকারিৎ হয়ে একবার বায়ে আর একবার ডানে ঘোরাতে লাগলো, তার নীলরঙের ছোট কিয়টটা বিছাড়ের মতই ছুটে চললো।

সীমার চোখে তরের নিবিড় কুঞ্জন। গ্রিহকৃষণের বাহ স্পর্শ করে বললো—করছো কি? আত্তে ব্যঙেরা যায় না?

—না। আত্তে বেতে গিয়েই ত' গর জুল করেছি। এখন হাতড়ে বেড়াছি শুধু।

গ্রিহকৃষণের মুখে কৌতূহলের উজ্জ্বল। সে আবার বলল—ভয় করছে তোমার?

—করছে বই কি। যে স্পিডে বাজ? একটা এ্যাক্সিলডেট না বাবাও।

—এ্যাক্সিলডেট হ'লে জুখ বাড়বে না অন্ততঃ। জুনি আর আদি একলকেই বাব? পানিরে থাকবার আর গর পাবে না এবার।

—ঠ! কত সিম্বালে মূখ জুললো সীমার। বললো—আমিই বুঝি পানিরেই বাই?

গ্রিহকৃষণের মুখে বিমল হাসির ব্যাধা ছুটলো। বললো—বেশ হয় একটা এ্যাক্সিলডেট হ'লে। কীভাবে যে দূরে দূরেই তু বাকলো, কতুতে সে এসে হবে লম্বিনী। কপকে দৃষ্ণনের ছবি একই লকে ছাপা হ'বে—গ্রিহ বোল আর সীমা যায়। সমস্ত কলকাতার লোকের চমক লেগে যাবে। গহন না তোমার?

সীমা যেন শিউরে উঠলো। ডায়মণ্ডহারবার রোডে ঘোড়ার এ্যাক্সিলডেট। পাশাপাশি পোরানো দুটি বেহ—রক্তের তেলিতে আবৃত।

হেলেনবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল সীমার। তখন ইতুদে পড়ে সে। হঠাৎ একদিন সে কি হৈ হৈ কাত। পাতার পিঠাটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার বেশী কিছু শোনেনি সে।

কিন্তু তুমি একদিন। ক'লে বেয়েছিলো ছোট্ট একটি লবোন। দুটি বুধক আর বুধতীর একসঙ্গে আস্তরতা করবে লবোন। ছোট্টলব একটা ঘরে তাড়া দুজনে একসঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে রয়েছে। বেরের মুহুর্তে সেদিন কীভাবে পারেনি লিখাশীর হাণ মা। প্রচণ্ড লজ্জার প্রহর হ'য়ে গিয়েছিল তাহের সব কাহা। আর আত্মকে যদি লীমার মনে হল সে বেগতে পাড়ে সেই ছবি। ববের কাপড়ের দিকে আঙুল বেঁধে ফিলফিল করছে লজ্জা। ও কে? গ্রন্থের বিজ্ঞের বস্ত্রায় তারে উঠবে চারদিক। চেয়ে বেগবে লাভবহুর পিত্ত পংকর। আঙুল দিয়ে গ্রন্থদ্বয়কে বেঁধে বলবে—ওটা কে বাবা?

স' করে একটা বাসকে পান কাটালো গ্রন্থদ্বয়। লজ্জা তরে চোখ বুজলো লীমা। তার লগায় কাতর একটি লব ছুটলো—হ'ছে কি?

—“লব বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি

আমরা দুজন.....”

গ্রন্থ লীমার দিকে তাকালো। কিন্তু লীমার বুধে আত্ম ব্যক্তি লাইনটুকু এলো না। আলতো লম্বলম্ব আসে। গ্রন্থ আত্ম হ'য়ে বেগলো, সে বুধ বেন ভয়ে আর ভাবনার পাতে।

তু তু নয়, এক অপরাধী মনের লজ্জাও সবলে শীতল করছিলো লীমাকে। সে সচেতন যে গ্রন্থদ্বয়ের কীধনের স্বপ্নকে সে ছুঁতে চ'রে'মিয়ে গেছে। যে যে ক্রামল অধোতার দেহমার্গে জল হ'য়ে তরে পড়তে পারতো, কল্প গ্রন্থের লীমা পেরিয়ে সে আত্ম বিশেষে উভাগ হতে চায়। তাই দীর্ঘ লম্বলম্ব পড়ে গ্রন্থি কিয়ে এলো বধন লীমা বেন বিশাখা হ'য়ে গেল। মনে হ'লো তার মনের ব্যাঘাত মুছে কেওয়ার জন্ত সে নিজের বুধ থেকে সবটুকু রক্ত ঢেলে দিতে পারে। তাই প্রথম দিনেই বধন গ্রন্থি বললো—সেই আশেকার মত হুঁয় নয়, তার মনের কাছে তুলে বরলো নিজের মনের ইচ্ছাটা—তখন লীমা আর আগন্তি করবার কোন কারবই বুঁকে গেল না। তু একটা দিন তা? লজ্জা বেঁধে বিকলে কিয়ে আসবে। নির্জন মিত্রাণ লব তারিখওয়াহাতের।

অবশ লীমাই জানে, কত অনুবিধে তার হয়েছে এই লুপ্তগটুকু ক'রে নিতে। স্বামী ইন্দ্রের বেতমাস্কর। তার দৃষ্টি ও বেতমাস্কর দুইই কড়া। সে দৃষ্টি লামনে দাঁড়িয়ে নিখো কণা বলতে গেলে লজ্জিত হয়ে যায় লীমা। তবুও তাকে বলতে হ'য়েছে।

বলেছে, বড় বোন প্রতিমার শরীর খুব খারাপ। বাসিন্দে তার বাতীতে একটা দিন কাটিয়ে আসবে তু। না, বিকলে গেলেও চলবে না। প্রতিমা হাস করবে। ও বলেই দিয়েছে লজ্জা এসে লারা দিনটা থাকার কথা।

লীমা জানে লতাখর প্রতিমার বাতীর ছায়া বাড়াবে না। তার স্বামী কলকাতার এক নারী কলেজের অধ্যাপক। তাছাড়া প্রতিমার স্বামী অধ্যাপক বয়ের ছেলে। লতাখর লজ্জা করতে পারে না তাকে।

লীমার মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগের আর একটি দিনের কথা। সেদিনও ডায়ালিসিস হারবার এসে ছিল সে গ্রন্থের লজ্জাই। কিন্তু সেদিনের লব আত্মকে বেন কোন তুলনা হয় না। গ্রন্থ সেদিনও তার হাত ছুঁয়ে বসেছিল—যদি এতদূরিতক হয়।

—কোক না। নীমা হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে বলেছিল—তুমিও একলক্ষই যাবো ত' ?
হাততালি দিয়ে সে আনন্দের কণ্ঠস্বর—

—আজ্ঞে! প্রিয় হঠাৎ সুখ জ্বললো।

—যদি কি জানো, আমি তোমারই সঙ্গে একদিন লাক্ষ্যের পাড়ি দিতে চেয়েছিলাম।
‘মনে আছে সেই সপ্নবস্তুর আগের একটা দিন ? এই রাত্তাতেই তুমি আর আমি...

—সে কি তোলা যায় ? নীমার গলার স্বর গভীর ও আত্মী।

—যার বই কি। কেউ দিনগুলোকে জ্বলবার কাজেই গুণু সাধনা করে। না করলে নতুন
দিনের আলো তারা পাবে কি ক'রে ? কিন্তু তুমি...কেউ কেউ থেকে যায় তারা পারে না। তারা
পারে না তোমারই সংস্পর্শে সবচেয়ে বোকা। তাই না নীমা ?

নীমা সুখ নীচু করলো।

প্রিয়ের ঘোরাতে ঘোরাতে প্রিয় বললো—কি স্নায়বিক কঠিনতা বেখেছে। পাছে ? এটা কান্ড
হাসি, না ? মনেও ত' এখন মুগ্ধ হয়ে নীমা ?

—তুমি কি তাবো, মনটা বকুনি ?

—যাকে যাকে তাই ত' জাবি নীমা। নইলে মনের এত বড় বয়ল বর কি ক'রে ?

—আমার ঘোরাই ত বেখে যাচ্ছে গুণু। জানো না প্রিয়মা, মেরেই কত অলসতার ? এই যে
চুপি ক'রে পালিয়ে এসেছি আচ্ছ—

একটা পাখিও হঠাৎ হাতা পেলো গাভীটা। একবারে প্রিয়ের হ'য়ে হাতু কিরিয়ে হাসলো
প্রিয়। হাসির ভিসিক দিয়ে বললো—সত্যিই ত' ? এত বড় আশ্চর্য্যের একটা ঘটনা লুকোনো
থেকে যাবে চিরদিন ? কেউ জানবে না ? প্রিয়তা নীমা বাহের কি অলসতার ভাবনা...

—যদি খিঁচুই করবে গুণু তা'হলে নিয়ে এলে কেন ? যদি জানো, আমি চুঁকো, তুমি, তবে
জাবার কেন তাকলে ?

কথা বললো না প্রিয়ত্বরণ। তার না বলার গাভীবে ঘন বর্ষার মেঘচ্ছায়া। কিন্তু গাভী
কোণার চলেছে ? এটা কি ভায়ামগুহ্যবাহার হোত ?

—কোণার যাচ্ছে তুমি ?

প্রিয় সুখ অলসতার বেহমার করণ। কিন্তুকিন্তু করে নীমার কানের কাছে সুখ এনে সে বললো
—পব ঘোড় নীমা। হুঁকে পাচ্ছি না যে। মেঘের কত স্রোত আমি ?

নীমা আঙে আঙে প্রিয়ত্বরণের হাতু হাত রাখলো। তারপর গাভীর তাকলো—প্রিয়মা।

প্রিয়র মনে গড়ে গেল বর্ণবস্তুর আগে ডাকা। এমনি আর একটি কর্তব্যরকে। একটি আহুত
বিবর্ত কর্তব্য, যে কর্তব্যকে পব জ্বলিয়েছিল। ইতিমধ্যেই কলঙ্কের হাত প্রিয়ত্বরণ পড়া ছেড়ে পালিয়ে
গেল কলকাতা থেকে। আচ্ছ সে পালিয়েই বেড়াচ্ছে। কিন্তু এতদিন পরে সেই কর্তব্যের আবার কেন ?

নীমাকে তাকে নিয়ে নিয়েছিল প্রিয় গভীর হায়ে। বাতায় গাভী বেখে গভীর গুণের বেকিতে
হুণচাপ বলেছিল প্রিয়। তার সবল হাতবুটি নীমার নিশ্চয়গণে গুণু কাতর করছিল নীমার কোমল গুটি
কর। একটা আশ্চর্য্যের বীজিত হঠাৎ মনে সঞ্চিত কিরলো তার।

—কি নাম পড়তে পারবে? ওই যে লাগা আঁচাখটার নামে লেখা?

—না, পড়তে পারছি না।

—কিন্তু তুমিই লেখা আছে 'রিজেক্ট'।

—মনে হ'লে ডেকোরোডাক্টিয়ার কোন বন্ধের নাম।

—এই আঁচাখ 'ত' ডক ডেকে আবার ভালবে আসে। ভালসে 'ভালসে' উদাও হ'য়ে যাবে রিজেক্ট। কতদূর গিয়েছে?

হঠাৎ গভীর বিষম গতে বললো প্রিয়—একটা কথা বলবো সীমা।

—কানি? কথা বলতেই ত নিয়ে এসেছো। কিন্তু তার আগে বলো—ওই 'রিজেক্ট' বন্ধর লক্ষ্য ক'রে আমার নিয়ে সমুদ্রে ভালসে পাবে? তুমি, পাবে? গিয়েছে?

সীমার চোখের মিকে অশ্রুত দৃষ্টিতে তাকালো প্রিয়। তারপর বললো—তুমি? কোমার সাহস

ঠাৎ উল্লীপ্ত হ'য়ে উঠলো সীমা—আছে। বরো আমার হাত। বেগবে, যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই আমি যাবো। তুমি পাশে থাকলে চিরকাল হবে ভালসে রাকি আছে।

—আর কয়েক মাসের মধ্যে আমাকে আমেরিকা যেতে হচ্ছে কানো?

সীমা চমকে উঠলো—কেন?

তাই বলতেই ত ডেকে এনেছি। কাল রাতে যে বকস্ট' গেয়েছি, সেইটা তোমাকে জানাতে ডেকেছি। ললিসিটর এ. এন. বেবের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা শাক। বাবা বললেন। তারপর বক্তবের টাকার বিবেশ।

কে যেন বরক হিটিয়ে দিয়েছিল সীমার সুখে। তাকে কপ:কর মত হাস। পলার খব নেই। নিবিদ দৃষ্টিতে প্রিয় একটা হাত আঁকড়ে ব'রে ডেকেছিলো—প্রিয়না!

সীমার সেই কলিত কোমল হাত দুটু দৃষ্টিতে ব'রে বলেছিল—তর নেই সীমা। উপায় বার করতেই হবে। আর উপায় আপাতত: একটাই আছে। আমার বাবা দুবল কঠিন লোক। তাকে ভেজানো যাবে না। আমাকেই এখনকার মত নিরুপেক্ষে যেতে হ'বে। তাইত বলছিলাম—তুমি কি করবে এখন? যাবে আমার সঙ্গে? তেলে পড়বে? এ'ও কিন্তু সমুদ্রে তালার চেয়ে কম লোকের কাজ নয় সীমা।

সীমা যেন অদ্ভুতের হাতছাতে লাগলো—কোথায় যাবে তুমি?

—কি ক'রে বলি। হরত লক্টো কিবা সুসৌরী। কিবা যখন যেখানে আরগা মিলবে।

সীমা বললো—যাকে বলোনা কেন?

—বলছি ত কোন লাভ নেই। আর এই অবস্থার তোমার বাবাকে বলেও কিছু হবে না।

তাইত বলছি—চলো তেলে পড়ি যখনে।

ইতস্তত: করলো সীমা। কি যেন বলবে তাবলো। তারপর বললো—বাবা আমার রাকি হবে না? তবে সাহস হবে কিনা জানি না। কিন্তু তাহলে বাবা কতদিন বাস করে থাকতে পারেন প্রিয়না?

—হয়ত আজীবন তিনি আর আবার সুখ দেখতে চাইবেন না। কিন্তু সে কথা হাঙ্ক! আমি জানি তুমি যেতে পারবে না। আপাততঃ আমিই বাজি। কিন্তু তুমি যেন অপেক্ষা করেও।

কিন্তু কথা রাখতে পারেনি সীমা। প্রিয় চলে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ সীমা তুল্লো একদিন তার ঘিরে। সে অনেক চেষ্টা করেছিল। না বেহে কেঁবে অনর্থ বাখিয়েছিল। পলায় পাগড় কড়িয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। সাতদিনের মধ্যেই ছুটিয়ে গেল তার সুমারী জীবন। বিয়ের আগেরে এসে থাকিয়েছিলেন প্রিয়র বাবা নিকে। আর নিঃশেষে কোন এক শিকারতনের শিকল সজোখের হাত হয়ে প্রিয়ের পাড়ীতেই স্থায়ী হয়ে চলে গেল সে।

—প্রিয়বা!

পলকে চমক খাশলো প্রিয়তুষণের। কান্ডনের বোর কোমালো হ'য়ে উঠেছে চারদিকে। পিঠের হাত্যা হ'য়ে হু হ করে ছুটে চলেছে তার ছোট্ট কিছাট। হঠাৎ কালভাতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি বেহে লাগিয়ে উঠলো পাড়ী। সেই মতল দীর্ঘ পথের বুক বাড়িয়ে তারপরেই ছুটে চলেলো ভীতের মত পোকা। বিবা! প্রিয় তারছিল, বিবাই হ'লে জীবনে ব্যর্থতার মূল কারণ। সে বিবা করেছিল; কোর করতে পারেনি। বিবাল করেছিল একটু মেরের ভীততাকে। দুই হাতে হিঁক্কে না নিয়ে গিয়ে সে অপেক্ষা করেছিল, সময়কে এগিয়ে যেতে দিয়েছিল। জীবন কথা করেনি তার উপায়তাকে। অবশেষে সীমা ত লুকা তার লুচিও বর্ণীনা নীরব জীবনযাত্রায়।

—প্রিয়বা!

সীমার খর কি চরিত? প্রিয়তুষণের কানের মধ্যে কানের কর্ণধর বেন—“বাও বাও তুই বেগে বাও...” মেঘের ছায়া পড়েছে বাবে। আকস্মিকভাবে আবার চাপ দিল সে। স্পিডোমিটারের কাঁটা ঘুরে বাজে। তর কি সীমা? আমি ত' আমি তোমার পাশে।

আবার একটা বাজা। গর্জন করে উঠলো পাড়ী। আর সেই মুহুর্তে মনে পড়লো সীমার—পকের তার ছেলের কথা। আজ সকাল সকাল কেয়ার কথা। কিরে এসে হয়ত বাবেনা কিছু। বা না দিলে নিকে কিছুই নেবে না সে। কিন্তু...প্রিয়বা কি পালন হ'য়ে গেলো? আন্তে চাপাও একটু, হোকাই তোমার...

উঃ! কি মূল করেছে সে এসে? উভার মত হুহুকা বাহ জীবন—বুঝকে তার তার কেথায়? কিন্তু সীমার?

সীমা চমকে উঠলো। সত্যেশ্বর কড়া লোক, তুই বড় অসহায়। জানে মোটা মোটা বই পড়তে আর ছাত্র টেডাতে। এক মাস অল পড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা নেই।

বিদ্যায় বেগে একটা ষ্ট্রাক ঘেরিয়ে গেল পাশ দিহে। তবে চোখ বুকছিল সীমা। তার মনে তবের একটা রকাক রূপ একটু হ'য়ে উঠেছে। সত্যিসত্যিই যদি আকস্মিকভাবেই বাটে একটা?

ওঃ! কলনার পিঠেরে উঠলো সীমা। আবার চোখে তেলে উঠলো একটা ক্ষুণ্ণের ছবি।

—প্রিয়বা...

প্রাণপণশক্তিতে আত্মনার ক'রে সীমা খণ্ডেৎ বহলো। প্রহর দুটো। নাতীটা হঠাৎ হোড়
হুড়ে গিয়ে স্তিম করেছে। না বেশী কিছু নয়। একটা বাকানি দিতে পাশে মাঠের মধ্যে বেমে
পড়েছে শুধু।

সিঁরাহিরে হাতের ভর দিয়ে নিঃশেষ হ'লে তইলো। প্রহর। অগ্ন্যস্ত্রের আলোছায়ে
পাশাপাশি পরস্পর। একজন সে হ'লে হ'লে দেখছিলো। দেখছিলো এই অমৃত আত্মার মধ্যে
আলোর প্রসার যেমন অসীম, ছায়াও তেমনি নিমিত্ত।

পাশের দিকে তাকিয়ে হাসলো প্রহর। সীমা সেই। কিছুকণ আগে একটা দ্বন্দ্ব তাকে
কুলে দিয়ে এলেছে। তীক্ষ্ণ একটা শাবির মত সীমা কাপতে কাপতে ছুটে গেছে বনের দিকে।
আমি পুত্রের ছায়ায় ঘেরা বাটার মধ্যেই কিরে গেছে। এ সেই ঘেরা তার হাত ধরে এক অমর সন্ত
বাতায় ভালতে চেয়েছিল একদিন। প্রহর সিঁরাহিরের শেষ টুকরোটা ছুঁকে কেলে দিলো বাইরে।

ছিন্নতর মথের একটা দ্বন্দ্বের এককোণে বলে বর বর ক'রে কাপছিলো সীমা। হাতঘড়ির
দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো সে আবার। কলকাতা পৌঁচতে আরও একঘণ্টা ঘেরা।

উঃ! একটা মত বড় কাঁড়ার গাত বেঁকে কিরে এলাম। সীমা আপন মনে বললো। তার
হঠাৎ মনে হ'লো না'বাগীটোলো লেনের একতলা অফিসার ঘরটি বড় সুন্দর। বড় হুম্বর সেই ঘরের
শাক্ত নিরিবিলা আবহাওয়া।

সীমার মনে অধিরতা,—সন্ত বাতায় অধিরতা নয়,—তার ঘেরালে বাবা একটি ঘর—সেই ঘরে
পৌছানোর অর্থে অধিরতা। অধির তাবনার সে ভাবছে,—বালটা এখন কতের পতিতে ছুটে চলে
না কেন।

সার আলিভার লজকে একবারি প্রহর করেন : আগনি ত পরলোকতর ও প্রেতাভ্যা
বিষয়ে অনেক কিছু লন্ডন করেছেন। আজ, আগনি বলতে পারেন সত্যি কি
কৃত আছে ?

সার আলিভার বৃহৎ বেলে বলেন : খুঁই বিবাস করি। তবে সে কৃতওলো এখন
হালুৎ হয়ে আগনারই মতন জুত বেড়াচ্ছে আর আমাকে প্রহর করছে,—এইটা তকাৎ।

কারাজীবনে সাহিত্য সাধনা

নীলাজি সোম

কাঁধামণ্ড অনেকের পক্ষে মুহূর্তমাত্রের চাইতেও ভয়াবহ। মুক্ত অবস্থার বা নিত্যচেষ্টা ছিলো সফলতা সেই এককোটি আলোর ক্ষত বাহ্যকার করে বনৌষ্মন। পাছপাশা, আকাশ সবই তখন অদৃশ্য। প্রিয়জন ও বন্ধুগণের সঙ্গে দেখাশোনার কোনোই উপায় নেই। বন্দীরা মানে বৃত্তি ভিলে ভিলে মুক্তি।

প্রধানত দুটি কারণে কারাগার ভোগ করতে হয়। প্রথমত অসুস্থ বা হীন মুহূর্তের ক্ষত। দ্বিতীয়ত, আর্থনৈতিক কারণে। প্রথম পর্যায়ে অপরাধীরা প্রায়ই অন্তঃসার সাধারণ। চুরি, ডাকাতি, নারীহরণ, বা জালিয়াতি ইত্যাদি করার ক্ষত তাদের কারাগার ভোগ করতে হয়। কারাগারে গিয়ে এরা নিজের চুক্তি, স্বার্থ বা নিজেকে নিয়ে সামান্যতম চিন্তা করেই বিস্মৃত উপন্যাসের মতো নিজেকে কেন্দ্র করে রাক্ষসিন আল বুনতে থাকে। এদের কাছ থেকে সমাজ বা দেশের আশা করার বেশি কিছু থাকে না। কিন্তু আরেক শ্রেণীর মানুষও মুগ-মুগে কারাগার ভোগ করে আসছেন। এঁরা বিশিষ্ট মাতৃ, এঁরা মনীষী। তবে কেন এঁদের কারাগার ভোগ করতে হয়েছে? কারণটা রাক্ষসিনিক। এঁদের স্বাধীন চিন্তা অনেক সময়ই রাষ্ট্রের কর্তব্যের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে থাকে। লক্ষ্যভেদে নিয়ন্ত্রণের ক্ষত তাই এঁদের দেখা হয়েছে। লজ্জাটিকে পেছায় মুহূর্তমাত্র করতে হয়েছে। হুমকি পান ক'রে। বীতশ্রীকে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে। জনবিদ্রোহ। আবার অনেক বৈধ বাকার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু ভোগ করতে হয়েছে কঠিন কারাবাস।

কিন্তু দ্বিতীয় হয়েও এই মনীষীরা মস্তক উজ্জ্বল রেখেছেন পূর্বসূরীর মতো। বাগের ক্ষমতা আছে, প্রতিভা আছে, কারাজীবনে বেগবা, লক্ষ্যের আঁড়ালে থেকে বাণ্যতমূলক অবস্থার হস্তে ওঁরা পুঁজি করেছেন দোলাপ। বাইরে ছিলো নানা ব্যস্ততা, নানা কর্তব্যের আয়োজন, বিভিন্ন মাতৃয়ের অন্তরীন লক্ষ্য। কারাজীবনে সেবে এলেছে অবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান, প্রচুর সময়, অবিরাম নিঃসঙ্গতা। একাকীত্বকে অভিযোগ মনে না করে, আশ্রয় রূপে মনে নিয়ে এইসব বস্তুর মাহাত্ম্য রচনা ক'রে গেছেন অমৃত কাব্য, মুক্তাঙ্কুর সাহিত্য। কারাজীবনের অস্বস্তিকার আকাশে বলবল ক'রে উঠেছে তাদের মনোর বিচিত্র ভাবনার ভাবের নক্ষত্র। মনোভার মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে এঁরা মনে বিস্তার করেছেন সুগন্ধ। তাই আমরা দেখি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর পুঁজি যে মানসার মেল ছিলো কয়েকীরের আঁতড়, যে দেশের ভয়াবহ রূপ উন্মোচিত হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একখানি পত্র, সেই মেলে ব'লেই শান্ত সমাহিত মোক্ষমাত্র তিলক রচনা করেছিলেন শ্রীতার ভাট। বিশেষের সাহিত্যের ইতিহাসেও আমাদের চোখে পড়ে এমনি করেতজন অসাধারণ মাহাত্ম্য।

মহাত্ম্যের কারাগার যে কী ভয়াবহ ছিলো আজ আমাদের পক্ষে ভা কল্পনা করাও অসম্ভব। মাতৃর তপস্বী অস্বস্তিকার মুহূর্তে পৃথিবী থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটাতে হতো বছরের পর বছর; হস্ততা সেখানেই কেসমতা শেষ নিঃশ্বাস। তার মুহূর্ত বধর পৃথিবীর উপরে কোনোদিনই আর পৌছাতেনা। শের-শকর এক কারাজীবনে ব'লেই বেবিয়াস রচনা করেছিলেন ওঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বি কনসোলেশনস অব কিসলফী'।

ক'এলও ভোগ করতে হয়েছিলো কবি সেই জন অব দি জনকে। 'কমেটোরী' জন সেইট মাধু' হার অফ গ্রিহাস্' এর এত নাম, সেই গ্রহের অল্প কাহ্নাগারে।

পতু'পালের এক মঠের তুগঠক কাহ্নাগার। আলো নেই। অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। তার ঘো বসেই তখন করে কুতানন রচনা করলেন ডেলিডের জোড়ের অপতপ তার।

শ্রোনের সর্বকালের ঐষ্ট ঔপভাসিক সাংকেনটিল। তাঁর রচিত 'ডন কুইজোট' বইখানার নাম পৃথিবীর নানাদেশের স্থলের ডেলমেয়েহাও আছে জানে। সেই ঔপভাসিককেও একবার কাহ্নারও ভোগ করতে হয়েছিলো। বাববারির কাহ্নাগারে বলে বসি করলেন শ্রোনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি 'ডন কুইজোট।'

জ্ঞানের রাধা হওয়ার আগে অরলিরেয়ের তিত্তিক হারান দুই বুর্গ-এর দুর্গে বহুকাল বন্দী ছিলেন। এই সময়টা তিনি কাজে লাপান পড়াভনোহ। এর কলে পরবর্তী জীবনে প্রজাতীয় পালক রূপে যুরোপে তাঁর ব্যক্তি।

মেরোসেরও কাহ্নারও ভোগ করতে হয়েছে। কহ্নানী হাফ চতুর্থ হেনরীর স্ত্রী মার্গারেট পুতর-এ কয়েদী ছিলেন। এই অবস্থার থেকেও তিনি সাহিত্যের অংশীদার ক'বে গেছেন।

তার ওয়াটোর হ্যালের অলমাসে গ্রহ 'হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড' প্রতিভেরা আছে। সমাহারে লকে পাঠ ক'বে থাকেন। এই গ্রন্থখানি তাঁর এগারো বছরের কাহ্নাঙ্গীবনের কলঙ্কিত। সামরিক তৎপরতা ও বৌ-বুড়োই তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তাই কাহ্নাঙ্গীবনের নিতৃত অবসর না পেলে তিনি বোধ হয় লেখার অমন সুযোগ আর পেতেন না।

জ্ঞানের কুখ্যাত বাতিল দুর্গে তন্টোরকে দুবার কারাকন্ড করা হয়।

'ধেনবিয়াড' গ্রহের পরিচরনা শুধু নয়, এই গ্রহের বাবো আনা লিখে ফেলেন।

রাহ্মেরাথে পড়ে কাহ্নাঙ্গীবন করেন জন বেনিয়ান। কিন্তু তাঁর মন ছিলো বানীন। জয়গ শেষে রচনা করলেন 'বি পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস'। হানস কীর্বাঙ্গীর লম্বুবে তেবে পড়েছিলো কাহ্না প্রাচীর।

রাহ্মনৈতিক পুত্রিকা লেখার অপরাধে ডিকো-কে নিউগেটে করেন ক'বে রাধা হয়। এই সময়ে তিনি 'রিভিউ' নামে বে সাময়িকীয় হচনা করেন, বিখ্যাত সম্পাদক স্টীল পড়ে তারই অহুসরণে কান্দ বের করেছিলেন।

মাদ্রের বেহকে বন্দী ক'বে রাধা যায়, কিন্তু তার মনকে কে কাহ্নাগারে রাখতে পারে? পৃথিবীর সব চাইতে পরজাত, বৈরাগ্যেরা পালকেরত সে কমতা নেই। অনেকে কাহ্নাঙ্গীবনেও মুক্ত। কাহ্নাগার ভাদে কানার অভ্যর্থনা। বহন মুখল চরণ বন্দনা ক'বে করে নমস্কার। সমাজ ও পৃথিবীর কাছ থেকে নিবাসিত হয়েও তাঁরা সমাজ ও পৃথিবীকে উপহার দিয়ে দান নিতৃত মনের বদি-মুক্তা, অবসরের সোনালি কলম।

একুপা কঠোর

শতীন রায়

কয়েক মাল আগে গ্রাম প্রতিমা সেই লমোবের বাজেট করার সময় বাসভী এখন কিছুতেই মেলাতে পারত না আগের সঙ্গে বাজতে তখন সে বলত, তোমার কাগজটা আসছে মাল থেকে বন্ধ করে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের তান নিয়ে বলে উঠেছি—“বোকাই তোমার, তুমি আমার আগের মাহ বন্ধ কর টিকিন বন্ধ কর কিন্তু ববরের কাগজ আর চা-টুকু কেন বন্ধ করেছে না।”

ববরের কাগজের পরমাটা এর কাছে সম্পূর্ণ বাজে ববরের গর্বায়ে ছিল—ব’লক মাল দু’তিন অস্তর পুরোনো কাগজ বিক্রি করে যা দু-পরমা পাওয়া যেত তা এর কাছে বাড়তি আর হিসেবে বেশ আনন্দের লক্ষ্য করত।

সে ইমিতক দিয়েছি। তবু বলত ক পরমার দরকার নেই। এরিকে যে সামলাতে পারছি না।

আমাদের মত সামগ্রিক জীবন অভ্যাসের অনেকের কাছেই লকালে চা আর ববরের কাগজ অপরিহার্য। হুটোর একটার অভাব ঘটলেই পানের ঘুরার মত ঘুরে কিংবে বলই মনে হাখে—কি কেন থাকি বহু পেছে। তবু তাই নয়—আমি যে কাগজটা রোজ নিই সেটার বহলে একই গর্বায়েই অল্প কাগজ দিয়ে পেলেও অল্পস্বিত হকারের স্বাভায়ে অল্প মেজাজের কটুফি ছোটে। কাগজের মাল টাইগর একই রকম না থাকলে মেজাজ টিক থাকে না।

বাসভীর প্রত্যাহার উত্তরে “আমার মাহ টিকিন” ইত্যাদি বন্ধ করতে হাঝা পলাই বললেও আমার সত্যিকারের কষ্টটা লম্বে বাসভী ওয়াকিবহাল, তাই লম্বে বাসভী লম্বে হুতি—হুতির হোকানের বাব বা সোয়াশার থাকি ইত্যাদি মেটাওয়ার চেষ্টা করেছি কাগজ বন্ধ করে দিয়ে।

কিন্তু মাল-তিনেক পরেই লম্বে বাব লরিং বাসভী বন্ধ করে মিল কাগজটা। ওরূপের হোকানের তখন করেচাটা ঢাকা হয়ে গিয়েছিল।

আমি আবারের মত লোকের কাগজ নেওয়াটা বিলাসিতা, কিন্তু তবু সেই বিলাসিতাটার অভাব হ’লে গিয়েই হুতি হয়েছে। এখন হুতি যে আমাদের মত লোকের বিয়ে কতাটা বিলাসিতা তাই বলে দিয়ে কতারপর বটকে কি বাব দিয়ে দিতে পারি।

মনে আছে, প্রথম যেদিন লকালে কাগজ পেলাম না ছোট ঘরের কাছ থেকে তার গ্রিহ বেলনা কেড়ে নিলে সে যেদিন আতঙ্কে কাহার তেড়ে গড়ে তেহনি একটা কষ্ট আছে গড়েছিল আমার হুকে, মেজাজটা খুঁজ হয়ে উঠেছিল অকার্যবৎ। সেদিন বেকার মন নিয়ে চাহের কাগজ নিঃসেধ করে খুঁজ গায়ে বাজারে বেরোলাম খুঁজ করে যাচ্ছে বলি না নিয়ে। তারপর সেটা নিতে কিংবে টোমেটিক কয়েছিলাম লম্বেই তাপা বলিটা দেখতে না পেয়ে। তারপর বিক্রি কিনতে গিয়ে বিক্রি হোকানের তেরের ঠাক করে গড়ে বাকা একটা কাগজ বেবে একটা লোভ আর লম্বে টানা-হ্যাঁকে লম্বে কয়েছিলাম কিছুকণ। বিক্রি নিয়ে পরমা করেই নিয়ে জনতে বেরী করলাম বসে—তারপর বিক্রি

বহাশানও, কিন্তু তখনও ঠিক ক'রতে পারলাম না কাগজটা ঢেঁচে নিয়ে দেব না, চাইব না।
পৰ্বত চলে আমার ঠিক আগের বুদ্ধিতে হঠাৎ ঢেঁচে বললাম কাগজটা লম্বা লম্বিরে বেঁধে।
কিন্তু মনে হ'ল ব্যাপারটা বুঝই সোজা। কাগজটা দেখতে চাকরা পক্ষ নয় এমন কিছু।

কিন্তু তবু প্রত্যাহাই আর বিক্রির হোকানে চাইতে পারতাম না কাগজটা। নিজের সৈন্তের
লম্বাই বুঝি বাব সাহস। কোন কোন দিন দেখতাম অজ্ঞে পড়ছে। তাড়াতাড়ি ও কাগজটা আমার
তৃপ্তি দিত সামান্যই। তবে হোক অকিল বাবার সময় বাসে উঠে চোখ ছোটোতাম কার হাতে কাগজ
আছে খুঁজে বার করতে। তারপর আগে আগে ভীড় হৈলে সেই তত্ত্বলোকের পাশে বা লামনে
গিয়ে দাঁড়িয়ে ঢেঁচে নিতাম কাগজটা। বা সেই তত্ত্বলোককে গিটে বসে পড়তে দেখলে উঁকি স্কিকি ঘেঁরে
বা কিছু অংশ ঢেঁচে নিয়ে চোখ বুলিয়ে তৃপ্তি কুড়োতাম কিছু কিছু। তবে যেদিন আমার অভ্যাগিত
ইংরেজি কাগজটা পেতাম সেদিন অনেক পাণ্ডার আশে ভরে উঠত মন। অল্পত এত ভর্তে অনেক
তত্ত্বলোকেরই বিরক্তি অসন্তোষ পেতে হয়েছিল অনেক লম্বিতে।

সেদিন একটু ভাতভাতাভিই বেরিয়েছিলাম। ভাতভাতাভি মানে আর বটোটাও আসে। অকিলে
সই করে একবার ইমসিভিয়েল অকিলে বাবার ব্যবহার ছিল। বাস-উপেক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম— হঠাৎ
চোখে পড়ল—আমাদেরই অকিলের তবে কোন সেক্সানের বা ডিপার্টমেন্টের জানি না, বুঝ চেনা এক
তত্ত্বমহিলার হাতে আমার প্রিয় ইংরেজি কাগজটা, সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা পারার ভজ্ঞে একটা লোভ বাধা
চোঁকি নিয়ে উঠল মনের মধ্যে। তারপর মজরে পড়ল আরও এক তত্ত্বলোকের হাতে রয়েছে একটা
বালা কাগজ, কিন্তু মনটা ওই ইংরেজি কাগজটার অজ্ঞেই আকাজ্জনা করতে লাগল বেশী।

শেষ পৰ্বত ঠিক করলাম সেই তত্ত্বলোকের কাগজটাই দেখব। লম্বা লাগতে লাগল তত্ত্বমহিলার
কাছ থেকে কাগজ চাইতে।

ইতিমধ্যে বাস এসে গিয়েছিল আমি সেই তত্ত্বলোকের সঙ্গে সঙ্গেই উঠেছিলাম কিন্তু
ঠেসাঠেসিতে দেখলাম এসে পড়েছি লেডিস সীটে বসে সেট তত্ত্বমহিলার সাহসে। আর একটু হৈলে-
হৈলে এগোলেই পৌঁছতে পারি সেই তত্ত্বলোকের পাশে কিন্তু ওই ইংরেজি কাগজটার লোভ আমার
আমার বিজ্ঞে করল, শেষ পৰ্বত পারলাম না—ঢেঁচে বললাম কাগজটা লম্বার বলাই না বেঁধে।

কিন্তু হটনাটা আমার সাহসে একটা স্বল্প সমাধান হাফির করল। বুঝলাম হোক একটু আগে
বেরিয়ে তত্ত্বমহিলার লম্বাদামী হ'লে আমার কাগজ পড়ার চাফিলাইলু মেটাতে পারি।

তাই তত করলাম পেরেবিন থেকে। কিছু কিছু কথাবার্তাও হতে লাগল—বাস-উপেক্ষ থেকে
অকিলের লিফট পৰ্বত। বাস থেকে নামার আগেই কিয়তের বিতাম কাগজটা। একদিন কবার
কবার বললাম আমার ওই বকম তবে কাগজ পড়ার পেরেবন কাগজটুকু তখন অভিজ্ঞত হ'লে তত্ত্বমহিলা
বললেন—“আপনি এক কাছ করলেই পাবেন—কাগজটা আপনি ওই বকমতাবে বাসে দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে কই করে না শজ্ঞে লেফলানে মিরে-গিরে পড়লেই পাবেন। তারপর আমার আমার লেফলানে
না হর দিয়ে যাবেন।

ওর কথাগুলো বেশ সহজকৃতিতে ভেজা বলেই মনে হচ্ছিল। প্রত্যাহটা পুকে নিলাম। জিজ্ঞেস
করে কেবে নিলাম তাঁর লেফলান ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি। মিরে বিলাম আমারও হবিন। বার
জানলাম—খোতা লম্বার। ঠেঁনা।

ক্রমে বেশ আলাপও হয়ে গেল, আঘাট চেয়ে বহলে অনেক ছোট। আমাকে ‘মদা’ ‘মাঝা’ করতে লাগল। আর তাকে আলাপ বলতে মিল না।

কতদিন কিরেওছি একলগে বসে ক’রতে করতে। বাস থেকে মেয়ে কেবাব পথে আমাদের বাড়ীর গলিটাই আগে পড়ে। শোভাকে ইটতে হয় আরও মিলিত করে। কতদিন ডেকেছি আমাদের বাড়ী আসতে—‘আসব আসব’ করে আর ওর আস’ হ’য়ে ওঠেনি।

কবীর কবীর হাসতাকে বলেছিলাম একদিন শোভা সবকারের কথা। তা শুনে হাসতীর সব বেশি শুকিয়ে যায়। বলে ওঠে—“তুমি একটু তোরে উঠে লাইব্রেরী থেকেওত কাগজটা পড়ে আসতে পার। এই ত পালের বাড়ীর সুবীণবাহু তোম তাই করেন। আর লাইব্রেরীতে গেলে অনেক রকম কাগজ পড়তে পাবে।

আর একদিন হাসতী বলে উঠেছিল—“বেশ ওসব মেয়েকে বেশী প্রেমহাসিও না ওয়া ভালো নয়।” আমি কিব কেটে বলেছিলাম—“ছিঃ ছিঃ, কি হাতা বলছ।”

হাসতী একই পলায় বলেছিল—“আমি বা বলছি—ঠিক বলছি। তাহাজা তোমাকেও আমি জানি...” বলেই চলে গিয়েছিল বর ছেড়ে।

তারপর এই দিন চারেক হ’ল আমি হঠাৎ স্কুলে আক্রান্ত হ’য়ে পড়ি। প্রায় আড়াই দিনের পর আর ছেড়েই সমরতে। কিন্তু দুবল ক’রে বিরোধে আসত। বিদ্যান ছেড়ে উঠলে মাঝা বোরে। অমত এই ভাবে শুয়ে থাকতেও মানসিক কষ্ট হয় অন্তর। ক’দিন বয়ে কাগজ পড়তে পাইনি। এক সময় মনে হচ্ছিল আমি যেন চলে গেছি পৃথিবীর বাইরে। কখনো মনে হয়েছে এই প্রিয় পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধহীন কোন একটা কারাগার এলে পড়েছি। বিরোধে পাকরা হেঁচা লকহিতাটা নিয়ে দুপুরের কিছুটা কাটিয়েছিলাম। তারপর বিকেলে জাঃ সুপার এল। বলল তালই তবে বিলার বরকার।

ডাক্তার চলে গেলে বরকারটা আর বড় কথা হয়নি সম্পূর্ণভাবে। বোলা অংশটুকু দিয়ে দেখতে পাওয়া গলির চলমান জনতার দিকে তাকিয়ে সময় হারাচ্ছিলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা—ফেলেমেয়েরা বেলতে বা বেড়াতে গেছে, হাসতী বাবুয়ে। হঠাৎ বরকার সামনে বেবি শোভা সবকার। যেমন বিশ্রিত হলাম তেমনি আনন্দিতও হলাম অন্তর।

পোতা সোজা চুকে এসে টেবলের ওপরে হাত-বাগ আর কাগজটা রেখে আঘাট শিরের পাশে বাটেতেই বলে পড়ে গাঁবাতের সহায়কৃতিমর আত্মলকটা কপালে ছুঁয়ে অস্তিত করতে লাগল তাপ। তারপর ব্যাকুলভাবে এর করতে লাগল অল্প সময়ের ও ডাক্তারের নির্দেশ সম্বন্ধে। সঙ্গে সঙ্গে হাতও ধোলাতে লাগল মাঝার।

পোতা বলল, বে. সে আমি না বাকরতে বেশ উত্তর হয়েছিল। হোকই তবে “কাল হরত আসবেন।” তৃতীয়দিন অর্থাৎ পঞ্চকাল লেকলানে কোন করেও জানতে পারেনি কিছু। ঠিক করেছিল আগবে যেনতে। তারপর আঘাট ভেবেছিল ঘনি-বাড়ী ছেড়ে অত কোথাও গিয়ে থাকি।

আজ সকালে লেকলানে কোন ক’রে জানতে পারে যে আমি চিঠি দিয়েছি স্কুলে আক্রান্ত হয়েছি বলে। তাই অকস্মিকেরতা চলে এলোহে।

বেশ পর করছিলাম—হঠাৎ পেছন থেকে হুড়ির একটা পরিচিত শব্দ কানে আসতেই বাকু তুলে ফিরে বেবি বয়ে হাসতী ঠাড়িয়ে। আঘাট দিকে বেশ দূর চোখে তাকাল সে।

আমার চোখ অঙ্গুলরন করে শোভাক তাকান দেখন করে। কপাল থেকে তার হাত অবতরণ করে নিরেছিল। কিন্তু বাসন্তীর যে তা চোখ এড়ানি স্থলান। তবু শোভাক তাকাতাই বাসন্তী চোখে বুঝে একটা তৈরী করা প্রলম্বতার প্রলম্বন রাখল। তাকে ডেকে বললাম—“এই সেই শোভাক সত্যকার বার কথা তোমার বলি—বার বয়ের কপাল পড়ি।”

শোভাক উঠে দাঁড়াল। বাসন্তী বয়ে চুকে আলোটা জেলে নিয়ে বলল—“বহুদূর চাকর নিয়ে

শোভাক আপত্তি জানাল, বলল—“হাত-পা না বুঝে আর গলা দিয়ে কিছু নামবে না। আর একদিন বরং বেয়ে যাব ঘোঁরি।”

বাসন্তী তখনই গলায় বার দুইরক আরও অঙ্গুরোধ করল। শোভাক আপত্তি আনিতে উঠে দাঁড়াল।

বললাম, “চা না: তবু মাই বেলে বোসাই মা আর একটু।” বলার সঙ্গে সঙ্গে একবার চোখ পড়ে গিয়েছিল বাসন্তীর চোখ চোটার শেষে, সে চোখে বেঁধে কঠোর এক বলত আগমনের আশ্রয়ী আবার আগ্রহটাকে তাই এটিয়ে আর বিতীর্ণতার অঙ্গুরোধ করলাম না। শোভাক বৃহৎ গলায় বলল—“বাঁকীতে বলা নেই। একটু বেশী হলে বাবা আবার বড় তাবেন। আর একদিন আসবেন। এইত আশাপ ক’রে বইল ঘোঁরি সঙ্গে।”

হাত-বাগটা নিতে গিয়ে কপালটা আবার দিবে শোভাক বলল—“কাল নিয়ে ব্যবসয় কপালটা। কাল থেকে অকিলে হাতের সময় আপনাকে কপালটা নিয়ে যাব আর ফেরার সময় নিয়ে যাবেন।”

এর ওই প্রত্যয়ে আনন্দে গল্পন বয়েই নরম আপত্তি আনাতে বাজিলাম কঠোর বাসন্তী হেসে বলে উঠল—“তাব আর বড়কার হবে না। কাল থেকে বাঁকীতে নিয়ে যাবে কপাল, আমি বলে গিয়েছি। আক থেকেই যেবার কথা ছিল, তুলে গেছে।”

আমি অভ্যস্ত বিম্বিত হয়ে বাসন্তীর দিকে তাকাতে গে তুলে কঠোর বসকাল আবার।

শোভাক বুধটা কেমন নিম্নিত হয়ে গেল। চোক গিলে বলল—“তা বেগত’ ভালইত’। আমার কপাল ত পড়েই থাকে অনেক সময়। আমার অঙ্গুরোধ হ’তো না।”

তারপর বিহার নিয়ে হাবার সময় শোভাক বাসন্তীর ব্রাউজের হাতের ওপরের সূচের কাছ দেবল ও আলোচনা করল কিছুটা। মনে হলো শোভাক তার মনের অবস্থা আনান না নিতে চেষ্টা করছে।

শোভাক চলে গেলে দরকাটা লঙ্ঘন করে খিল তুলে নিয়ে খুঁজি বাঁকিয়ে বাসন্তী বলল—“তোমার সঙ্গে আমার এত কি পড়তা? তবু লঙ্ঘনো অত্যাচারে বাবার হাত নিয়ে লোহাঙ্গ জানানো হচ্ছে? আমি কতি খুঁজি ভাঙা, খুঁজি না কিছু, না? এই তোমার ভাল যেহেতু ছিঁরি।”

বলতে বলতে বর ছেড়ে চলে গেল উকলত বল চোখের কোণে নিয়ে।

বাসি পুকেতে গান দিয়ে শুভান।

কিন্তু নির্জন বয়ে বটমটোর চোমহন মুকে একটা কষ্ট বনিতে তুলল। একটা দুখে ঘোঁরার মত বুকের ওপরে জমল। শোভাক বাণিত বুধটা বার বার মনে পড়তে লাগল।

এ ঘর ও ঘর

মানবেন্দ্র পাণ্ডা

এ বাড়িতে যে ভাড়াটেবা এসেছিল তারা ভাল চলে গেল। অবশ্য এখন আর বিবচনে বলা চলে না—একঘটনা। দু'জন এসেছিল, বাবার লম্বা গেল একজন। অপরাধী—তবু চোখের জল ফেলতে ফেলতে গেল। আর এক জন? সে তো আপসেই চলে গিয়েছে। এ লগোয়ের সব জালা-বহুবা মান-দামানের পালা চুকিয়ে।

মাধবী আর তার শাভড়ি সেই পরিভ্রান্ত পুত্র বর দু'বানির দিকে তাকিয়ে বইলেন। দু'জনের কেউই কোনো কথা বলতে পারলেন না। বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস শুমরে শুমরে উঠছে। দু'জনের চোখেই অশ্রু-কণকণ দৃষ্টি। এখনো যেন তাঁদের কানে ঈশ্বরের চাপা কথা শোনা যাচ্ছে। ঈশ্বরি কিছুতেই যাকি হবে না, কিন্তু শ্রুতি ছাড়বে না। সে ছুটে এসে কোবে উত্তেজনার চিহ্নিত দু'হাত ধরে কাঁকানি দিয়ে বললে, আমি বা ব্যাধ্য করব তোমাকে ভাবুকরতাই হবে। যোক্তার পর যোক্তা বাড়িতে দেব না।

বাধা হয়েই ঈশ্বরিক তাকি হতে হল। তারপর সেই দিনই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। বর্ধাজিক দুর্ঘটনা! এর অন্তে শ্রুতিই অপরাধী, অনুযোগ হয় খুব বেশি বাড়ী করা চলে না। অন্তত মাধবী তার শাভড়িক কাছে সেইরকম কবাই বলেছে।

বড়ো বাড়ি। বকশলে এই বকম বাড়ির অভাবে নেই। উঠোনে বাসের ঘরই, গোরালে পল্ল—ওহিকে উঠোন পর হয়ে গানের ঘর, ইঁদার। বাড়ির এ দু'ফোয় বসবার ঘর, আর এ দু'ফোয় রান্নাবর। এ ছাড়া গুপরে নীচে চারখানা বড়ো বড়ো শোবার ঘর। অবশ্য সেই অস্থপাতে পরিবারের লোকলগো। নিত্যজই কম। বাড়িতে ছেলেমেয়ে নেই—বিনি পুষ্কর্তা, তিনি গ্রাম সাহাধিন বোকান নিয়ে ব্যস্ত। অন্তবড়ো বাড়ির মধ্যে শাভড়ি আর বৌ দীপিরে ওঠে। তাই শ্রেণ পৰ্ব্বত বাড়ির একটা বিক ভাড়া দিয়ে বেড়া হয়েছে।

ভাগ্যক্রমে মনের মতোই ভাড়াটে জুটে গেল। একটি দল' আর তার বিধি। দল'টি নিত্যজই ছেলেমানুষ। বছর তেইশ বছর। কালো বোলা, দু'বেশ শ্রী এই বয়েসেই নই' হয়ে গেছে। কখনো লকালে ভিউটি, কখনো নাইট ভিউটি। তার গুপর প্রতিদিন এক মাইল সব বৈটে হাসপাতালে বাতায়ত করা। দু'চোখের দৃষ্টি এইর মধ্যে রক্ত হয়ে উঠেছে—সব সময়ই কেমন যেন চাপা অপজোব।

বিধিটি বিবাহিত। দু'বে একটি শান্ত গভীর বিবাহের দাপ।

খুঁই ছোটো পরিবার। এর সংক্ষিপ্ত পরিবার এর কেউ আশা করতে পারেন নি। তবু একটা লম্বা হিল—ভরমহিলার স্বামীটির এখনো সর্পন মেলে নি। তিনিও যদি মোটামুটি ভরমহন তাহলে আর দুঃখিতা থাকে না। পোনা গেছে তিনি নাকি কলকাতাতেই থাকেন। বাস্তবমধ্যে ছুটিছাটার আসবেন। বাস্তবমধ্যে কখনোই নয়—কান টানলে মাথা আসে; খ্রীটি যখন এখানে তখন ঊরও অবিরত প্রায়শই ঘটবে এমন আশা করা অসম্ভব নয়।

ক'বিনের মধ্যেই এঘর দু বোনের সঙ্গে পাণ্ডিত্য-বোনের আশ্রয় হয়ে গেল।

পাণ্ডিত্য একদিন সমগ্র হয়ে বললেন, বুকে বোনা, বাবা মেয়ে ঐ বড়ো বোনটি।

দ্বিধা পড়ায়।

মাঝেই বললে, ছোটো বোনটিও বেশ।

কিন্তু জীবনটাকে এর মধ্যেই

চিনে ফেলেছে।

পাণ্ডিত্য বললেন, বোন না হয় নাস'গিরি কংগ্রেসে এসেছে, কিন্তু আমি ভাবি, বিমির কী কাহ্নে, নিজেই স্বামী-সংসার কেলে বোনের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে!

মাঝেই তুচ্ছ হুঁকে বলে, কেন, য থাকে সেইটেই মুক্তে পারি না।

আমি মুক্তে পারি। তিনি বলেই দোষভ বোনকে একটা ভেঁড়ে দিতে পারেনি।

মাঝার ওপর ওদের মা-বাবা কেউ নেই।

কান বৈকি। এর মধ্যেই মাঝেই ছোট বোন স্বস্তির কাছ থেকে এমন অনেক কিছু লেনে নিয়েছে যা তার পাণ্ডিত্য এখনো জানেন না।

মাঝেই বললে, মা বাবা নেই। ভাইয়া আছে।

—ভাইয়া আছে মানে কি?

প্রোডা আরও নতুন তথ্য পরিবেশন করার অন্ত্রে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। একটা ভাই তো কান করে, আর ছোটো ভো বোকার!

মাঝেই মাথা নেড়ে বলে, না, ও ভাইই বোকার হতে পারে কেন? ছোটোটাও এজন্য কলমে পড়ছে।

পাণ্ডিত্য এ সময় পান নি। বড়ো বোন খ্রীতি এসংবাদ এখনো দেখনি। তবু তিনি তার হানবীর পাজী নন। মাথা কাঁচিয়ে বলল, ওই হল। গড়োপোনা করছে সে তো টেকারের বাড়ী।

মাঝেই মনে মনে হাসল। সে বেবেছে ঐ খ্রীতির ওপর ইতিমধ্যেই পাণ্ডিত্যের এমনি মারা পড়ে গেছে যে তার গুণগান সর্বাত্মকভাবে লায় যা নিলে তিনি মুহূর্তেই পড়েন। তবু গুণগানই নয়, ঊর বোন ইচ্ছা খ্রীতিও তাঁকে প্রজ্ঞা করে ভালোবাসে বলেই তাদের সব কথা একমাত্র ঊর কাছেই অকপটে বলবে। আর সেই কথাকল্যাণ—অবিস্মৃত বলেও মাঝেইকে তা হানতে হবে।

যখন, খ্রীতি নাকি বলেছে তার স্বামীর মতো বাছুর হয় না। তিনি নাকি পত কষ্টের মধ্যে থেকেও মাতৃগিষ্ঠহার: ভ্রাণিকটির রক্তপানেকণের ভয়েই ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আরও নাকি বলেছে, অনেক হুঁকারী বনীষের কস্তারের সঙ্গে স্বামীর বিয়ের কথা হয়েছিল, কিন্তু ঊর সঙ্গে পরিচয় হবার পর আর তিনি অন্য কোথাও বিয়েতে নাকি হন নি। রণ? রণে কি আসে যায়। ঊর স্বামী তুচ্ছ রণ-ঐবাণের মোহ লব করেছেন। তিনি নাকি সাধারণের অনেক উর্ধ্বে।

পাত্তির ঘুমে এই-সব কথা শুনে মাথায় মনে মনে হালে। কিন্তু ঘুম ভুটে প্রতিবাদ করতে পারে না। পাছে বুঝা যায়। কিন্তু শ্রুতির এই স্বামী-স্বরটিকে সেবার জ্বলে কোকুৎস বেড়েই চলে।

কোকুৎস দুঃখের কথা নয়। এমন যে দেব-দুর্গত স্বামী—এমন বার ভাগে সেই মাহুটিকে বহন না। চোখের দেখা দেখছেন ততক্ষণ সারাতি নেই। হুসপাহ তো কোট খেল কিন্তু শ্রুতির স্বামীর দেখা নেই।

সেবে অবৈধ হয়ে আবার একদিন ক্রোড়া গিয়ে চুকলেন শ্রুতির ঘরে।

—কী করছ গো যেয়ে? হায়াবাহা হল?

শ্রুতি ভাড়াভাড়া একটা আলম পেতে মিল।

—বহুন মাসিমা।

ক্রোড়া বরটার চারিধিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে প্রশংসা করে বললেন, বাঃ এরই মধ্যে তো বেশ শুদ্ধিবে কেনে। কুমিই শুদ্ধিয়েছ নিশ্চয়?

শ্রুতি শিত হেসে বললে, হ্যাঁ, আমিই শুদ্ধিয়েছি। ও আর বর-সংসারের বিকে নম্বর দেবে কখন? সারা মিস্তো বাইরে বাইরেই ফাটে।

হায়াবাহা তো সব তোমাতেই করে রাখতে হয়।

শ্রুতি বললে, হ্যাঁ, আমি ছাড়া আর কে করবে বহুন। ভিটটি সেয়ে কিবে এসে ও বেচারী আর উঠতে পারে না।

ক্রোড়া নিচু গলায় বললেন, তা গরের সংসারের জ্বলে এই যে বেটে মরছে এটা তোমার স্বামী লক্ষ করেন?

শ্রুতি একটু হেসে বললে, তাঁর ইচ্ছেতেই তো আমি এখানে এসেছি মাসিমা। তাঁর ইচ্ছে না থাকলে—তার সেবার যদি উনি ভেবে নিতেন তাহলে কি আর আমি এখানে পড়ে থাকতে পারতাম?

শ্রুতি একটু বেমে আবার বললে, তা ছাড়া গরের সংসার বলছিলেন, পর কে? স্বতি? ও তো আমার নিজের মায়ের পেটের ঘোম। ওর বদলির চাকরি। এখানে না হই আপনাদের মতো কত পরিবারের মধ্যে এসে পড়েছে, কিন্তু তেমন আদর হল কি ওকে একা ছেড়ে দেওয়া যেত।

ক্রোড়া বুঝি হলেন। বললেন, আবা যোগ্য স্বামীর যোগ্য স্ত্রী। কিন্তু আইনটিকে বাহা আম পণ্ড দেখতে পেলি না।

শ্রুতি কয়েক মুহূর্ত ক্রোড়ার চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গভীরভাবে বললে, তিনি কাল এসেছিলেন।

ক্রোড়া চমকে উঠলেন, কানাই কাল এসেছিল।

—হ্যাঁ, মাসিমা।

—চলে গেছে?

—কাল রাত পাঁকে এসেছোটাই ঝুঁকেন এসে আক ভোরবেলা চলে গেছেন।

ক্রোড়া অজ্ঞোচনার পুরে বললেন, একবার তাকলে না না, দেখতাম। তা অমন করে আলাই বা কেন যদি না ছোটো মিস থাকতে পারে?

কীট্রি রান হেসে বললে, কী করবে বলুন। ওঁর যে অনেক কাজ। তা ছাড়া এখন ওর সকালেই ডিউটি।

ক্রোড়া নিজস্বাং কণ্ঠে বললেন, জামাই আবার কবে আসবে?

কীট্রি রান মুখে মাথা নেড়ে বললে, জানি না।

—সে কী! জামাই ব'লে ঘরমি কবে আবার আসবে?

—বলতে চেরেছিল, আমিই বলতে নিতিনি। আমি তো জানি ওর আসা এত অনিশ্চিত। ইচ্ছে করলেও আসতে পারেন না। তুণু তুণু আশা করে লাভ কী?

বাইয়ের দরজায় এখন সময়ে দুটুদুটু করে ছুতোয় লব পাওয়া গেল। ডিউটি শেষে একমাইল লব হেঁটে স্বাতি বাড়ি ফিরল। ক্রোড়া অমনি উঠে পড়লেন। এই রহস্যের সামনে তিনি কিছুতেই লসে থাকতে পারেন না, কথা বলা তো ঘরের কথা।

ক্রোড়া চলে আসতে আসতেই তুললেন স্বাতি দিহিকে বাড়িরে বলছে, খুব তো পা হাড়িরে বলে গল্প বলিল, উত্তরনে আঁটটাও দিহে রাখতে পারিনি। এলে যে একটু চা বাঁধ তার উপায় নেই।

কীট্রিকে স্বাতি যে দেখতে পারে না তার হাবেভাবে চালেচলনে এতদিনের মধ্যে তা বরা পড়েছিল, কিন্তু এখন উচ্চত বয়ে দিহিকে তিরকার করতে ক্রোড়া এই প্রথম তুললেন। আর সেই সঙ্গে লক্ষিত হলেন,—গল্প করতে কীট্রি তাঁকে ডাকে নি তিনি নিজেই বিরোদ্ধিলেন।

কিন্তু একটা কথা তেবে তিনি আশ্চর্য হলেন, এতদিন পর হঠাৎ আজই বা স্বাতির এখন অপোতন আশ্রয়কাশ কেন?

ওদিকে মাধবীর সঙ্গে স্বাতির গল্প এক এক দিন বেশ অমে ওঠে।

স্বাতির মতো মেয়েরা মাধবীর কাছে বিশ্বহ। এই যে অল্পবয়সী কুমারী মেয়েরা পেটের দায়ে নানিগের কিছা ক্যানিলি প্র্যানিগের কাছে চুকে পড়েছে এর আর মাধবীর মেমি কৌতুহল তেমনি সীমাহীন সংগ্রহহৃত। ঐটুই মেয়ে কী বা কেনেছে জীবনের? এইই যবে জীবনবৃত্ত? তাও জামাইমারি প্রানের পিতামহে শিক্ষাবান নয়—একেবারে পূর্ণান মহনারীর তটিনতম জীবন-অধ্যায়ের গুরু-বাহিন্যগ্ৰন্থ। এদের কাছে ব্যাঙালি মেয়েদের চিরন্তন প্রাণ সংকোচ বলতে আর কিছুই নাই। গাল-পার্বণ, ব্রত-উপবাস, পুজা-অর্চনা এমনকি ব্যাঙালিক লজ্জা-সংকোচটুই পথক একেবারে খুয়ে মুখে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। এদের হাতে এখন ছুঁচ ওঠে—তবে তা সৌখীন টেলিফ্রমে ফুলের নজ্জা রচনার জন্তে নয়—চামড়া পেশী তের করে মরমেহের পতীরে শিখা-উপশিখার লঙ্ঘনে। এরা অননীর কোলে অতি যত্নে সন্তান তুলে দেয়, কিন্তু নিজেদের কোল জুড়ে বড়ো-একটা লজ্জান পায় না। আবার গর্ভ-নিরোধের সঙ্গে এদেরই কাউকে কাউকে বাধ্যতামূলক লবরকম শিক্ষাই নিতে হয়—নিজেদের কৌমার্য বজায় রেখেও।

স্বাতি বেলে বললে, আমেন মাধবীদি, কিছুদিন আগেও রাত্তা দিহে বড় দিহে যেতে দেখলে আ তেকে উইতান। আর আজ লারা রাত মড়া আগলে বলে থাকলেও মনে কিছু হয় না। হাসপাতালে বহুক্ষণ থাকি, ততক্ষণ যেন আমি আর এক মানুষ হয়ে গাই। এক এক সময়ে অস্বাভাবিক হয়ে তাড়ি কী করে এক শূন্য হতে পারলাম। ঠিক যেন একটা বহ! কিন্তু বাড়ি এলে চুপলেই শরীর মনের লব

কোর কনে যায়। আরবি সেই নিম্নীষ দুইল ঘেরে করে পড়ি। মা-বাবার কথা মনে পড়ে তাৎবে অল
আলে—তব্বিতের কথা শুনে ছুটুকটিয়ে ঘরি। তখন সুদই আমার একমাত্র প্রতি এনে দেহ।

পুতি একটা দীর্ঘবাস কেলে বায়ল।

মাববী বললে, তবু ভালো জমন দিদি পেয়েছ।

এ কথাই শুতির সুখবাস লক্ষ্য করি হয়ে উঠল।

মাববী তা লক্ষ্য করে আর একটু সোজাশুধি গ্রহণ করল—তোমার জামাইবাবু পূব গ্রন্থপো
কিন্তু তাঁকে এবার সৌভাগ্য অজ্ঞেয় হল না।

পুতি উদ্বৎ বাকা জুয়ে বললে, তার অজ্ঞে অজ্ঞেয় করবেন না। সে জুয়েগে বহবার পাবেন।
কথাটা বলেই পুতি ঢলে যাচ্ছিল, ঠঠাৎ কী মনে হল কিরে ঝড়ালো। তারপর বীবে বীবে মাববীর
দিকে এসিয়ে আলতে আলতে বললে, আজ পূর্বন্ত নিজের জীবনে অবন্ত কখনো সালোবাসার আশ্বাস
পাইনি, কিন্তু আপনায় কি মনে হয় মাববীদি, ভালোবাসার বোহাই দিয়ে একটা জোড়ার বাস্তবায়ন
চরিত্রকীর্ণ পুত্রকে দিনের পর দিন গ্রন্থের সেওয়া যায়।

মাববী অধাক হয়ে বললে, তুমি কার কথা বলছ।

—সুপালবাবু—দিদির বাবী।

মাববী হেসে বললে, তাই বলে। তাকলে আর ভালোবাসার বোহাই দিচ্ছ কেন? বলে
আমিদের দাবি।

পুতি মাথা নেড়ে বললে, না মাববী দি, আগনি জ্বলেন না দিদি কতখানি sacrifice করে
এলেছে। ভালোবাসার প্রচণ্ড জেল না থাকলে অতবড়ো sacrifice সম্ভব নয়। আর এ বয়সের
ভালোবাসা হচ্ছে একটা সেটিমেন্ট। আমার মতে, একমাত্র বোকা যেহেতাই এইরকম সেটিমেন্ট নিয়ে
মাতামাতি করে।

মাববী বললে, এলব তোমাদের তাই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার পোনা উচিত নয়। তবু
তুমি যখন এতদূর বললে তখন আর একটু স্পষ্ট করে বলে।

অতি বললে, সব কথাই বলব আপনাকে, কিন্তু স্নিহ আপনায় পাওড়িকে বলবেন না। তিনি
জননে গ্রিক দিদির কানে তুলবেন। আর অমনি অশান্তি, চোখের জল, উপবাস তক হয়ে যাবে।
উঃ এ যে কী ব্যর্থতা মাববীদি। কিন্তুতেই এলব বরফাত করতে পারি না। কবে যে ওদের হাত
থেকে নিড়তি পাবে।

দরকার বাইরে এই সবই পায়ের পশ্ম পাওড়া পেল।

—বৌমা।

পুতি অমনি লাফিয়ে উঠে গালিয়ে পেল।

—বৌমা তো বৌমা, এটা কার চিঠি।

মাববী বামখানা হাতে নিয়ে দেখল। আর পর পাওড়ির হাতে কিরিয়ে দিয়ে বললে,
ঐতিয়।

পাওড়ির চোখপুটে। পুশিতে বুকে এল। বললেন, নিশ্চয় জামাই চিঠি দিয়েছে বুঝেছ।
আলবে বোধ হয়।

বলেই সুখবর দেবার ভয়ে ভাড়াভাড়ি চিঠিখানা নিয়ে খ্রীতির ঘরের দিকে গেলেন।

প্রৌড়ার অগ্রহানই ঠিক।

সেরিন পনিবার, সত্যল থেকেই খ্রীতির চোখে-মুখে একটি কেবল আমনের আভাস। সত্যল কাকেই স্মৃতি। নিম্নরূপে বইখানা বিক্রয় দেবার ভাড়া। বিকল্প বেলার একটু ঘটা করেই সা হুলো, দুবার করে মুখে লাগান মাখন। তারপর বোঝা পাতিবানি পরে, লি'বিশে বস করে সিঁদুর দিয়ে হাতের কোপাতি করতে লাগল।

প্রীতকাল। অন্ধকারে রকের এক দিকে ঝাঁপল দিচ্ছে তবু আছেন মাঝবীর পাতিতি, আর মাঝবীর বখালাখ্য নিজেকে সোপান করে বেড়ালে টেলান দিয়ে বলে আছে। হুন্মেই উৎকর্ষ—কখন মৃণালবাহু এসে গড়ে। পাছে রাতের অন্ধকারে এসে তোর না হতেই চলে যায় তাই ওরা হকনে বলে আছে। মৃণালবাহুকে আজ দেখবেই।

এখান থেকেই খ্রীতিরের বস দেবা যায়। খ্রীতি আজ কেনন বীরে বীরে পরিভ্রমণে রাসা সেরে নিল। তোলা-উঠনটা একপাশে লিহিয়ে যেনে, অগ্নিগাটি মুখে ফেলল। তার পর মাখন দিয়ে আর এক প্রাই হাতমুখ বোঝা হল। তার পর পাশেপাশে তালো করে পা মুছে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

—স্মৃতির দেবা নেই কেন?

মাঝবীর বললে, আজ তো ওর ছুটি। সিনেমার গেছে বোঝকর।

এখনি সময়ে বরফায় লব হল। মাঝবীর পাতিতিকে একটা টেলা দিয়ে সচেতন করে দিল মৃণালবাহু আসছেন।

না, মৃণালবাহু নয়—স্তায় তালিকা। খুঁট খুঁট করে উঠানের সামনে দিয়ে চলে গেল। স্মৃতিকে যেন গভীর মনে হল। কোনো দিকে কিংবা ভাবালো না। নিজের বরফানির সামনে এসে একবার উক্তি দিয়ে দেখল। তার পর চুকল।

স্মৃতি ঘরে ঢুকতেই খ্রীতি ভাড়াভাড়ি বস থেকে বেরিয়ে এল। এই একখানিই তালো বস। এই ঘরেই দু'বোনে খোর কিছ বে রিন মৃণালবাহুর আবির্ভাব হয় সেইদিনই মৃণাল। সকেচে খ্রীতি কিছু বলতে পারে না। সে তো জানে এই অতিথিটি তার বোনের কাছে কতখানি আবাহিত। বিশেষ করে এইদর রাতে স্মৃতিকেই বরফানি ছেড়ে দিয়ে পাশের ছোটো বরফানি—ঘেটাকে ত্যাগের বর করা হয়েছে, সেখানে চলে যেতে হয়। সে যে খুব প্রুন্ন মনে যায় না মৃণালও তা নিশ্চয় বুঝতে পারে।

স্মৃতি ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। তার পর উঠে কাপড় ছাড়ল, হাতমুখ হুলো, বেতে বলল। লাগনে বলে খ্রীতিই বাওয়ালো। কিছ হুন্মের মধ্যে কথা নেই। স্মৃতি গভীর তাবে খের উঠে গেল। খ্রীতি এঁটো পরিষ্কার করে আবার তালো করে হাত পা মুছে সামনের রকে এসে বলল। দিকে কিছ এখন খেল না।

ওদিকে স্মৃতি খেরে উঠেই একটা বালিস আর চামর নিয়ে গভীর মুখে ছোটো বরফাট চলে গেল। এতক্ষণ নিঃশব্দতার পর তবু একটি লব সঝোরে এসে কানে খাঙ্গল—বড়াহু! স্মৃতি একটু আত্মতাত্তিক খোঁচাই করল।

মাথারী শাকড়ির কানেক কাঁছে খুঁব এনে বললে, বুড়তে পারছেন ?

শাকড়ি অশ্লীল বরে বললেন, হ'।

—কী বুড়লেন ?

—বিন্দুকে মেয়ে বলে বরছে, মিসির দ্বারী আসবে কিনা।

মাথারী বেলে বললে, হত আশঙ্কবি করনা আপনরে।

শাকড়ি চটে গিয়ে বললেন, তবে কী শুনি।

মাথারী বললে, দাঁড়ান, রকমকে আসে নারকের আধিষ্ঠান হোক।

নারকের আধিষ্ঠান হল হাত এগারোটার পর। লাঠি ট্রেনে কলকাতা থেকে এল। চুপি চুপি বরজা ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। বরজায় দু'দিন হল আলকাতরা মাথানো হয়েছিল, এ বাড়ির সকলেই লাগেদান হয়ে চলছিল—কিন্তু মৃণালের তা জানবার কথা নয়। তার হাতে বোঁদ হল আলকাতরা লেগে গেল।

বরজা ঠেলার লজ হতেই শ্রীতি তাকাতাড়ি লঠন হাতে বেরিয়ে এল।

চাপা গলার বললে, বাবাঃ! এত রাত! —ও কী, হাতে কী হল।

—কলকের ছাপ, তোমার বুকে ঢুকতেই।

উপরটা বেকীল বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ও উপর চলেন। শ্রীতির বুকেও কণকালের জ্বলে বেন একটা ব্যাঘাত চাড়া পড়ল। তাকাতাড়ি লাগলে মিরে হাসবার চেষ্টা করে বললে, চোখের শক্তি হলো। বেনম রাতছপুরে চুপি চুপি আসা।

এই বলে মৃণালের হাতটা আলোর সামনে ধরল।—চলো দেখি কেবোলাসি আছে কি না।

মৃণাল চাপা পরিহালে বললে, তালিকা অনুবীর ডিকুটি আক ঘরে না বাইরে ?

শ্রীতি ইশারায় শ্রুতির বড় বরজাটা দেখিয়ে দিল।

হাত খুঁব বুয়ে মৃণাল রকে এলে দাঁড়ালো। লঠনের অশ্লীল আলোর বতটুকু দেখা গেল—ভালোই লাগল। বেশ অশ্লীল চেহারা। বুবে লম্বু পরিহালের হাসি বেন লেগেই আছে। কোনো কিছুতেই বেন ভুলব ঘের না। হায়েও নয়, বিপদেও নয়। বুকের ঐ হাসিটিই তার একমাত্র অস্ত্র। বেন হাসতে হাসতেই সব উচিত-অনুচিত বিবেক-বিবেচনা উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে।

মৃণাল হুই ভিকে হাত আড়ত করে দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে গাছা ছিল না, শ্রীতি বর থেকে গাছা আনতে থাকিল হঠাৎ মৃণাল গিহন থেকে শ্রীতির ঝাঁচলটা বরে টেনেই হাসতে হাসতে হাত বুড়তে লাগল।

মাথারী কিন্তু কিছু করে বললে, না, নাটক শুরুতেই ঘনচ্ছে। এখন আশাবের গ্রহনই ভালো। শাকড়ি হাই তুলে বললেন, তাই চলো। কিন্তু ওদের তো দেখছি বেশ তাব—তবে যে ওয় খোনটা কী বলে বেড়ায় ?

মাথারী বললে, তাবটা ওদের একই বেশি কিনা তাই লম্বের হয়। শ্রুতির কাছে কাল লব ভবব।

এই বলে মৃণাল উঠে পড়ল।

—আমি কিছু কাল কামাইয়ের লবে আশ্রয় করব।

মাবনী হেসে বললে, তাহলে আপনাকে কোয় রাজিরে উঠে বরকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে

হাত চারটে। তখনো চাহিরিকে ভালো করে আলো কোটে নি।

মাথা বরফাটির পাশে করা দু'জনে এসে দাঁড়ালো দুটি ছাত্রাভূতির মতো।

শ্রীতি সংকোচে কিছু কিছু করে বললে, একটা কথা বলব কিছু মনে কোরো না।

মুগল সহাস্য মুখে তাকালো।

শ্রীতি বললে, কিছু বরচ নিয়ে বাধে না? টাকা না পেলে খুঁটি বা কাঁচ করে।

এই বা অপরাধ কী—বা অজ মাইনে।

মুগল কিছু মাত্র না ভেবে বললে, টাকা নিজেই আসতাম।

ষ্টিক

আছে সামনের লগ্নাকে নিস্তর টাকা দিয়ে দাও।

শ্রীতি তাকাতাড়ি বলে উঠল—না না না, সামনের লগ্নাকে আর তোমার আসতে হবে না।
বেলা বরতো হাঙ্গ করবে।

মুগল হঠাৎ জোরে বলে উঠল। বললে, পাগল হয়েছ! ও কানতেই পারবে না তোমার
এখানে এসেছি।

শ্রীতি চমকে উঠে বললে, তুমি যে এখানে আসি বেলা কানে না?

মুগল মাথা নাড়ল।

শ্রীতি আতঁব্বের বলে উঠল, তুমি তবে তার কাছেও লুকিয়ে আস—চোরের মতো অপরাধী
মতো আস?

মুগল গম্ভীর হয়ে বললে, হ্যাঁ।

তারপর কাঁচ হাসি হেসে বললে, লবাই তোমার মতো এক উদার নয় শ্রীতি।

তুমি বরা করে ছেড়ে নিয়ে এসেছ, সেই অধিকারটাকে বেলা দাবি বলে মনে করে।

এতটুকু সম্পর্ক দে মজ করতে পারবেনা।

মুগল চলে বাজিল। শ্রীতি হঠাৎ এর হাত চেপে ধরে ব্যাকুল কাঁচ বললে, তাহলে এই যে
পেটে একটা আসছে এর তথিত্ব?

মুগল যোব হয় সে দুঃসংবাদ জানত না। তার মুখটা মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল।

শ্রীতি তার দু হাত ধরে স্বাক্ষর দিচ্ছে বললে, তোমার পারে পড়ি। অমন চুল করে খেকে
না। যদি তুমি শক্ত না হও তা হলে আমি খুঁজি পাও কোথা থেকে! আর-তুমি পরে খুঁজি বরন টের
পাবে তখন সে যে কিছুতেই—। পাতলা টোটার ওপর দাঁতের কামড় দিয়ে শ্রীতি কড় রোদন চাপতে
লাগল।

মুগল তবালি কোনো কথা বলতে পারল না। অপরাধীর মতো বিবাক দাঁড়িয়ে উঠল।

শ্রীতি কণকাল পরে সামনে নিয়ে বললে, তোমার বোঝার দেরি হয়ে যাচ্ছে। পরে আটকে
রাখব না তুমি।

একটা কথা—যদি পার টাকা মনিঅর্ডারেই পাঠিয়ে দিও। আর বাই হোক বেলা আমার চেয়ে
ছোট, তার কাছে আমি ছোট হতে পারব না।

বলেই নিষেকে বের ছিঁকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বরকার বিকেল জানলার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে মাবনী নিঃশব্দে লব দেখে গেল।

বহুস্মারক

ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়

বাঁটা: কলকাতা থেকে পরিবহন করে এনেছিল বহু, পুষ্করকে পরিবেশন করার জন্য
করলও সে। বলল, তুমিই মেজলা?

মেজলা: অর্থাৎ পুষ্কর নেতিবাচক থাকে না? বলে, মেয়েদের কথা না, পোনারই ভাল।
তুমিই থাকে।

বহু: বলে, থাকে বাড়ুক। তবুও পোন।

—উহ। পোনার আর পুষ্কর নেই।

—আছে। এখন যদিও বা আছে, পোনার পর একটুও থাকবে না। আর সেই জন্যই
কলকাতা থেকে বাঁটা—এই দুর্ভাগ্য তিনশ হাইল পর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেছি শুধু তোমার
পোনার বলে।

—ভাল করনি। দাদার মত মাথাতো-বোনের এই কলসার মত মনোভাবটি তুমিই বুঝে

—না? হ'ল, কিছু এসে যাবে না। কিছু তুমি পোন। বাঁটার পুটনিক, আমেরিকার পুনা
আর বাংলা বেপার বীণা, এরা প্রগতি-শীলতার প্রতিযোগিতার ফেটে কাঁচও চেয়ে কদম হয় না।

—তুমিই কিছ বুঝলার না। তুমিই দুর্ভাগ্য। তাই একটু দুর্ভাগ্য করে নিতে চাই।
তোমার প্রথমটিকে অর্থাৎ পুটনিককে মনে হচ্ছে যেন তিনি তিনি, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ পুনার কথাও যেন
পড়েছি কিছু কিছু। কিছু তুমিই? একে ত চিনলাম না। কি এর পরিচয়?

—পরিচয়, ইনি একজন বহুললনা। কিছু প্রতিজ্ঞা করতক আর লাগলে দুর্ভাগ্য।

—বুঝেছি। কাঁচাকালে হেঁচো শুধু নিজ নিজ পক্ষ। কিছু কি এর প্রতিজ্ঞা?

—প্রতিজ্ঞা ভীষণ। আমার বন্ধ মানবীকে ত চেন? বীণা তারই মাথাতো বোন। সে
সবচেয়ে ঘোষণা করেছে, মেয়ের সমস্ত বাপ যদি বিবাহ দেন মত কোথাও, তাহলে লব দুহুট থেকে
তবে দুহুট। অর্থাৎ একশ হুজি মিসিট পার হবার আগেই সে করবে আত্মহত্যা। আরও বলেছে,
বাংলা বেপার ছেলেদের সে চেনে। মেয়েদের মীচল বহু ছেলের দল। এ কথা পোনার পর
কারোই লাল হ'বে না তাকে বিয়ে করার মত এগিয়ে আসতে। সুতরাং বিয়েও তাকে আর
করতে হবে না।

তখন পুরুষের হাসে। বলে, মন কথা শোনালে না বরু। তোমার মনেরীর বেশে মনবীর প্রতিজ্ঞার কথাটা তুললাম। আরও জানলাম তার বাংলা দেশের প্রতি প্রভাব কথাটা। কিন্তু মনবীর বিবাহে এতখানি দীর্ঘদিন কেন? অপারমহতা না অল্প বয়স কিছু আছে?

হ্যাঁ বলে, বয়স একটু আছে। দীপার মনোমত পাও অল্প, কিন্তু দীপার বাবার নয়।

—হঁ! বুঝছি। কিন্তু বেড়ুটা কি?

—কেতু অতর্কের যা। তিনি নাকি এ্যাংলোর মেয়ে। একটা নাইট ক্রাংবেণ্ড নাকি তার পতিবিবি ছিল। দীপার বাবা আধুনিক বটে কিন্তু সবাধুনিক নয়। এ ভাবে মেয়েকে জুলে দিতে পারেন না বায় তার হাতে। মেয়েরও বয়স তাকে পণ, বাংলা দেশের পান্দলে ছেলেদের বিয়ে করার চাইতে আশ্চর্য্যতা করে বাঁচা অনেক ভাল।

—বটে! তোমার নীল বুকের কল দীপা, কপালী?

হ্যাঁ সঙ্গতি বৃত্তক ছাড় নাড়ে। বলে, কপাল তাও জোখুর আছে। অবশ্য ইচ্ছে সে করবে না, করলে তোমা হেন জীমবেশ, নিরল ভদ্রান শাস্ত্রের অধ্যাপক, তারও মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

—বাঃ! বেশ মনোর ব্যাপার ত। দীপাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। কটো থাকলে দেখিও ত?

—দেখাতে পারি। এবার কলকাতার মানবীর বাড়ীতে তিনঘনে এই কটোখানা কুলেছিলাম কিছু দেখাব এক লাঠে।

—তুমি, কি লাঠ তোমার?

—কটোখানা বেধে দীপার সবছে তোমার বায়গা অকপটে জানাতে হবে।

—বেশ, জানাব। এখন কটোখানা দেখি।

হ্যাঁ তার ভ্যানিটি ব্যাগ ধুলে একখানা কটো পুরুষের চোখের লামনে জুলে বসে। পুরুষের দেখে। বেশ একটু অভিনিবেশ লঙ্কারেই বেধে দেয়। তারপর তাচ্ছিল্যভাবে বলে, এ হাসিয়ার পুটিনিকও নয়, আমেরিকার লুনাও নয়। একেবারে টিপিক্যাল বাংলার মেয়ে। এ মেয়ে কোন দিনই আশ্চর্য্যতা করতে পারে না বা পারবে না। চাক পিটিয়ে পাখি খুঁধি বেধে কেউ আশ্চর্য্যতা করে? একটা কাকিল মেয়ে। একে তিন দিনে চিটু করে দিতে পারি।

হ্যাঁ চোব কপালে তোলে। বলে, বল কি। কুঁচি পারবে একে চিট করে দিতে? আমি বিখাল করি না।

—তোমার অভিরুচি। কিছু আমি পারি। তার প্রমাণও আমি হাতে হাতে দিতে পারি।

হ্যাঁ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, কি বকব?

—দুই সাধারণ নিয়মে। যদি তোমার মানবীর মানার আহার বস নাম পোত্র দীন একজন অধ্যাপকের হাতে কড়া সম্মান করতে আপত্তি না থাকে তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি এ মেয়ে চিট হয় কিনা। কুঁচি ঘটকালী করতে পার হ্যাঁ।

হ্যাঁ এবার আকাশ থেকে পড়ে। হু চোব বিস্মিত করে বলে, কুঁচি। যেমন কুঁচি বিয়ে করবে দীপাকে? অবাক কাত। শেষ পর্যন্ত একটা কেলেকারী না বাঘিছে ছাড়বে না দেখছি।

পুরুষের হাসে। বলে, কেলেকারী একটা বাঘবেই। হয় তোমার দীপা বাঘবে আশ্চর্য্যতা না করে, আর না হয় আমি বাঘাব তাকে আশ্চর্য্যতা করতে না দিবে। আন হ্যাঁ, বতকণ মেয়েদের

দাপার সিঁহর আর হাতে শাঁখা না ওঠে, ততক্ষণই তাঁদের বাজানোফাট। কিন্তু উঠলেই সব তল। তখন এ দুটোকে মিথ্যাপনে ভাবতেই তাদের প্রাণান্ত।

—কিন্তু দাদা!—

—এর মধ্যে কিছু কিছু নেই। আমি স্পোর্টসম্যান। প্রস্তাব দিয়েছি, লায়ন থাকে গ্রহণ কর। যেখানে চাই বাংলা দেশের সব হেলেরাই পান্দলে নয়। তবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে বেক না। কলকাতা থেকে শুধু ঐ মানবীকেই ব্যাগে-পুরে আনিনি নিশ্চয়, দাবাড়ুই অস্ত্রও কিছু এনেছ আপন। করি। অষ্টকের হস্তাশ্রয়, করিতেছে আসাশ্রয়। যা এনেছ চটপট হার কর। উহ, ভিন্নগুলির প্রয়োজন নেই। হাতেই হার। বলতে বলতে তান হাত বানি সে প্রদাহিত করে দেয় ইচ্ছার সামনে।

হতা হলে কলে। বলে, তোমার হাতুলে কিবে একটু লায়ন লাগে দাদা। এ পান্দলে ছেলেদেরও হার মানায়। মানবীকেও এনেছি, তোমার খোজাকও এনেছি। এই নাও গেল। সে মিলিত একটি বাস্তব পুরুষের দিকে এসিয়ে দেয়।

তিন মণেক পরই হতা তার পজের উত্তর পায় মানবীর কাছ থেকে। মানবী লিখেছে, তোমার দাবার বত জুগায়ে হাতে দীপাকে লম্বর্ণ করতে দাদা। অভ্যস্ত আশ্রয়ী। কিন্তু তব হর বেচারা অধ্যাপকের অস্ত্র। দীপাকে চিট করতে গিয়ে তিনি নিজেই চিট না হয়ে বান। বা মোকালী কেশী-বহে দীপা। একটু বুধে হুধে কান করতে দিল অধ্যাপককে।

চিট পড়ে পুরুষের হালে। হতাকে বলে, তোমার বহুকে নিশ্চিত থাকতে বলে। বোলানীর মেয়ে কোলকোলানিই লাঠ। তবে দায়সার দোষ আছে। ও বহলে রতীন দ্বয় লকলেই বেবে। দু দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হতা বলে, তোমার দাবারটা দিয়ে পণ্ডিত জুতাবনার আমার অস্ত্র নেই। কি জানি, ভাল করেছি কি মন্ করেছি বুঝতে পাচ্ছি না।

—ভালই করেছ। একটি পরিবারকে অনিশ্চিত দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করেছ।

এর পর তত কালে আর বিলম্ব হয় না। নিমিটে দিনেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। তবে পুরুষেরই অচরণে একেবারে শেষ লয়ে। পুরুষের বলে, হাতের একটা দাবকতা আছে। বিশেষতঃ পতীর হাতের। তাই সে লম্বর্ণটাকে এড়িয়ে চমাই ভাল।

মানবী দীপাকে সামিয়ে দেয় লম্বর্ণ করে। বাস্তবিক লম্বর্ণ মূর্তি হুটে উঠে লম্বর্ণের হ'য়ে। সে তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলে, যা মানিয়েছে তোকে দীপা, পুরুষের বাহু একেবারে লুটিয়ে পড়বে তোমার ও ছুটি হাতা পায়।

দীপা হালে, হান হালি। বলে, ততক্ষণের জন্তে তাই। তোমাদের বিয়ের লম্বর্ণ লম্বর্ণ হাত তিনটে পায়তালিগ মিনিটে আর আহারও পদম লম্বর্ণ হ'বে পাঁচটা পায়তালিগ মিনিটে। তারপর বত পায় নতুন করে আমার লাঞ্চারে দিও।

মানবী তার গাল আলতো তাবে টিপে দিয়ে বলে, বাংলাই হাট! আককের দিনে অমন অনুশ্রমে কথা বলতে নেই দীপা। দাবিল এ বিয়েতে তুমি জুবি হ'বি।

বর বহুকে বদন এ ঘরে মানবী পৌছে দিয়ে দায় তখন হাতের অস্ত্রকার

ভয়ল হয়ে এসেছে। যিনের আলো তখনও চুটে উঠেনি ঘটে, কিন্তু তারও যে বেশী বিলম্ব নেই এ খেপ খোঁকা বায় বাইরের নিজে থাকিবে।

কুলের গড়ে আনোদিত বর। বধবে, সুবাদিত বিছানা। তারই এক প্রান্তে কাঠ হয়ে বসেছিল শীপা। পুন্ময়ও বসেছিল একতর। এবার উঠে পড়ে বরের মধ্যে পাঠ্যচাৰি কহতে কহতে বলে, কে সঙ্গে থাকতে গেলে চূপ-চাপ থাক। হার না। তাই সমস্তার গড়ে গিয়েছি; ডাকব কি বলে?

শীপা চোপ তুলে তাকায়। কল্প করে তার মুখনিরে বেগিয়ে আসে, কোন মানবী বলে। মানবীর কোন মানবী। বাপা নামটি কিন্তু।

পুন্ময় হেসে উঠে, কবাটা কানে গেছে তারলে? কিন্তু নাম সমস্তা আমার সমস্তা নয়। সমস্তা সখোবন পূজ নিয়ে। আজ্ঞা, কোন ইচ্ছার পড়া হয়? প্রথম? দ্বিতীয়? তৃতীয়? তাও না? তবে চতুর্থ?

এবার শীপার ঘাড়টা নড়ে উঠে। সমস্তিগুণক বাজ় নড়া।

পুন্ময় হতাপ ভাঙতে বলে উঠে, তা হলে মিলল না। সব ভেত্তে গেল। আমার দৌড় বার্ড ইয়ার পৰ্যন্ত। অর্থাৎ আমাকে বার্ড ইয়ার পৰ্যন্ত ক্রলে নিতে হয়। কোর্ড ইয়ারে সব দিনিয়ে ঠুড়েট। স্তবং সখোবনের পত্নী প্রথম-পুন্ময়ের যবোই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

পুন্ময় পাঠ্যচাৰি বদ্ধ করে দাঁড়ায়। পকেট থেকে একটা মোটা চুট বাত করে বাতের মধ্যে চেপে বরে কিন্তু তাতে অসিলংযোগ করবার আগেই শীপা বিছাতবেগে বিছামা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে। তীক্ষ্ণ কঠে বলে, বাড়াব! ওসব বদ অভ্যাস এখানে অচল। ওর দুর্গজ আমি লইতে পারি না। তাছাড়া আমকের দিনে ও হাই ভয় কেউ যায় না।

পুন্ময় নিজে চুট বায় না। শীপার চুট সবছে যে একটা দুর্বলতা আছে এ কথা সে ভনেছিল। তাই তাকে একটু উত্তেজিত করবার অভিপ্রায়েই সে এ ছলনাটুইর আশ্রয় নিয়েছিল। এখন চুটটা দুব বেকে বায়িয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, মানা করবেন, এ আমার কান্য ছিল না। আর তা ছাড়া আমকের রাতে যে ও সব হাই ভয় বেতে নেই এওকম অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে আমার হয়নি। তাই এর নিয়মও আমি জানি না।

শীপার চোপ দুব লাল হয়ে উঠে। রাগে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেল। কিন্তু তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, এ অভিজ্ঞতার কথা নয়। এ তত্ত্বতার কথা। যাদের কষ্ট, শৈলী, ঐতিহ্য আছে তাদের এ কথা অরণ করিয়া দেবার প্রয়োজন হয় না।

পূর্ণবর ভেতনি হাসিমুখে বলে, যেপূন, হাঁড়ির এক সামান্য কলেজের হাসান পাঞ্জের অধ্যাপক আমি। ঐ পাঞ্জের সামান্য জ্ঞানটুকুই আমার সমল। জানিনা কোন বসিকপ্রথম এ পাঞ্জের নাম রেখে- ছিলেন রতনপ্রায়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, পাণ্ডব নিভড়ালে যদি বা এক কোটা বস বেহর, একে নিভড়ালে এক কোটাও বস বেহবে না। এখনি এক নিয়ম জিনিষ নাকড়াড়া করে যাব দিন কাটে, তার মধ্যে কষ্ট, শৈলী, ঐতিহ্যে সত বসলে শুধুগুলি পক্ষাৎ কি করে বপুন? এখন দেখছি আমি ঠিকিনি।

—যানে? শীপার কঠ আরও তীক্ষ্ণ।

—যানে, বিয়ে করে। বিয়ের আগে ভাবনা ছিল অনেক, নিজের অপটুতার ভয়। এখন যে ভয় দুব হ'ল। কষ্ট, শৈলী, ঐতিহ্যে আশ্রয়ন এবার কিছুটা পায়।

—না, পাবেন না। কে দেবে এ সব আপনাকে ?

—কেন আপনি ?

—আমি ! কেন—কেন দেব ? কি কারণে আপনি আমার সম্বন্ধে ?

—কিছু না। শুধু জানি একজন ভদ্রমহা মেয়ে—যার মধ্যে কৃষ্টি, শৈলী, ঐতিহ্যের সমাবেশ আছে, আর আছে নানা গুণাবলীর সমন্বয়। যার লাগতর্থে এসবের অধিকারী একমাত্র আমিও হয়ে উঠব।

—না, পাবেন না। এসব কিছুই পাবেন না আপনি আমার কাছে থেকে। কেন না আমার সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না।

পুরন্দর ভালমাত্রের মত বলে, আর কি জানবার আছে বলুন ?

শীপা তাঁকাল কণ্ঠে উত্তর দেয়, যদি বলি আমি একজনকে ভালবাসি। বিফল করবেন

—কেন করব না। যাহার কৃষ্টি, শৈলী, ঐতিহ্য আছে, সর্বোপরি সত্তম জ্ঞান আছে, তাহের মন শুদ্ধসাহ, সুপবিত্র হতে পারে না। ভালবাসা সেখানে শুধু বাধা বোধই। এইটাই শুদ্ধাচারিক। এ কথা অবিশ্বাস কেন করব বলুন ?

শীপা অস্বাক হয়ে যায়। সে পুরন্দরের কাঁতোজল সুবের দিকে, সুগঠিত মেহের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকে। কণ্ঠের তীক্ষ্ণতাকেও কেন্দ্র ঘন হারিয়ে কেনে। তাই যেম যেম বলে, কেন করবেন না। এ শুদ্ধাচারিক নয়। যদি বলি তাকে না গেলে আমি আত্মঘাতী হব এবং সেটা এই মুহূর্তেই।

পুরন্দর সহ্যত মুখেই কয়েক পা শীপার দিকে এগিয়ে আসে। বলে, এই মুহূর্তে কেন, কোন মুহূর্তেই নয়। আত্মঘাতী হবেন কোন ক্রমে। আত্মঘাতী হয় মানবীরা, মানবীরা নয়। সেই অজ্ঞেই শুদ্ধাচার নাম থাকতে বেছে নিয়েছি এ নামটাকেই।

বাইরে মানবীর সঙ্গ পাওয়া যায়। সে বরজার টোকা দিতে বলে, যাত গোহাল, গুন্ডা লবি, শীপা উষার মাহাজিক।

শীপা সচ্যকিত হয়ে উঠে। ত্যাগাত্যক্তি মরজাটা খুলে দ্বিহ্নে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

মানবী সাহাস্যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে শীপার দিকে তাকিয়ে লবিন্ময়ে বলে উঠে, তুমি অস্বাক করলি শীপা। এক মাথা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছিল কি বলে ? পুরন্দর বাহু এক কোটা ছেলে, তাকে আবার লজ্জা ! খুলে ফেল তোমার ঘোমটা।

বলে হাত বাড়িয়ে শীপার মাথার ঘোমটা সে খুলতে যায়। কিন্তু শীপা খুলতে দেয় না। হঠাৎ লজ্জার আধিক্যে সে ঘন কেন্দ্র বিস্তৃত বোধ করে। ছোঁর করে ঘোমটা ঝাঁকড়ে ধরে থাকে।

খুলিতে মানবীও সুব উজ্জল হয়ে উঠে। সে পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি শুধু পুরুষ পুরন্দর বাহু। কাল ব্যাতক যে মেহের মাথার ঘোমটা দিতে বাকি হয়নি, মাত্র এক বস্ত্রীয় দ্বারা তাকে কি 'ভুক্ত' করলেম সে এখন ঘোমটা খুলতেই রাজি নয়।

পুরন্দর বলে, পরিদ্রব্ধতার এত বড় সার্টিফিকেট আমার মেঘেন না। ঘোমটা তব্বের কিছুই জানি না আমি। ঘোমটা পরাতেও আমি নই খুলতেও আমি নই।

—আপনি নন সত্যি কিছু লবই আপনার নিমিত্তার্থে। ওর খোঁজটা পরটাও আপনার করে আর না খোঁজটাও আপনার করে। কিছু অপত্তর হস্ত আমি এসে আপনারের বিশ্রান্তালাপে বাধা দিলাম।

পুরন্দর বলে বলে, কিছুই না। যে আলাপ লক্ষ ঘটনাতেও সমাপ্ত হবার নয়, এক ঘটনাতে কিইবা তার অগ্রগতি বা বাত হ'বে। এখনও ত হাতে এক কয় লক্ষ ঘটনা বাকী। তাইতে পুথিয়ে নেব লব। বলেই সে উত্তর দাত করে উঠে।

মানবীও হেসে ফেলে বলে, তাই নেবেই। লব শুধু পুথিয়ে নেবেই। শুধু আপনার অগ্রগতি বা বাত এই দাত লক্ষণে সে আতি পাতল। বলে হেসেছিলেন তাহেই আপনাকে রওনা হ'তে হবে। আমারের দিক থেকে সে ব্যবস্থা পূর্ণ। এখন আপনারা বিশ্রান্তালাপটা যদি এক কয় লক্ষ ঘটনার অন্ত উপস্থিত পুথিত রাখেন তা হলে আপনারের রওনা হওয়ার অনুবিধে কিছু হবে না।

তারপর দীপার দিকে তাকিয়ে বলে, হলা সবি! নীল কুকের কল দীপা, খাতার কল লর সন'পত গ্রায়। এখনি প্রদর্শনে রত হতে হবে তোমাকে। এল অব্যাহিত করি আমার। বলতে বলতে দীপার হাত ধরে টানতে টানতে তাকে ঘর থেকে বার নিয়ে যায়।

লবটাই পূর্ণ পরিকল্পিত ব্যবস্থা। এর উদ্ভাবক, প্রযোজক এমন তি ব্যবস্থাপক, পুণ্ডর। মানবীকে আনিয় রেখেছিল যে একটা বিলিং বা উত্তরনাপূর্ণ ঘটনার স্তর দিয়ে দীপার হনকে আকর্ষণ করতে হবে। তাই সে প্রস্তর হয়ে এসেছিল নিজের নটরশানি নিয়ে। এই ঘটনাই তার বিবাহোত্তর দাতা ব্রহ্ম হবে দীপাকে সঙ্গী করে। শুধু সে আর দীপা, আর কেউ নয়। তার এ পরিকল্পনা সে শুধু আনিয়ছিল রক্ত আর মানবীকে। আর তাহেই সত্যতায় একে রণমান করতে লক্ষ্যও হল সে।

বিদ্যায়ের গালা দাক হলে দাতীতে টাট দিল পুরন্দর। দাতী ছুটে চলেছিল হাইলের গর মাইল। পুরন্দরের পানটিতে বসেছিল দীপা কাঠ হয়ে। একটা যে অন্তর্গত তার মধ্যে চলেছে এ পুরন্দর বোকে। একটা আনন্দের ব্রহ্ম বুকে বার করবার চেষ্টা করে। তাই দাতীর সতিবেগ মনোজুত করে দীপাকে বলে, একটা অন্তর হঠাৎ পেছে আমার তরক থেকে। বলতে পাবেন এ আমার আনন্দের কটির আরও একটা নিদর্শন। তার কত্রে কমা চেয়ে মিছি আপনার কাছ থেকে।

দীপা বুঝতে পারে না। তাই সে বিমিত্ত বৃষ্টি কুলে পুরন্দরের বুকের দিকে তাকায়।

পুরন্দর বলে, লবই জানেন এবং আপনিও ভবেনে নিশ্চয়ই যে আমার উপস্থিত পরবাহল বর্তমানে আমার এক বিধির বাতীতে। কিছু তিনি বলে কোন কিছুই আমার নেই এবং বর্তমানেও আমার পরিচিত কেউ থাকেন না। লুতরাং লেখানে আমার বাচ্ছি না।

দীপা পতিত কর্তে প্রগ্র করে, তাহলে আমার বাচ্ছি কোথায়?

পুরন্দর দিকে বৃষ্টি রেখেই পুরন্দর উত্তর দেয়, দাতী যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে।

—হানে?

—হানে দাতীর হস্তক লব আছে অর্থাৎ তেল আছে, দাতী ততকল ছুটেবে। তারপর যেহে আপনার হস্ত নিয়ে আমার ছুটেতে লব হয়ে যাবে।

—তারপর?

—তারপর, আচ্ছা তব পাবেন না লবুন?

—তবু বা পাবার পেরেছি। এখন বলুন আবার কোথায় থাকি ?

—যদি যদি গীতি।

—গীতি !

—হ্যাঁ, এক দৌড়ে গীতি। অবশ্য যাতে একবার ঘন মনে ঘূর্ণাপুণে, আর একবার ঘনবার্ণে। তারপর হাজারিবারের অকলেশ তেতর ঘিরে পাছাত পর্বত ডিঙিয়ে গিরে উঠে আমাদের ডেবা গীতিতে। এ ভ্রমণে একটা শ্রুতি ভাব আছে। পাঠবেন এ সকল লইতে ?

দীপা রোমান্তিক হয়ে উঠে। এর তরে, হাজারিবার অকলেশ যাব আছে না ?

—তাত আছেই। তবু কতবে ?

দীপা ভক্তকে যায়। কিন্তু মুখে লালস দেখিয়ে বলে, না।

পুরুষের বলে চলে, দিনের আলো থাকতে থাকতেই এ ঘন আশাদের পার হ'তে হবে। নইলে দুঃখিন।

—দুঃখিন ! দুঃখিন কেন ?

—বলেছি ত, যাব বাসিনীর বল আছে দেখাবেন। তাছাড়া আর একটা দুঃখিন হয়েছে—।

—কি ?

—আপনার পাড়ীর রঙটা। এ রং চোখে পড়লে লজ্জা-আনোয়ারেরা একেবারে ক্ষেপে ওঠে। সেই লজ্জা আপনাকে ঘের নিশ্চয় পেক্টের গছ একবার যদি তাগের নাকে যায়, ততলে সোনার সোঁধাঙ্গা।

দীপা তবু কঁপে উঠে। পুরুষের ঘিকে একটু লতে আপে। শুক কঠে বলে, সেট আরি মাগতে চাইনি কিছুতেই। কিন্তু মানবী জোর করে চলে গিল গারে। সেইত বেছে বেছে এই পাড়ীটা গরিয়ে বিল আহার। আহিত লাজতে চাইনি। তারপর কি তেবে নিয়ে বলে, আজ্ঞা, বানবানে ত থানা হবে বলছিলেন। তখন যদি পাড়ীবান পাঠে নি আর সা হাত-পাটাও বেশ করে বুয়ে নিই লাবান কলে ?

পুরুষের পাড়ীর প্রতিবেশ বাড়িয়ে দেয়। হাসি চোখে বলে, বেশ ত, তাত ত দেবী আছে। অবশ্য বুকে ব্যবস্থা করব'বন। তারপর আড় চোখে দীপার লজ্জিত সুখধানিকে একবার বেঁধে নিয়ে বলে, আপনি জ্বাইত করতে জানেন ?

দীপা সচকিত হয়ে ওঠে। বলে, না ত ? একথা কেন ?

—জানলে ভাল হ'ত। বলা ত যায় না কিছু। এই বলে অকলেশ বমকার হ'লে লালার্য করতে পারতেন আমাকে। এবনে আপনি ছাড়া আমার লাহার্য করতে আর কে আছে বলুন ? এখন আমার বল ভরসা সবই ত আপনি।

দীপা কেনন ঘেন একটু অসবায় কোঁচ করে। অপরাধিনীর মত মুখ করে বলে থাকে।

পুরুষের আবার বলে, তবে মনে হয়, জ্বাইতি আপনি খুব শীঘ্রই শিখে ফেলবেন।

দীপা ঘেন একটু আশাবিত হয়। এর করে, কি করে জানলেন ?

—এ কামতে হয় না। বেবেই বোঝা যায়।

—কি বেবেলেন আপনি আপনি আমার মধ্যে ? দীপার অহের মধ্যে আগ্রহের সুখ।

—অমন পুরুষ যাব হাতের গড়ন, পায়ের গড়ন, তার কাছে বাছব ত ছািব, প্রাণবীন পাড়ীও বসিত হয়ে গড়বে।

দীপা আরক্তিম হয়ে উঠে। বলে, হান! সব চালাকি।

পুঙ্খর আত্মরিক ভাবে বলে, চালাকি নয়, সত্যি বলছি। বিন পনেরর যবোই আপনাকে শিখিয়ে দেব। পেখালে, শিখবেন ত?

দীপা উৎসাহিত হয়ে উঠে। বলে, পেখাবেন? নিশ্চয় শিখব।

বেলা বেড়ে চলেছিল। ত'রই সঙ্গে গ'ল্লা দিছে, গাড়ীর সতিবেশও বেড়ে চলেছিল। তৃতীয় দীঘারে গাড়ী চালাচ্ছিল পুঙ্খর। হুদীর্থ পথস্রমে একটা স্ট্রাঙ্কির ভাব হুটে উঠেছিল দীপার চোখে যুবে। আরও একটা বিপত্তি দেখা গিল গাড়ীর আলানি লগছে। সে পথটি নিঃশেষিত করে আসছিল ক্ষতপতিভে। স্রুতযাং পুঙ্খর ব্যস্ত হয়ে পড়ল হানবারে পৌঁছবার ক্ষত। পথের দৈর্ঘ্য কমাবার ক্ষত লবল হাতা ছেড়ে অলসল পথ হবল সে। পার্বত্য পথ, নির্জন এবং বহুতর। এ পথে হুতর কমানর হুবিধা যেমন, অহুবিধাও তেমনি। সেই অহুবিধার যুবেই পড়ে গেল পুঙ্খর। হুটাং হুটাট বেয়ে কল বিপত্তে বিকল হয়ে পড়ল গাড়ি। সেই সঙ্গে পুঙ্খরেরও যুব দিছে বেগিয়ে এল একটা হত্যাণ্য ব্যাকক ধ্বনি, ঐ বাঃ।

দীপা ভয় পেয়ে যায়। পুঙ্খরের পা বেঁসে লরে এলে বলে, কি হল?

পুঙ্খর বলে, গাড়ী বিগড়েছে।

—বিগড়েছে। তাহলে উপায়?

—বেশি কি করতে পারি। ছুপ করে বহুন এখানে।

পুঙ্খর গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। তারপর প্রল হয় গাড়ীর সঙ্গে যত্নার্থিত। কিন্তু রস'রন পাত্রের অধ্যাপকের স্ত্রীর মধ্যে গাড়ীর ইঞ্জিনীওয়ের স্ত্রীর অস্ত্রাব ব্যাক'র কলে পলন বরা পড়ে না। পুঙ্খর কিংবে এলে দীপাকে বলে, পলন কি স্ত্রিত বরা পেল না। কিন্তু গাড়ীখানা রাস্তার মাঝখানে বিকল হয়ে পড়েছে। এটাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নির্জন জায়গা। এখানে লোক মেলা ভার। আগনি বহুন। আমিই চেষ্টা করে দেখি একবার।

পুঙ্খর হালকোছা বেঁবে আত্মন স্ত্রীর দাঁড়ায়। তারপর ঠেলাঠেলি স্রুত করে দেয়। কিন্তু পার্বত্য বহুতর হাতা। এক'র পক্ষে এক কাল লজবণর নয়। দীপা বোকে। তাই চেষ্টা করে সেও গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। গাড়ীর স্রুতলবানা পুঙ্খ কেমর করে বেঁবে নিয়ে পুঙ্খরের পাশে এলে দাঁড়ায়। বলে, আত্মকেও একবার তাকলেই পারভেন বহন যুৎছেন এক। একা লজবণর নয় এত বড় গাড়ীখানাকে ঠেলা। আহুন একসঙ্গে ঠেলি দুজনে। দুজনের চেষ্টায় বহুতর লজবণর হতে পারে।

পুঙ্খর কিংবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখল দীপাকে। সঙ্গলসে স্ত্রীর হাতে কিংব হুটে উঠে। একস্রুত তাকিয়ে থেকে বলে, মহাতারত পড়েছেন? স্রুতযাং অর্ধুনের পাশে এলে দাঁড়িয়েভিলেন স্রিক এমনি তাংবেই বহন অর্ধুনে তাকিয়ে বহন করে নিয়ে শালাজিলেন হারকা থেকে।

দীপা আরক্তিম হয়ে উঠে। যুবযানিকে স্রুগিয়ে নিয়ে বলে, আমি অধ্যাপক নই যে অতো স্রুটিনাটি লব মলে বাবব। স্রুতযাং চিত্তা ছেড়ে উপস্থিতের চিত্তার মন দিলে স্রুতল শাভাং বাবে।

অতএব চেষ্টা স্রুত হয় এবং সমবেত চেষ্টায় কলক শাভাং যায়। গাড়ীখানাকে দুজনে এক পাশে সরিয়ে আনে।

পুঙ্খর বলে, তজ্জে। এই'ত লবে কামের স্রুত। আসল কাল ব্যাকী। কালে স্রাপিয়েই

বধন পড়েছেন, আর কিছুটা সাহায্য করুন আমাকে। হুতরা শুধু বব চালানাই করেন নি, অর্ধেক অস্ত্র সাহায্যও করেছিলেন। অস্ত্রএব—।

—বধন কি করতে হবে? নীপা যেন প্রস্তুত হয়েই প্রস্তুত করে।

—বনেটটা খুলে ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আপনি যন্ত্রপাতিগুলি এগিয়ে বিন একে কিছু তার আগে বনেটটা একটু খুলে বচন এমনি করে।

পুরন্দর ঘেঁষিয়ে দেয়। কিছু নীপা তুলে করতে দিয়ে এক কাণ্ড করে বলে। আর একটু হলোই সবতত ফেলে দিয়েছিল পুরন্দরের বাড়ির উপর। পুরন্দর তাড়াতাড়ি বের ফেলে বলে, অর্ধেকের সাহায্যকারী হুতরাই বটে। নিয়েছিলেন ত বাড়টা ছেড়ে!

নীপা ভীষণ অপ্রস্তুত পড়ে। তবে তার মূণ ভাঙিয়ে আসে। বলে, তারটা ঠিক নৃতকে গাছিনি। হাতটা কেমন গিঁহলে নিয়েছিল।

পুরন্দর হেসে বলে, অন্যতালের ফোটা। হাতান, লোহার রডটা দানিয়ে দি। তাহলে বয়ে দাড়িয়ে থাকবার প্রয়োজন হবে না।

বনেটটা ঠিকভাবে আটকে দিয়ে ইঞ্জিনের উপর পুরন্দর হস্তি ধরে গড়ে। এ যেন এক বিকট যন্ত্রের বিরাট মূর বিবরে অস্ত্র সমর্পণ করা। এ বৃত্ত নৃতন নয়। নীপাও দেখেছে অনেক। শিবজীতাহারতা বধন কাজ করে, এমনিভাবেই তার। কাজ করে। তখন এর মধ্যে খেঁজুটিনার কোন আশঙ্কা থাকতে পারে এ কথা সে ভাবে হেঁচনি কোনদিন। কিছু আজ সে ভয় পেয়ে যায়। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা হুতর মধ্যে তার ঝাঁপন বরে। সে থাকতে পারে না। পুরন্দরের গা বেঁধে লয়ে এলে হাত দিয়ে থাকা দেয়, এই, শুনছেন?

পুরন্দর মাথা তুলে বাড়ি থেকে প্রস্তুত করে, কি বধন?

নীপা লম্বা পায়। তবুও বলে, একাঙ্গ আপনায় নয়। আপনি লয়ে আসুন। আসুন বলছি।

পুরন্দর বলে, জানি, এ আমার কাজ নয়। কিছু করবে কে? বনেটটা এগিয়ে দিতে পারেন?

—বনেট? সে আবার কি।

—হয়। বাই সাহায্যে নাটু বস্ট্রী আটা হয়। ঐখানে রয়েছে।

বনেট এনে দেয় নীপা। কিছু কাজ হয় না। পুরন্দর বলে, এ একমুণের কাজ নয়। একমুণের শুধু চেপে বসতে হবে কোর করে। অস্ত্রএব গ্রাহালটিক নিয়ে আসুন।

—গ্রাহাল? নীপা বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

পুরন্দর হতাশ ভাবে বলে, কিছু হবে না আপনার। গ্রাহাল চেনেন না, বনেট চেনেন না, কি করে গাড়ী চালাতে শিখবেন আপনি? অর্ধেকের বাই প্রাতি পথে পথে এক কথা সেবাতে হুত হুতরকে, তা হলে হুত করা হুত না তার। একেবারে আনড়ি। বাতুন লাগা হুত বলে এখানে আর বাবের কান্ড থান।

নীপা হেসে ফেলে। বলে, আমি না হয় বাবের কান্ড খেলায়। কিছু বাবিনীও তা আছে। সে ত ছাড়বে না আপনারকে। লোকা নিয়ে বাবের তার জেরায়, নতুন করে বর লংসার পাঁচবার করে।

—সে তবু ভাল, এমন আনড়ির সঙ্গে বর সংসার করার চেয়ে। কিছু বাবিনীর ভাবনা এখন

আমার নয়। ভাবছি প্রাণেলের কথা। থাকে আপনাতা সাধারণ তাহার বলে থাকেন গ্রাম। গ্রাম দিয়ে ঢেপে বসতে হবে ওটাকে। পারবেন ?

—আনাক্টিয় হাত, হস্ত পারব না। তবু চেষ্টা করতে হবে।

দীপা চেষ্টা করে। পুরন্দরের পাশে কুঁকে পড়ে দু'কাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে। কিছু কল হয় না। অকলগ্রহ পরিশ্রমে তবু কোনই ফলাফল হয় উঠে। দীপাকে সবিয়ে আনে পুরন্দর। লজ্জিত হাতে বলে, তবু তবু খাটিয়ে হারানাম আপনাকে। কল হ'ল না কিছু। যেমত দান করাই সার হ'ল। তবুও যা করেছেন তার ক্ষেত্রে অনেক অনেক বড়বাহ। হারী পাড়ীখানা একেবারে মাটি হ'য়ে গেল। সুখেরও কি ছিঁচি রয়েছে সেখান। চট করে বুকে কেপুন এই কমানখানা দিয়ে। বলে নিজের কমানখানা বাব করে দীপার হাতে শুঁকে দেয়।

এই সময় আপ-পাশ থেকে কতকগুলো শিয়াল লম্বাঘরে বিকট চীৎকার করে উঠে। দীপা ভয় পেয়ে যায়। ক্ষেত্রে পুরন্দর পা খেলে এসে দাঁড়ায়। পাতেমুখে গরু করে, ওতি ?

পুরন্দর কৌতুক করে বলে, উই নয়, বাইও নয়। ওগুলো শিয়াল।

—শিয়াল।

—হ্যাঁ, এখন শিয়াল কিছু পরে বাব। এখনও আলো আছে তাই ভয়ছেন শিয়ালের ডাক। আলো ছুরালেই ভয়বেন বাঘের ডাক।

—সত্যি ? আপনি ভয় দেখাচ্ছেন।

—ভয় দেখাব কেন ? দেখছেন না। চারিদিকে পাহাড় আর বন। সে অতাই ত দুর্ভাবনা। ভাল করি নি এ পথ এলে। আজ্ঞা দাঁড়তে পারবেন, একটু ঘোরে ?

দীপা ঘাড় নাড়ে। বলে, বাব হয় পারব।

পুরন্দর বলে, তাহলে আপনি এসিয়ে যান। রিমের আলো থাকতে থাকতে পাহাড়টা পার হয়ে যান। লোকালয়ে পৌঁছে দিয়ে বসি কিছু সাধারণ পাঠাতে পারবেন পাঠিয়ে দেবেন।

—আর আপনি ?

—আমি এখানে থেকে পাহাড়ীখানাকে আগলাব।

দীপা বুঝে দাঁড়ায়। দৃঢ় তর্কে বলে, না। আমি স্বার্থপর নই, নীচ নই যে তোমাকে এই বিপদের মুখে একলা কোলে রেখে পালাব। দ্রুতঃ বিপদের সময় অর্জুনকে এভাবে একলা কোলে রেখে নিশ্চয়ই পালানি নি। আমিও পালাব না। একথা জুনি ভাবতে পারলে কি করে ? বিপদ বসি আসে, দু'কানাই আগ্রহ। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ঠিক বুকে বাব দেব।

পুরন্দর পুলকিত হয়ে উঠে। দীপাও দ্রুতঃ প্রাণেশ্বরের মনে আনন্দের বান হয়ে যায়। তবুও সে আর একবার চেষ্টা করে বলে, বিপদের কথা বলছি না ভয়ে, বলছি নিরাপদের কথা। একজন নিরাপদ হলে অপরের দুর্ভিক্ষ কমে যায় অনেকখানি।

দীপা বলে, একজনের কান্নাঝিনা দুর্ভিক্ষের তার কমান্বায় ক্ষেত্রে আমি নিরাপদ হ'তে চাই না। এ চিন্তাও গণে।

পুরন্দর বলে, বেশ, একবার শেব চেষ্টা করে দেখি। উটটা যেখানে হ'বে একবার পাহাড়ী

তলাটা পরীক্ষা করে দেখে নি চুট করে। বলতে বলতে সে আনটা ধুলে ছেলে পাড়ীর তলায় চিং হয়ে উঠে পড়ে।

পাড়ীখানা যেখানে দাঁড় করান ছিল, সে আনটাটা অন্তরতল এবং ঠোঁট চাপু। পুরুষের টানটানিতে সম্ভবতঃ পাড়ীখানা একটু ঝেঁপে উঠে। দীপা চমকে উঠে। তখন তার দৃষ্টি দ্বিধা ঘটে। মনে হয় পাড়ীখানা বৃষ্টি চাপু পথ ধরে নেমে আসছে পুরুষের থেকে উপর দিয়ে। ক্ষমণ একটা করে দীপা মিলেহারা হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের পাশটিতে বলে পড়ে সে ভ-ভাত দিয়ে তাকে আকর্ষণ করতে থাকে, এই উঠে এস। পাড়ী সারিয়ে ফাট নেই। শেষ পর্যন্ত পাড়ীর তলায় গ্রাণটা দিতে হবে না কি ?

পুরুষ ছু হাতে দিচ্ছে একটা বোটা তার টেনে ধরে বলে, তর নেই। কিছু হবে না। এইবার টেঁটা দেওয়াতে হবে আমাকে।

দীপা নীচু হয়ে উঠে। দেবারায় চেষ্টা করে। কিন্তু সুবিধা হয় না। তাই এক মুহূর্ত সে ইতস্ততঃ করে কিন্তু তার পরই পুরুষের মত পাড়ীর তলায় তার পাশেতে গুমে পড়ে ছু-হাতে টেঁটিকে টিপে ধরে।

পুরুষ ঝাঁপকে উঠে। বলে, আরে কর কি, কর কি। পাড়ী চালান শিখবে বলে ধুলোয় সড়াগড়ি মিলে শেষ পথান্ত। হারী পাড়ীখানির ইচ্ছাত যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল তাকে সেল।

—যাকসে। এসবর পাড়ী ট্রাউকের মারা কমলে চলবে না। পাড়ী সেলে পাড়ী হবে। কিন্তু গ্রাণটা সেলে ত আর কি হবে পাওয়া যাবে না।

—তবু তবু গ্রাণটা যাবে কেন ?

—হানি না। কিন্তু এ ভাবে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কেরামতি আর দেখব কত ? এখন হয় করে পাড়ীর তলা থেকে বেরিয়ে এলে আমি যে ধাঁচি।

অসত্য। পুরুষকে বেরিয়ে আসতে হয়। বেরিয়ে আসতে আসতে বলে, ভাল কথা, বেরিয়ে না হয় এলাহ। কিন্তু তারপর এই নির্জন অরণ্যে বলে বলে মশার কানকু বাওয়া আর ঘাঘের গান শোনা। এই ত ? তখন দীপার দিকে তাকিয়ে সে লম্বাঘে বলে উঠে, কি ব্যাপার ! একেবারে বিহুতিভূতবা কিন্তু বাই বল, বালা। মাসিরেছে কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার লাহেবাংকে। ঠিক গৌরীশ্রী। গৌরীশ্রী কাকে বলে জান ? না ? তবে পান। গৌরী-রানির মোত পড়ল মহাছেদের তঘের গণ্ডর। ভাবলেন, না জানি কি না ঐসবাই লুকান আছে এর মধ্যে। চুহি করে মাখলেন লারা আলো মহানন্দে। তারপরই বাবল বিভ্রাট। মহাছেব আর চিনতে পারলেন না গৌরী-রানিকে।

দীপা বলে, ভালই হয়েছে। ঘাঘের দলও আর চিনতে পারবে না আমাকে পাড়ীর রঙটকে ভর ছিল, সে রঙত পাণ্টে গেছে। আর সেট ? তার সৌরভ পাড়ীর তেল কাফা মেখে উঠে গেছে। এখন নিশ্চিত মনে নির্ভাবনার পাড়ীতে বলে থাকা যাবে।

—হঁ। তা যাবে। তবে নিশ্চিত মনে আর নির্ভাবনার নয়। ক-ই।

দীপা ভয় পেয়ে ধরে। একেবারে পুরুষের পা খেঁলে সরে আসে। তর চকিত দৃষ্টি মেলে জীত করে বলে, কি ?

পুরুষের বিবিকার কর্তে বলে, কিছু না। একটা কাঠ বিড়ালি। কিছু তাবছি কাঠ বিড়ালির তবে যে একবারে কোলের মধ্যে এলে ঢোক, বাহ বেগলে সে শেঁখুবে কোবায় ?

—কোবাক না। আচরক্য আর বেগলে লড়াই ভয় পায়।

—তব পাওয়া বাবের স্বভাব তারা সব সময় ভয় পায়ই। এখানে আচরক্যের প্রয়োজ্যে ভীতি না। কিছু দাঁড়িয়ে থেকে এভাবে সময় মত করা ত চলবে না। তখনই বলেছিলাম একটু এগিয়ে যেতে। সেলে এককণে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যেত নিশ্চয়ই।

—আর যদি না যেত ? আমি একে মেয়েছেলে, তার এটা বিবেক। যদি পাবে কোন বিশাকে পড়ে যেতাই, কে বধর মিত এখানে ? লহরে পৌছেও যদি কোন ব্যবস্থা না করতে পারতাম কিস্যত হ'ত তাতে। একজনকে মিলেব অবস্থার বাবের সুখে ঠেলে দিয়ে কি মোক পেতাম আমি এক অনিশ্চিতের মাঝে জাঁপ দিয়ে ?

—এ মোকের কথা নয়, এ আশ্চর্যক্য।

—আশ্চর্যক্য। আশ্চর্য্য। পারবে তুমি এভাবে আশ্চর্যক্য করতে, আমার এখানে এভাবে একলা কেল রেবে ? কখনও না। আমি ত ক'চি খুঁচি নই যে এটুকু বুঝতে কষ্ট হবে আমার।

—বেশ, তাহলে আর একবার দেখ চেষ্টা করে দেখি এস।

—তাই কর। এ বিষয়ে সব লাভ্যাই তুমি পাবে আমার কাছ থেকে। মাল চাও মাল, মাইনাল চাও মাইনাল সব আমি জুসিয়ে বেব তোমার হাতে হাতে। তবু এখানে থেকে অমন তাবে চলে যেতে তুমি আমার অসহ্যেব করনা।

—অসহ্যেব আমি করিনি তব, করেছে আমার কর্তব্য বুদ্ধি। উত্তর না তখন, যদি কোন বিপদ ঘটে, কি কৈকিরং বেবায় থাকবে আমার।

—তার কোন প্রয়োজন হ'বে না। বেবায় হ'লে বেব আমি।

—তাই দিক। বলে পুরুষ হালে। হাসি মুখেই পিয়ারের উপর পা রেবে স্ট্রাইং হাইল হয়ে বলে। দীপাও এলে বসে পাশের স্থানটি দখল করে। পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে কি একটা বলতে যায়, কিছু লহলা লায়নের দিকে দৃষ্টি পড়তে সে উদ্ভ্রাণ হয়ে উঠে এবং পর মুহুর্তে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে জটপনে রাস্তার মাঝখানে এলে দাঁড়িয়ে নিশ্চেষ্ট লোকের আচলবানি বিন্যাসের মত বাতালে আন্দোলিত করতে থাকে।

পুরুষের হকচকিয়ে যায়। চেষ্টায়ে, ব্যাপার কি তবে ?

দীপা আচলবানিকে আন্দোলিত করতে করতেই উত্তর দেয়, আশ্চর্যক্য।

—হানে ?

—বাবের হাতে থেকে আশ্চর্যক্য। সে যে তোমার মাসেটাকে পরমানসে চিবিয়ে চিবিয়ে বাবে আর তাই আরাকে চেয়ে চেয়ে বেগতে হবে, এ আমি পারব না। দেবায় তুমি আশ্চর্য্যভর দেখিয়ে বলেছিলে, ওই। এবার আমি তোমার সাহল দেখিয়ে বলছি, লায়নে চেতে বেব, ওই। বলে সে লায়নের দিকে দেখিয়ে দেয়।

পুরুষের তাকিয়ে বেবে। নমে হল, দুই থেকে একটা গুলির বড় বেন এখিকে উড়ে আসছে।

একটু ভাল করে দেখেই সে বুঝল এ দুটিই স্বামী নয়। একখানা লম্বা প্রচুর দুটি উঠিয়ে এদিকে ছুটে আসছে। দীপার লজ্জা দীর্ঘ একই আবিষ্কার করে পরিচয়পত্রের আশায় উৎসাহ হ'তে উঠেছে।

মাল বোঝাই লম্বা। ছুটে আসতে আসতে ঘেঁষে গেল দীপার অনতি দূরে। লম্বা থেকে নেমে এসে মাথায় পান্ডুলিপি পাজারী ছাইভার। দীপা এগিয়ে যায়। ছাইভারকে অগ্রসর করে তাকাতাকাতা হিম্মতে বলে, বড় বিপাকে পড়ে গেছি লগ্নি। মেঘেরবাগী করে তোমার ছোট বহিনকে একটু লাগাও কর।

ছাইভার চমকে উঠে। বহিনের কথায় সাংগেই প্রসন্ন করে, কি করতে হবে আমাকে দিদি।

পুণ্ডর নেমে আসে। ছাইভারকে লব হুঁসিয়ে বলে। তারপর উঠে পড়ে লাগে দুজনে পাড়ীখানিকে নিয়ে। লগ্নিও অতিষ্ঠ লোক। মটর ইঞ্জিনের নাকী নকর তার নখায়ে। জড়ী তার চোখে সহজেই বসা পড়ে যায়। লগ্নি লগ্নি পাড়ী আবার লগ্নি উঠে। লগ্নিও বসে, টিক হয়ে গেছে বাহু। তবে একবারে হাঠিতে ছুটে যাবেন না আজ। যাবেন পাড়ীখানা পড়ি। করিয়ে নেবেন। তারপর দীপার দিকে তাকিয়ে কানিমুখে বলে, কোন ভয় নেই বহিন। আর কোন বিপদ হবে না পণে। সমস্ত।

—সমস্ত। বলে দু-বাত ভুলে অভিযান জানাল দীপা।

পাড়ী আবার চলতে শুরু করে পার্বত্য পথ ভেঙে। দীপা ঘেঁষে বসে পুণ্ডরের পাশটিতে। বলে, বাঘের সুবে এবার ছাই পড়ল। আঁধা ঘোরা। আমার এমন নর্য মাংসের দ্বারা থেকে তার হসনা বাক্ত হল।

পাড়ী চালাতে চালাতে পুণ্ডর উত্তর ঘেঁষে, তাই ব'ল। কিন্তু বিনিময়ে কি অকৃতের তাকাতার দিগে আমাদের অন্তর পূর্ণ করে দিল জান।

—না। কেনে আমার কাজ নেই।

—তবে শোন।

—তবে আমার কাজ নেই।

—অকৃতজ্ঞতা। বাঘের চেয়েও অকৃতজ্ঞ। বাঘ যে এতদূর উপকার করে গেল আমাদের সেটারও স্বকৃতি দিতে চাও না। তার করে যদি অভিযান উভল না হয়ে পড়তে তাহলে তোমার অন্তর নিঃসৃত এমন অমিরবাগী কি শোনার দৌত্য হ'ত আমার।

—হ্যাঁ-ও। দীপা তার আরক্তিম মুখখানি লোপন করতে চায়।

—যা। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা তোমার মুখ থেকে শুনে যেতে চাই। বিবাহ হয়েছে আমাদের মাত্র পাঁচ বছর। কিন্তু সত্যি করে বলতে এই লম্বাটুকুর মধ্যে এই যে অভিযান, এমন একটা যৌবনবর্ষ অতিষ্ঠতা কেন্দ্র লাগল তোমার।

দীপা ব্যাক্ত লগ্নি তবির অকৃত করে উঠে বসে, ভাল। খুব ভাল। সে আরও একটু বসিষ্ঠ হয়ে বসে পুণ্ডরের পা ঘেঁষে।

পাড়ী টিক এই সময় পার্বত্যস্থিতি ত্যাগ করে লোকালয়ে প্রবেশ করে।

পল্লব মন্ত্র-সত্য

“অভয়চরণ”

মল্লমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ বৎসর আগে চৌরাস্তার কোণে ক্রিস্টিএর মাথায় অপেক্ষা করছি আর ট্রিকি পুলিশের উচ্চ হাতের পাননের অবদান কতকণে হবে তাই ভাবছি, এমন সময়ে অবাঞ্ছিতভাবে চোখে আবিষ্কার করলে—দশমর্মের মত মুহূ এক মঞ্জীর-বিপ্লবিনি আমার ঠিক পিছনটিতে এসে বেন বেবে গেল। হান-কাল-পাতি জুলে মনটা বামোকাই হুজুপি হুলকানার একটা পেন্সিল-ব্লক ক’রে ফেললে—তার কারণ হয়ত যাত্রা এই যে, সময়টা লম্বা এবং গুটী। বলল। কিরে তাকিয়ে বেবদুহ, ঠিক পিছনে না হলেনও, আপোনাগে ত’স্তিহাটি সুবেশা তল্লী মগায়মানা—রাত্তা পার হবে—কিছ মঞ্জীরজাতীয় কোন পদার্থ তাহের কারো চরণে লক্ষ্যগোচর হল না।

বে শব্দটা কানে এসে, পেটা তাহলে কিসের ?

উত্তিমধ্যে ট্রিকি পাসপোর্ট পেয়ে কোন্ ক্রিস্টিএর ওপর দ্বিধে পারার্থীদের হু’হুই প্রবাহ শুরু হয়ে গেল। এবং তখন হল রহস্তভের। লোকটিকে আমি যোটে নজরই করিনি,—ও দাঁড়িয়েছিল ঠিক আমার পিছনটিতে—গিটে একটা কোলা, হাতে কতকগুলো কী প্যাকেট, পায়ে হুজুহ। আমার পাশ কাটিয়ে রাত্তা পার হয়ে চলল। আমিও ভতকবে পা চাণিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হুজুহের অবলম্বেই মনে হল লোকটিকে কোথায় হুঁরি বেবেছি, হুণটা বেন একেবারে অচেনা নয়।

ওপারে পৌঁছে বোকা। গেল, মশেয়টা আমার একার নয়, তারও।

‘আপনাকে বেন কোথায় বেবেছি মনে হচ্ছে।’ আমি বললুম।

আমার অস্ত্রে লোকটি দাঁড়িয়েই ছিল। বললে, ‘আমিও আপনাকে কোথায় বেবেছি!’

‘তাই নাকি ? কোথায় বলুন তো ?’

‘তাই ভাবছি। মনে করতে পারছি না ঠিক।’ মনে করতে না পারার অবিস্মৃতিতেই হুঁরি পায়ের হুজুহগুলো একবার স্বভাব দিয়ে উঠল।

রাত্তার আলোকভক্ত থেকে ফ্লোরেন্সে টিউবের উজ্জল আলো লোকটির হুঁবের ওপর এসে পড়েছে। একই লম্বে, ওপার্শ্বের নিওন-সাইনের মিল রঙিন আলোর অল্য-নেতা ওর হুঁব বেবে প্রতিনিধিত্ব। সেইমিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল থিয়েটারের স্টেজে রঙিন আলোর অল্য-নেতা, এরা তাইই অস্বাভাবিক হুঁবের মনে পড়ে গেল ক’বাটা।

‘আজ্ঞা, বিখ্যাত অঙ্ক শাস্ত্র কৃষ্ণচন্দ্র দে’র সঙ্গে কি আপনায় পরিচয় ছিল?’ মনের কথা মুখে বাক্য করলুম।

‘হ্যাঁ, ছিল। ঠিক সঙ্গে অনেক দিনের আসরে, থিয়েটারে অনেকবার গিয়েছি। যথেষ্ট দেখে করতেই আসার?’

‘কৃষ্ণবাবু সঙ্গে আমারও আসাপ ছিল, ঠিক পান আমার বড় ভাল লাগত। অমন গলা বড় একটা হয় না।……আজ্ঞা, আপনায় কি তখনকার আমলের থিয়েটারে যাতায়াত ছিল?’ আমি সাগ্রহ লগ্নেই বিজ্ঞাসা করলুম।

লোকটি জবাব দিলে, ‘ছিল। থিয়েটার তখনক ভালবাসতাম। শিশিরবাবুর অভিনয়ের তরু ছিলাম, সুযোগ পেলেই দেখতে যেতাম। আগনিও—’

ওকে শেষ করতে না দিয়েই বললুম, ‘চলছে, এবার বেরছি।—হ্যাঁ, আমিও এক থিয়েটার-পাগল। ছিলাম এবং থিয়েটারেই আপনাকে দেখেছি কয়েকবার। তাছাড়া কৃষ্ণবাবুর সঙ্গেও। এবার মনে পড়ছে। তাই তো তানি—’

‘—চেনা চেনা লাগে কেন!’ আমার বললে ও-ই লালপুত্র ক’রে গিলে। আর সেই সঙ্গে একটা প্রাণখোলা হাসি—‘আমারো ঠিক একই কথা। কিন্তু আমার তখন এই বেশ আর চেহারা ছিল না। অ্যাঁচিন হয়ে আগনি চিনলেম কী ক’রে?’

সত্যি। চিনলুম কী ক’রে। হাতে চানাহুরের প্যাকেট, পায়ে বুড়ুর, কাঁধে চানাহুর তক্তা বোঁসা, মুখে অস্বস্তি সজ্জিত খোঁচা খোঁচা লাড়ি—এই বেশে ওকে তখন পানের আসরে বা থিয়েটারে দেখিনি। বদ্ব্য মনে পড়ে, বদ্ব্যের হুতি-পাঞ্জাবী—কিন্তু তা বোণদুহর, সুন্দর ও মাথার চুল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বসন্তটা আঁজা বজার আছে, তবে তখনকার মত বোণদুহর নয়। বহু আঁবরলাই বসতে হয়। পাঞ্জাবীর বদলে এখন হাকপ্যাট, হুতিখানা পোড়ালী বেকে বেশ অনেকটা ওপরে। জীবন-লগ্নোমের ছাপ সারা অব্যবহে। তার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত রয়েছে বার জন্মে লোকটিতে অবজা না ক’রে লক্ষ্য দেবারে ইচ্ছে হয়—কী একটা অজানা বিশেষত্ব আত্মলিত বার জন্মে আমি কোঁতুলনী না হয়ে পারলুম না।

‘এবারে ঠিকিয়ে ঠিকিয়ে কথা না করে চলুন না একটা চায়ের বোঁকানে গিয়ে বস। বাক্য।’ আমি বললুম—‘আপনায় কোন অসুবিধে বা তাক্সা নেই তো?’

‘না, তা ঠিক নেই। আজ্ঞা চলুন।’

দুজনে একটা লাস্যাসিমে চায়ের বোঁকানে গিয়ে উঠলুম। বোঁকানে যে ‘বহ’ ছিল তাকে ছ’কাপ চায়ের কথা বলে বিলম্ব। আর কিছু বেতে সে রাখি হল না।

‘তা আসতে আসতে শুভকণ আঁবার এই চানাহুর টেক্ট ক’রে বেপুন একটু।’ আমার লম্বী একটা প্যাকেট বোঁসা থেকে বের ক’রে এগিয়ে দিলে। একটু বেলে বললে, ‘ব্যবলাপাতী করছি না কিন্তু।’ ইমিতটা হুঁতলুম।

‘আগনি কি আগেরও এই কাজ করতেন? না বোধ হয়।’ চানাহুরের প্যাকেট হাতে নিয়ে আমি বললুম।

‘ঠিক হয়েছেন। এ পেশা খুব বেশিদিনের নয়।’

‘আগনার নাম কী?’

‘আজ্ঞে, অভ্যুত্থান নাম। মণিরে?’

নাম জানিয়ে বললুম, ‘আগনার বাড়ি বানেশ্বরে?’

‘বেদীপুর। সে আমারই অগ্রদূতের অগ্রদেবী। বহুদিন আগে সে আমার আশ্রিত হয়েছিল।’ অভ্যুত্থান বলল: ‘তার জন্মেই দেখাওতাঁরা দুজনের পত্নী পেয়েছে। তাই আমি হিলাস পাত্তাভী, পাত্তাভী দেবীনা পত্নী আমার বিবাহ দিলে বেশি—আইন-অমাত্য, লতাএক, চরকা কাটা, জেলে বাড়ি—এইসব। পাঁচ-সাতবার জেলে গিয়েছি।’

বলতে বলতে অভ্যুত্থানের দৃষ্টি অতীতের দিকে পিছিয়ে গেল—‘কিন্তু একেই সময় অফিসে আনোলাম ছেড়ে হাতে আঁধার জ্বলে নেবার প্রচণ্ড ইচ্ছা হত। সে ঐ ইংরেজদের বধন্যতার কারণে। তাকে উপবাস ক’রে ছুটত। বহুদিনের ক্ষেত্রে ওরা ছিল অমাত্য। একবার—’

অভ্যুত্থান চুপ ক’রে থেকে অভ্যুত্থান বলতে লাগল, ‘একবার আমারই দলের একটি মেয়েকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পাত্তাভী ক’রে হলেনও বোম্বারদের সঙ্গেও নাকি তার পরোক্ষ যোগ আছে, এই অভিযোগে কিছু গোপন বসাবসব আবারের মধ্যে পুলিশ জেলে মেয়েটির ওপর ক্রমশ উৎসাহিত হতে করে। তাতে কোন ফল না পেয়ে শেষে একদিন এক লালমুণ্ডা অফিসার কয়েকজন কর্মকর্তাদের দিয়ে পায়ে জেলে গেলেনও উল্লস করিয়ে দিল—তারপর সেই অবস্থায় হিচ্, হিচ্, ক’রে টানতে টানতে নিয়ে এল বাইরে খোলা জেল-কপাটতে। শ্য—উল্লস—জানোয়ার—’

নিরীহ চান্দ্রের বিরুদ্ধে এক রূপান্তর আমি দেখলুম সেই মুহূর্তে। ওর দৃষ্টি আশ্রিত হয়ে বর্তমানের কাউকে দেখছে না, দেখছে ভ্রূণদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্য—চোখ দুটো যেন বাঘের মত জ্বলছে, সাতাশ বছরের পেশীগুলো টান্-টান্। আমি চুপ ক’রে বসেছি, সময় বহু। নিঃশব্দেই আত্মবিকার দেখা দিয়ে গেল অভ্যুত্থান। তখন বললুম, ‘তারপর?’

‘তারেও কোন স্বীকারোক্তি ছিল না। এই ঘটনা বাইরে প্রচারিত হয়ে বৈ-বৈ লড়ে গেল। আবারের প্রাদেশিক সংসদেও সত্য ভাঙা হল। প্রস্তাব গৃহীত হল তখনও প্রতিবাদ জানিয়ে। আর সরকার বাহাদুরকে দলের পক্ষ থেকে প্যারাটি দেওয়া হল যে, বিপ্লবীদের সঙ্গে ঐ মেয়েটির আরেণেই কোন যোগাযোগ নেই। পরে ওরা তাকে ছেড়ে দেয়।’

‘মেয়েটির শেষ পর্বত কী হল?’

অভ্যুত্থান আমার দিকে চেয়ে কেমন যেন অসুস্থভাবে হাসল—‘সত্যিই ও নির্ধোষ ছিল। গোলাগুলির ব্যাপার কিছু জানত না। কিন্তু যেনই কোর ছিল অনাধার! অভ্যুত্থান যেন ঐ ঘটনার পর হত আত্মহত্যা করত। কি, পাগল হয়ে যেত। কিন্তু ওর খেলার তা হতনি। তাকে আমি রাজনীতি থেকে সরিয়ে আনলাম। ওর সম্রাট নিয়ে তাকে নিয়ে কথালায়।’

ইতিমধ্যে চা এসে কখনও যে জড়িয়ে গিয়েছিল, তা কেউই বোঝা করিনি। ‘বাম’-এর তাকে চরক ভাঙল। অভ্যুত্থান সেই প্রায়-ঠাটা চা এক চুমুকে শেষ ক’রে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘চলুন, বাইরে বাই।’

নাম দিগন্তে নিয়ে আমি ওর সঙ্গে ছুটপাথে এসে দাঁড়ালাম।

‘আগনাকে বহুদূর মত মনে ক’রে অনেক কথা বললাম।’ অভ্যুত্থান বীরে বীরে চলতে

লাগল, সেই সঙ্গে সুস্থ সুস্থ লক্ষ্য ফুলতে লাগল ওর গায়ের সুতর—‘আগনি হয়ত বিয়ত্ব হলেন মনে মনে।’ কমা-প্রার্থনার মত শোশাল ওর মুহূর্তে।

‘মোটাই না ভাবি।’ আমি ওর কাঁধে হাত রাখলুম: ‘আগনি আমার মুহূর্ত করেছে, সত্যি বলছি।’ একটুখানি চুপ করে থেকে বললুম, ‘আগনাকে এতক্ষণ আটকে রেখে আগনার ব্যবসার ক্ষতি করে নিলুম কি?’

অভ্যুত্থান হাসিমুখে আমার বিকে তাকাল, ‘কিছু ক্ষতি হয়নি। বরং আগনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমার খুব ভাল লাগছে।’ হঠাৎ দাঁড়িয়ে গড়ে বললে, ‘আগনার ঘর কোন কক্ষে?’

মাসখটা একেবারে বদলে গেছে এতক্ষণে। একটু আগের সে আগুন নির্বাপিত। সে আগুন বদল করেছে একটা লক্ষ্য হাসিমুখী তার। আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারলুম না ওর আহ্বান। বললুম, ‘কোথায় থাকেন আগনি?’

আগ্রহী হয়ে উঠল—‘খুব বেশি দূরে না। এই কারখানা টাক মেন। আসবেন?’

বললুম, ‘চলুন।’

হয়ত সত্যি সত্যি আশা করেনি, আমি ওর সঙ্গে বাব। অভ্যুত্থান উৎসাহিত হয়ে উঠল। একটু পরে সুতরের তালে তালে ছুটে উঠল ওর পদা।...

‘আমি বলি রায় রায়

মেঘিনীপুর আমার রায়

বিশ্বনাথকে করি প্রণাম।

অভ্যুত্থান আমার রায়।

এই চান্দ্রের আমার রায়।’

আমি বললুম, ‘এ রায় কি আগনার কাঁধ? না, আর কারো?’

অভ্যুত্থান হেসে বললে, ‘আমিই বৈবেছি। স্বাধীনতা আন্দোলন বেয়ে গেল, পাতীশীর্ষ কর হল, ইংরেজেরা আন্তে আন্তে পাততাকি গুটোল এবেশ থেকে। তখন আর আন্দোলনের দরকারটা কী। দিনি লোকের হাতে শাসনের তার—।’ আমার মনে হল, অভ্যুত্থান একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপল: ‘তবে আমার মত অনেকজনরা বইল যে তিরিয়ে সেই তিরিয়েই।’ কর্তব্যের আবার সন্তোষ হল, ‘অবিত্তি তার করে পরোয়া করিনি কিছু। চান্দ্রের ব্যবসা বরদাশ, কিছু না গেয়ে। এক হিসেবে ভাল, স্বাধীন ব্যবসা। গোড়ার কিনে এনে বেচতাম। এখন নিজেই তৈরি করি।’ বলে আবার দান বরদা—

‘মত্যা জেতা বাপের কলি

মেয়েরা ঘর মনে করে

চার দুগের কথা বলি।

সেতু সিদ্ধ বাবতে পারে

চান্দ্রি মুন্দের মেয়েই দার

কালনাগিনী আসে ঘরে

ওদের মায়া বুঝা তার।

নগে ছিল লক্ষ্মীরে।

হয়েছে ওরা পুলিস অফিসার

সুত লব তেলার ভাবে

পদ্মকা নাইকু হয়েছে গবর্ণর।

বাঁচিয়েছিল দাত দিনের গয়ে—”

এইই ঘণ্টাই আমার পক্ষের ঘুটে পেল অভয়চরণের। চানচুঁরের প্যাকেট দিয়ে পয়সা নিয়ে
আবার সে হুড়া কাটতে কাটতে চলল।

‘ঐরামচন্দ্রের বনে গমন
সে ঐ ঘরের কারণ।
(আবার) ঘেরেরা যদি বলে বলে
বন্দোবস্তব্দ বলে,
কালনাগিনী বাবে বলে।

কিন্তু দাসী—

বন্দোবস্তব্দ হল হাট্ট

বহিঃস্থানু নেতাই যে
আনন্দরটে লিখেছেন গ্রন্থ
বন্দোবস্তব্দ বলে হাট্ট
সুছে বাবে বাংলার কষ্ট।

ঘুরলো নাকো বাংলার কষ্ট।’

সব শব্দ ক’রে আঙুল তুলে দেখাল অভয়চরণ—‘ওই যে দেখছেন লালমত খোতলা বাড়ি,
ওই পাশের একতলা বাড়িটা, ওখানেই আমি বাড়ি একটা দিকে তাকা দিয়ে।’

বাড়িটার নিশিষ্ট অংশের প্রথম বসবাসই বেন তিরেনঘরের চেহারা। বড় বড় দুটো উল্লম,
কড়াই, কুড়ি-চেতাই, চিনেবাগান, মটর তিকোনা, তৈরি কিছু চানচুঁর, ইত্যাদি। অভয়চরণ বললে,
‘এটাই আমার কারখানা।’—[‘কারখানা’ শব্দটার একটু জোর দিয়ে]—‘এখানে চানচুঁর তৈরি
হয়, সে ভারটা প্রায় ওগর। আমি নিজে কিরি করি হ’লতকন ছোকরাকেও মাইনে ক’রে রেখেছি।
তারি লাভারপত টেপে কিরি করে।...আজ্ঞা, আসুন এদিকে।’

হুঁচরে পা এগিয়েই টোটে একটা আঙুল দিয়ে পাশের ঘরের জানালার তিতর দিকে আঙুলি
নির্দেশ করল। দেখা গেল, দেয়ালে টাঙানো পাকীকীর ছবির সামনে প্রবৃত্তা এক নারীমূর্তি, ছবির
ক্রেয়ে আটকানো হুঁতিনটি গুণ জলছে। নিজস্ব চোখে তাকালেই অভয় আনন্দে বাড় নেড়ে কানালে
—হ্যাঁ। প্রণাম্যতা ওইই প্রী।

প্রণাম শব্দ বলে আনন্দা হয়ে হুঁকলুর সাড়া দিয়ে। অভয়চরণ পরিচয় করিয়ে দিলে—‘ইনি
আমার এক নতুন বন্ধ। মহাপ্রিয় ব্যক্তি। আর ইনি আমার প্রী।’

কীবন-সংগ্রোধের ছাপ অভয়ের প্রীরও মুখে, পর্দায়। তবু তা ছাপিয়ে একটা সতেজ ভাব,
একটা অনবদীয় মনোভাবী, একটা কমনীয় ঐক্যে বেরোচ্ছে। মুখে একটি দিগ্ধ হাসি খাণানো,
অপরিচিত বলে কোন রকম আড়ম্বর নেই, বন্ধন, সখ্য। হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললে,
‘বহুদ আশনারা, আমি চা ক’রে নিয়ে আসি।’

‘পাকীকীরে ও দাগ লগা করে। পাকী হত্যার পর ও কঁপে আঙুল হয়েছিল।’ কৈফিয়ৎ
দেবার ভরীতে অভয়চরণ বলে, ‘কাজে কর্ণে—কী ঘরের, কী বাইরের—সু বড়। চানচুঁরের কারখানাটা
বলতে গেলে ওইই উৎসাহে চাপু করতে গেরেছি। এখন বেশ ভালই আর হয় আপনাদের আশ্বিনায়।’

‘হুঁলেপুলে ক’টি?’ এর না ক’রে গায়পু না!

‘নেই।’ অভয়চরণ একটু হেসে চুপ ক’রে রইল। পরে বললে, ‘ওইটেই ওর মনে লবচেয়ে
বড় দুঃখ। তা নইলে আর কোন দুঃখ ওর নেই। লগোর আর চানচুঁর তৈরি নিয়ে লম্বাই ব্যাপ।’

‘কবেশী আমলের কথা ওর মনে পড়ে না? বন উনি কহী ছিলেন আর আপনাদের বিবাহ হয়নি?’

‘মাকে মাকে পড়ে মিশেই। সুবের কথায় টের পাওয়া যায়।’

‘আর আপনায় সে-কথা মনে পড়ে না হাসিমুখ?’

অভয়চরণ কোন উত্তর দিলে না। চুপ ক’রে একদিকে চেয়ে রইল।

ভারতের সম্পদ উপাখ্যান সাহিত্য।

কম্পানকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাদেশে জনকবার আর ভেদন কবর নাই। বর্তমানে বাংলার শিত ও কিশোর সম্প্রদায়ের অন্তঃসমকালীন নানাপ্রকার কাহিনী গ্রন্থ হাটবাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবারের বহুকা বহনীদেরও ভেদন জনকবার সঙ্গে মিথেনেই পরিচয় নাই; তাছাড়া শিত ও কিশোরের পক্ষ লোনাবার প্রবণতাও যথেষ্ট স্থাপ পেয়ে গেছে। জনকবার গ্রন্থমান যৌত আদ্যভুক্তকার কাহিনীকে স্থান করে দিয়ে মিথেনে বিপুলপ্রিয় পণে।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে কিছু জনকবার তথা কাহিনী-সাহিত্যে অন্ততম গ্রন্থান অধিষ্ঠান কৃষ্ণ, চরিত বা অঙ্গুষ্ঠিত্বই। এদেশের জন-কথা ও উপকথা সাহিত্যে নিয়ে আলোচনা কম হয় নাই; এদেশের সংগ্রহও কম বিদিত নয়। কিন্তু বোধ হয় এখনও অনেক কাহিনী সংগৃহীত হয় নাই; এর কিছু লোকমুখে এখনও রহস্য সচল, অনেক বিপুল ও প্রায় বিপুল। বা সংগৃহীত ও মুদ্রিত হয়েছে তার পরিধি বিস্তৃত হলেও তা কিছু প্রচলিত কাহিনী সাহিত্যের সবটুকু নয়। বর্ষায়ী মহিলাদের মুখে জনকবার পুনরাবৃত্তি আর রহস্য সচল নয়। তা হলেও এই জনকবাণুলিকে স্বাভাবিক বিস্তৃতি-পর্বে তুলিয়ে যেতে মিলে সংকৃতির একটা অঙ্গ অঙ্গুঠ হয়ে পড়বে লক্ষ্যে নাই।

ভারত এই সব জনকবাণ ও উপকবার পক্ষ পক্ষবার যে লক্ষ্য কোণলটি লক্ষ্য করা যায়, তাহার যে প্রসারগুণ এবং পেরন যে সমাজের সতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ও ভারতীয় সতি সম্পর্কে চেতনা স্পষ্ট দেখা যায় তার সংবেদন অজ্ঞাতই বিশেষ মূল্যবান। এই জনকবাণ সমূহের অন্তর্নিহিত রসের অঙ্গুষ্ঠিত্ব অন্ত এবং এগুলির প্রকৃত মূল্যায়নের অন্তঃ এই জনকবাণুলি সংগ্রহ করা এবং এগুলিকে পৃথালোচনা করা প্রয়োজন। এগুলির মধ্যে সংকৃতির এবং সামাজিক উপাখ্যান এমনকি প্রকৃতভাবে ঐতিহাসিক উপাখ্যানও বিশেষ চতুর্ভুতর সঙ্গে সম্মিলিত করে দেখার প্রবণতা এই জনকবাণুলি রচয়িতাদের ছিল। এই সঙ্গে বলা যায় যে জনকবাণ-রচনার এবং জনকবার বিপুল জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে ভারতের স্থান সঙ্গত অগ্রগত।

ভারতে এই কাহিনী রচনার মূলে যেতে হলে বৈদিক সাহিত্যের কথাই সঙ্গ্রহম উল্লেখ করতে হয়। ঋগ্বেদের প্রার্থনা মন্ত্রগুলিতে সাধারণ মানা দেবতার প্রতি স্তুতি উচ্চারণ সেই সঙ্গে মানা কামনার কথাই প্রদানতঃ দেখা যায়; তবে ঐ ঋগ্বেদেরই এখানে ওখানে বিভিন্ন ধরণের কাহিনীর

ভারতের সম্পদ উপাখ্যান সাহিত্য

অবতারণা করা হয়েছে। ঐ কাহিনীগণের ভিত্তি সম্পর্কে গণিতের মতো কোনো মতামত নেই। তবে এগুলি যে পরবর্তী যুগের উপকথা, লোককথা বাতীর কাহিনীই এইভাবে কোন মতামত নেই।

এই সব কাহিনীর মধ্যে নারীলোকের আদর্শগুণের উৎস ও আদর্শ পুত্র পুত্রবাহ্য প্রবাহ-কাহিনী অন্তর্গত। এই সমষ্টিতে পরস্পর থেকে বহুদূরে অবস্থিত এক নারীর সম্পর্কে এক যোগ্য পুত্রের আকর্ষণ ও বিলম্বের কথা এক অসম্ভবতম কাহিনীর মধ্যে উপস্থিত করা হয়েছে দেখা যায়। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সময়ে এই কাহিনী নানা সাহিত্য প্রকারে রচনার কাণ্ডে নাটকে পুণীত হয়ে উন্নততর সাহিত্য রচিত হওয়ার অগ্রদূত বলে মনে হয়। কিন্তু মূলত এই কাহিনী তত্ত্বাত্তিক উপকথারই অন্তর্গত বলেই ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের কথা বলা হয়।

এই ধরনের অন্য একটি উপকথার আভাস পাওয়া যায় ইন্দ্র ও তুষাকপির কাহিনীতে। তুষাকপি ছিল ইন্দ্রমহিষীর অতি আশ্রয়ের একটি পৃথগালিত বীহর। এই বীহর তার সহকাত প্রবৃত্তি বলে নানা উপদ্রব ঘটতে; আর ইন্দ্রমহিষীর পায়ের ও অঙ্গতন্ত্রের কলমে তাকে কাতো কিছু বলবার উপায় ছিলনা। এই উপদ্রব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলে এক সময় মহিষীর আত্মকৃত্য সত্ত্বেও দেবরাজ ইন্দ্র তুষাকপিকে বিতাড়ন করে দিলেন।

তারপরে কি হল? ঐ কাহিনীতে তার কোন উল্লেখ নেই। এই সাপেক্ষ উপকথার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ অত্যন্ত প্রাচীন কাহিনীতেও লক্ষ্য করা যায়।

যেখানে আর একটি কাহিনীর কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই কাহিনীর নায়িকা সরমা; পতির আশ্রয়ের পোষন অপরূপ করে নিয়ে গেলে লরমাকে ইন্দ্র পোষনের সংবোধন করে পন্থার নিকট পাঠিয়েছেন। সরমার সঙ্গে পণ্ডিতের বানাহুবারে মাঝে মাঝে দুই পদ অতিক্রম করে সরমার পন্থার পোষন আসার সংবোধন পরিবেশন করা হয়েছে। পণ্ডিত কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি কোন প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করল না এবং সরমার দ্বীত্য কাণ্ডে ব্যর্থতার পর্যাপ্তিত হল।

অনেকে এই কাহিনীটির মধ্যে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ছাড়া লক্ষ্য করেছেন। উপকথার কাহিনীর আড়ালে অনেক আশ্রয় ইতিহাসের কোন বিশেষ ঘটনার আভাস থাকলেও কাহিনীগণ মূলত নারীবাহ্যের বসবোধকে পরিচয় করবার মতই পরিকল্পিত হয়। এই সমষ্টির সংবেদনও মূলত উপকথারই পর্যায়ের। এই ধরনের লোককথা বা উপকথার যে ব্যক্তিরা যথেষ্ট সামান্যই লক্ষ্যে লক্ষ্যে লাভ করেছিল এই কাহিনীগণিতে তার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে লক্ষ্যেই।

যদিও সমস্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতগুলি দিলমুখ্য এবং কতগুলি চিত্রিত লক্ষ্যেরা হয় তার মূলও কোন না কোন অন্তর্গত কাহিনীর অস্তিত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। এই সব কাহিনীর মূলে কোন দেবদেবীর বাবা বা প্রচারণার মত প্রচেষ্টা ছিল। এই ধরনের একটি দিলমুখ্য দুই অর্থকরী ডালের বাগানে হওয়ার মত একটি নারী মৃত্যু আছেন। এই মৃত্যুর সপক্ষে উৎসর্গের একটি পুত্র ছবি; নীচে প্রবৃত্তিভাবে হওয়ার মত একটি মৃত্যু। সমস্তমিলিয়ে হাত একটি কাহিনীর কোন একটি বিশিষ্ট মূর্তিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যে কাহিনীর প্রমাণ প্রতিপাত হতে অর্থকরী উপকথার দেবতার মত প্রচারণা। পরবর্তী যুগে ভিত্তি ভিত্তি পূরণ কাহিনীতে নানা দেবদেবীর সম্পর্কে বেশব লোককথার উল্লেখ পাওয়া যায় এই দিলমুখ্য সম্মিলিত কাহিনী চিত্রের সঙ্গে তার নিকট সাপেক্ষ উল্লেখযোগ্য।

লোকতত্ত্ব এই ভাবে দুটি ভাগের প্রবর্তন হয় অতি সুপ্রাচীন কালেই ভাষ্যেতে উল্লেখিত। এর একটি একটি বিশিষ্ট গতি অবলম্বন করে দেব-দেবীর অলৌকিক কার্যকলাপের কাহিনীরূপে বিবৃত এবং প্রচলিত হতে থাকে। এই পর্বাংশই ইংরেজীতে বলা হয় Mythology। এই ধরনের দেবোপাখ্যান ও মূলত লোককথা; তবে এই দেবোপাখ্যানকে অবলম্বন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি সঞ্চারিত করা এবং এই বিশ্বাস ও ভক্তিকে জীবন্তীয় ভাষায় প্রচেষ্টাই প্রধান। এই প্রচেষ্টার অন্তর্গত অনেক সময় বার্ষিকের পূর্বাহিত সম্রাটের সম্রাটের উপর প্রতাপ বর্ষায় বাঁধবার ইচ্ছার প্রকাশও লক্ষ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সব দেবোপাখ্যানের উদ্দেশ্য ও অবশেষের পক্ষে সাধারণ মানুষের লোকতত্ত্বের প্রতি অগ্রগতি ও গল্প শোনার সহজাত ইচ্ছাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। লোকতত্ত্বের একটি গতি প্রধান এমনি করে দেবোপাখ্যান বা মিশ্রলিখিত পরিণত হলেও রাষ্ট্রের সহজ সমাজব্যাপক লোক লোকতত্ত্বকেই দেবোপাখ্যানে পরিণত হতে সক্ষম নাই। ভারতে দেবোপাখ্যান নিরপেক্ষ নিছক লোককথারূপেও অনেক উপাখ্যান সমাজে প্রচলিত থেকে গিয়েছিল। আর এই ক্ষেত্রে ভারতের কিছু বৈশিষ্ট্যও ছিল।

অত্যন্ত সত্যতার ক্ষেত্রে দেবোপাখ্যান ছাড়া অন্য লোককথার কোন বিশেষ মর্যাদা উচ্চতর সমাজে স্বীকৃত না হওয়ায় সেই সব লোককথা নিছক Folktale রূপে অত্যন্ত নিম্নতরের সাধারণ মানুষের সমাজের সম্পদ রূপে পরিগণিত হয়ে পড়ে ছিল। সমাজে উচ্চতর অত্যন্ত প্রথম শ্রমিক শ্রমিকেরা Mythology ছাড়া অন্য কোন গল্প বা উপাখ্যান উচ্চতর সমাজে বিশেষ সম্মানের লাভ করেনি বা উচ্চ তরের সাহিত্যে উপলব্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ভারতে লোক কথার গতি প্রবাহ নিম্নমুখিত্বের বিবৃতি স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

এখানে লক্ষণীয় ঘটনা এই যে ভারতের লোককথাকল্পিত নিষ্ঠার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে থাকলেও সেগুলির গতিবিধি উচ্চতর সমাজেও কিছু কম ছিল না। এবং প্রয়োজন মত সাহিত্যের ভাষায় পরিমার্জিত হয়ে বিভিন্ন মুখে উচ্চতর সমাজেও সেগুলি যথেষ্ট সম্মানের লাভ করেছিল। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য ও বৈদ্য পুর্বাংশের মুখে সাহিত্যে এই লোককথার অনেক পরিচয়ই বিদ্যমান আছে। এর পর মহাভারত ও রামায়ণে বহু লোককথা অন্তর্ভুক্ত ও লোককথাকে সংকলিত হয়ে রয়েছে দেখা যায়। এই সব লোককথার অনেকগুলি দেবোপাখ্যান, দেব দেবীর মহিমা প্রচারের জন্য কল্পিত-কাহিনী। অতগুলি সাধারণ উপাখ্যান; কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু আশ্বাসপ্রদায়ী, অল্প কিছু উপাখ্যান মজা। সুপ্রাচীন ঐ সাহিত্যে সংকলিত এই ধরনের লোককথার বৈচিত্র্য এবং বিস্তৃতি অত্যন্ত চমকপ্রদ। কিন্তু কেবলমাত্র উপাখ্যানের সংকলন রূপে সাহিত্যের গতি অত্যন্ত ক্ষয় এবং প্রচলন ও বিদ্যমান থাকা নামে পরিচিত উপাখ্যানমালা প্রাচীনতায় ও বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আধুনিক পুঁথি পুঁথি বিচার বা প্রথম দশকে গতি অত্যন্ত গল্পগুলির উপলব্ধি অনুভব পুঁথি অনুভবের ঘটনা। গল্প বিখ্যাত অর্থব্যয়মূল্যে তপস্বীকালীন বোধি বা নিধি সাহিত্যের অব্যাহিত পুঁথি অনুভবের অক্ষমতা কাহিনীর লাভ করেন ও প্রবর্তনায় বারবার তাঁর পুঁথিগটে বিপদ বহু ক্ষণের কাহিনী প্রোচ্ছল হয়ে ওঠে। বিপটিকের নিধান কথা নামে পরিচিত উপাখ্যান মালায় পুঁথি নিধান উপাখ্যান রূপে কিছু কাহিনী পরিমার্জিত করা হয়েছিল। তবে অত্যন্ত নামে সংকলিত এই কাহিনী

সমুদ্রের ঘণ্টা আঘাত বহু উপাখ্যানের সমাবেশ করা হয়। প্রত্যেক উপাখ্যানেই কিছু না কিছু আত্মপরিচয় ইঙ্গিত সন্নিবিষ্ট থাকলেও গল্পগুলি নিছক গল্পমণ্ডল গ্রন্থত পরিমার্জিত উপভোগ্য। আর এগুলির জনপ্রিয়তাও যে খুবই বিস্তৃত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতীত কালে হয়েছে যে সে যুগে প্রচলিত অসংখ্য গল্পকথা সংগ্রহ করে বৌদ্ধেরা গল্পবান বুদ্ধের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ক্ষয় কাণ্ডকথাদ্বারা ভুলে প্রচলিত করে। এই কাহিনীর অনেকগুলির অন্তর্ভুক্তিও গবেষণার প্রাচীন ঐতিহাসিক বটমার দ্বারা লক্ষ্য করেছেন। সেই পণ্ডিত ভ্রাতৃ উল্লিখিত বুদ্ধের ও বৈষ্ণবের সম্বন্ধে যে গ্রন্থাদি লিপিকৃতের প্রখ্যাত ব্যক্তির কৃষ্ণ একথা সর্বজন স্বীকার্য। গল্পগল্প কাহিনীতে রামায়ণের সুপরিচিত গল্পের সারসংক্ষেপে বর্ণিত কাহিনীও এক অল্পতর গল্প লক্ষ্য করা যায়। যাকের ভ্রাতৃক পুত্র বাবিলনের সঙ্গে পণ্ডিত সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত কৃষ্ণকান্দ (বর্তমান জা'স) বন্দেই মাঝামাঝি বাণিজ্য চলত তার সুশ্রুতি পরিচয় অন্যতম। এইসব বৈশিষ্ট্যসমূহ এই আখ্যানিকগুলি যে নিছক গল্পমণ্ডল গল্পের রসগর্ভ সে বিষয়েও পণ্ডিত মহোদয় কোন সন্দেহ করেন নাই।

ভারতীয় লোককথার বৈচিত্র্য এবং সরলতা যে কত মহানার তার অল্পতর পণ্ডিতের বিবৃত হয়ে আছে লক্ষ্য করা হইতে পারে। কাহিনী সংগ্রহ বুদ্ধকথা নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থ ভারতের কাহিনী-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বস্তুতঃ ভারতীয় প্রাতিভার ক্ষেত্রে নিছক লোককথাকে কি পরিমাণে রসগর্ভ এবং উপভোগ্য করে তোলা যায় এই বুদ্ধকথা তার অল্পতর পরিচয়।

এই গ্রন্থকেই উল্লেখ করিতে হয় কথা লিখিত সংস্কৃত, বেটাল গল্পবিশেষ, বাঙালি পুতলিকা ও বিজুপুর্ণা বিরচিত মিত্তেদ মিত্তলত নামে অভিহিত গল্পের কাহিনী গ্রন্থে। এই সকল উপাখ্যান বা কাহিনী গ্রন্থের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বাইরে বড় একটা নাই। আরবেও লক্ষ্য রচনীর কাহিনী ভারতের কাহিনী সাহিত্যের মতই বৈচিত্র্যপূর্ণ কিন্তু ঐ কাহিনীর বিশুদ্ধ নীতিত। আর গ্রীকদের ইলপ্স, ফবলস ও আরবদের অল্পবিত্ত গল্পের কাহিনীও ইংল্যান্ডের গল্পের মত।

ভারতের এই লোককথার সম্পদ কালার্পি অধিক্রম করে আজও প্রচলিত হয়েছে। ভারতের সাহিত্যিক সম্পদের এই সম্পদকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় নাই। এই বিস্তৃত লোককথার মধ্যে গল্প সংগঠন ও রস পরিবেশনের যে কৌশল বিহিত আছে তার ব্যবহার্য্য ইন্সট্রাকশন দেয় নাই যে কোন সাহিত্যিকই বৈবেশিক গল্পরচনা কৌশলকে অতিক্রম করে ভারতের চিত্রচিত্রিত গল্পরচনা কৌশলের সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠাপন করতে পারেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চলতি দুনিয়া

পৃথিবীর প্রথম বর্ষদট

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কথা বর্ষদট করেছিলো? পোথিয়েত সংবাদ সংস্থা এ পি, এন আনাজেন আবেলের জুপিটার মহিষে যে গ্রীক বাণী বার্ষিকতা নিহত ছিলো তাহাই পৃথিবীর প্রথম বর্ষদটকারী। তর্কবিবর্তিত সময়ের ব্যাপ্ত এবে করা চলবেনা, মহিষ কতৃপক্ষের এই নিবেদ্যাকার প্রতিপাদে তাহা বর্ষদট করে। ঐ:পু: ৩০৯ অবে।

তিথারীণের স্মারকপত্র

মহা-শাক্তি উত্তর করার স্তম্ভ প্রার্থনা বিশ্বাস বিবেচনা ক'বে দাবী নিয়ে হাজির হয়েছ আমসেবপুরে কয়েক হাজার তিথারী। বর্তমান কালের গুরুতর ব্যাপ্ত-পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে দ্রষ্টব্য ভোক্তাদের প্রত্যাব এয়া করেছে। একটি স্মারকপত্রে নিবেদনের নিয়াকণ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তিথারীরা আনায় অচিরে যদি ভাবের বাচবার মতো ব্যাপ্তর ব্যবস্থা না করা হয় তবে দেখা যাবে যাতায়াত তিথারী-দুগ্ধদেহে ভ'রে উঠেছে।

সমুদ্রের নিচে মেয়ে

মেহী মার্গারেট বেভেল বিশ্বের একজন গরল। যথের ল'ভাক। সম্ভ্রতি তিনি সমুদ্রের নিচে ছয় বর্টা কাটিয়েছেন। তিনি ঠিক করেছেন সমুদ্রের নিচে তিন দিন থাকবেন।

মিল রেভেলের বয়স ২৯। তিনি আমেরিকার মেয়ে। তিনি বলেন: "সমুদ্রের তলার আবীনতাবে বাস করবার চেষ্টা আমিই প্রথম করছি।"

হিস বলে থাকার সময় হাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার স্তম্ভ তিনি তবাবের গোখাক ব্যবহার করেন। এছাড়া তাঁর বস প্রতি বর্টার অস্ত্রিখন লবনহাঙ্কের ব্যবস্থা করেছিলেন। কলের নিচে পুণোবার স্তম্ভ একটি গরম বিছানায়ও ব্যবস্থা ছিলো।

চলতি দুনিয়া

যেহাঁর সংবাদিক খাম্বী—এরউইন গুডউইন আনিয়েরেন ছ'বটা। অলের তলায় থাকার মতন দেহীও কান দুটির ভিতরে একটু অনুবিহার সজ্জা হয়েছে; তবে এ সব তুহুতুইই হয়, দিন কয়েকের মধ্যেই আবার ঠিক হয়ে বাবে।

অকুত উইল

আমেরিকার এক ধনী সম্পত্তি দায়া গেছেন। মরার সময় তিনি উইল ক'রে রেখে গেছেন দু-লক্ষ ডলার। আশ্চর্য্য অস্তিত্ব যিনি প্রমাণ করতে পারবেন ওই বিপুল অর্থের অধিকারী তিনিই হবেন। তত্ত্বলোক দায়া যাওয়ার পর থেকেই এ পর্ব্বত বহু হাকীমার চাঞ্চির হয়েছেন। জানা যায় অন্তত ২৫ জন লোক দাবী করেছেন যে আশ্চর্য্য অস্তিত্ব তারা প্রমাণ করেছেন। এরা প্রত্যেকেই টোকাটা দাবী করেছেন। এমনকি তা নিয়ে আদালতে মামলা-মোকদ্দমা পর্ব্বত শুরু হয়ে গেছে। এই ২৫ জন ছাড়া এটি প্রতিষ্ঠানও ওই অর্থের হাকীমার। প্রতিষ্ঠানটির নাম ফিলিক্যাল রিসার্চ ফাউণ্ডেশন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যেহেতু অশরীরি আশ্চর্য্য হ'লে কিছু নেই সুতরাং ওই অর্থ এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিলে মনস্তাত্ত্বিক পদবেষণার ব্যয়িত হবে, মাত্রের কাজে লাগবে।

গর্তপাত

একদিকে নীতির প্রের, অত্রদিকে সামাজিক কল্যাণের প্রের—এই দুই প্রেরই অভিহিত আছে গর্তপাতের লগে।

বিশ্বে ও আমাদের দেশে গর্তপাত যে কতানো হয় এতে কোনো সম্বন্ধ নেই। কথা হচ্ছে আমাদের দেশে একে বৈধ হ'লে ঘোষণা করা ঠিক হবে কি না।

রোমান সাম্রাজ্যের যখন কমিছু অর্থ্য তখন গর্তপাত ছিলো একটি স্বাভাবিক প্রথা। বড়ো-বড়ো আইনজ্ঞেরাও একে নিষিদ্ধ করতে সাহস পেরেন না। প্রাচ্যের বহু দেশে গর্তপাত ছিলো সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

ঐতিহ্যের আবির্ভাবের লগে-লগে জুরোপীয়দের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। ওই বর্ষ হলে যে ঐক্যই শিক্তরও আশ্চর্য্য আছে। গর্তপাত অপরাধ হ'লে সর্বা করা শুরু হয়। সেট অগতির ঘোষণা করেন : “য হা-র বহু লসান বরপের ক্ষমতা আছে, সে যদি তা দারণ না করে তবে ততগুলি লসানের হত্যাকাণ্ডী হ'লে তাকে সর্বা করা হবে।” ১৫৫৬ সালে রাজা ফিলীপ হেনরী গর্তপাতকে গুরুতর অপরাধ হ'লে ঘোষণা করেন ও জানান যে ওই অপরাধে কেউ দোষী লাগাত হ'লে তাকে দ্বুদ্বা-ধণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

১৫২০ সালে পোতিয়েট হাশিরা গর্তপাতকে বৈধ হ'লে স্বীকার করে। সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে নিজেই ওই ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৩০ সালে কল সংস্কার নীতির পরিবর্তন করে। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া গর্তপাতকে বৈধাইনী হ'লে ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৮ সাল থেকে জাপানে গর্তপাত বৈধ হ'লে স্বীকার করা হয়েছে। সেখানে ১৯,০০০ জন জাক্সের লাইসেন্স আছে। তাইই গর্তপাত করান। এর কলে জাপানে মগের হার খুবই কমে গেছে। জনগণেরা মনস্তাত্ত্বিক আর্থিক সমাধান লগব হয়েছে।

গর্তপাত সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে ইংরাজরাই বোম্বের সব চাউতে রক্ষণশীল। ইংল্যান্ডে কোনো ম'গর্তপাত ঘটলে তাকে আত্মীয় ক'রারও ভোগ করতে হবে। অবশ্য ঘটনাক্রমের বহর প্রায়ই বিচারকের আদালত পর্যন্ত পৌঁছায় না। আমেরিকাতে গর্তপাতকে বৈধ করার ক্ষমতা আন্দোলন চলেছে। কিন্তু এর পরিণাম কী হতে পারে সে সম্পর্কে আটকায় না থাকায় লেখনকার আইন-জীবীরা এখন পর্যন্ত হস্তক্ষেপ ক'রে উঠতে পারেন নি।

গর্তপাতকে বৈধ করার ক্ষমতা জার্মানির মেম্বেরা আর আন্দোলন চালাচ্ছেন। নাৎসীদের আমলে গর্তপাত গুরুতর অপরাধ রূপে গণ্য হতো; তার ক্ষমতাও হতের ব্যতীত ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানিতে গর্তপাত অপরাধের ক্ষমতা মুহূর্তে বহিত করা হয়। বর্তমান পশ্চিম জার্মানিতে কেবল ১৯৮৮ সালে গর্তপাত ঘটাবার ক্ষমতা ৬০০ লোককে প্রেরণ করা হয়।

১৯০২ সালে ফ্রান্সে যে পারিবারিক আইন গৃহীত হয় সেই আইন এখনো চালু রয়েছে সেখানে গর্তপাত ঘটানো বা গর্তপাতের চেষ্টা করলে তার ক্ষমতা এক থেকে পাঁচ বছর কারাবন্ড এবং ৩০,০০০ থেকে ৬০,০০০ ফ্রাঙ্ক পর্যন্ত জরিমানা দিতে হয়। একাধিকবার ওই অপরাধে লিপ্ত হয়েচে এই অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে জরিমানা দিতে হয় ওই অর্ধেক দ্বিগুণ। অপরাধী স্ত্রীলোককে ধরা হয় হ'রাস থেকে হ'বন্দর কারাবন্ড আর তাকে জরিমানা দিতে হয় ৬০০০ থেকে ১২,০০০ ফ্রাঙ্ক। তাছাড়া ওই একই অপরাধে চিকিৎসক, চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানকে পাঁচ বছরের ক্ষমতা চিকিৎসার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

লাটিন আমেরিকার গর্তপাতের হ'বকম স্রোতি নির্ধারিত করা হয়। এক হলো মহিলায় লজ্জা নিয়ে যেটা করা হয়, দ্বিতীয়ত তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা গর্তপাত করা হয়। শেখোত ক্ষেত্রে অপরাধীকে নিতে হয় পাঁচ।

ফেন্ডিনেস্তার দেশগুলির মধ্যে দুইডেনই প্রথম ১৯০৮ সালে স্বাধীন, মানবিকতা ও সামাজিক কল্যাণের প্রায় বিচার ক'রে গর্তপাতকে বৈধ হ'লে স্বীকার ক'রে আইন পাশ করে। এক বছর পরে ডেনমার্কও অল্পরূপে আইন পাশ করে।

গর্তপাত বৈধ করা হবে কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে আমাদের দেশেও তর্ক-বিতর্কের স্বক উঠেছে। অবশ্যভাবে এতে আইনের স্বীকৃতি মিলে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে ব'লেই মনে হয়।

সোনার ঘরে চুল—

বরষটা শুনে আপনারা অনেকেই অবাক হবেন কিন্তু কথটা গল্প নয় সত্য। ভারতবর্ষের মেয়েদের চুলের ক্ষমতা পশ্চিম দেশে এখন কাড়াকাড়ি হয়েছে। জন্মের মেয়েরা বিশেষ করে হাওয়া beauty conscious এবং up-to-the minute fashionable তাদের এই অসুস্থ craze। তবে সবচেয়ে বেশী পাপল হাফিং দেশের মেয়েরা এবং সে দেশের আভিমান্য সম্ভ্রমারের মেয়েরা। হলিউডের সবচেয়ে নামকরা গায়িকা এখন ভারতের মেয়েদের চুলের ক্ষমতা অধিব—তাঁরা এই অসুস্থ লক্ষণে যে কোন উদ্বুদ্ধে কিনতে রাজী। ভারতীয়দের চুলচুচে কালো-চুল বিশেষ করে ভারতীয় মেয়েদের আভিমান্য লবিত প্রায় তক্ষু কেশজঙ্ঘ আত্ম তাদের বস্ত্র হয়ে যাচ্ছে। রজনীগন্ধা নিত্য নৃতন চুলের fashion ভারতজুড়ে চাই পড়চুলা। প্রায়শ্চলনো সনসাতানো সৌন্দর্যের অধিকারিণী হতে হলে আত্ম আত্ম

bobbed hair নয়। Bobbed hair—এখন out of date। তাই আজ দক্ষিণ মুলুকে এক একটি পবচুলার দান কম করে ছুইপত আড়াইপত টাঙা। আদ্যের মেয়েরা এখন শুভলে সত্যি সত্যি তাক লেগে থাকে তোরা তো সর্জহারা—তারের নিজেদের অপভ্রম কেশের শোভা,—তমর তরু আদ্যহু লবিত তেলগুজু তারের আজ কখনার আছে। ওদেশের মেয়েদের লেখালেখি—এদেশের মেয়েদের bobbed hair কালসন হয়ে গাঢ়াল। কিন্তু আজ যখন শক্তির হৃদয়ের সুললিতা এদেশের মেয়েদের সত্যাবস্থাত লবা যন কালো চকচকে চুলের অস্ত পাগল তখন আদ্যের মেয়েরা কি করছে ?

দক্ষিণ মুলুকের একজন ব্যবসায়ী মাহুদের চুলের অস্ত লাবা পুঁথির খুঁজে খুঁজে পেয়ে তারতে এসে খুঁটি পেড়েছে। যাহাযে একটি আমেরিকান কোম্পানী কিছুদিন পূর্বে একটি পবচুলার কারবার খুলেছে। সেখানে এখন কাজ করছে ৮০০ লোক। প্রতিমাসে তৈরী করে ২০০০টি হাতে তৈরী আর ৮০০০টি মেশিনে তৈরী পবচুল। আমেরিকার বাজারে হ হ করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এবং এতে কোটি কোটি টাকা তারা রোজগার করছে। এবারে এদেশের বিভিন্ন মাহুদ চুল বিক্রির অস্ত যে হকোড়ি করবে তাতে আর আশঙ্কা কি ?

অলেক দুটোশুত্র সখে একটি

আমাদের এরকম অলেকের একটি ছোট কারবার নাম দ্বোটাইন। কাটার পাঁচক লোকের দাল। এই ছোট শরত্রে আছে একটি বাজারালারের ধনেজুনের দ্বারা ১৭৭০ সালে নির্মিত একটি দুর্গ।

দুর্গটি ছিল তথ্যপ্রায়। ১২৪১ সালের পরে হানীর অধিবাসীরা দাবি তুললেন যে দুর্গটি একেবারে ভেঙে ফেলা হোক, ফেরনা বৃত্ত হিলাবে সেটি পূর্ব নন্দাভিয়ার ছিল না।

কিন্তু দুর্গটি ভেঙে ফেলার বিকল্পে যোরতর আগুনি আদ্যলেন ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বললেন যে দুর্গটি ভেঙে ফেলতে হলে প্রচুর ব্যয় পড়ে যাবে। তার চেয়ে দুর্গটি নতুন করে গড়ে তুললে পহরের একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

প্রত্যয় তখন অনেকই বেসেছিলেন, বলেছিলেন যে ব্যাপারটা হয়ে গাড়াচ্ছে মুক্ত নৌবা নির্মাণ করার মতো। কিন্তু তা লঙ্ঘ্যে প্রচারণা কার্বে পরিণত হল। হানীর অধিবাসীরা প্রথমে নিতান্তই কৌতূহলী হয়ে যেভাবে এসেছিলেন, পরে অভিমতের আগ্রহী হয়ে কাকে বাত লাসিহেছিলেন।

এমনিভাবে যেখানে ছিল একটি ভাড়া দুর্গ সেখানে গড়ে উঠল জাববর-প্রেকাপুহ-মক ইত্যাদি সমস্ত বিরাট এক সংস্কৃতি-ভবন।

এই নির্মাণকার্বে ১৫,০০০ মার্ক বাত কর: হয়েছিল সাংস্কৃতিক তহবিল থেকে। হানীর অধিবাসীরা কোনো পারিশ্রমিক না নিয়ে খেজাপ্রাণোষিত হয়ে যে-পরিমাণ কাজ করে বিহেছিলেন তার দ্বারা ছিল প্রায় ৫৫,০০০ মার্ক।



জ্যোতির্ষ

ভারত বনাম ইংলও । দ্বিতীয় টেস্ট ।

লর্ডস মাঠ । আরম্ভ

২০শে জুন ১৯৬৭

প্রাককথন

প্রথম টেস্ট-এর দ্বিতীয় মক্কার অপ্রত্যাশিত এবং চমকপ্রদ ব্যাটিং লাকলোর পর তরুণ বেলোয়াড়ের সেরা বল যে কীরে এসেছিল পূর্ববর্তী দুটি খেলায় তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে । কেন্দ্রিক বিনবিভালমকে ভারত ইনিসিং-এ পর্যাবৃত্ত করেছে এবং তার পরের খেলায় ক্রমশঃসারকে হারিয়েই দিয়েছে বলা চলে । ক্রমশঃসারের দ্বিতীয় ইনিসিং-এ শেখ ব্যাটলম্যান যখন বেলেতে নামলেন তখন ভারতের কয়লা হবার অস্তে ছ'লাত রান ব্যক্তি । এদিকে আর একটি মাত্র ওক'র খেলা হবে । সেই ওক'রে অমিত বিক্রমে বল কয়েন হুইত স্তব । এই খেলার তার আগে তিনি দুটি উইকেট পেয়েছেন । শেখ ওক'রে তাঁর দুটি বল খেলোয়াড় পা দিয়ে আটকালেন । দু'বারই পূর্ব বিখ্যাসের সঙ্গে দৃঢ়কর্মে এল. বি. ডবল্লু আবেদন জানানো হয়েছিল । দু'বারই আপ্যোচার সেই আবেদন নাকচ করে দেন । ওক'রকাই একটি পত্রিকার মন্তব্য করা হয়েছিল যে দ্বিতীয় আবেদনটিতে কোন ভুল ছিল না এবং ভারতের দূর্তাগ্য যে ব্যাটটি তারা দ্বিততে পারলেনা । সে যাই হোক, ওক'র আক নিসেলয়ে বলা যেতে পারে যে অহুতুল আবেদাওরা গেলে ভারতের খেলোয়াড়রা খেলা যেখানে পারে । কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে মক্কার অস্তাব না থাকলেও সেই মক্কার এবং খেলার মান মক্কার রাখবার অস্তে যে দৃঢ়তার প্রয়োজন, যে মানসিক হৈর্ষের মক্কার, তার অস্তাব প্রায়ই দেখা যায়, ফলে আক চমককার খেললেন, পরের দিন একেবারে বা-তা । এই খুব ভাল, এই খুব মজ, এর ফলে আকনিষ্ঠরতা কয়ে যায়, মনোবল বঠ হয় ।

দু'মলেই নির্বাচিত খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশিত হয়েছে । প্রথম টেস্ট-এর বিনবিভাল মানের ক্রতিব অর্জনকারী খেলোয়াড় বরুচট হল থেকে বাব পড়েছেন । খেলার ওপর রান করলেও তার শব্দক সত্তির খেলা খেবে মন্তব্য খোনা সিহল পরবর্তী টেস্ট-এ তাঁকে মলকৃত করা হবে না । দু'তিমকন নতুন খেলোয়াড়কে এই টেস্ট-এ ইংলও সুযোগ দিয়েছে ।

ভারতের খেলোয়াড় নির্বাচনে ভারতীয় নির্বাচক বতলী অগ্রবিধার পড়েছেন । মোহল ও ও

অথবা থাকার তাঁদের হলভুক্ত করা হয়নি। হুহুহুহু সিংও সম্পূর্ণ সুস্থ নন। বাই হোক আশাকরি খেলার দিনগুলিতে তিনি সম্পূর্ণ সজ্জ্ব থাকবেন। তিনি বলের কম স্তরলা নন।

হু'বলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম নীচে দেওয়া হল :

ভারতের পক্ষে :

পাতোদি (অধিনায়ক), দিলীপ লবনেশাই, অমিত ওয়াদেকার, চান্দু বোহাদে, হুময় সিং, কলি স্রুতি, সি অরুণ্যাম, প্রদম, চন্দ্রশেখর, বিবেক বেনী, এক ইঞ্জিনিয়ার ও দুই সূক্ষ্মবন।

ইংলেণ্ডের পক্ষে :—

ব্রাহান ক্রোথ (অধিনায়ক), কেন ব্যারিংটন, বেলিল ডি অলিভিয়েরা, টম গ্রেভন, যে ইলিংওয়ার্থ, জন বো, তেলি অ্যামিল, ডেভিড ব্রাউন, বোন হবল, জন বাতে, বাশন ব্যাকিং ক্রেচার। প্রথম দিন।

ভারত টলে জিতলো। বিশেষ স্তর হুহুহু। শুকনো মাঠ। রুটি সেই। কিন্তু ভারতের অভাবনীয় ব্যাটিং বিপর্যয়। রান্ড ১৫২ রানে লকলে আউট। হুময় বেলতে পারেন নি। কিন্তু সেটা কোন কৈফিয়ত নয়। ভারতের খোচনীয় ব্যাটিং দেখে লকলেই বিম্বিত। কোথায় সেল সেই মারমুখী লড়িয়ে হনোভাব? কোথায় সেল সেই আত্মপ্রত্যয়? একমাত্র ওয়াদেকার ৫৭ রান করে তাঁর সুনাম বজায় রাখলেন। সারদেশাই ২৮, সুব্রহ্মণ্য ২০ আর প্রদম ১৭। ব্যাকি লকলে ১০ এর বরেন্ড পৌছতে পারেন নি। ইংলেণ্ডের ফাট বোলার বো আর্থ ব্রাউন দু'জনে ৬টি উইকেট জাগাতাশি করলেন। এইদিন ইংলেণ্ডের উইকেটকিপার জন মায়ে ভারতের হু'বল ব্যাটসম্যানকে আউট করে অট্রেলিয়ার উইকেটকিপার ওয়ালি গ্রাউটের সহান হলেন। এক ইনিংসে আর কোন উইকেটকিপারই হু'বলকে আউট করতে পারেন নি। অতএব জন মায়ে বিশ্ব রেকর্ডের তালিকাধার।

চা পানের আগেই ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ। ইংলও ব্যাট করতে নামল। দিনের শেষে ভারতের রান ২ উইকেটে ১০৭। ভারতের নৈরাত্তজনক খেলা লকলে বিশেষভাবে বলেছেন, কাস্ট বোলিং চিরকালই ভারতের পক্ষে দিভীবিলা। তার ওপর লর্ডস-এর সবুজ পিচে বল পড়ে ফত ছুটেছে আর ভারতের ব্যাটসম্যানরা সেইসব বলে খোঁচা দিয়ে মরেছেন।

দ্বিতীয় দিন।

প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে বেলে ইংলেণ্ডের ব্যাটসম্যানরা ৩ উইকেটে ২৫২ রান করলেন। তারপর রুট্রিও বেলা হুহুহু। হুহুহু ব্যাটসম্যান ব্যারিংটন-এর দুর্ভাগ্য লর্ডস মাঠে তাঁর সেকুহী হল না। ৩ রানের অল্প তা থেকে বকিত হলেন তিনি। টম গ্রেভনের নট আউট ৭৪ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একমাত্র চন্দ্রশেখর ছাড়া আর কোন ভারতীয় বোলারই সুবিধা করতে পারেন নি।

তৃতীয় দিন।

৩৬৬ রানে ইংলেণ্ডের ইনিংস শেষ। তার মধ্যে গ্রেভনি একাই ১৫১। এই নিয়ে তিনি টেস্টে ৯টি সেকুহী করলেন। এই খেলার সেকুহী করতে তাঁর সময় লেগেছিল ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। রানের মধ্যে একটি ৬৩ চোখটি ৪। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে চন্দ্রশেখর ৫টি উইকেট হবল করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

চতুর্থ দিন।

চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন বিরতির ১ ঘণ্টার মধ্যেই বেশ খতম। ভারতের ১ ইমিংস ও ১১৪ রানে পেন্সেনার পরাজয়। দ্বিতীয় ইমিংস-এও অপ্রত্যাশিত ব্যাটিং বৈফল্য। চতুর্থ দিনের শুরুতে ভারত ২৪ ইমিংস আরম্ভ করে। সাহসেশাহী আহত থাকায় ব্যাট করতে পারেন নি। একমাত্র কুন্ডেরন ৪৭। ব্যক্তি সক্ষেই বেশ বলির পাঠ। মধ্যাহ্ন ভোজের পর মাত্র ৩৭ রানে ৬ জন আউট। এই ইমিংসেও ইলিংওয়ার্থ ৬টি উইকেট দখল করে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

এই বেলায় নিঃশব্দে যা প্রমাণিত হল তা হচ্ছে এই যে প্রথমত ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দক্ষতার ছাপ দেখা গেলেন, তাঁরা তার মান বজায় রাখতে পারেন না। টেস্টে বেশার যে বরন বাচন মনোভাবের প্রয়োগ, যে আত্মবিশ্বাস সারাক্ষণ মনের মধ্যে থাকে দরকার, ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের তা নেই। ফলে, এক-এক সময় বিজ্ঞান দীপ্তির মত চমকপ্রদ খেলা দেখালেও সেই দীপ্তি তাঁরা ধরে রাখতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বোলিং অত্যন্ত নীচু শুয়ে। কান্ট বোলার না থাকলে টেস্টে খেলা চলে না, এবং ভারতের তা নেই। চন্দ্রশেখর নিঃশব্দে তাল বোলায়। কিন্তু রলের শ্রীম বোলার মাত্র তখনই কার্যকরী রন দেন রলের কান্ট বোলার বিপক্ষে রলের ব্যাটিংএ প্রথম আঘাত হেনে তার মধ্যে কাটল খরির দেয়।

ভারতের অতীত সফরের কথা এই ক্ষেত্রে মনে পড়ছে। তখন ক্রিকেটে ইংলও বিপ্লবিসমূহ। দিকপাল নায়ী সব খেলোয়াড়। তাঁদের বিতর্কে অরণ কখন ১৯৪৬ সালের ভারত সফর। মার্কেট, মানভক্ত, সুভাষা আলি, পাতৌদি, অহমদাব, অহরদিং, মিসার। মামিকড়ের মোট ১১২০ রান ও ১২০ উইকেট, ব্যাটে বলের সহায় অসাধারণ কৃতিত্ব। বংসরের শ্রেষ্ঠ ৫ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে স্বীকৃত। মার্কেট-এর মোট রান ২২৮৪। পূত্র ৭৪'৫০। একমাত্র প্রাক্তমান ও লাট্রীক ছাড়া আর কোন সফরকারী ব্যাটসম্যান ইংলও পিছে অত রান করতে পারেননি। স্বাক সেলব পুরোনো কথা। বর্তমানে ইংলও ও ভারতের ক্রিকেট বা দেখছি তাতে নিঃশব্দে এই লতা প্রাক্ট যে এই দুই দেশেরই ক্রিকেটের মান অত্যন্ত নেমে পড়েছে।

ডোর বোর্ড

ভারত। প্রথম ইমিংস

ডি সাহসেশাহী ক মারে ব ঘো	২০
এক ইঞ্জিনিয়ার ক মারে ব ব্রাউন	৮
ওয়ারেকার ক ইলিংওয়ার্থ ব আলিভেরা	৫৭
গি বোরহে ব ঘো	০
পাতৌদির নবাব ক মারে ব ব্রাউন	৫
আর স্মিথ ক মারে ব আলিভেরা	৬
ডি মুহাম্মাদিয়া ক মারে ব ব্রাউন	০
বি কুন্ডেরন ক মারে ব ঘো	২০
প্রথম রান আউট	১৭
বেদী ক এমিস ব ঘো	৫
চন্দ্রশেখর বট আউট	২
অতিরিক্ত	৪
মোট	১৫২

বোলিং—মো ২০—৫—৪২—০, ব্রাউন ১৮—০—৬১—০,
ইলিংওয়ার্থ ২—২—০—১।

ইংলণ্ড। প্রথম ইমিসে

কে এডরিচ ক ও ব হুতি
কে এক ব্যারিংটন ব চম্পশেবর
ডি এল এমিস ব চম্পশেবর
টি গ্রেভনী স্ট্যান্‌ল ইজিনিয়ার ব বেবী
বি অলিভেরা ক ও ব চম্পশেবর
ডি বি ক্রোজ ক বোরসে ব প্রসর
কে টি হারে ব চম্পশেবর
আর ইলিংওয়ার্থ এল বি ডবলিউ ব চম্পশেবর
আর হবস ব বেবী
ডি ব্রাউন ক গভোদি ব বেবী
কে মো নট আউট
অতিরিক্ত

১

৫

৮

২৯

মোট ৩৬

বোলিং—হুতি ৩১—১০—৬৭—১; সুরতপান ৭—১—২—০; চম্পশেবর ৪০—২—১২৭—৫
বেবী ৩১—১০—৬৮—০; প্রসর ৩—৫—৭৮—১।

ভারত। দ্বিতীয় ইমিসে

বি কুম্বেয়ন এল বি ডবলিউ ব ইলিংওয়ার্থ
এক ইজিনিয়ার ক এমিস ব মো
এ ওয়াশেকার ব ক্রোজ
দি হোরসে ক মো ব ক্রোজ
গভোদির নবাব ক গ্রেভনী ক ইলিংওয়ার্থ
আর হুতি ক অলিভেরা ব ইলিংওয়ার্থ
সুরমনিরাম ক এডরিচ ব ইলিংওয়ার্থ
ই প্রসর ক অলিভেরা ব ইলিংওয়ার্থ
বি এল বেবী ব ইলিংওয়ার্থ
বি চম্পশেবর নট আউট
ডি সারথেশাই অপরহিত
অতিরিক্ত

১৫

মোট ১১০

বোলিং—মো ৮—০—১২—১, ব্রাউন ৪—২—১০—০, ইলিংওয়ার্থ ২২—০—১২—২০, ৬,
হবস ৮—১—১৬—০; ক্রোজ ১৫—৫—২৮—২।



সুপর্ণ সায়

ওয়াল্ট ডিস্নে মার্শেলাইনের একরকমি শব্দর বো। হাবীর বৃদ্ধা ডাকার চূপচাপ ব'লে আছেন। ওই এলাকারই

একজন শিল্পী ডাকারের ঘোড়ার ছবি আঁকছেন। ডাকারবাবু বেগছেন সেই ছবি আঁকা। আঁকা শেষ হতেই সজীরভাবে মাথা বেড়ে ব'লে উঠলেন: "বা! বাস! ছবি হয়েছে তো! আমি এটা কিনে নেবো।" শিল্পীর হাতে তুলে দিলেন একটি মুদ্রা।

শিল্পীর বহুল মাত্র সাত। ওই মুদ্রা দিয়ে সে কী করেছিলো তা জানার উপায় আজ আর নেই। তবে ওই মুদ্রাটির মূল্য অপরিসীম আর পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ মানুষ মক্কেল শব্দের ওই বৃদ্ধা ডাকারের কাছে বসে। কারণ ওই ডাকার আনতেন সম্রোচিত সম্রাটের শিল্পীর অস্বাভাবিকের গন্ধে কতখানি অকস্মী। তিনি যে-ও আনতেন যে শুধু-কথায় ভিঁড়ে তেমন। তাই তিনি শিল্পীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ওই মুদ্রা। শিল্পী যে ঘোড়ার ছবিটি এঁকেছিলেন পরে তার পিছে-পিছে হাবির হয়েছিলো বিভিন্ন কীৎ-কব্জর এক বীর্ষ খোজাবাদ। সবই অবশ্য শিল্পীর মানস-অবস্থা থেকে। সেদিনের এই বাসক-শিল্পীই পরবর্তীকালের বিখ্যাত প্রতিকা ওয়াল্ট ডিস্নে। প্রতিভার একটা অভিযান আছে। পূর্ণ স্ফুট করার আগেই তিনিমিত হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ বিখ্যাত লোকের জীবন এই সত্যের সন্ধির। কিন্তু ওয়াল্ট ডিস্নে এই নিয়মের আদর্শ ব্যতিক্রম। হতদিন কীমিত ছিলেন তাঁর প্রতিভার বৃত্তিও ছিলো অব্যাহত। বসন্তটির মতো তিনি ধন দিকে এবং উর্দ্ধে নাবা-প্রশাখা বিস্তার করেছিলেন।

লস এজেন্সির কাছে অবৈধ কাউন্টিং ক্যালিকোনিয়ার মাটি খুঁড়ে যেন বেরিয়ে এলেছে এক আশ্চর্য্য কথা—ডিসনের অসাধারণ কল্পনা আর প্রতিভার বস্তু-সত্ত্বের অভিজ্ঞান। একজন মাত্রকের রচনা, তাই আরো বিস্ময়কর। এই রচনার নাম ডিসনেল্যাণ্ড।

এই মাহাত্ম্যমির স্রষ্টার নিজের ভাষায় “ডিসনেল্যাণ্ড হলো এক আনন্দ মেলো, আরব্য বঙ্কমীর একটি নগর, তবিত্ত্ব কালের রাজধানী, সখীরা সভা আর কাহুর প্রাণমী, লম্বা উপরে, পাতি ও জামের লীলাত্মি।” আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু-বিক্রেতার সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ডিসনেল্যাণ্ড।

ওহায়ো ডিলনে বসি একটিও ছাত্রাছবি না কুলতেন তবু তিনি শ্রুত করে থাকতেন শিশুদের সব-পেয়েছির-বেশ ডিসনেল্যাণ্ডের স্রষ্টা রূপে। লম্বা চুনিয়ার ছেলেমেয়েদের বস্তু-তীর্থ ডিসনেল্যাণ্ড। আর বড়োরাও এখানে গেলে কিরে গাবেন তাঁদের হাসানো মৈলব। যেন এক রসকবার লগৎ আস্ত ধরে এনে বলিয়ে বেড়া হয়েছে মাটির উপরে। এমনি মাহাত্ম্য ছিলেন ডিসনে। ফ্লোরিডাতে ডিসনেল্যাণ্ডের বিভগ্ন আরতনের আরেকটি মাহাত্ম্য-উদ্ভাটন নির্মাণের পরিকল্পনা তাঁর ছিলো। কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু হলো।

অতীত, আসামীকাল, কিংবা যে কালে কোনোদিনই আসবেনা সেখানে যাবার কোনো উপায় আছে কি? আছে, ডিসনেল্যাণ্ডে। সামান্য দক্ষিণা দিয়ে একবার সেই আশ্চর্য্য দেশে ঢুক পড়লে কত কিছুই না মনকে পড়বে? চোখে পড়বে আশ্চর্য্যক লক্ষি পরিচালিত এলিন। একবারে চম্পামী রকেট। টুংগোল্যাণ্ডের একটি মনোমুগ্ধ নৃত্য। প্রতিবার ল্যাণ্ড বা সীমাত অকলে রয়েছে কয়েকটি সুবক্ষিত দুর্গ। ক্রিমি নদী। অথাক হতে হয় অ্যাডভেনচারল্যাণ্ড বেধে। সেখানে ঘন বন-জঙ্গলের মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট ছুঁড়েঘর। আর ক্যান্টাসিল্যাণ্ড বা কল্পনের বেধে সব চাইতে আগে চোখে পড়ে ৭০ হুট উচু একটি দুর্গের চূড়া ক্যালিকোনিয়ার অত্যাশ্চর্য্য কলমল করছে।

ডিসনেল্যাণ্ডে হুবি এর স্রষ্টার মনেই প্রতিচ্ছবি। অতীত আর তবিত্ত্ব এখানে পরস্পরের প্রতিবেশী। এখানে সব জিনিসই আরতনে ছোট কিংবা বেখালো নয়। এ যেন গ্যালিভারের বেখা বামনদের বেশ। বাড়ি-ঘর, জীব-জন্তু সবই ক্ষুদ্রায়তন। প্রতিটি জিনিসেই লক্ষ্য করা যায় স্রষ্টার সচেতন, লম্বা প্রায়।

ডিসনের লম্বা উত্তর ডিকালো লহরে। ১৯০১ সালের এই ডিসনেল্যাণ্ড। তাঁরা চায় তাই এক যোন। তাইদের মধ্যে ডিসনেই সবর ছোট। বাবা এলিহাস ডিসনে। জীবনে সব কাকেই হাত লাগিয়ে বেবেছেন, কিন্তু কোনো কাকেই লক্ষ্য হননি। তবে ভালো বেহালা বাজাতে পারতেন। ওয়াশিংটন মা ফ্লোরা ডিসনে ছিলেন হালিউদী মহিলা।

ফ্লোরিডাতে গিয়ে কমলালেবু কল্যাণের চেষ্টা করেছিলেন এলিহাস ডিসনে। গাবেন নি। মনবাহারণ করে কিরে এলেছিলেন। চাষ-বাগের চেষ্টা করেও সুবিধা হলো না।

ওহায়োের সব চাইতে বেশি পাতিয় ছিলো তিন নথর তাই রয়-এর লক্ষ্যে। রয় পথে বেলেছেন : “ওহায়োের সব-সময়ই বেশ হালি-খুশী থাকতো। সবাই ওকে ভালবাসতো। ছেলেবেলাতেই ওর হুবি আঁকার তীব্র ঝোঁক ছিলো। একবার তো আমাদের স্বক-স্বক পাখা বাড়িটার মেয়াল ছবি এঁকে ত’রে ফেললো। আর ছবিগুলি ঝাঁকলো আমকাত্তরা দিয়ে।” রয়-এর কান্ড বেকেই জানা যায় ডানের বাড়িতে ছিলো বাসারকম গোবা জীবজন্তু, এমন কি শূঁয়োও।

আজ বহু রূপকথা শুঁতে উঠেছে ওয়াশ্‌টনের শৈশব জীবন ঘিরে। তবে তাঁর শৈশব যে হারিয়েছে মতো অতিবাহিত হয়েছিলো এতে সন্দেহ নেই। পলোয়ে যখন তরুণের অনটন চলেছে সে-রকম এক দিন। এলিয়ান ভিন্সেনে জানালেন বাবার যে মাখন হয় তাই সবটুকুই বিক্রি করতে হবে, বাড়িতে একটুকুও ব্যবহার করা চলবে না। এমন কি বাজারের মজত রাখা যাবে না। স্ত্রীরা ভিন্সেনে স্বামী রত্নের বিক্রেতা একটি কবাও হলেন না। সেই রাতে গৃহখানী খাবার টেবিলে বসে দেখলেন হেলেনেরা ননী হস্তিত কটি নীরবে খেতে নিচ্ছে, কোনো বায়-প্রতিবাদ না করে। তিনি অধঃপতন হলেন, বুশিত হলেন। আসলে, যা কিছু প্রতিটি কটি নিচে দিকটার ননী লাগিয়ে দিয়েছিলেন; উপর থেকে তা ক্রবার উপর ছিলোনা।

মাসেন'টন থেকে ভিন্সেনে পরিবার চলে গেলো কানসাস পহরে। বড়ো পহর কানসাস। সেখানে এলিয়ান নিলেন বহরের কানসাস সববতাহের কান। রহ আর ওয়াশ্‌টনকে খুঁজ থেকে উঠতে হতো। আর চড়েটা। খুল বলার আগেই বিলি ক'রে আসতে বড়ো কানসাস। খুলের ছুটির পরে আবার থেকেতে হতো বৈকালিক কানসাস বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দিতে।

ওয়াশ্‌টন খুলে মোটেই ভালো কল দেখাতে পারেন নি। পরীক্ষিত ক্রান্তির মত। বিতীহত খুলের পাঠ তাঁর কাছে মোটেই আনন্দের বিষয় ছিলো না। "যদি বাটার মশাইরা আমাকে বুঝিয়ে বলতেন যে লেখাপড়া শিবলে আমার জীবিকার সুবিধা হবে কিংবা পাঠশালা শিবলে একদিন আরকের হিলাব করতে সুবিধা হবে তাহ'লে হয়তো মনোযোগী হতুম। কিন্তু সে রকম কিছুই তারা বলেন নি।" বলেছেন ওয়াশ্‌টন।

জীবিকার ভাগিনে আরো মানায়কম কাজ করতে হয় ভিন্সেনে তাইয়ের। কানসাস পহর আর চিত্রাণের মাধ্যমে চীনাধারাম আর মিঠাই বিক্রি করতে ভালো লাগতো ওয়াশ্‌টনের। হকারের মুনির্ম শ'য়ে নিজেই কেনন পবিত্রই মনে হতো। দ্রষ্টকর্মে গাড়ি চুকতেই চলত কানসা থেকে লাঞ্চারে মাঝার সময় নিজেই মনে হতো বীর। স্থানীয় বহনকে অভিনয়ও করেছেন মাঝে-মাঝে, চালি চ্যাপলিনের অনুকরণ ক'রে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভিন্সেনের ভিতরে মাঝে মাঝে মাথা চড়া দিয়ে উঠেছে অভিনয়-সুখ।

আহেরিকা যোগে গেলো গ্রন্থ মহাপুত্রে। রহ কাজ নিলো নৌবাহিনীতে। ওয়াশ্‌টনেরও ইচ্ছা যোগ দেন। কিন্তু হারবে যোগ দেয়ার বয়স সঞ্জনো হরনি। বয়স তাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত হলেন ফ্রাংগে রেডক্রস অ্যাথলেটের ট্রাইভার। কিন্তু তখন বৃদ্ধ গ্রাংগে শেষ হয়ে এসেছে। ওয়াশ্‌টন গয়ে বলেছেন : "কাজ করেছিলাম মাত্র একমাস; পেয়েছিলাম ২২ ডলার। এর চাইতে অনেক, অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করলাম তুলি চালিয়ে। মার্বিন লৈজরা যে-রকম শিরদ্রাণ ব্যবহার করে সে রকম শিরদ্রাণ বিক্রি করে ভালো অর্থ পেলাম। বাড়ি কিয়দূর ৫০০ ডলার নিয়ে। সীতিমতো ধনী।"

৫০০ ডলার অর্থ বেশি দিন রইলো না। তবে কানসাস পহরে জুটে গেলো কার্টুনিষ্টের এক চাকুরী। শুধানে এক কোম্পানী ছায়াছবির ট্রাইড তৈরী করছিলো। ওই কোম্পানীতে আর করেকদিন কাজ করবার পর ওয়াশ্‌টনের মনে হলো এ রকম একটা ব্যবসা নিজে শুরু করলে তো বেশ হয়। তাঁর বয়স তখনো মাত্র উনিশ।

একদিন এক দাঁতের ডাক্তার এসে ওয়াশ্‌টনকে জানালেন দাঁতের খায়া বন্ধার প্রয়োজন

সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার ক্ষমতা তিনি একটা কাটুন তুলতে চান এবং এ বিষয়ে ওয়াশ্‌টনের সঙ্গে পরামর্শ করতে চান। ওয়াশ্‌টনকে তিনি নিজের ডিপেনেন্সারীতে নিয়ে যেতে চাইলেন। ওয়াশ্‌টন খুবই আনন্দ হলো কিন্তু আনন্দে তখনই তাঁর গলায় বাকি থেকে বেচেনা লম্বা নম্র তারণ তাঁর মুখে। ছোড়া বারোই দুটির কাছে। তা আনতে গেলে যে ৭৫ সেন্টের তার তা অগাভত ওয়াশ্‌টনের নেই।

ওয়াশ্‌টন ছোট্ট স্ট্রিটের কাছে ছিলো অলংকা ইন্ডিয়ান। গায়ে তালু কলবার মুক্তিপণের পর্শর অনবরত বাঁধার খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেছে-বেছে করেছটা ইন্ডিয়ান ব'য়ে ওয়াশ্‌টন বেছে নিলেন বাঁচার। ওদের সঙ্গে তার করার ইচ্ছা। একটা ইন্ডিয়ান নাম রাখলেন মার্টিন। ভারী ভীক হতাবের ইন্ডিয়ান। একটু বাজে, আবার একটু বাসছে, পরিষ্কার করছে পোক। সমস্ত বেধা দিলো কানসাস শহরে বাঁচার সময়। এই বন্ধুদের নিয়ে কী করা যায়। ওয়াশ্‌টন ইন্ডিয়ানকে বাঁচা থেকে বের করে একটা বোলা মাঠে নিয়ে তাঁদের মুক্তি দিলেন।

কানসাস শহরে নিয়ে খুব অসুখে পড়লেন। একটা ক্যাফেয়া বার ক'রে তুলতে লাগলেন ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের ছবি। তা বিক্রি ক'রে হাতে লামাক কিছু অর্থ জমালো। সেই পরসার টিকেট কিনে লস-এঞ্জেলসে গেলেন তাই রত-এর সঙ্গে বেধা করতে। এক আত্মীয়ের কাছে থেকে ৫০০ ডলার বার ক'রে হুঁতাই মিলে শুরু করলেন ছবির কাজ। এই সময়ের তাঁদের সহকারী ছিলো দুটি মেয়ে। সাপ্তাহিক ১৫ ডলার বেতনে। এদের মধ্যে একটি মেয়ে লিভিয়ান বাউন্স এট বেতন অতি সামান্য মান ক'রে গ্রাহাই ঢেক ভাঙাতো না। এতে বর খুব খুশী হতো। ছোট্ট কোম্পানীটির আর্থিক দিকটা সামলাবার বাড়ি বাড়ি উগরে ছিলো কিনা। লিভিয়ান ঢেক বত কম ভাঙার ততাই ছবিবা। বর তাই ওয়াশ্‌টনকে বলতেন লিভিয়ানের উপরে প্রভাব বিস্তার ক'রে তাকে ঢেক ভাঙানো থেকে বিরত করতে। সেই বয়সের প্রভাব বিস্তারের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। লিভিয়ান খুবই ভালো মেয়ে। তাইদের আর্থিক অবস্থা কী সে তা নিজেই টের পেয়েছে। এই সমতামতী মেয়েটি ওয়াশ্‌টনকে আকৃষ্ট করলো। তিনি একে ভালোবেসে ফেললেন, বিয়ে করলেন। বাসন্ত্য জীবনে ওয়াশ্‌টন খুবই সুখী হয়েছিলেন।

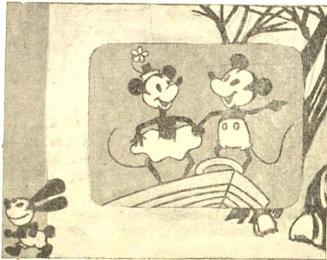
একটা কাটুন কিনা তুললেন। কাকে নামক করা যায়? মনে পড়লো পুর্বোক্তো বন্ধু ইন্ডিয়ানকে। 'পেয়েছি', টেডিয়ে উঠলেন ডিলেন, "মার্টিন-বাই হবে আমার ছায়াছবির নামক।"

"মার্টিন? বিক্রি নাম। ইন্ডিয়ান পকেট একটা ভালো নাম দাও," বললেন মিলেন ডিলেন।

ওয়াশ্‌টন বললেন : "তা হলে নাম যোক বিক্রি।"

ইন্ডিয়ান-নামক গ্রন্থ দুটি কাটুনের একটিও তখন সময়ের গেলো না। আস জন্মন নিবেশিত 'লাক মিগার' তখন সঙ্গে মুক্তি পেয়েছে। শুরু হয়েছে শব্দক চলচ্চিত্রের যুগ। ইন্ডিয়ান বিষয়ে ছায়াছবি দেখার উৎসাহ ফাকর দেই, বিবেচন্য সে ইন্ডিয়ান আবার নির্ধারক। তিন বছর কাটুন 'স্ট্রিমিংটো লাইন' বর্ষন মুক্তি গেলো, গ্রন্থ গ্রন্থনীতে দু'তাই নিয়ে গেলেন বার বার স্রীকে। এই ছবিও নামক বিক্রি হুঁয়। ছবির সামান্য অংশ দেখানোর পর থেকেই মর্মরবা আকর্ষণ্য দিতে শুরু করলো, তীব্র হৈ চৈ করলো। ছবি শেষ করার পর কপালে নাম নিয়ে দুই তাই স্রীকের তথ্যলেন "কেমন হলো?" তার উত্তরে স্রীক তথ্যলেন, "কেমন হলো? "মাথা-পাশলা" বাসীসের হতাব করার ইচ্ছা তাঁদের ছিলো না।

বর্নকদের বিতরণতা আর বিজ্ঞপের পরেও কিন্তু দু'জাই ভেবে পড়লেন না। ওরাণ্টে নিজেই ব্যক্তি তো বহুত্ব দিলেনই; বহুত্বও বললেন তাঁর ব্যক্তি বহুত্ব দিতে। দু'জনের মিলিত অর্থে তৈরী হলো নতুন ছবি "স্ট্রীমবোট উইলী।" বায় হলো ১,২০০ ডলার। এই ছবি তুলবার পরেই এঁদের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। ওরাণ্টে রাতারাতি বিখ্যাত হলেন। দাপ্তরের তৈরী ইন্দ্র অগনিখ্যাত হলো। আবার সেই ইন্দ্র ওরাণ্টেকে এনে দিলো আন্তর্জাতিক ব্যক্তি। নিজের স্বাধীন চরিত্রগুলির মধ্যে মিলি ছিলো আত্মবিশ্বাসের লবচাইতে প্রিয় চরিত্র। তাই কাউকে পুঙ্খনত করতে গেলে তিনি 'মাইবোট' নিয়ে তাকে পুঙ্খনত করতেন। ভিলনের এই পুঙ্খনতের খেত তাঁর আত্মভেদী পুঙ্খনত।



মিকির আবির্ভাবের পরে তার সঙ্গে একে-একে যোগ দিলো আরো বহু চরিত্র :
গুটো, গোফী, আর ডোনাল্ড ডাক।

১৯৩৭ সালে মুক্তি পেলো ভিলনের প্রথম সত্যিকারের মন্বৎ ছাড়াছবি 'সো হোয়াইট।' এই ছবি তুলবার সময় কাল করেন সাত ন শিল্পী। প্রচুর অর্থে বায় হয় ছবিটি তুলতে। কিন্তু লাভও হলো খুব। প্রথম মুক্তিতে পাওয়া গেলো ৯,০০০,০০০ ডলার; আর দ্বিতীয়বারের মুক্তিতে ৫,০০০,০০০ ডলার। ওই একটি ছবি লাভ করলো আটটি আত্মভেদী পুঙ্খনত। ওই ছবিতে যে বামনেরা আত্মবিশ্বাস করেছিলো তারা। প্রত্যেকে পেলো ছোট্ট একটি ক'রে অকার পুঙ্খনত। ছবির সত্যবাদী গান অসাধারণ জনপ্রিয় হলো। তার কলে ওরাণ্টে পেলেন আরো ১০,০০০,০০০ ডলার। লন্ডনের একটি বিখ্যাত চাইল চিত্রকালের লন্ড ওই ছবির প্রদর্শনীর দায়িত্ব নিতে। এ-খন রূপকথা লগভের সাক্ষ্য। ওরাণ্টের নিজেই অন্য কোন ছবিও তবিরতে এই সাক্ষ্যের বায়ে কাছে যেতে পারে নি।

এই অতাবানীর সংকল্যে নয় মনে হতে পারে ডিলনের দুঃখের দিন বৃদ্ধি শেষ হলো। তা কিন্তু নয়। 'গিনেভিয়েরা' ছবিটি তুলতে তাঁর ব্যয় হয়েছিলো ২,৬০০,০০০ ডলার, ক্ষতি স্বীকার করতে হয় ১,০০০,০০০ ডলার। 'ক্যাস্টালিয়া' ছবি তুলতে ব্যয় হয় ২,০০০,০০০ ডলার, ক্ষতি হয়েছিলো ১,০০০,০০০ ডলার। তারপর শুরু হলো বিত্তীয় বিপদ। কলে কাককর্ষ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো।

ডিলনে থাকতেন প্রবল ক্রিয় সাহায্যিবা ব্যক্তিতে। তিন বেয়ে আর প্রী লিপি ডিলনকে এদের নিয়ে মাঝে-মাঝে যেতেন বেড়াতে।

একবার তিনি বাইরে বেড়াতে গেছেন সেই সময় তার স্টুডিওর একটা পাখার পুতল-সজ্জান হলো। স্টুডিওতে থাকা ছিলেন ওয়াশটোকে তারবার্তা পাঠালেন: "অভিনন্দন গ্রহণ করুন। শেষ-পর্বত আপনায় একটি পুত্র, আপনায় উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়েছে। যদিও সে পর্বত, তবু পুত্রই সন্তান তো বটে।" তারবার্তা পেয়ে ডিলনে তো আজলাবে আউথান। টেলিগ্রামটা লজকে দেখালেন।

যেয়ে ডায়েরার বন্দ সজ্জান হলো তখন সাতারহ ডিলনের আনন্দ দেখে কে।

ব্যক্তিগত জীবনে ডিলনে ছিলেন সুখ, বাস্তবিক হাঙ্গাম। কোনো বকম উৎকটতা তাঁর চরিত্রে ছিলো না। তবে তাঁকে বৃষ্টি ওঠা ছিলো অনেকের পক্ষেই শক্ত। কারণ একেই সময়ে তাঁর মেজাজ একেই বকম থাকতো। সেই বিক থেকে তিনি ছিলেন শিশুর মতো। দুটু লক্ষণ আর বলিষ্ঠ আশাবার ছিলো ডিলনের চরিত্রের দুটি বিশিষ্ট বিক। হয় আর ডিলনে প্রবল সেই ছিলেন দুঃসাহসী, কতিয় সন্তাননা কোনও অজানা পদক্ষেপ নিতে তাঁরা এতটুকুও ভয় পেতেন না।

স্টুডিওর ছিলো প্রবল সেই প্রাণ। তাই তাঁরা কখনো এক এখানেগেলে চকুতেন না। বিদ্যায় প্রবর্তনার একজন মারা গেলে অন্তত আরেকজন তো থাকবেন স্টুডিওর রাখারনা করবার ক্ষম।

কোনো একজন মারা সহকারীর উপর ডিলনে কখনোই নির্ভর করতেন না। তাঁর চল্লিশ জন কর্মচারীর প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁর সহকারী। নিজেই বিচার-বুদ্ধি আর কখনোকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। আর শুকন দিতেই নর্যকদের বিচার-বিবেচনাকে। ঐতিহাসিক একনিষ্ঠতা নিয়ে পুছাপুছ নম্বর দিতেন নায়ক-নারিকাদের পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে যাতে তা হয় কালোপযোগী, পাজোপযোগী। অভিনেতার কপাল কতবারনি উঠে হবে, কবেই বা কতটুকু চকু হবে এ নিয়েও তাঁর হুঁত-হুঁতনির অস্ত ছিলো না। সব যাতে নিশুত হয় তার ক্ষম সব-সময় তাবতেন, কাক করতেন। তাঁর সঙ্গে কাক ক'রে-করে অস্ত্র কৰ্মীরও নিজেদের অকায়েই কখন কখনো হয়ে উঠতো ডিলনেরই মতো; সব নিশুত না হলে তাবেরও মন ভরতো না।

ডিলনে এমন এক ছাত্রী সংস্থা প'কে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন যে সংস্থা অব্যাহতভাবে উপহার দিয়ে যেতে পারে উচ্চমানের ছাত্রছাত্রী। তিনি বলতেন: "আমাদের কাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষাই বড়ো, আর্থিক লাভ-কতিয় প্রায় নয়। ছাত্রছাত্রীর উৎকর্ষই আমাদের লক্ষ্য।"

বড়োদের ক্ষম দেখা, ছবি জাকা, অভিনয় করার লোকের অতাব সেই। কিন্তু শিশুদের আনন্দ দেখার মতো লোকের সতি অতাব আছে। কারণ এর ক্ষম চাই শিশুর মতোই আনন্দিততা আর নিঃস্বার্থমন। ওয়াশটো ডিলনের তা ছিলো। তিনি বলেছেন: "আমি শিশুদের ক্ষম ছবি তুলি না; এমন ছবি তুলি যা শিশুরা উপভোগ করতে পারে।" শিশুদের প্রতি করুণা নয়, ভালোবাসা ছিলো বলেই তিনি উপহার দিতে গেছেন শিশির মৌত, স্বর্গীয় ছাত্রছাত্রীগুলি। তাঁর ছাত্রছাত্রীর

একটিতেও অস্বাভাবিকতা বা কৃত্রিমতা এতটুকু স্পষ্ট নেই। আছে নির্বিল আনন্দের আয়োজন। তাই তাঁর ছবি শিল্পের তো বাটেই, শিল্পী, কবি, হার্পনিক সকলকে যাকিয়ারে বিতে পেরেছে। চলচ্চিত্র-শিল্পের যে কী আশ্চর্য সজ্জাবনা, ভিলনের আবির্ভাব না ঘটলে তা উপলব্ধি করা সম্ভব হতো না। কিন্তু গুয়াণ্ট ভিলনে তাঁর কীতির চেয়ে অনেক বড়ো। গিনেমা জগতে কত প্রতিভাই তো এলেছেন, কিন্তু ভিলনের বায়ে কাহেঙ কেউ যেতে পারেন নি। তাঁর তৈরী সবগুলি সেলুলয়েডের কিংবা রবিন মুছে পান্ডা হয়ে যাবে সেদিনও সকলের মনে বেঁচে থাকবেন গুয়াণ্ট ভিলনে, যেমন বেঁচে থাকেন বড়ো কবি আর শিল্পী।

এক বিখ্যাত কিন্তু মোকাত্তী কটোগ্রাফার বহুবুর্গ থেকে এসেছেন গুয়াণ্ট ভিলনের একটা কটো। ফুলতে। ভিলনে বললেন, “আমি আপনাকে বড়ো জোর আশ্বস্ত। লম্বা দিতে পারি।”

কটোগ্রাফার চিংকার ক’রে উঠলেন, “অলভব। আশ্বস্তার মধ্যে আপনাকে আমি কেনন ক’রে বুঝবো?”

ভিলনে লাগু গলায় বললেন, “কিছু মনে করবেন না। এখানে অনেক প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমার সঙ্গে কাজ করছেন, তাঁরা আজো ও আমাকে বুঝে উঠতে পারেন নি।”

মেয়েটি ফুলে পড়ে। সহপাঠিনীদের কাছে বাবার নাম বলতেই তারা হেসে ওঠে হো হো করে। মেয়েটা তো বড় ভালবাস। কাহন ঝাঁর নাম করছে তিনি যে ভীষণ বিখ্যাত ব্যক্তি।

মেয়েটি সেদিন ফুল থেকে কিয়েই ছুটে যায় বাবার কাছে। বলে, “বাবা তুমিই কি—?”

বাবা স্বীকার করেন তাঁর ওই নাম। মেয়েটি কিয়ে পায় নতুন বিশ্বাস। বলে, “বাবা এই কাগজটাতে তুমি একটা থাকর ক’রে রাখ তো, ফুল নিয়ে যেখানে। ফুলের মেয়েরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান্ধে না যে তুমি আমার বাবা।”

মেয়েটির নাম জায়েরা। বাবা গুয়াণ্ট ভিলনে।

নাট্যমঞ্চ

রচয়িতা

The Theatre is the Crucible
of Civilization.

It is a place of
Human Communism.

All its Phases need to
be studied.

It is in the Theatre
that the Public Soul is formed

Victor Hugo.

নাট্য চিন্তা

নাটক যদি সমাজ ও জাতির দর্পণ হয়, তবে আধুনিক
যুগে কোথায় সেই দর্পণ বা আমাদের চমকে দেবে,
সজাগ করবে, অগ্রগোষণা যাবে, উৎসাহ করবে? যুগে
যুগে সর্বদেলে দেখা গেছে, জাতির লক্ষ্যেটের সময় লংগোয়ের

সময়, নাট্যকারের কলমেই যুগে তারই কাহিনী ফুটে উঠেছে; বঙ্গনির্বোধে পোনা গেছে। সমাজের
অজ্ঞাত, পাগ, অনাচার দুই করবার ক্ষেত্রে নাট্যকার দর্পকের সামনে তুলে বহেছেন এমন দর্পিত্ব ছবি
যা বেবে দর্পক বিহীন হয়েছিল, আত্মবিশুদ্ধ হয়েছিল, চীৎকার করে জানিয়েছে সেই অজ্ঞানের বিরুদ্ধে
প্রতিবাদ, জুতো ছুঁড়ে ধরেছে স্টেজের উপরকার সেই পাগ ও অজ্ঞানের নায়ককে, তুল করে তেবোরে,
অভিনেতা বৃষ্টি সজিই সেই নায়ক। এই তাই সেই দেখা হয়েছে আর লক্ষ লক্ষ দর্পকে উঘেলিত
করেছে, মৌলদর্পণ, শাস্তি কী শাস্তি, বুড়ো শালিকের খাড়া ঠোঁট, একেই কী বলে সভাস্তা, সিরাজখোলা,
সিঁদাখী, বাগাএতাপ, ঘেহাং পতন, প্রতাপাদিত্য প্রকৃতি কালজয়ী নাটক। কিন্তু আজকের দিনে,
এই বিপুল অবক্ষয়ের দিনে, এই প্রচণ্ড হতাশা আর বিকোত্তের দিনে, এই সর্বব্যাপী আত্মবিজ্ঞানসার
দিনে, বালো রঙালয়ে কোথায় তার প্রতিফলন? কোথায় সেই নাট্যকার, ধীর নাটক বেবে
আজকের বাঙালী দর্পক উঘোষিত হবে, নতুন পথের লক্ষ্যন খুঁজে পাবে?

আন্তর্জাতিক

মঞ্চ

মহোদয় ভাষাতানমত বিবেচনার পর নির্দেশক ছবেন
লিমেসলত সত্তর বছর বয়সে এখার লেখিন পুস্তকর লাত
করেছেন। লিমেসলতের নাট্যচর্চার সূত্রপাত বহমানভাষন
কল পরিচালক রেভেগেনি ভাষাতানমতের পিতৃত্বপে।

ভাষাতানমত লিমেসলতের অভিনয়ের হৃদয়গেহে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'ভূবাননো' নাটকে জকলমিলো ও
পাতালোনের অভিনয়েই তিনি প্রথম বৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর 'ক্যামেলট' নাটকে
বামবিন্দি ক্রিডিয়াল, 'ইক্টারভেনমদন' নাটকে জনৈক উচ্চত বৈরাগ্যাবাহী, 'দি অ্যারিস্টোক্র্যাটস'
নাটকে চানবাম উদারজন ও বৃদ্ধিমান ক্যান্টেন কট্টিয়া, 'মাত এভো অ্যাভাউট বাথিং'-এ
পরিচালিত বামবলিক রেভেগেনি, সাইরানো ও ডন কিথোটেব কুমিকার তিনি অভিনয়
করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয়-কীর্তি এছাড়াও সে কিসিপোর 'কিলুমেদা বাকু'রানো' নাটকে
মোমিনিকো মোরিগানোর কুমিকার অভিনয়। নাট্যানির্দেশকত্বপে লিমেসলতের প্রথম প্রযোজন্য
মোত ক্রিইট সিন্ডিকেন। পটিনবছর বয়সে সার্থকতর প্রযোজন্য নিকোলাই পোপোভিনের 'ম্যান
উইথ দ পাল'। এই প্রযোজন্য লেখিনের কুমিকার অভিনয় করেছিলেন বোরিস পুহকিন। জনতা
ও নেতার বহুস্বী সঙ্গর্কেই লিমেসলত তাঁর নির্দেশনার বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
ভাষাতানমতের বতাবলিৎ কায়দার লিমেসলত তীব্র সজীৱতা, স্টাইল ও কলগোজিনন, প্রকাশবাহী
চরিত্রায়ণ, উৎসবের উল্লাসতা ও সজীৱ সংযমকে মিলিয়েছিলেন। ১৯৩৭-এর এই প্রযোজন্যের পর
লিমেসলত নানাবরণের নাটক পরিবেশন করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিকতম প্রযোজন্য মোত কলম্বোর
'ক্লীবর শব' ও আইজাক ব্যাংগেলের গল্প অবলম্বনে 'অ্যাগোই বাথিং'। কলম্বোর নাটকে ক্রিগোদোর
মোতাসলতের অতর্কীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়নি, এই সংস্করণটি কি বস্ত:সুত্বভাবে নৃত্তি ও গুণ
মুগ্ধেছেন, তাই ছিল নাটকের প্রলম্বভূমি। বতাবলিৎ প্রযোজন্যর অনেকটা জুড়ে আছে জিপলিদের নাচ
ও গান। মোতাসলত প্রাণপণে চেষ্টা করে এই দারহীন বুকপক মোটের লগে মিশে বাবার, কিন্তু পারেন
না। সমাজ ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ বেগে সে কিছুতেই নিষেধক মুক্ত করতে পারেন না। এইভাবেই
আসে ট্রাণিক পরিণতি। বর্তমানে লিমেসলতের পরিচালনার লিওনিদ জোরিনের বনভাষিক নাটক
'কায়ল বেলডি' অভিনীত হচ্ছে।

গুয়াশিটেন

নির্ধায় রমালয়

গুয়াশিটেনে গ্যারিক গ্রেয়ার্স নামে এক সম্ভ্রায় গ্রাি একবছর বয়ে পহরাকলের প্রাথমিক ও
মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নাটক পরিবেশন করে আসছেন। গত বছর এঁরা প্রযোজন্য
করেন শেকসপের 'বিবাহ প্রত্যাগ'। এ বছরের নাটক ভ্রাম্যুদেল বেবেকটের 'অ্যাট উইথআউট ওয়ার্ডস'।
অভিনয়ের পরেই এঁরা বর্ণকবের লগে এক প্রমোত্তরের বৈঠকে যোগ দেন। কয়েক মাস আগে গ্যারিক
গ্রেয়ার্স-এর প্রযোজক-নির্দেশক জেরাক স্যাক্সেট-এস এপিল কোপাল চার্চ-এর বেকারেও স্ট্রাইট গ্যাট
এর কাছে তাঁর নির্ধায় সপ্তাহে একদিন নাটক পরিবেশন করার অল্পমতি প্রার্থনা করেন। এই

অষ্টানের মত কোন প্রবেশবুল্য গ্রহণ করা যাবে না, এবং বিশেষতঃ যারা কখনই নাটক দেখেননি, তাঁদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে, একথাও জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রস্তাবটি অতুমোদিত হয়েছে। পার্থক্য প্রকাশ দিবার মধ্যে পিটার ডাকারের ‘ন প্রাইভেট ইয়াহ’ এবং ‘ন পাবলিক আই’ নামে দুটি একাত্ম অভিনয় করেছেন।

যুগ-চিন্তা তখনকার দিনে বাংলাথিয়েটারের অবস্থা...সাতা রাত অভিনয়... একসঙ্গে তিন চারখানা পঞ্চাশ নাটক...দর্শকদের জগৎ

উপহারের ব্যবস্থা...গঙ্গার ইলিশ...গুরিতরকারি...বই...সোনার ইয়ারি...ছাতা...বোম্বাই চাদর...বর্ণনা করছেন নাট্যকার ৮/৮পেন্সননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়...তীর্থ সেই চলিশ বছর আগেকার লেখায় আধুনিক মননের পরিচয় রয়েছে।

তখনকার দিনে

“বাংলা থিয়েটারে অনেক নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রী থাকত। সবচেয়ে বড় বেনী এক দ্বারে বিক্রয় হইত—সাত আটশো টাকা! বেনী দর্শক টানিবার মত তাই একখানা নাটকের বদলে আর খানা নাটক একবারে অভিনীত হইত। অন্ততঃ দুইখনি বড় বড় (পঞ্চাশ) নাটক না দিলে আর লোক হয় না।

আর দর্শকবৃন্দের কথা বলি। একাদিনে বসিয়া বাতো তেহো বসি! অভিনয় দেখা—কেমন করিয়া রক্ত-মাংসের বেহে লক্ষ হয় এবং ভাল লাগে, আমি কিছুতেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইংলণ্ডের দিনের বেলা বায়োরাগি তলার বসিয়া “বৌফুজুর” হাতা শোনা যে সহস্রভাগে ভাল। তাহাতে পরীক্ষা বাসণ হয় না। যদি বুদ্ধিমান,—ইতর প্রেয়ীর নীচজাতীয় দর্শকবৃন্দে বঙ্গদেশে পরিপূর্ণ হয়,—তরলোক কেউ এরূপভাবে সমস্ত ব্যক্তি অভিনয় দেখিতে চান না,—তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু তাহাত’ নয়। দর্শকবৃন্দ লক্ষ্যেই তরলোক,—তোমার আমার পরিচিত, আত্মীয়—আপনার জন; সুতরাং আত্মপোষ বিচার নহে কি, তাহায়া এতলভাবে অভিনয় দেখেন কি করিয়া? কাণেই বসিতে হয়,—আত্মকালের দর্শকবৃন্দ নাট্যকালিনয় দেখিতে চাহেন না,—অভিনয়ের বিশেষত্ব—নৃতনত্ব—এতমত কিছুই দেখিবার মত বান না! তাঁহা বান—আট আনা, কিংবা একটাকা, কিংবা দুই টাকা খরচ করিয়া আমোদ করিতে,—সুখী করিতে—যজ্ঞা দেখিতে,—অভিনেত্রীর ‘রূপ’ দেখিতে! রক্তের নগ্নকীর্ত্তন হাসিয়া হাসিয়া—নাচিয়া। নাচিয়া—খুঁচিয়া কিহিয়া—কেমন কটাক্ষবান হানেন—ত’ই দেখিতে! ইংলণ্ডের আমরা সকল বিষয়েই অনুকরণ করিতে হাই,—কিন্তু এ বিষয়ে ত’ তাহাদের মতন হইতে পারিলাম না। বিশেষতঃ তিনবস্তীর অধিক বিবেচ্য হয় না, তাহাতেই রম্যলয় দর্শক পরিপূর্ণ। তবু কি তাই? এখানে আমাদের সম্রাটের মত তিনবস্তী অভিনয় হয়,—বিশেষতঃ রবিবার ছাড়া প্রত্যেক রাতেই অভিনয় হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক রাতেই রম্যলয়ে লোক গবে না। এখানে বড় ভোর

চারিটি রফালসহ,—বিলাতে (এক লগুন সহযেই) সর্বত্র প্রায় একমুঠি বায়টী রফালসহ। এর ভাবে সাহা
য্যত কোমলই বলিয়া একবারে আঘাত রফালা নাটকের অভিনয় দেখি,—একথা ভাবিয়া সত্য ইংরাজ
মন মনে নিশ্চয়ই ভ্রমে করিয়া ভাবেন,—“বাকালীয়া এতকাল আঘাতের সংস্পর্গে থাকিয়া এখনও সত্য তা
শিখিল না!” আমি একমন বিয়েটারের অধ্যক্ষকে ভিজাঙ্গা করিয়াছিলাম,—“এই যে একবারে বড় বড়
পাঁচ-ছয়খানি নাটক অভিনয় করিবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন—এত সময় পাইবেন কখন?” অধ্যক্ষ
মহাশয় বলিলেন,—“আরে কেণেচেন মশাই? নাটক কি আর যেরূপে? নাটকের ‘মলাটখানা’ সে
করিয়া ছাড়িয়া দিব। বসি, এই Competition-এর বাজারে বর্ষক টানিতে হইবে ত?” একবার ভ্রম
করেক ভ্রমলোক বিয়েটারের টিকিট বিক্রয়কারীকে আলিয়া ভিজাঙ্গা করিলেন,—“মশাই! আপনাদের
এখানে বিয়েটার ‘ভাষিবে কখন?’ টিকিট-বিক্রয়কারী বলিলেন,—“আজ্ঞে সে ভাবনা নেই—এখানে
বেশী বাত হবে না। বাজি ছুঁটোর মধ্যেই তেজ বাবে?” ভ্রমলোকগণ একটু বিচল হইয়া বলিলেন,
—“ঐ, মোটে ছুঁটা তাতির? তবে আর কি হবে? চলছে—অঙ্ক বিয়েটারে বাই, সেখানে নিশ্চয়
লকাল পড়ার হবে।” ভৌতুলমহাবতী হইয়া ভীতান্নিককে ভিজাঙ্গা করিয়া আনিয়াছিলাম—ভীতারা
মক্কেল হইতে কলিকাতার বিয়েটার দেখিতে আনিয়াছেন। সহরে ভীতাদের এক রাজির মত
খাতিয়াং হানি যে এমন কোনও আত্মীয় বা বন্ধু দেখায় মাই। স্ততরা বাজি দুইটা পঞ্চম বিয়েটার
দেখিয়া—অবশিষ্ট রজনীটুকু কোথায় বাপস করেন? প্রত্যেকাল পঞ্চম বিয়েটার দেখা হইলে—
গমাহান করিয়া কোকানে কিছু নিষ্ঠার বহির করিয়া অলযোগ করিয়া—পরদিন পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিবেন।
স্ততরাং ইংরাজ যদি সমস্ত রাজি অভিনয়ের লক্ষ্যাতী হন, তাহা হইলেও ভ্রাতঃ বর্ষতঃ ইংরাজের পক্ষে
কিছু অস্বাভাবিক হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও ভীতারা বর্ষা নাটক ও অভিনয় দেখিতে আসেন না,—
এক রকম “ফটকে আটক” থাকিতে আসেন।

যাহাই হোক, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, নাট্যলগ্নে এ সময় বিপণ্যর ক্রান্তের
মত একা কি বর্ষকবুঝেই হোবী? এমন তা’ দেখা দিয়াছে—অথবা শোনা দিয়াছে—পুরাতন
রূপে “লম্বা মনহ”, “সত্য কি কলকিত্তির” ভ্রাতঃ মাত্র একখানি কুস্ত্র সীতিনাটোর অভিনয়
দেখিতে হইলে এককালে বর্ষকবুঝে পরিপূর্ণ হইত। সে হুল পালটাইলেন কাহারা? রফালসের
কর্তৃপক্ষগণ না বর্ষকবুঝ? বর্ষকবুঝ তা’ কর্তৃপক্ষগণকে বলেন না,—“আপনারা যদি এই রকম এই রকম
না করেন, তাহা হইলে আরহা আপনাদের বিয়েটার দেখিব না।” সেই পুরাতন রূপে (মাত্র ১৯০১
বৎসর পূর্বকাল কথা বলিতেছি) চারিটি বিয়েটারের অধ্যক্ষগণ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইয়া—
পাঞ্জা বিয়া বোকাহানারী আরম্ভ করিলেন,—নিজের কোলে কোল টানিবার মত বর্ষকগণকে প্রলোভন
কোষিতে আরম্ভ করিলেন, এ বিয়েটার যদি একখানি নাটক অভিনয় করে,—ও বিয়েটার দুইখানা
আরম্ভ করিলেন,—সে বিয়েটার চারখানা লাগাইলেন,—অন্ত বিয়েটার পাঁচখানা নাটক অভিনয় তা’
করিলেনই,—উপবস্ত প্রত্যেক বর্ষকবুঝকে আবার উপহার দিতে আরম্ভ করিলেন। এই উপহার যে
মত বকরের বেগুলা হইয়াছে তাহা ভাবিলে মশাইই মনে হুবে, কোত, লম্বা ও চুপার উদয় হয়। কোনও
বিয়েটার নাকি একবার আপু, গটোল, সাউপাক, কুমড়া ইত্যাদি বাজারের শাকসব্বী বর্ষকগণকে
উপহার দিয়াছিল। পুস্তক উপহার তা’ এখনও মাঝে মাঝে চলে দেখিতে পাই, কোনও বিয়েটার
সোপায় হুল, ইয়াংগে—উপহার দিয়াছিল। বর্ষাকালে ছাতি, সীতকালে বোখাই চাবর ইত্যাদি এরকম

উপন্যাসের কথাও শুনা মিথ্যাহে। কেলেঙ্কারী করিয়াছিলেন কোনও একজন বিয়েটোয়েট অধ্যক্ষ মণ্ডল। তিনি অস্তিনযাত্রে প্রত্যেক মর্শ্বকে একটি করিয়া পুড়ায় টাটকা ইলিশ মাছ উপহারে মিথ্যাহিলেন। তিনি বিতারিত বিজ্ঞান লিখিয়া আদির করিলেন,—“অস্তিনয় সেবিত্তে আসিবার সময় পুষ্ণিতিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিবেন—যেন শেষ দ্বায়ে উননে আগুন দিয়া—টেল প্রস্তুত করিয়া রাখেন। অস্তিনয় দেখিবার পর বাঙালী পিতা সন্তান পরর ইলিশ মাছ ভাতা খাইয়া নব-নবনার তপ্তি লাভন করিবেন। ইহার উপর আবার কোনও কোনও বিয়েটোয়েট এক টিকিতে দুই রাত্রি অস্তিনয় দেখাইয়াছে। অতএব বলাই দেখি—এই প্রকারে তৎকালের ও নাট্যাঙ্গিনয়ের যে ভয়ভর কতি হইয়াছে—তাহার অস্ত কি মর্শ্বকম্বু দেখী? তৎকালের কর্তৃপক্ষসম হোকামদার, মর্শ্বকম্বু পরিচার। যেখানে বেশী প্রেলোভন দেখিবে, সেইখানেই পরিচার হইবে—তাহার আর বিচিত্র কি? কি কৃষ্ণপেট বাংলার তৎকালক পুণ্যালের ভায় রংকরা সস্তীর বকল ছাড়াই—দ্যাববিকল্প কথ্যবাহ্যতাবর্ণন নৃত্যগীতাদি দ্বারা জনসাধারণের মন জুলাইবার অস্ত কর্তৃপক্ষসম হইয়াছিলেন। অবিকারে মর্শ্বক যদি শুধু সেই প্রেলোভনেই বিয়েটোয়েট হান, তাহা হইলে এতল স্থলে সর্বাঙ্গসম্মত নাটক অস্তিনয়ের, নাট্যকলা-বিস্তার উন্নতি সাধনের আশা কোথায়। তবে যে সকল নাট্যাঙ্গলার অধ্যক্ষ অথবা কর্তৃপক্ষসম বলিবেন “আমরা ব্যবসা করিতে বলিয়াছি,—আমরা ওসব কিছু শুনিতে চাইনা। যেমন করিয়া হউক—টাকা আ’সলেই হইল,”—ঐহাসিককে এ সম্বন্ধে আমরা কোনও কথা বলিতে চাইনা, অথবা বলিবার অবসরক বিবেচনা করি না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, তৎকালের কর্তৃপক্ষ, অধ্যক্ষ বা ব্যবসায়িকগণ যদি যালো আবার উপর আটোতা আনা স্বার্থপর না হন এবং নিজদের সর্বাঙ্গ-বিশেষে সর্বাঙ্গমুখ—এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে বাংলাদেশে তৎকালকে এখনও তৎকাল সন্তান হইতে পারে,—এখনও নাট্যকলাবিস্তার উন্নতিলাভন,—স্বাশ নাটকের স্থিতি এবং লোক সবে যথেষ্ট অধোপার্জনও হইতে পারে।

রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য প্রবাহ

নব-নব রূপে দুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগে : তাদের দেশ, শ্রামা, মাদার খেলা, তাম্র সিংহের পদাবলী, তাদের দেশ, বাঙ্গালীকি প্রতিষ্ঠা, জিহাদবা।

পুরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক তাদের দেশ ও শ্রামা

রবীন্দ্রনাথের ওই দুটি নৃত্যনাট্য আমাদের কাছে নতুন নয়। বহুবার বহু প্রতিষ্ঠানের অস্তিনয় বেবেছি। তাহা সব পাকা দল। মারী সব নাচির আর গাইয়ে সে সব বলে। কিন্তু পুরী হোটেলেইয়া সে পর্বেয় পড়ে না। তাহা কোন বিভাগের নাচ পানের তিগ্রীবাদী নয়।

নিতান্ত সন্দের স্বল্প পুতীতে বলে তারা বকীজ্ঞানাবের পান পেবে, এবিষয়ে তাদের স্বপ্ন ও পরিচালক হলেন পুতী হোটেলের স্বত্বাধিকারী ও পুতী হোটেল রিক্রিয়েশন ড্রাবের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযাখন লাল হালদার। সেই অপেক্ষাবার অল্পবয়সী মেয়েদের হল যে কলকাতার এলে এমন চমৎকার অভিনয় পরিবেশন করতে পারবে তা প্রত্যাশা করিনি। সত্যিই অত্যাবশ্যিক। সর্বদিক দিয়ে তাদের দেখ ও শ্রমায় এমন সর্গস্বন্দর অভিনয় দেখিনি বললেও হয়। নাচের এবং লক্ষীতের দিকোয়েল ব্যাক্তিই স্বার্থনৃত্যানাটোর রূপ ও রস পরিবেশন করেছিলেন শিল্পীরা। এর ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রশংসা দাবী করবেন নৃত্যপরিচালক শ্রীবেদনাথ গাঙ্গুলী, আবার লক্ষীত পরিচালক শ্রীবনমোহন গাঙ্গুলী এবং লক্ষীত পরিচালক শ্রীযাখনলাল হালদার।



আদ্যাদি অক ফাইন আটল নকে সত ছুন মালের ২৪শে ও ২৫শে এই ঘটনাদের আলো বসেছিল।

দুটি নৃত্যানাটোর অভিনয়েই প্রত্যেক শিল্পী বিপুল নৃত্যকুশলতার পরিচয় দেন। তাঁদের মধ্যে বর্ণকরা বিশেষ দুই করে ধানের হৌপ্যপদক উপহার দেবার কথা ঘোষণা করেন, তাঁরা হলেন, সুমারী বীণা হালদার (তাদের বেশে রাজপুত্র ও জানায়ে বজ্রলেন) পাঁচটি পদক; সুমারী মণিকা লাহা (তাদের বেশে হরতনী ও জানায়ে কোটাল) পাঁচটি পদক; সুমারী যমজা হালদার (তাদের বেশে পান্না জানায়ে উজীর) দুটি পদক, সুমারী তপতী ঘোষ (জানায় পান) দুটি পদক; সুমারী বর্ণা ঘোষ (তাদের বেশে রাজা) একটি পদক।

পুতী হোটেল রিক্রিয়েশন ড্রাব কর্তৃক অভিনীত 'জানা' নৃত্যানাটোর একটি দৃশ্যে (৪ দিক থেকে) সুমারী মণিকা লাহা (কোটাল) ও সুমারী বীণা হালদার (রাজপুত্র) তাদের মনে চিরকাল বেশে থাকবে। এই দুবিশের শ্রুতি

দ্বিতীয় দিন অভিনয়ের শেষে সাধারণ পদ থেকে বিদায় ভাষণে বলা হয় কলকাতার বর্ণকরের কাছে এই সাধারণ তরুণ শিল্পীরা যে শ্রুতি ও উৎসাহ পেল তা তাদের চিরকালের প্রেরণার উৎস হয়ে

হইল। দ্বিতীয় দিন অভিনয়ের শেষে দর্শকদের পক্ষ থেকে এই অভিনয়ের উল্লেখ্য-পরিচালক শ্রীমাখনন্দাল তালদারকে এবং বাবরাকতী শ্রীমতী বীণা তালদারকে অভিনয়কর আনন্দো হয়।



নৃত্যানন্দী কুমারী বীণা তালদার



সদ্যত ও অভিনয়শিল্পী কুমারী বর্ণা ঘোষ

এই অটুটান উপলক্ষে উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে যে আবরকগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তা যেমন চিঠিযোগেও, সেখান সিক দিয়েও তেমনি চিত্তাকর্ষক।

আঙ্গমিক সঙ্ঘের অনুষ্ঠান

জাতিনিকেতন আঙ্গমিক সঙ্ঘ বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট নাম। ১৯১১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যপতিবে এই প্রতিষ্ঠা হয়। শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে তাঁদের শ্রবণতী জীবনে শান্তিনিকেতনের ও স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবনধারণকে আঙ্গমের বাইরেও প্রচার করতে পারেন সেজন্যই এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং প্রবর্তকরা এবং বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের তিরোধানের পর আঙ্গমিক সঙ্ঘ যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তা সংক্ষেপে এই :-

১। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক জন্ম যে একদলক বিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন, বিশ্ব-ভারতীকে ঠিকারে রাখার ক্ষেত্রে সে টাকা ব্যয় হয়ে যায়। অবশ্যসেই পুরস্কার-অর্থটি দিয়ে একটি কাণ্ড বোম্বাই হোটে পোস্তন ও সন্মত। তাই সঙ্গে নোবেল প্রাইজ কাণ্ড নামে একটি অর্থ জমাগারে এই টাকটি সংগ্রহ করে রাখতে চান। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা বছরে বছরে অভিনয় করেন এবং তাঁর সংগৃহীত অর্থ ওই কাণ্ডে জমা দেন। এ পর্যন্ত তাঁরা একুশ হাজার টাকা জমা দিয়েছেন। (২) 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' এই ধরনের নাম দিয়ে তাঁরা দুখণ্ডের একটি স্মারক গ্রন্থ সংকলন করছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সংস্পর্শে তাঁরা এসেছেন, সেই সব আঙ্গমবাসীরা এবং আঙ্গমের বাইরের ব্যক্তিগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্মত তাঁদের দৃষ্টি চারণ এই বইএ লিপিবদ্ধ করবেন। এই লেখাগুলির মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবনের, ব্যক্তির এবং আঙ্গমের অনেক উজ্জল অঙ্গনাটি ও অগ্রহণ্য চিত্র পাওয়া যাবে।

সত্য-একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করতেন, যাতে রবীন্দ্রনাথের অনেক অপ্রকাশিত ছবি দেখা যাবে। স্বতন্ত্রতা এবং আলোকচিত্রেও মস্তে আত্মম্বিক সত্য দেখানোর মধ্যে কাছে আবেগের জানিয়েছেন। নিজেদের বিগট কর্মসূচীর মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আত্মম্বিক সত্য প্রকাশ পাতিমিত্তনবাসীনের নিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থাও করেন তাকে বিশেষ করে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুনাট্যগুলিকেই উপস্থাপিত করেছেন। এ বছর তাঁরা ছুঁদিনের ব্যবস্থারও আয়োজন করেন তার মধ্যে ছিল মাজার বেলা ছুঁদিন, তাহসিংহের পদাবলী, তাসের দেশ, বাঙ্গালী প্রতিক্রিয়া ও চিত্রাঙ্গনা।

সত ২০শে জুন রবীন্দ্র সঙ্গনে তাঁদের অগ্রষ্ঠান শুরু হয় মাজার বেলা গীতিনাট্যের অভিনয় দিয়ে। এবারকার বৈশিষ্ট্য ছিল পাণ্ডার ভূমিকায় স্ত্রীরা মিত্রের মহাবতরণ। বলা বাহুল্য তাঁর কণ্ঠে পাণ্ডার সানগুলি বিশেষ প্রতিশ্রুতকর হয়েছিল। নাটকটির আয়োজনসাপে একটি সফল সফল গল্প আছে। নায়ক যে জাদুবালা প্রথম জীবন থেকে তার বালাসঙ্গিনীর কাছে পেরেছিল তার মরণোত্তরতে না পেরে তার মামলীর সঙ্গনে বহির্বিবেক এক হাতের জাদু মৌলমহী নায়িকার তপে মোহিত হয় এবং সেখানে থেকে প্রত্যাহ্বাত হয়ে আবার সেই বালাসঙ্গিনীর কাছে ফিরে এসে পাণ্ডুলীলা করে। রবীন্দ্রনাথ ২৭ বছর বয়সে (১৮৮৮) এই গীতিনাট্য রচনা করে লেখেন, নাটকটি কোন সমাজ বিশেষ বা দেশ-বিশেষে আবদ্ধ নয়। সত্যের কল্পনাও কোন সত্তা নেই। অভিনয়ে খুঁটা ভূমিকায় ছিলেন অপেক্ষাকৃত, স্ত্রীরা: মিত্র, স্ত্রীরা: সেন, প্রদীপ: সেন এবং পুর্নিমা ঘোষ ও হোলনটাপা বাপগুপ্ত। কটন নাটক এই মাজার বেলা। আত্মম্বিক সংঘের শিল্পীরা সেনিন বিশেষ বক্তৃতার সঙ্গেই নাটকটিকে রূপ দান করতে পেরেছিলেন।

ষষ্ঠীয় গীতিনাট্য তাহসিংহের পদাবলী। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই বৈকুণ্ঠ কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ব্রহ্মলীলার পদগুলি তাঁর মনে ভাবের বহুত বসিয়ে তুলেছিল। জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন—একদিন মধ্যাহ্নে ঘুম ঘেঁষ করিরাছি। সেই বেলা দিনের চাহাযন অবকাশের আনন্দে ব্যক্তির স্তিত্বের একটা ঘরে বাটের উপর উপুড় হইয়া গড়িয়া একটা স্রোত লইয়া দিগ্বিদ্যাম ‘গহন জুহু জুহু মাঝে।’ রাবাক্রমের প্রবর্তনকারী এই মৃত্যুনাট্যের উপলব্ধি। অত্যন্ত মনোপ্রাণী রূপে তাহসিংহের পদাবলী পরিবেশিত। খুঁটা ভূমিকায় ছিলেন, পুর্নিমা ঘোষ, সুনীলা সাহায়া, হোলনটাপা বাপগুপ্ত।

চতুর্থ নাট্য তাসের দেশ। একাধিকবার এই সত্তা এই নাট্যের অভিনয় করেছেন। সবদিক দিয়েই এবারকার অভিনয় অনেক বেশী মনোজ হয়েছিল। এই বর্ণনা মৃত্যুনাট্যটিকে বাস্তবিক গুণে আত্মম্বিক সংঘের magnum opus বলা যেতে পারে। তাসেরা আর রাজকুমার ও লগান পুত্র সকলেই প্রকৃতির হয়েছিলেন। খুঁটা চরিত্রে ছিলেন, চন্দ্রোদয় ঘোষ, বিহির ঘোষ, অম্বা ভট্টাচার্য, হোলনটাপা বাপগুপ্ত ও পুর্নিমা ঘোষ।

চতুর্থ নিবেদন, বাঙ্গালী প্রতিক্রিয়া। এটি কবির সৃষ্টি বহু বয়সের রচনা। এই নাট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“আমার বিলাত বাইবার আগে হইতে আমায়ের বাড়ীতে যাত্রা করে বিজ্ঞান লগান নামে সাহিত্যিকদের সন্নিধান হইত। সেই সন্নিধান গীতবাহ, কবিতা আবৃত্তি, ও আমায়ের আয়োজন ব্যক্তি। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর একবার এই সন্নিধানী আহুত হইয়াছিল, ইলাই শেখবার। এই সন্নিধানী উপলক্ষেই বাঙ্গালী প্রতিক্রিয়া রচিত হয়। আমি বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের এবং আমার সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রতিক্রিয়া সন্নিধানী সাহিত্যিকদের, বাঙ্গালী প্রতিক্রিয়া নামের মধ্যে

সেই ইতিহাসটুকু বহিরা গিয়াছে।" এই নীতিনাট্যের অভিনয়ে আশ্রয়িত সাধের যে হুমাস আছে তা এবার আরও বাতুল বসেই মনে করি। লক্ষ্যেই চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। সম্রাটের নাট্যের প্রচুর প্রবলো পেয়েছিল শ্রোতাদের তাই থেকে। মুখ্য ভূমিকার ছিলেন, অশোকচক্র, যোজনটাপা, ভাবতী সুযোগাধ্যায়, ত্র্যমল সুযোগাধ্যায় ও পুদিয়া ঘোষ।

সমাপ্তি দিবসের অভিনয় চিত্রাঙ্গদা। চিত্রাঙ্গদা এই প্রথমবার আশ্রয়িত সঙ্গে কর্তৃক মঞ্চ হল এবং বোধকরি চিত্রাঙ্গদাই-এঁদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা। গানগুলি অপরূপ শুনিতেছিল এবং সেই সঙ্গে অসামান্য নৈপুণ্য দেখা গিয়েছিল নাচে। মুখ্য ভূমিকার ছিলেন, পুদিয়া, যোজনটাপা, মিহির ঘোষ।

এই পাঁচটি নাট্যের অভিনয়ক লক্ষ্য করে তেলেবার কাছে ঠিক আশ্রয়িতোগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, সারো—অশোকচক্র যোজনটাপা, অশোক ঘোষ, অরবিন্দ বিশ্বাস, ভাবতী সুযোগাধ্যায়, সীলিমা সেন, প্রসাদ সেন, কমলা বসু, ইন্দুলেখা ঘোষ, বেণু ভৌমিক, মাহা সেনগুপ্ত, শ্রীয়া চৌধুরী, বেলা ভট্টাচার্য, অনিমা যোজনটাপা, মুখরী বসু, চক্রেস্বর ঘোষ, অরুণ চক্রবর্তী। লক্ষীতাহবকে—অরুণ চক্র, অনিল সত্ত, অরুণ ঘোষ, সীমেশ চক্র, অরুণ দে, অরুণ চক্র, তেজস্বিনী সিং। লাক-লক্ষ্যায়—এ বাসুচন্দ্র, তাহ বাসুচন্দ্র, বর্ষ বাসুচন্দ্র, অরুণী সেন, সীমা সুযোগাধ্যায় সুব্রতচন্দ্র, উমা সেনগুপ্ত, সুরতি চক্রবর্তী। প্রায়োগিক—অরবিন্দ সত্ত গুপ্ত, আরতি অধিকারী, প্রবীণ ঘোষ, হুমীল সত্ত, তনয় দাস।

লালসল্লা প্রায়োগিক। আবহলক্ষীত—সমস্ত কিছুই মধ্যে যেমন ছিল। পরিপাট্য, ভেদনি ছিল বাহ্যিক বহির্ভিত্তি পরিমিত। শান্তিনিকেতন আশ্রয়িত সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠা লক্ষ্যে প্রায়োগিক কর্তে বহীষ্করণের দ্বারা তথা শান্তিনিকেতনের ব্যাপকে অগ্রসরণ করেন, অর্থাৎ আবেহ লক্ষীত, সূত্র সংযোগে। অভিনয়ের আলিকে বা উপস্থাপনে কোথাও কোন অধবা আড়ম্বর বা বহির্প্রায়োগ ঘটতে যেন না, ফলে অনেকসময় তাঁদের কর্মকে rigid বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভাবধারায় সঙ্গে ধারা পরিচিত তাঁদের কাছে আশ্রয়িত সঙ্গে মাতা পরিবেশন অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক হয়েছে নিঃসন্দেহে। গোবাক পরিচ্ছদের প্রতি উজ্জ্বলতার সর্বিশেষ ও সত্যক সূচী ছিল। প্রত্যেক নাট্যেই বিষয়বস্তু অগ্রবর্তী গোবাকের ব্যবহার ছিল নিখুঁত। সবচেয়ে উৎকর্ষ দেখা গেল, চিত্রাঙ্গদায়। সূত্রগা চিত্রাঙ্গদায় পাঁচি বহির্ভিত্তি গোবাকটি লক্ষ্য কর্মকেই বিশেষ সূচী আকর্ষণ করেছিল।

অভিনয়ের মধ্যে মুখ্য ছিল নৃত্যান্ধিক। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তিনি সকলের বেশি সূচী আকর্ষণ ও প্রবলো অর্জন করেছেন তিনি হলেন শ্রীমতী পুদিয়া ঘোষ। প্রত্যেক নাট্যে তিনিই ছিলেন, প্রায়োগিকতার প্রতীক, নৃত্যনাট্যের বা প্রথমস্তম সত্ত, বসু-কুণ্ড আনন্দমিত্রের অধবা প্রবাহ তা তাঁর নৃত্যভাবনার প্রতি লক্ষ্যে সূচী উঠেছিল। সর্বোপরি সেই অতিথিক অধবনী ভাবটি থাকে ঠিকমত বৃত্তির বলা বাধে না, থাকে বলা যেতে পারে প্রায়োগিক লক্ষ্য বা আবেশ, বা সমস্ত টেকনিককে ছাপিয়ে উঠে একটি ভাবময় সংবেদন বর্ণকচিত্তে ছাপিয়ে তোলে, সেই অনন্ত অতিথিক তাঁর প্রতিটি নৃত্যে সূচী উঠেছিল। ফলে লক্ষ্যের সঙ্গে থেকেও তিনি ছিলেন সত্য, আর যেখানে একক দেখানে তিনি ছিলেন লক্ষ্যকার অনেক উর্ধে। বিশেষ করে চিত্রাঙ্গদায় সূত্রগা-চিত্রাঙ্গদারূপে তিনি যে নৃত্য পরিবেশন করলেন তা সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পের নমুনার মধ্যে গণ্য করার যোগ্য। বাহার বেশার মুখ্যসহচরী, তাহসিংহের পরাবল্যতে- বাহা, তাদের বেশের সহচরী, বাস্তবিক প্রতিভার মুখ্য

বনবালা এবং চিত্রাঙ্গনার কুরগা চিত্রাঙ্গনা—বলতে গেলে, আঙ্গনিক সংখ্যের এই পাচবিনের উৎসবে শ্রীমতী কোর ছিলেন একাই একশো। কঠিন তাঁর পরিচয়, অসহ্য তাঁর অব্যবসায়, ত্রিষ্ট তাঁর লাবনা এবং লাবক তাঁর নৃত্য পরিবেশন।

রঙমহলে আদর্শ হিন্দু হোটেল

এক একটি বিয়েটারের এমন একটি ছুটি স্টক নাটক থাকে যার পুনরাবৃত্তির দর্শক আকর্ষণ করা যায় লম্বাক্ষেপে, অস্তিত্ব করে কতকটা জড়।

সেকালে কবেছি তাঁর বিয়েটারের ছিল—চন্দ্রশেখর! এই নাটক যখনই যখন হত তখনই দর্শক পাওয়া যেতো প্রচুর। অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসের মাইনে বেওয়া থাকে না। লাগাত চন্দ্রশেখর। মাইনের টাকা উঠে গেল।

এ দুগে তেমনি একটি নাটক—আদর্শ হিন্দু হোটেল। বিজুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মানবদরদী-কাহিনীটির এমন একটি আবেদন আছে যা আঙ্গকের ক্ষতদাবমান, কৃত্রিম ও ক্ষয়হীন জীবনব্যাপার প্রচণ্ডতার মতোও অস্বপন করা যায় এবং উপভোগ করা যায়।

রঙমহলে এই নাটক বায়ে বায়ে এবং বরাবরই অনুষ্ঠিত।

এবার এর নায়ক পাচক-ব্রাহ্মণের কুমিকার হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল। হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে অভিনয় বলে মনে হয় না—এমনই স্বাভাবিক তাঁর চরিত্র রূপায়ণ।

অজ্ঞাত কুমিকার লাবিনী চট্টোপাধ্যায়, অপর রায়, লম্বুবালা, অমিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁদের অভিনয়ে পূর্বকার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

রঙমহলের পরবর্তী নাটক—লম্বু বহন।

ভাঙ্গার বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত। জীবনের অতি-বাস্তব ব্যাখ্যান এই নাটকের উপকীর্ষ।

ব্যাপার যাঁ চলেছে

চক্রপানি

[মতামতের জন্য পত্রভারতী-সম্পাদকের কোন দায়িত্ব নেই]

খাপচুরিয়াস। চোখেবুখে যেন আঙনের কলকানি। বিড়বিড় করে কী বললেন, বুঝতে পারলাম না।

বললাম, তা বাবে?

বললেন, না থাক! বলি, কী ছাইভয় লিখছ। কলকাতার রাস্তাটা একবার ঘুর এসো।

সে তো হোজাই খুঁচি।

চোখে পড়ে না?

হ্যাঁ, তা পড়ে বৈকি। ভত কি চোখে পড়ে।

কলকাতার রাস্তার উপলেন গোলাক পরা

যেহে বেবেছো? বাঙালী যেহে?

উৎসাহিত হয়ে বললাম, না, সে সৌভাগ্য

এখনো হয়নি। জুনি বেবেলে নাকি?

প্রকাণ্ড হুতার ছেড়ে বহু বললেন, হ্যাঁ, এইমাত্র

সেখো এলাম। কলকাতার টোকে।

বল কি! তাহলে তো তোমার জীবন
দার্ক হল।

গত মাসের সেই বড়ুটি আবার এসে
উপস্থিত। বললাম, এসো, বল।

সময় বাব তো মহাকাশি লনকে খেয়াল
করেছিলে, এবার তার পালো?

বেবলাম, বড়ুটি এবার যেন আরও



বাক্য বোঝো না। সে কী অদ্ভুত দৃশ্য। আড়ল পা, মুকে এক কালি কিতোর মতো কাঁচুনি।

শাক্তীর আঁচল নেই বললেই হয়। ভাড়াটা শাক্তী পরাব তবীটাক ভেদনি করব, শিছন যিকে কোমরের

অনেকবারি নীচে ঝেদছে শাক্তীটা, আর সামনের যিকে নাইকুখুলের নীচে পর্যন্ত বেধা থাকে। বানো—

আর মানে বোঝাবার বরফার নেই। তা এ তো চমৎকার গোলাক! আবারও প্রথম দিবসে

কোন নাগরিক। যদি বকপুত্রীর ষষ্ঠ চোখে মিরে রাস্তার বেতোন, তোমার আপত্তি করবার কী আছে।

মুসী পাকিয়ে বহু বললেন, জুনি একেবারে কাহারামে গেছ। এইরকম গোলাকে রাস্তার

বেতোনো জুনি সমর্থন কর?

আমায় সমর্থন-অসমর্থন কিছু এসে যায় না। মূলের হাওয়া বইছে। তাকে ঠেকাবে কি

করে? এরকম গোলাকপরা মেয়ে আজকাল হামেশাই বেধা থাকে। হাওয়াটা এসেছে পশ্চিম থেকে,

তারপর শুকরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব হোয়ে বাংলা দেশে। অবাভাশী মেয়েদের মধ্যে আকর্ষণ প্রচুর চলল। এইরকম গোষ্ঠাকের এই শব্দে। তার ছোয়া লাগবে বাভাশী মেয়েদেরও দেখে যেন, এ আর বিতর্কে কি।

বহু বললেন, কিন্তু এই যাওয়া যে কী বিষ হুজুকে তা কী ভেবে দেখেছো। এবে পর্ণোগ্রাফীর চেয়েও মারাত্মক। প্রত্যক্ষ প্রবোচনা। গবেষণা তো লোক হাঁ করে সেই মেয়েটাকে দেখতে লাগল। কলেক্টর ছাড়া তার শিছু শিছু চলল। সেই ছাত্রগুলোর ঘন যদি বিস্তৃত হয় তাতে আশ্রয় দ্বারা কিছু নেই। এমনি করে বেশের য় সর্বনাশটা হচ্ছে তা কি ভেবে দেখবার নয়।

অবশ্যই ভেবে দেখবার। কিন্তু ঐ পর্বত। করবার কিছু আছে বলে মনে হয় না।

আলবৎ আছে। বহু সংগে বললেন, কেন, পাকিস্তান এর বিধিত করেনি? অবাভাশী গোষ্ঠাক পরে মেয়েদের লব চল। লবানে বহু। এখানেও তাই করতে হবে। এ যদি যোগ্য না করা যায় তাহলে --

বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু আমাদের যে ভারত, ভারত তাই ইচ্ছা ইতিবা, বাহীনতার পরে এক নতুন ভারত। সর্ব বিষয়ে আমরা কিছু বৈধ বাহীন। ব্যক্তিবাহীনতা, ব্যক্তিবাহীনতা এখানে অব্যব, সেই লবে কর্মবাহীনতাও।

বহু বললেন, ছাই বাহীন! এই কী বাহীনতা? বাহীনতার নামে উজ্জ্বলতা, বোকাচার আর সব কিছু ভালকে না-মানা? কেন, পড়নি, তোমাদের কাগজেই তো যোগ্য এই প্রথম এই না—মানার লবকে লেবা হয়েছে এই পত মানেই?

পড়েছি। পড়েছি আর অরণ্যে বোঝেন করেছি।

বহু বললেন, না, অরণ্যে বোঝেন নয়! যদি তোমাদের মতো আর সব পূজ পত্রিকা এই নিয়ে চিত্তা করে, প্রতিবার জানায়, তাহলে তার কল কলবেই। সংঘবদ্ধভাবে এই নৈতিক অযোগ্যমনকে প্রতিবেদন করতে হবে। সরকার হলে আইন চালু করতে হবে। বেশের ছেলেমেয়েগুলোই যদি সব মই হবে যায়, তাহলে এ বাহীনতার নাম কী? বিশ বছরে বিশ হাল হয়েছে আমাদের, তাতেও ছাত্রটা বাড়ী ছিল এতদিন। কিন্তু এবার নীতির বাধনটাও বলে গুচ্ছে। আর যোগ্য হয় যাকে নেই! সিনেবার টপলেন, বাস্তব্যাটে টপলেন, এমন কি, সেনিন বেবে এলাহ, স্বাধীনতাভক্তির আসবোত টপলেন!

বললাম, তাইতো! তাহলে কী করা যায় বলতো?

করণে আর কী। কোরসে কলম চালাও।

কিন্তু কলমে কী হবে? এর অস্ত্রে সরকার, চাপু, বিলুটি অব্যব করাটা!

লোৎসাহে বহু বললেন ঠিক বলেছো!

বাণেশ্বর হা গেলে তার মধ্যে নিত্য নতুনদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বোকাবের কথা বলছি। যোগ্যই নতুন বহনবে, নতুন টেকনিকের বোকাও-র কারিনি। সেই সব কারিনির মধ্যে নাটকের উপস্থান আছে। উপস্থানের বোকাও আছে। আজ যদি থাকতেন, রত্নাঙ্ক অমৃতলাল, তাহলে নিশ্চয়ই এতদিনে বহু বহনকেও 'বোকাও' নাটকের অভিনয় দেখতে পেতাম।

হলে বাণেশ্বর বাণী বোকাও করেছে, এ সংবাদ এলে এই লব কলকাতার হকিগাকল

থেকে। বাসবপুত্র বান। এলাকার বৈষ্ণববাড়ীর দ্বিধি মণ্ডল এম. এল. এর বাড়ী ঘেঁষাও করা হয়। আর সেই ঘেঁষাও-বলের নেতৃত্ব করেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র। মণ্ডল মণায়েব বাড়ীর টেলিকোনের তার কেটে দেওয়া হয় এবং দণ্ডাতীতি বাড়ির ওপর ইন্সটল করা হয়। ব্যাপার কি? তেন এই যেবাড়ী তার কারণ আনা। বেশ, ছেলে কন্সটিটু আদর বাল ছেলের জন্মলাভ হলে, সম্মতি সেই মল তার করে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। অতএব বাপেরও যেমন স্বাধীনতা আছে হলত্যাগের, মেলেরও তেমনি স্বাধীনতা আছে তার প্রতিবাদে বাপের বাড়ী ঘেঁষাও করে তাঁকে নাস্তানাবুদ করবার। সবচেয়েই অবাধ স্বাধীনতা।

প্রেম করবার স্বাধীনতা তোমার আছে বাউ। কিন্তু চুপি চুপি প্রেম করে কেটে পড়বে—সেই হবে না। প্রেম কয়েছো, তার ফল ভোগ কর। বিয়ে কর। নইলে বেগাও। সত্যিই মিথ্যাপ্রেম এক প্রেমিক-প্রেমিকা সেবাওব পালায় পড়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছে বলে আনা পোড়। “প্রেম করে তার পরাণ ত্যাগ দায়।”

তাঁরা দুজনেই ছাত্র। প্রেমিক কলেজের। প্রেমিকা ইন্সলের। ছাত্রদের ভারী প্রেম। প্রায়ই সন্ধ্যার পর তাঁরা একটি বাড়ীতে মিলিত হয়। তাঁরপর বন্দী দুইতিন সেই বাড়ীতে কাটিয়ে যে বার হয়ে কেহে। বেশ চলছিল কিন্তু বাদ সাধল পাড়ার ছেলেরা। তাঁরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল কয়েকদিন ধরে। একদিন তাঁরা এক মতলব আঁটলে।

স্বাধীনপ্রেম প্রেমিক প্রেমিকা মিলিত হয়েছে এমন সময় ছেলেরা হলবৎ হয়ে সেই বাড়ীতে ঢুকতে হল। প্রেমিক প্রেমিকা তখন পালাবার ক্ষেত্রে পথ হুঁকতে লাগল। কিন্তু প্ররোপ করা হল সেই অব্যর্থ বাওয়াই—ঘেঁষাও।

ঘেঁষাও-বলের দাবী : এভাবে সুকিয়ে প্রেম করা চলবে না, বিয়ে করতে হবে। এবং এখুনি আদর রাইয়ে। ঘেঁষাও-র চাপে প্রেমিকা রাখী। কিন্তু প্রেমিক রাখী নয়, বাবা শুনলে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে, বাবা……

ওসব অজুহাত চলবে না। প্রেম করবার সময় বাবার কথা মনে ছিল না? বিনি পরসায় ভোক বাবে? তা হবে না বাহাদুর! গাঁটছড়া ধাঁতে হবে! ছেলেরা রাখী নয়। অতএব চালাও ঘেঁষাও।

রাত বাড়ি। পাড়ার ববর ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দিকে ঢাকঢাক। শেষ পর্যন্ত প্রেমিককেও রাখী হতে হয়। তখন পাড়ার ছেলেরের সে কী উল্লাস! হর হর বোম্ব বোম্ব করতে করতে তারা ছ’জনকে প্রথমে বানার নিয়ে যায়। সেখান থেকে বিকটবতী এক কালী মন্দিরে। তাঁকা হর পুজারীকে। তাঁরপর দণ্ডাতীতি পাঠসম্বতভাবে যদিও ছব্বয় বহ, মালাবহন, উলুউলু। শুভকাক নিবিয়ে সম্পন্ন। সত্যীর রাত। কিন্তু তাহলেও সেই বিয়ে দেববার ক্ষেত্রে মলে মলে লোক আসতে থাকে। ছেলের বাড়ী আর ঘরের বাড়ী—হু’ জায়গাতেও ববর যায়। তাঁরাও এসে সেই বিয়েতে যোগ দেন। ছেলের বাপ



আর ঘেঁষে বাঁপ—ছ'জনের ঘনের কথা অবশ্য জানা যায় নি, তিন ছ'জনকেই, "এই বেঁধাই"
"হেঁই, এইবে বেঁধাই" বলতে শোনা গিছিল।

সম্মার্জনীর অন্তরঙ্গ বাবলারের কথা শুনেছি। কিন্তু সেই মোক্ষম অন্ত দিয়ে যে ভাঙাতী
করা চলে তা এতদিন জানা ছিলনা। সম্মার্জনীর ঘরের পোশাখা বাবার বেস্তনীর চাঁট থেকে চাল



কিনে কয়েকজন পুরুষ বাড়ীঘুরে চলেছিলেন এমন
সবর তাঁদের চাল লুট হয়ে গেল। পুঠনকারীরা
সকলেই ছিলেন মহিলা, আর তাঁদের অন্ত ছিল—
খাঁটা। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন আর
পুরুষ-চালভরালাদের সংখ্যা ছিল কুড়ি। হঠাৎ আক্রান্ত
হয়ে পুরুষরা বিজ্ঞপ্ত করে পড়েন এবং প্রতিরোধ
করতে উত্তম হন। তখন চলতে থাকে খাঁটাগেট।
মহিলাদের সকলের হাতেই ছিল খাঁটা। পক্ষ
কাটিকলা সম্মার্জনী। তার গোটে পুরুষরা শেষ পর্যন্ত

চাল ফেলে গুঁঠ প্রদর্শন করেন। আর মহিলারা মহানন্দে বর্ণনায় করে চাল নিয়ে বাড়ী ফেরেন।

আর এক বর্ণনের মহিলা-আবীরভাগ নহ্না।

প্রাইভেট টিউটর অনাধি বোব হয়ে চুকে বললে, এক কাপ চা আনতে বল। একটা চাকরি
খুঁয়ে এলাম।

অনাধি অনেকদিনের বন্ধু। খেঁক টিউশনি করে জীবনটা কাটিয়ে ছিল। ছেলে পড়িয়ে
ভালই বোজসার করে। তার কথা শুনে আর তার বিনয় সুবের দিকে তাকিয়ে বললাম, বল কি।
চাকরি খোঁজালে কেন?

অনাধি বললে—ছেলেটা ভাল মাইনে পড়ে। বাপ তাকে পড়াবার সঙ্গে আবার মোটা টাকা
দেন। কিন্তু ছেলেটা শপ করেচে, সে সব বিষয়ে কেল করবেই। আজ আর থাকতে পারলাম না,
তার কান মলে দিয়ে বললাম, করে হতভাগা, তোর বরলে তার আভ্যন্তরীণ দুহুকে প্রত্যেক বিষয়ে
কাট হয়ে প্রয়োজন পেলেন। আর তুই সব বিষয়েই কেল! তাতে ছেলেটা কি বললে, জানো?

কি বললে?

ছেলেটা মলে মলে উত্তর দিলে, "আপনার বাসে তার আভ্যন্তরীণ হাইকোর্টের লক
হয়েছিলেন, আর আপনি ক্যা ক্যা করে ছেলে ঠেঙিয়ে বেড়াচ্ছেন।" তুইই বল এর পর আর সে-
ছেলেকে পড়তে বাধ্য চলে?

সংক্ষেপে বললাম—সত্য, চলে না।

মেয়ে 'মডেলিশ'

[দেশবাসী আজ খাত্ত লম্বট

এই নিদাক্ষ খাত্ত লম্বটের দিনে আদ্যেরে বা অর হা অর করে বিকোত না আনিরে
লম্বটের কতটা হোনাংলা আদরা করতে পারি—সেই বিষয় বিশেষ চিন্তা করে দেখা দরকার।
আদ্যেরে কবা, গল্প-ভারতীর 'মেয়ে মডেলিশ' করেকজন লম্বাট মহিলা এই নিয়ে
আলোচনা করতে এসিরে এসেছেন। আদরা এ-সংখ্যায় কলকাতা যেতার প্রতিষ্ঠানের
মহিলা-সহলের পরিচালিকা শ্রীমতী বেলা দে এবং ইনস্টিটিউট অফ কেটারিং টেকনোলজির
লেকচারার শ্রীমতী হীনা সেনের দুটি সমরোপযোগী রচনা পত্র করলায়।

এই নিয়ে এ-গ্রন্থেরে শুরু হলো,—বিকল্প খাত্ত-লম্বাঙ্কিত আরো অনেক আলোচনা প্রতি
সংখ্যা গল্প ভারতীতে নিরমিত প্রকাশিত হবে।

পত্ন বিচার বিষ-মহোদয়ের সময় রূপে ঠিক এমনি খাত্তলম্বট দেখা দিয়েছিলো।
তখন সেবানকার লরকারী খাত্ত-গল্পর যেতারে এই নিয়ে রীতিমত অভিমান শুরু
করেছিলেন। ওষেপের মেয়েরা বিকল্প-খাত্ত গ্রন্থেরে নানা উপায় উদ্ভাবনে অগ্রসর
হয়েছিলেন। শ্রীমতী বেলা দে ঠিক সেই সময় ইংল্যাণ্ডে ছিলেন এবং বিকে সন
দেবেছিলেন ও শুনেছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কবা তিনি এ-গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে খাত্ত-গল্পর খাত্ত-লম্বট সমাবানে জনসাধারণকে বিভ্রাণে লভেতন
করভেন তার একটি নিবর্ণনও মুদ্রিত করা হলো।

খাত্ত লম্বাট আজ সর্বাপেক্ষা শুকতর, এবং এর সমাবানও সর্বাপেক্ষে প্রয়োজন। আদরা
গল্প-ভারতীর পাণ্ডিকা, লেখিকা এবং দেশের মহিলা-সমাজকে অজ্ঞেয়র আনাজি, বিকল্প-
খাত্ত গ্রন্থেরে লবিম্বৃত আলোচনারে বোপবান করন ও খাত্ত লম্বাট লমাবানে সাহায্য করে
এই দুদিনে দেশের মহাকল্যাণ সাধন করন]

লম্বাঙ্ক—গল্প-ভারতী

FOOD FACTS

MISS LIGHTFOOT works in a factory all day. She makes no song or dance about it, but she is doing her bit. And the thing you couldn't help noticing is that even in wartime conditions she is seldom tired, never ill, never nervous. What is it Miss Lightfoot does that perhaps you don't? She eats potatoes and carrots. So do you. But *she* eats them every day—and every day in a different way. They protect her from illness and fatigue and keep her full of vitality. They'll do just the same for you.



Carrot Sandwiches for a change

1. Add two parts of grated raw carrots to one part of finely shredded white heart of cabbage, and bind with sherry or sweet pickle. Pepper and salt to taste.
2. Equal amounts of grated raw carrot, cabbage leaves and crisp celery bound with sherry or sweet pickle. Pepper and salt to taste.
3. Bind some grated raw carrot with minced onion, surrounded with a dash of vinegar.
4. Cook sliced carrot in heavy water until tender enough to spread easily with a knife.

All these fillings taste their best with wholemeal bread.



Our doctors don't mind making their lives in the food you eat, but if you want to stay fit, eat something every day!

Carrot-Cap Salad

Every woman who values her good complexion should have this salad regularly.

Cook two or three good sized potatoes in their skins. When tender, drain without drying off, so avoid making them floury. Slice and dice finely, then dress in vegetable dressing (two parts of salad oil to one of vinegar). Pepper and salt to taste while they are still hot. Put in a salad bowl lined with a few shredded lettuce leaves or watercress. Sprinkle with a little chopped chives or rings of young onion, and put high with grated carrot. To make a more substantial dish, add one or two baked sprouts or slices of smoked herring.

"Fodge" for Breakfast

"Fodge" is both nourishing and filling. It is excellent for breakfast.

Boil water-well-washed potatoes, then peel and mash them while hot.

When the mash is cool enough to handle, add salt and work in enough flour to make a pliable dough. Knead lightly on a well-floured board for about 5 minutes, then roll into a large circle about 1 in. thick. Cut into wedge shaped pieces and cook on hot griddle, on electric hot-plate or on the upper shelf of a oven, until brown on both sides, turning once.

Potato Flossies

These are real energy givers.

Scrub a potatoes and grist with a coarse grater over a bowl. Then add sufficient flour to form a batter. Season with salt and pepper. Heat a little dripping and make very hot in a frying pan. Drop the mixture into it. When brown on one side, turn and brown on the other. Serve with a little jam if you wish it as a sweet dish. If you think it is a savoury, add a pinch of mixed herbs and a dash of soy-sauce.



When you "dig for victory", grow vegetables not normally eaten from abroad — tomatoes, leeks, carrots and onions.

Remember to turn on your wireless at 8.15 every morning for useful food tips from the radio Kitchen Front.



বিকল্প খাছু

বেলা দে

গত মহাবুদ্ধের সময় লগ্নের সাধারণ মেয়েরা প্রত্যক্ষভাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান না করেও পরোক্ষভাবে যুদ্ধের কাজে বীর এবং দৃঢ় মনে কি ভাবে সাহায্য করেছিলেন তারই কয়েকটা ঘটনা নিয়ে এই প্রবন্ধ লুক করা যাক।

সৈতের সন্ধ্যা, তিনটে বাজতে না বাজতেই লগ্নের বৃক অন্ধকার ঘনিয়ে এলেছে, আর তার মাঝে টিপ্‌টিপ্‌ করে ঝুঁপ পড়ছে। আমি যে বাড়ীর অতিথি হয়ে ছিলাম সে বাড়ীর গৃহিণী ছিলেন ভারী অসামান্য! টেবিলে চা খেতে বসেছিলেন দুজনে—তখনো বাড়ীর অত্যন্ত অতিথিরা আসেন নি। কথায় কথায় মিলেমিশে গুণাতেন বললেন, আমি তো কাল 'বড়দিন' আমাংয়ের বেগে প্রতি ঘরে ঘরে এই দিনে নানা সজ্জার 'কক' লাগানো হয় এবং আত্মীয় পরিজনকে তা উপহার দেওয়া হয়। কিন্তু এবারে সামান্যই কেত তৈরী করেছি! বেশ লজ্জা জ্বরেই বললেন, জান তো এখানে মরনা, চিনি, মাখন ইত্যাদি প্রাত্যহিক ব্যবহারের সব জিনিসই রপ্যোন। তাই রপ্যানের জিনিস থেকে বাঁচিয়ে এই সামান্য কেতটা তৈরী করেছি। তবেই দেখেছি, রপ্যানের বাইরে কেউ বৈদ্য নাম দিয়ে জিনিস কিনে বাড়ীতে লকয় করে রাখে না। অথবা রপ্যানের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সে-সেপের লোকেরা অপূত্রিতে অথবা অমাহ'রে মারা যায় নি। এটা লজ্জা হয়েছিল ঐ সব বেগে গৃহিণীঘর সংসার চালানোর নৈপুণ্যে। সেখানে দেখেছি, যুদ্ধের সময় যত্নেবর লজ্জা যে রপ্যানের বরাদ্দ ছিল তাতে লগ্নায়ে প্রতি লোক পিছু ৮ আউল দেহ পদার্থ, ২ আউল চা, ৮ আউল চিনি, ২ আউল চীক, ৪ আউল বেফন বা ছাম এবং এক শিলিং পরিমাণ মাংস পাওয়া যেত। পিত্ত এবং তথ্যী বা ছাড়া হর এবং কমলালেবু পাওয়া দুহর ছিল। ডিম লগ্নায়ে একদিন পাওয়া যেতো। টিমে বাণা মাহ মাংস পাওয়া যেত না,—

তবে পূর্ণাঙ্গ তরিতরকারী পাওয়া যেতো বলে কোনো অসুবিধা ছিল না। মাহ মাংসের বসলে লাক লবলী বসী ব্যবহার হোত। মনে পড়ে ঐ সময় এক বিদেশী পরিবারে একটা পিত্তর লগ্নমিনে নিয়ন্ত্রণে গিয়েছিলেন, দুপুরের বাঙড়া ছিল। কিন্তু বাঙ তালিকার পলগুলি আদার আকো মনে আছে। একটা বড় ঘোটে বাঁধাকপি লেছ লাগানো হয়েছে, কিন্তু তুখু বাঁধাকপি নয়; লেছ বাঁধাকপিকে জিনিসার দিয়ে একটু টুক মত করে নেওয়া হয়েছে; তার উপর ছোট ছোট পানর, বীম, আলু প্রভৃতি

সেই করে সাধিবে । এতটা হয়েছে । অপর একটা পাতে বড় বড় ফুলকপি আঁধ সেঁক করে মাখনে তৈরী উপরে একটু মাট্রিও দিয়ে রাখা হয়েছে । কী মুচির বাংলাই নেই, এমন কি পাউচীও তখন হুজুয়া । কাকেই কতকগুলো বড় বড় পেঁয়াজ আঁধ সেঁক করে একটা পাতে রাখা হয়েছে ! কিছু মাংসের হোষ্ট ছিল । আঁধ ছিল মূণ । মিশি হিসাবে কতকটা মিক্সাচীর কল । কিন্তু খুব তুলির লোক খেয়েছিলাম । সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে না বলে গৃহকত্রী অসহ্যই নন ; হাং হা পাওয়া যাচ্ছে না তার বললে বিকল্প বাস্তব রাখা করতেই তাঁরা বাস্তব ।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের বাড়ীর বিদেশী বন্ধু ডরোথীর কথা ! দুজনে গ্রায় বলে নানা রকম পরামর্শ করতাম । ডরোথী Y. W. C. A.তে কাজ করত, বিশেষ সেবাশ্রম জানত না । কিন্তু বুকের সময় বারে বলে সময় নষ্ট না করে সেই সময়টুকু বাইরের কাজের মধ্যেই নিজেদের পিত্ত করে রেখেছিল । কারণ ওর বাবা ও বড় ছই তাই মুছে চলে গেছেন—বাড়ীতে বৃদ্ধা মা ছোট একটা ভাই । একদিন ওর লকে Y. W. C. A.তে গিয়ে হেলান ডরোথীর কাজ হচ্ছে চা কাপে তরি করে মেয়েদের দিয়ে আসা । আবার ট্রলি করে খাদি কাপগুলো বোড়ার অস্ত্র নিয়ে আসা । তা ছাড়া ওখানকার একজন অতিথি হাঁহবার লোক করেকজন মেয়েকে এক কাপের বসিয়ে বিকল্প বাড় হিসাবে কি বস্ত্রের বাড় তালিকার ব্যবস্থা করা তার সে সম্পর্কে বেশ ভগ্যপূর্ণ আলোচনা করতেও যেতাম । আমি ডরোথীর পাশে চুপ করে বলে শুনিলাম । কত সহজ ও অল্প বয়সের বয়স ব্যবহার কথা যে তখনমহিলা বললেন তা শুনে ভারী আশ্চর্য লাগল । ঝাড়া তখনেও তাঁরা কিছু যে বাহ বাস্তব সে-সব লিখে নিচ্ছেন আরো পাঁচজনকে জানাবার অস্ত্র । কী উৎসাহ ! ভদ্রিকে তখন মহাসমর বেবেছে ; কিন্তু এরা তাকে চুপচাপ হয়ে বলে নেই ! দেখছি W. B. S.-এর মেয়েরা সবত থেকে গ্রামে গিয়ে শরণাগত শিশুদের সেবাশ্রম করতেন । এছাড়া ব্যাপারের অবিকালে হোতাই যেহেতু চালাতেন । মূণ দিয়ে কাপড়, বই, কাগজ বাড়সামগ্রী সবই যেতেরা দেওয়া দেওয়া করেছেন হাসিমুখে ।—স্বামীপুত্র মুছে গেছেন বলে নিজেদের অসহ্য মনে করে কেউ করে বলে থাকতেন না । এমন কথা কত ঘটনার কথা মনে পড়ে ।

কালেই বাড়-সমস্ত অসতে নতুন সমস্ত নর । পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় এমন কোনো দিনের উল্লেখ নেই যে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মহিষ পরিপূর্ণভাবে বেতে পেয়েছে । তবে সমস্তটা হয়েছে কখনো কত কখনো বেশি । বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যাবে এই সমস্তার হাত থেকে কোনো আত্মিই বাহ পড়েনি । তবে হয়তো সমস্তার প্রকারভেদ আছে । কারণ একটা দেশের মোট বাড় পরিমাণ যথেষ্ট থাকলেই যে সে দেশ সমস্তার হাত থেকে রক্ষা পেলো তা নয় । দেশের সমস্ত লোক সেট তরে আহাৰ কত্রও সুখার্ভ থাকতে পারে ; এ সুখা হল তা অগুহী সুখ । আর এ অগুহী সুখ যেন বেড়ে না যায়, তার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে প্রতিটি পৃথিবীর ।

আমাদের দেশেও এখন ব্যাপান কমিয়ে আনার বাওয়া দাবীর দিক থেকে যে সমস্তা দেখা দিয়েছে, তাতে ঐসব দেশের আহাৰ প্রাপ্তির পদ্ধতি অল্পসং কমলে কিছুটা অত্যাং মিটবে । অবশ্য এটা ঠিক লক্ষ্য দেশেই অলম্ব্যত্ব অবস্থা অহমারী বাস্তবতায় পড়ে ওঠে । সুতরাং হয়তো পুছাপুছিত-ভাবে বাড়ের ব্যাপারে আমরা অল্প দেশের অহমারী হতে পারব না । অতুত কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেষ্টা করলে কিছুটা ব্যবস্থা করা যায় । যেমন, শাকসবজী, তরীতরকারী ইত্যাদি একটু বেশি পরিমাণে

এবং তার সবটুকু ভিটাঘিন বেধে বাঁধয়া বেতে পারে। বাঁধায়ে কল দায়া বছরেই একটা না একটা থাকে। তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম দামী অথচ খারোচ দিক থেকে উপযোগী কলও বেখেই রয়েছে। ঐ বছরের কল প্রত্যেক পরিবারেই নিয়মিত বাস্ত তালিকার তাখা বেতে পারে।

আমাদের দেশের মত ততুল জাতীয় এত খাজপত্র পুখিরীরা মাঝ কোমর বেধে নেই। কাজেই এক বাঁকো এবেশের লোকের চোখে বাঁজাভালি বলানো কষ্টের বলেই মনে হবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কম খাজপত্র ও উপযুক্ত বাস্ত নির্বাচন করায় যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে কথা লম্বাই উপলব্ধি করছেন। কাজেই আমাদের বিকল্প-বাস্ত ব্যবহার মধ্যে দিচ্ছে বাস্ত্র অর্থ নির্ভর হতেই হবে।

আজকাল ঢালায়ে 'মাইলো' দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। এই মাইলো লম্বা নানাঅনের নানারকম জুল দারখা আছে। কিন্তু ততুল জাতীয় বাস্ত্রের মধ্যে মাইলোর বাস্ত্রগুণ গ্রাহ্য লম্বের লম্বা; সুতরাং মাইলোর ব্যবহার লম্বাগ্রহণ করে তুললে আমাদের বাস্ত্রের অভাব কতকটা মিটেবে। সামের লম্বা। পশ্চিম বাংলার কোনো কোনো জায়গায় মাইলো 'মো-বান' নামে পরিচিত। মাইলো থেকে কি কি জাতীয় ব্যবহার সবচেয়ে তৈরী হয় এবং কিভাবে করা যায় তার একটি তালিকা দিচ্ছি।

১। মাইলোর বিচুড়ি—প্রথমে মাইলোর লম্বা বেড়ে পরিষ্কার করে তারপর লম্বা তাল্য কলে কি ধাতার আবতাসা করে নেবেন। লম্বাটিমাঝ মূল বা মূহুর ডাল ঘিণিতে বেমন বিচুড়ি তাল্য হয় সেইভাবে করবেন।

২। জাউ-ভাত—বতগানি মাইলো নেবেন তার ভিন্ন ভাগ জল দিয়ে হাঁড়ি উত্তে বসান। জল গরম হলে আবতাসা যোগ্য মাইলো ঐ হাঁড়িতে চেড়ে দিল। সুশিখ বলে নামিয়ে নেবেন, ক্যান পালবেন না। এবার কিছু হুন ও তরকারীর লম্বা পরিবেশন করুন।

৩। মাইলোর খই—মাইলো বেড়ে নেবেন। একটি কড়াইতে কিছু মোটাকানার বালি দিয়ে উত্তে বসিয়ে দিল। এক গোছা কুঁচি বা মারকেলের কাটি দিয়ে বালি নাড়তে থাকুন। বালি গরম হলে ঐ কড়াইতে মাইলো ছেড়ে দিল দেখবেন সুন্দর তুলের মত খই হবে।

৪। মাইলোর মোয়া—মাইলোর খইয়ের লম্বা শুক পাচ করে মেশান দেখবেন চমৎকার মোয়া হয়েছে।

আজ এই পর্যন্ত হইল। বাস্ত্রের বিকল্প বাস্ত্র হিসাবে আরো অনেক কিছু পরিবেশন করবার ইচ্ছা হইল।

কী খাব ?

খীনা সেল

ক'খার বলে খেয়ে পরে বেঁচে থাক।

বাগদাটা আসে। তদুৎসব স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে বাগদা, তা নয়; পুষ্টিগত খাদ্য না খেলে শরীর মৃত্যু খাচ্ছে না।

আমাদের দেশে আর কিছু না খাচ্ছিল; অন্তত বাগদার অভাব ছিল না। এদেশে দু'কলাং—এখানে আছে 'কা' আর; এ-খাবা খেয়ে তাই বাঁচি না।

কিছু ভাবতে হচ্ছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় খাদ্য সন্তারের অপ্রতুলতা এতই বেড়ে গেছে নিত্যজীবী যে টুকু হরকাত সেটুকু খাদ্য যোগাড় করণে একরকম অসমর্থ হয়ে পড়িয়েছে। দেশের এবং মনের লব্ধিকার পুষ্টি সাধনকারী খাদ্য পাওয়া কঠোর কথা; মূল খাদ্য (staple food) চাহিদা যান্ত্রিক পাওয়ার 'ফাউন্ডেশন'। মূল খাদ্য বলতে আমরা বাঙালীরা বুঝি 'চাল'। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থার সময় অন্ততম প্রধান খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। জনপ্রতি বরাদ্দ বেশন ওতম পূর্ববর্তন স'ধারণ-বিষয়ী লোকের পক্ষে যথেষ্ট কিনা এ নিয়ে চিন্তা করে কোনও মূল কিনারা পাওয়া যায় না; চাল-এবং গম ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যেমন মাছ, মাংস, ডিম, আলু অন্ততমী তরকারী সবই ক্রয়: দু'মূল্য হয়ে ওঠতে সাধারণ হব্যবিত্ত ও নিরক্ষিত পরিবারের পুষ্টি বহুল খাদ্য সংহান করা আদ্য অসম্ভব। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পুষ্টিগত লব্ধিই 'এ রকম খাদ্য সঙ্কট দেখা' দিয়েছিল। সেই সময় পাকিস্তানের মহিলা সমাজ অগ্রণী হয়ে বিকল্প খাদ্য প্রচলনের যে ব্যবস্থা করে বিরাট খাদ্য সমস্যার আংশিক সমাধান করেছিলেন; আজ এই খাদ্য সঙ্কটের দিনে কিছু কিছু বিকল্প খাদ্যের চিন্তা করলে চমক আংশিক স্বাধীন্য আসতে পারে। আমাদের সে-কথা এখন ভেবে দেখা দরকার।

প্রথমেই বগা বাক চালের কথা। বর্তমান সরকারী ব্যবস্থার বেশনে চালের বরাদ্দ কমতে কমতে ৫০০ গ্রামে এসে পেরেছে। তার বদলে অন্তত সম কিছুটা পরিমাণ বেওয়া হচ্ছে। চাল বতটুই পাচ্ছি তাতে সাধারণ ভাবে ভাত রান্না করে খেলে কোনমতে চাষ বেলা চলতে পারে, তাক-বেশ কষ্ট করেই। চালের বিকল্প খাদ্য কিছুই হতে পারেনা। তবে ভাতের বদলে এমন কিছু আমরা খেতে পারি যাতে চাল কম লাগে অথচ পেটভরে। যেমন ডাল বিশিষ্টে বিলুপ্তী হ'তে পারে; ক্যান ভাতও খেতে যথ্য লাগেনা; যাতে যাতে কলাই ডাল বিশিষ্টে 'দোলা' তৈরী করাও চলে; ভাতের ক্যান ভাতের সঙ্গে তকিয়ে কেলে রান্না করে ভাতও করা যায়। ভাতের চালের পরিমাণ কিছু কম লাগে এবং কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে, খেতেও সুখান্দ।

তারপর বরা হাক গম। গম দিছে হাতে গড়া কটি খেতে আমরা বাঙালীরা সত্যায় ছিলাম না; তবে চাল পাচ্ছি না বলেই গম খাওয়া অভ্যাস করা হচ্ছে। কটি তৈরী এবং কটি খাওয়ার এক-বেহেদী হাত থেকে নিষ্কার পেতে হলে, দালিচা (আমতামা) তৈরী করে নেওয়া যায়। দালিচা তাহের মত অন্নরসে সেদ্ধ করে, বা বিচুড়ী ঘেঁষে খাওয়া চলে। দালিচা ভেলে আমবার পর চালনী দিয়ে ছেঁক নিতে হয়। খুব মিঠি নয় অথচ বানিকটা আটা তা থেকে লাওয়া যায়; সেগুলি শুকনো কড়িতে ভেজে ছাঁকুর মত খেতে ভালই লাগে। অথচ এগুলো লবই পরিভ্রম এবং সময় বার করেই করতে হয়। তাহের মত সহজে রান্না করা যায়না। আমকের দিনে অনেক মেয়েই বাইরে ঢাকরি করতে যান, এত লব করতে গেলে পতাবানি সময় দরকার, পতাবানি দিতে পারবে কইকর, তবুও ধীরা খাম্বী, পুত্র, কস্তা, মা, বাগ, তাই বোনের লজ্জা ঢাকরি করতে যেতে পারেন এবং খুশিমনে পরিভ্রম করেন তাঁরা নিজেদের গ্রোহলনের সাননে বৈচিত্র্যের ব্যবহার উপস্থিত করতে পারার আনন্দকে অবশ্যই খুশি মনে গ্রহণ করেন।

এর পরেই আসছে প্রোটিন জাতীয় বাস্তব অর্থাৎ মাছ মাংস ডিমের গ্রন্থ। প্রোটিন অথচ কিছুটা পরিমাণ উরিহ লগৎ থেকেও খাওয়া যায়, তবুও প্রাণীক প্রোটিনের গ্রন্থোচ্চনীয়াত অস্বীকারই বা করি কি করে? বিশেষ করে বাস্তব ছেলে বেহেদের লগৎ প্রাণীক প্রোটিনের গ্রন্থোচ্চনীয়াত খুবই বেশি। কিন্তু মাছ, মাংস, ডিমের মূল্য বৃদ্ধি যে বায়ে লুপ্ত হয়েছে তাতে অন্নবিত্ত পরিবারে এসব বাস্তব বর্জন করতে হয়েছে বাধ্য হয়েই। ছিটেকোঁটা মাছ আর একটু করে মাংস, আবেদান ডিম ক'টা লগাতে কোটো প্রাণীক প্রোটিনের বিক্রম বাস্তব একমাত্র লগাবীকেই বলা চলে। যে জাতীয় উপাদান মাছ, মাংস, ডিম পাই, সেই জাতীয় উপাদানই 'লগাবীনে' পাওয়া যায়। কিন্তু লগাবীন এহেনে বিশেষ পাওয়া যায়না। আর অন্ন মূল্যেও বিক্রি হয়না, তাহেই লগাবরণ পরিবারের বাস্তব তালিকাভুক্ত করা চলেনা। এ অবস্থায় ডাল একমাত্র বাস্তব যা দিয়ে প্রোটিনের গ্রন্থোচ্চন কিছুটা যেটান চলে। লগাবরণভাবে ডাল রান্না করা ছাড়াও ডাল দিয়ে নানারকম সুবোচক বাস্তব তৈরী করা চলে। আত সুপ সেদ্ধ করে 'ভড়কা' রান্না করলে বাস্তব হিসাবে উপায়ে বিশেষ করে কটির লগৎ। পুষ্টি দিক থেকেও অতুলনীয়। এছাড়া ডাল তিলিয়ে 'বোকার ডালনা' করাও চলে। গুপ্তে ও হাতের বাস্তব ছাড়াও লগাল বিকালের টিকিনের লগৎও ডাল দিয়ে নানা রকম সুবোচক বাস্তব তৈরী করা চলে; যেমন দুগ ডালের লগৎ, ছোলার ডালের বরিক, হাঙ্গু, মুগের পুলি, কলাই ডালের রলবড়া। এগুলো করতে গরম। খুব বেশী বরচ হয়না; উপরন্তু সুবোচক ও পুষ্টিবর্ধক; তবে এগুলি তৈরী করতে পরিভ্রম এবং সময় দুই লাগে। অথচ একবাও তারা জুল হবে যে গুপ্তমাত্র ডাল জাতীয় বাস্তব খাওয়ালে মাছ, মাংস বা ডিমের গ্রন্থোচ্চন একেবারেই হবেনা। লগাবস্ত বাস্তব মাছ, মাংস ডিম দুইয়ের ব্যবহার বাস্তব হবে।

ডালের পর 'লগাবীন' ছাড়া সীনের কথা আমরা তাৎযতে পারি। লগাবরণ বেশী সীম বহুরের একটা সময় বেশ লগা হয়। তখন যদি বীজগুলিকে শুকিয়ে রাবা যায় তাহলে সেগুলি অল্প সময় লুক্কর ডালনা রান্না করে খাওয়া চলে। কীটাল বিচি পুষ্টিবর্ধক একটি বিশেষ বাস্তব উপাদান। পশ্চিমবঙ্গে কীটাল বিচি বাস্তব হিসাবে গ্রন্থ। গরমের সময় কীটাল পাকে, বিচিগুলি বহু করে রাবলে লগাবহুরই ঘেঁষে খেওয়া যায়। কিন্তু কীটাল বিচি কলকাতার মত লগবে অন্ন মূল্যে পাওয়া যায়না।

মাত্ৰ, মাংস, ভিৎসের সহ উপাধান পেতে পারি ছানার মধ্যে। কিন্তু ছানাই কি স্থলতা তবে মাঝে মাঝে দুধ যদি কোন কারণে বরচ না হয় সেটা দিয়ে ছানা কেটে শুষ্ক যে টিকিনই করা যায় তা নয়, ছানার ডালনা, ছানার পাত্তরী ইত্যাদি সুবরোচক খাদ্য ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে খাওয়া চলে।

বেশজুড়ে বপন খাদ্য বাড়ন্ত—তখন কী খাব—তার নানা কথা আনাদেরই বুঝে বার করতে হবে। আমি 'মেয়ে-মকলিপে' এই প্রসঙ্গের স্মৃতি। কবলাস—আলু, আলু আদরা আরো ব্যাপক—তবে এবিষয়ে আলু-আলোচনা করি, চিন্তা করি এবং এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিয়ে যে সন্দেহ আলু বেশব্যাপী দেখা দিচ্ছে বস্তুরূপে পারা যায় তার সমাধান করে দেপের কল্যাণে নিশ্চয় হই।

বাওয়া একটি অভ্যাস। কেউ বা কব খায় কেউ বা বেশি খায়, আবার কেউ অনেক বেশি খায়। কম খেলে কিছুই এলে যায় না। আর বেশি খেলেও কোন লাভ হয় না। বা খাবেন ভালকরে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবেন; যাতে তা সম্পূর্ণরূপে হজম হয়। তাহলেই তা শরীরের পুষ্টি সাধন করবে। বেশ হজম করতে না পারলে বেশি খেলেও কোন ফল হয় না। বরং তাতে শরীর অসুস্থ ও অসুস্থ হয় অনেককণ হবে যাতে যাতে খাবেন আর বা খাবেন বেশভালকরে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবেন, তাহলে বেশি খেতে পারবেনও না আর তাঁর প্রয়োজনও হবে না। শরীর বেশ কর্মক্ষম সুস্থ ও সবল থাকবে। দেশের এই নিষাক্ষণ খাদ্য সংকটের সময় কম খাওয়ার অভ্যাস করে দেখুন। বেশ ভালই থাকবেন, আর কি খাব, কোথায় পাবো, বলে অস্থির হতে হবে না।

যারা মোটা তাদের কিনা কষ্ট

জান্ডা পাকড়াশী

যারা তেমন ভাবের মোটা মন অবশ্য বেশ সেলসল পড়ন থাকে তারা যেন আবার যোগ্য হবার দিকে বেশী ঝোঁক দেবেন না। একটু চেষ্টা করে যেমন আছেন সেটাই স্বাস্থ্য বোধে চলবার চেষ্টা করবেন। লজ্জা করবেন যে একেবারে হাড় খেঁচ করা যোগ্য চেষ্টার চেয়েও একটু মাসেল সেলসল চেষ্টারই অনেক বেশী লাভবান থাকে। তবে হ্যাঁ স্লামবক্স হওয়া চাই। কাকর পিছনটি অপরিমিত পুঁথল। কাকর বুক দুটি জেগীভারক্স, আবার কাকর বা গাল দুটি একেবারে হলোপোল্লার মত কোলা কোলা—এমন যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।



হালকা ব্যায়ামের সঙ্গে পরিমিত আহার বিশেষ করে প্রোটিন জাতীয় আহার থাকেন। যেটো চলে থাকাযেন। প্রত্যেক মাসে ট্রিক একই পোষাকে একই ওজন-বয়ে ওজন নেবেন। তাহলেই বাড়ছেন কি কমছেন বুঝতে অসুবিধা হবে না। তবে ওজন-বয়ে, যে হাইট অসুস্থতাতে ওজনের চাট থাকে তার সঙ্গে জুলেও নিজেকে মেলাতে থাকেন না। খালল কথা হচ্ছে মানব। আপনার বা ওজন তাতে হয়তো কিছু বেশী বা কিছু কম হল। তাতে আর কতি কি! আপনাকে বেমানান না লাগলেই হল। সুতরাং শু নিয়ে মন ব্যাধি করার কোন মানে নেই।

কম বেলেই যোগ্য হয়ে যাবো, এই মনে করে তারা ছ' পরস তাত খেয়েই উঠে পড়েন—বেতে সেলেই তথ এই বৃষ্টি মোটা হয়ে সেলান; তাহাই নিজেদের যৌবনপ্রী নিম্নের হাতে মঠ করে থাকেন। কম বেলেই যোগ্য হওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, কি থাকেন তার বিচার করুন। ভাত, আলু, ডিম, ভেল, মি, মাখন এসব যদি দিয়ে কল, টাটকা সবজি, মাছ, মাসে ডিম, এই সব খেলে মোটা তো হবেই না, উপরন্তু পুরীবে খোর পাবেন। তারা সত্যিই ক্যাট কমাতে চান, যান, হীতিমত কমাতে চান, তাদের মত ব্যায়াম ও ডায়েটের চাট তৈরী করে দিচ্ছি; নিজস্ব উপকার পাবেন।

তবে ব্যায়াম করারও নিয়ম আছে। মন দি়র করে ব্যায়াম করতে আরম্ভ করবেন। নিয়ম করে রোজ একবার, অন্ততঃ বৃশপনের মিনিট ব্যায়াম করতে হবে। ব্যায়াম থালি পেটে করতে হয়, তাই

ভোরে উঠে করাই ভাল। কিন্তু তখন সন্ধ্যারের কালের চাপে লম্বা না হলে কতটুকু অকস্মে আর ছেলে মেয়েদের স্থলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘান্নের আগে কখন। প্রত্যেকটি ব্যাখ্যান তিনবার থেকে শুরু করে হাফবার পর্যন্ত করবেন। বেশী নয়। বীরা দ্রুতিমত মোটা ওদের দৈনন্দিন আহার ও ব্যায়ামের চার্ট :—



অতিরিক্ত মোটা হয়ে উঠলে নিজেদেরও চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়, তাই হাফা অস্ত্রের খেঁপে তখনতে হয়। কিন্তু বীরা মোটা তারা যে কতটা অলস হয় সে ধোঁষ ককরের থাকে। কম খেলেই যে বোকা হয়ে যাবেন এই ধারণা কিন্তু অত্যন্ত জুল। তাতে পরীক্ষার ভেতরটা ছুঁল হয়ে যায়। দুখে নানা রকম হাসি হয়। ছোপ পড়ে, চোখের কোমরে কালি পড়ে, দুখে জাঞ্জির হাসি ছুটে ওঠে। আর সবচেয়ে বড় কথা নানা রকম যোগে হয়ে। সব বেতে আগে হবে যজ্ঞরতা কিংবা আ-নিমিহা। তার চোরে ভাল যেটুকু বান পুষ্টিকর বাস্তব বান। তবে সবপ্রথমে আপনাকে ঠাট বা পর্করা আতীর খাবার একেবারে ঘন পত্র করে পরিহার করতে হবে। আর মিষ্টিও বেতে পারবেন না। একটু বঠি হবেই; তবে বীরে বীরে অভ্যাস হয়ে যাবে। একেবারে যদি শুষ্ক প্রোটিন আতীর খাবার বেতে পারেন তবে অতি লম্বা সেই বের কমিয়ে কেলতে পারবেন।

ভোরবেলা পুষে। একটি লেবু রস এক রান উলস উলস আলো দিশিমে দু চামচ যুঁ দিয়ে বেয়ে এতে কোষ্ঠ পরিষ্কার করবে। বের করে যাবে; স্বকণ্ড বসল হবে।

এবার ব্যায়াম শুরু করুন—

(১) দুই পা ঝাঁক করে ঝাঁড়ান, দুই হাত দু পাশে ছড়ান—একবার বড় করে নিঃশ্বাস নিন, সেই সঙ্গে পায়ে পোড়ালি জুগুন, হাতও হাতটা পাবেন উঁচু করুন; এবার নিঃশ্বাস ছাড়ুন, পা নামান হাতও নামান। বোলা আনন্দের লামনে এটি হাফবার অভ্যাস করুন। এতে কোমর, পেট, হাত, পা সবচেয়েই নাড়া পড়বে। এটি লব্ধবীন ব্যায়াম।

(২) ঐভাবে পা ঝাঁক করে ঝাঁড়ান, দুই হাত লোকা করে মাথার সমান্তরাল তবে ওপরে স্থলে রাখুন, এবার বেহের উর্ধ্বে একেবারে সোজা। তবে বীরে বীরে নীচু হোন; হাত দিয়ে হাটি ছুঁয়ে পায়ে ঝাঁক দিয়ে পেছনে তাকাতে পারবেন এই তরীতে আছেন। একেবারেই পারবেন না, বীরে বীরে পারবেন। প্রথম দিন মাত্র তিন বার অভ্যাস করুন। যখন নীচু হবেন তখন পা একেবারে সোজা থাকবে, আর নিঃশ্বাস কেলতে কেলতে নীচু হবেন, হাটি ছুঁয়ে থাকবেন এক দিমিট সময় নিঃশ্বাস একেবারে বের করে যাবেন। একবার বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে বসটা পাবেন পেটটি ভেতরে টেনে নিয়ে উঠতে থাকুন। পূর্ব বীরে বীরে উঠবেন একেবারে টান হয়ে ঝাঁড়ান। তদুপর বীরে বীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিন। তাতে করে জুঁকি কমে গিয়ে পেটের গড়নটি হ্রাস হবে, তাই হাফা সময় বেহেই অধ্যাহিত বের করে গিয়ে বহুটি নিটোল হবে। এই অ্যাসনটি বড় কঠিন। বীরে-দুর্বে অভ্যাস করবেন।

(৩) হাটিতে চিৎ হয়ে ভরে পড়ুন। দুটি পা ওপরে জুগুন। একেবারে ওপরে জুগুতে

হবেন।। পান্নাভ তুলে পা দুটি ঘুরিয়ে একবার বাসিকে তেলুন, তারপর ডানদিকে তেলুন। মাথা আর লাত বাটি ছুয়ে থাকবে। উঠবেন না; এতে পেটের চবি খুব তাড়াতাড়ি করে যাবে। জুড়ি কয়ে যাবে।

(৪) এবার বা পাটি তুলুন, পেটি ঘুরিয়ে ন'মান। বাব তিনেক করুন। আবার ডান পা করেক বাব ঘুরিয়ে ন'মান।

(৫) পাশ কিয়ে গয়ে পড়ুন। বহুকের মত বেকে যান। মাথার ওপর ছু লাত তুলুন, বা পাশে কিয়ে বা হাতে মাথা দিখে তুলে ডান হাত বীরে বীরে নামিয়ে ডান পায়ের বুকে আঙ্গুল ছুঁয়ে দিন; আবার আঙ্গের অবস্থায় কিয়ে যান। আবার ছুঁয়ে দিন। তবে হাত পা লোপা নাগরে উঠবে, ভীষ হবে না। এতে কোমর লক্ষ হবে। ঠিক এই সেটএর ব্যায়াম আবার ডান পাশে কিয়ে করুন।

(৬) উঠে শুনুন সোজা হয়ে ঝাড়ান। শুধু আঙ্গুলে তব দিখে করেক পা হেঁটে আঙ্গুন। প্রতিটি ব্যায়ামের মাঝখানে এমন করে করেকবার হেঁটে নেবেন। এতে নিঃশ্বাস তড়োদ হবে আর সহ্য হিশ্রাম পাবে।

এবার এই কটি ব্যায়াম অভ্যাস করুন, পরে আরও জানাব।

বাঁওয়া। বাবা সত্যিই খুব শীঘ্র বোলা হতে চান তারা শুধু প্রোটিন হুড নিব। তাত, কটি, বিস্কুট, পাউকটি একেবারে সব বন্ধ করে দিখে লাগারিনে এক পো মাহ বা এক পো বাঁসে যান। সবজির মধ্যে আলু, বাঙালু, কুমকো, কচু এসব বাস। শাক খাবেন। তেল খি বহিষত তারা খাবেন। আর ছানা বেতে পাবেন। তবে মিষ্টি একটুও নয়। চায়েও চিনির বসলে তাকারীন যান। দই বা পাতলা দুধ যান, লব মিলিয়ে আবেদের। তাত যাবন তোলা দুধ। কলের মধ্যে কলা বাহ। দুধখি, পেঁপে, কমলা লেবু বেতে পাবেন।

সকালে ভিন্ন যান একটি আর গা। একটু বেলার কাফি যান এককাপ। কিছা চা। তারপর দুপুরে আবেগো মাহ, বা আবেগো বাসে, একটু ত্রালাড আর একটা সবজি একটু ডাল আর দই। মাংসের চবি বাহ বেবেন। বিকলে, শুধু চা, আর একটু ছানা। আবার মাঝে মাহ-মাংসে আবেগো আদ্যাক লগে সবজি আর দই যান। একমাস যদি এইভাবে খেয়ে যান,—দেখবেন, কত শীঘ্র খেদ হয়ে দিখে-রীতিমত পুষ্ট হবে উঠবেন। অথচ শরীর ভাঙবে না। তেতরে খেতে বল পাবেন। অল্পখণ্ড ধরবেন; বং পালাবে। সবগুলি ব্যায়াম কিত একসঙ্গে অভ্যাস করবেন না। সুবিধা মত বেছে নিব। যেটি সহজ মনে হয় এমন দুটি তিনটি বেছে গ্রহণে আরম্ভ করুন।

রাণীগীবিশদের নিয়ে

—মালবিকা যোষ

আমাদের দেশের স্বাধীন রাজা মহারাজারা পরাধীন ভাবতে পারেনে এমন কিছু ইংরেজ শাসকদের কিছু মোটারকম বাইরে হুগে-খাতিতেই রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলেই তনেছি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার তাদের রাজত্ব আর সেই লম্বা ভোগ বিলালের সুখ-সুবিধা খুঁচ গেছে বলেইত জানি। তাবছেন অত পুরোনো কাহুনি খেঁটে আর কি হবে?

আরে না, না। পুরোনো কাহুনিতে আমার দোত নেই। আমি নতুনের সজ্জানে খুঁচি। কিন্তু পুরোনোকে বারিয়ে নতুনকে পেতে চাইনা। নতুনের মধ্যে তাই পুরোনোকে খুঁচি। এ বছরের অক্ষর তৃতীয়ার তৈরী নতুন কাহুনিতে গত বছরের সুখ পেতে চাই।

আসল কথা—আজ যে এগুনে আমার চিন্তা বিচলিত, তাতে রাজা-মহারাজাদের কথাই বেশী মনে পড়ছে।

তু তাই নয়। তাবছি স্বাধীন রাজা। রাজা-রাণীদের ঠাই বেওয়াত চলেনা মোটেই;

তবে হঠাৎ কিছুকাল কংকন সব সুইকোড় রাণী (Queen) ও সুবরাণীদের (Princess) কোথা থেকে যে আসলেন বটেছে ভেবে পাচ্ছি না। প্রত্যাক সংবাদপত্রখানে চোখের সামনে যেনে বতলেই দেখবেন ওখানে শ্রীমতী অমৃত 'রাণীগণ' (Queen) নির্বাচিত হয়েছে। সেখানে শ্রীমতী 'সমুদ্র' সুবরাণী (Princess) গণে নির্বাচিত, এখানে শ্রীমতী 'সমুদ্র' ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমান সমাজের সুপণ্ডিত ম্যাসাজিনগুলির পাতা ওটাতেই চোখে পড়বে এক রাণী (Queen) ও সুবরাণীদের (Princess) ছবি। অমৃত এবং সমুদ্র দুনিয়ান রাজ্যের রাণী বা সুবরাণী। আর সেইমত যোগ হয় রাজাদের পাতা পাচ্ছি না। কোনও কোনও রাজা আবার বনে-বাগানে বাগানে কীদে কীদে বেড়াচ্ছে বলেও শুধর শোনা যায়। কিন্তু তাই বলে যেন ভাববেন না, এরা মুকুট (Crown) বিহীন 'রাণী'। 'বেগুন না কেমন' সুখের মুকুটটি



হাবার লটকানো। বেগুন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—খুলুন, আপনাব ম্যাসাজিনখানার পাতা ওটান। কি আশ্চর্য। কষ্ট করে শুভাবেন কেন? আপনাদের দেখার সুবিধার্থে ম্যাসাজিনের মলাটে বা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় এদের ছবি, যার জাতি সোপরি বর পর্বত থাকে। তু মা-বাধার পরিচয় দিতে বা একটু কার্পণ্য। কারণ সেটাতো নিম্নরোজন। সমাজের পরিচয়েই মা-বাধার পরিচয়।

তবে কখনও কখনও এইসব মবারাগী, রাণী ও দুবরাণীদের ভারী-স্বামী স্বাক্ষরের বহর কলাও করে সংবোধনের প্রধান পৃষ্ঠায় সর্বভারতীয় প্রধান সংবোধন হিসাবে সংযোজিত হয়ে থাকে। এটা হলো আমেরিকান টাইল। কানেন না, আমেরিকার অধিকাংশ সংবোধনের প্রধান সংবোধন হচ্ছে—না, না, রাজনীতির কড়াফাতি নয়—পছন্দ নানা ভাষায় নিম্নোক্ত কোড ও কোডমাফট। এই বসন, এক কোণার ডাচি বাপন করলেন। এই নিয়ে কথার ভার বিবাহ বিচ্ছেদ হলো। কথার তিনি নাসিং কোম বেলে খুঁতে এসেছেন। তিনি এক মাপাড়ে ক'কনের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যা মেটে যেতে পারেন। তিনি নিজে কতবার পোষাক বদলান বা চুলের কাছো (Hair style) পাটান। লারা রাজিতে উারা (পুরুষ ও মহিলা) কটা স্প্রিংপিল্ খেলে তবে উাদের গুম হয় ইত্যাদি ইত্যাদি দাবতীয় বহরে যোগাই।

মহত কোটে ক'কন স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর বিচ্ছেদ বিবাহ-বিচ্ছেদের ন'লিশ কল্প করছে, তার হিসাব।

সেই সঙ্গে আরও একটা জোর বহর থাকে; তা হলো ঐ 'রাণী' (Queen) ও দুবরাণী (Princess) নির্বাচন উৎসব এবং উৎসব উপলক্ষ্যে পান-ভোজন এবং স্রমের লগা কীর্তি।

তাই বলে 'বহরে' আমাদের বেশও কি পিছিয়ে থাকবে? সেই জন্তই বোরহর আমাদের বেশও আলকাল এ'রকমের বহর বিতরণের হেঁচোছড়ি পড়ে গেছে।

তবেই বৃহন্ন আমরা কি ভীষণ সত্যিতে এগিয়ে (নাকি) চলেছি :সেই fast life of fastest running country of the world-এর দিকে।

আজ আমার মনে প্রের মগেছে এ ছোটো কি স'র্ধক হবে? নাকি তুমি হীতা বেরীর মত লোক হাদিয়ে আইনজীবিকে বললদা বা করে বিদেশের আশ্রিত হয়ে কিয়ে বেড়াতে হবে!

কিন্তু এখনও আপনার দায়নে বিভাগনটা রয়েছে—রাণী হইতে চান ও আজই বিভিন্ন তরীমায় হোলা কটো সমেত দ্যাকাত করুন। বান—বিলম্বে বিকল হবেন। নিরাশ হবেন। আর এত লভ্য রাণী (যদিও কুমিহীন বাচ্চোয়)—বনে বাবেন মন্ড কি? চাই কি 'হুয়োরাণী' অন্ততঃ 'হুয়োরাণী' হলেই বা কম কি? তবু ত লোকে এক বাক্যে বলবে—হুয়ো! হুয়ো!



ভাববার কথা

—সদানন্দ

অনেকদিন পর সেদিন রামণন্দাবু এসেছিলেন। প্রাচীন প্রখ্যাত সাহিত্যিক রামণন্দা মুখোপাধ্যায়। গল্প-কথিত্যের সঙ্গে গোড়া থেকেই তাঁর লম্বন্ধ। অনেকক্ষণ ধরে দু'জনে আলোচনা করেছিলেন। কথায় কথায়, সাহিত্য, সমাজ, দেশ, দেশের মানুষ সব নিয়েই কথা হলো। কথা বলতে বলতে অনেক গল্পেই চলে গেলেন দু'জনে।

রামণন্দাবু গ্রামের লোক। গ্রামকে চিরদিনই ভালবেসে এসেছেন। গ্রামের মাঠা, গ্রামের পুষ্টি সব সময়েই তাঁর মনে উজ্জ্বল। তিনি গ্রামের কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন একদিন ছিল যখন গ্রামের লোকদের কত আনন্দ ছিল। প্রাচুর্যে ও স্বাভাবিক্যে মাঝে তাইর দিন কাটিতো। পরশুরের মধ্যে ভেতন সন্তান ও ভালবালা ছিল। একজনের কষ্টে আর একজন কাতর হত। কত সুখ কত শান্তি তখন ছিল গ্রামে। গ্রামের লোকেরা মনে করতো তারা যেন এক পরিবার। অত্যাচার অভিযোগ যে ছিল না তা নয়, তবে আত্মকোষ মত কারনিক নয়, আর যা ছিল তাও লুকলে ভাগ করে নিতো। কাছের কাছের কোন কষ্ট হতোনা। একজনের দুঃখ বশবশ্তে বুকপেতে নিতো। মস্তকবৎ ছিল, প্রাণ ছিল। মজা, সাক্ষ্য মজা-মজা, ভালবালা গ্রামকে আনন্দোন্মুল করে রাখতো। সে-গ্রামও আজ নেই সে-মাজুও নেই। সে-দিনের সে-সব লোকদের কোন কিছুই আজ আর মনে পড়ে না। রামণন্দাবু বলেন আবার বাবা খুব বড়লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মন, তাঁর মস্তক কত বড় ছিল সেই কথাই আজ ভাবি। গ্রামই গ্রামের অত্যাচারের লোকেরা আসতো। বাবার কাছে। বিপদ আপদের কথা বলতো ও চৈতন্য অচৈতন্য বাবার কাছে হাত পাতিতো। বাবা কটকে কখনও বিদ্রূষ করতেন না। আর বাবা শোখ কক আর নাই কক, কাটকে কখনও তাগিতও করতেন না। মজা বাবার কিছুদিন পূর্বে বাবা আনাহের বলেছিলেন যে গ্রামের অনেকলোক তাঁর কাছে থেকে টাকা ব্যয় নিয়েছে কিন্তু টাকার মজা যেন তাইর কোন তাগিত করা না হয়। বিপদে পড়েই তো তারা এসেছিল ব্যয় করতে। এখন উঠু মন, এমন উদার হৃদয় ছিল সেদিনের লোকদের।

রামণন্দাবু চলে যাওয়ার পর আমি বলে বলে ভাবছিলাম কত মন্ব ছিল সেদিনের সব মানুষ। তাঁরা লতাই মানুষকে ভালবাসতেন ও তাইর দুঃখে কাতর হতেন। অতি লম্ব ও সরল ছিল তাঁদের জীবন বাহা। কিন্তু মনটা ছিল খুব উচু। পরের দুঃখে কাতর হতেন ও প্রাণ দিয়ে দুঃখ মোচনের চেষ্টা করতেন। সেই জীবন-আত্ম, সেই জীবন-বর্ষ আমি আর পৃথিবীতে খুঁজে

শাক্ততা ধাবেনা। সেই উন্নয়ন। সেই মহত্ব, সেই মনুষ্য পৃথিবী থেকে নিষ্কৃত হয়ে গেছে বলেই আজ পৃথিবী হয়েছে এত ভরকর। সেদিনের মানুষ নিজের কথা ভাবতো না, ভাবতো পুণ্যের কথা। ভাবতো শাক্তা প্রতিবাদীদের কথা, ভাবতো দেশের ও মনের কথা, গৃহ ত্রিষ্ট ও মরিত্রের কথা। ভাবতো সর্বস্বার্থের কথা। আর এই ভাবনা তাঁদের ছিল বলেই দেশ হয়েছিল বড়, মানুষ হয়েছিল অত মহৎ আর লগ্নার হয়েছিল আনন্দময়। কোন সংকীর্ণতা, কোন মলিনতা তাকে স্পর্শ করতে পারতো না। ধর্ম, কর্ম, ধ্যান, ধ্যান, আত্মের সেবা ও সকলকে ভালবাসা এটাই ছিল সেদিনের সাধনা। এটাই গ্রাম-সিঁহে ভালবাসাই পৃথিবীকে সেদিন করেছিল মূল্যবান আলোকোজ্জ্বল আনন্দময়—স্বর্গ। আর আজ এটাই ভালবাসার অভাবই কি বিষয় কি ভরকের হয়েছে মানুষের জীবন। আজ মানুষ হয়েছে সার্বজনীন সংকীর্ণচেতা, আত্মকেন্দ্রিক। নিজের ছাড়া যে জানে না। নিজের অস্ত সে সকলকেই বঞ্চিত করে গেছে। নিজেকেও বঞ্চিত করেছে (কিন্তু সে তা বোঝে না)। তাই সে ভালবাসে না, 'মমতাকেও নয়। দেশের কথা তো হেঁড়েই দি। আর এই ভাবে গুরিরাটা চলেছে বলেই আজ কি মর্যাদিক বিতংসতা, নীচতা ও বার্থতা এনে লোককে আশ্রয় করেছে।

তবু মলাধি, তবু প্রেমকন্যা, তবু নীচতা, তবু সার্বজনীনতা, এই হল আজকের মানুষের চরিত্র। সুখ নেই, শান্তি নেই, আনন্দ নেই, আশা নেই। কেবল অস্তহীন গৃহ, কষ্ট, যন্ত্রণা ও হতাশা প্রতিদিনই মানুষকে দখল করেছে।

এই অবর্ণনীয় দুঃখবহা ও নিরাকরণ যন্ত্রণাও বিজ্ঞানটির হাত থেকে লোককে মুক্ত করতে হলে আবার কিভাবে আনতে হবে সে-দিনের মানুষকে। সেই মানুষ-বীর গ্রাম ছিল, বীর গুণ ছিল, বীর মহত্ব ছিল, বীর ভালবাসা ছিল।

তা নাহলে, বিজ্ঞানের লবল লব্ধি, বিংশ শতকের অস্তঃসারশূন্য সভ্যতা, সুবৈজ্ঞানিক বনভাগিকের নিয়ে এসিয়ে এলেও আজ আর অপগুহ্যের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবেনা।



বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস

৮৪, আন্ততৌষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

বোতল প্রত্যহ্ন সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা
ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার
সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত খোলা
থাকে। যদিবার লক্ষ্য রাখ।

একমাত্র সত্বাদিকার :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত



সাধনা অশোকরিষট

মেয়েদের মুখের হাসি অটুট রাখে

সাধনা ঔষধালয় - ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

এম. মাদ্রাসেলগাতি, এম. সি. এম.
(১৩৭) এম. সি. এম. (অগ্রহরিকা)
কালেক্টর কলেজের ওলটন পাথর
হুতপুত্রি মধ্যমিক

কলিকাতা পেস্ট
ডাঃ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
এম. সি. বি. এস. কলিঃ
আত্মনিয়ন্ত্রণ



পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের
আধার



লক্ষ্মীঘি

বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত খাদ্য



ছত্রপতি শিবাজী



স্বামী লিবেকানন্দ



রাজা রামমোহন রায়



স্বামী অষ্টদানন্দ



লোকমাজ বাসুদেবের ভিলক

গল্প-ভারতী

ত্রয়োবিংশতিতম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ :

জাতীয়তাবোধের জন্মকথা

ক্যাস্টরল

শুগলী ক্যাষ্টর অয়েল



স্বাস্থ্যাজ্জ্বল ঘন কেশত্রীর জন্ম

রুচিবান ব্যক্তিমাজেই, কি নারী কি পুরুষ,
ব্যবহার করেন ক্যালকেমিকোর ক্যাস্টরল,
কারণ তাঁরা জানেন ঘন কালো,
কেশবর্ধনে এর তুলনা নেই।



সমস্তকারক ই
সি ক্যালকটাই কেমিক্যাল কোং লিমি
লিকাতা-৭২



গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

আগষ্ট ১৯৭৪, AUGUST, 1967

চতুর্থবিংশতি বর্ষ—২য় সংখ্যা



প্রতি সংখ্যা—এক টাকা

বার্ষিক পনের টাকা

সম্পাদক

শৈলজামল মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রিন্টিংয়ে কল্যাণ রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী দারিত্র্য সনন প্রাইভেট লিমিটেডের নকে
২১০ বি, চিত্তরঞ্জন-এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত।
২, শিবনাথবাসী রাস্তা, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

॥ বাংলা দেশকে জানুন ॥

জেনারেল প্রিন্সাস চ্যাণ্ড পারিশাস প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

'ভারতত্ত্ব-ভাষক' আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত

বাংলা দেশের ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ) ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত (মধ্য যুগ) ১৯০০]

অসংখ্য চিত্রসম্বলিত একমাত্র নিউমোশা ইতিহাস

: কয়েকটি অভিমত :

- ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "All these things make your book one of the most important publications for the study of the history and culture of Bengal..."
- লর্ডো বিবিসিয়ার ও ঢাকা বিবিসিয়ার ইতিহাস-বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক-প্রধান ডাঃ কালিকারজ্জ্বল কানুঙ্গো বলেন, "...এই ইতিহাস কেবলমাত্র ছাত্রদের জন্য লিখিত হয় নাই ; ছাত্রের শিক্ষক এবং পিতা-পিতামহ তথা শিক্ষিত বাঙালীরাই এই ইতিহাস পড়িয়া লাভবান হইবেন ; মাদ্রাস পরশাদের বাম্বীও ইহার মধ্যে ব্যবহার্য নূতন আলো পাইরাছে ।..."
- শাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সীতার ডাঃ বি. পি. মজুমদার "Searchlight" পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "...The publisher is to be congratulated for the excellent printing, beautiful reproduction of photographs and above all for publishing the finest re-assessment of the medieval history of Bengal in modern times..."

জেনারেল বুকস্

৫-৯৯, কলেজ স্ট্রিট বার্কট

কলিকাতা-১২



My day long companion

Lovely Lord's Sweets, filled with Jelly, Chocolate, Cream...that get into your mouth and tickle.... make you want to eat a jar a day.



Lord's

Sweets & Toffees

JAMES LORD & SONS LTD. CALCUTTA-1.

এই সংখ্যায়

मण्डलान्तर्गत

ବାହ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ

ভবিষ্যৎ কথা

ସ୍ୱର୍ଗତ ସହାୟତା (କାର୍ବନ)

বঙ্গ। বঙ্গ। (উপস্থাপ)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত





উজ্জ্বল প্রীতি আলোকিত জীবন

অসংখ্য দিনের লাইট ল্যাম্প সকল ও বিদ্যুৎ আলোকিত জীবন
আপনার ঘরে অসংখ্য আলোকিত জীবন ফেলে। অসংখ্য
দিনের লাইট-এ ফেলে আলোকিত জীবন। অসংখ্য আলোকিত
জীবন আপনার জীবনকে আলোকিত করে-আলোকিত জীবন
আপনার জীবনকে আলোকিত করে।

Osram

একটি আলোকিত জীবন

৪৫৫

আপনার
প্যারাডি

OSRAM

OSRAM is a registered trademark of Osram AG, Munich, Germany.

গল্প-ভারতীর প্রিয় লেখক অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অসংখ্য গ্রন্থ বহুপ্রশংসিত রচনাগুলি ॥ সত্যপ্রকাশিত ॥

চার্লি চ্যাপলিন	৩.০০
গল্প-ভারতীতে প্রকাশকালে যে রচনা পাঠক- মণ্ডলে বিপুল চৈতন্যের সৃষ্টি করেছিল।	
যাত্রা হ'ল স্তম্ভ (উপন্যাস : চলচ্চিত্রে রূপায়িত : ৩য় সংস্করণ)	৩.৭৫
অবশেষে রূপে (বিদ্যুৎ বিচিত্র সংগ্রহযোগ্য রচনা কাহিনী)	৩.৫০
বীরবল রায় (আত্মজীবনী সত্যের বীরবলের বিশ্বকর্ষক বুদ্ধিমত্তার আত্মকাহিনী)	৩.০০
জাতিবাদের পরশমণি (উপন্যাস)	৩.০০
পূর্বাপর (গল্প)	২.৫০
বিদ্যোপাস্ত (গল্প)	২.৫০
হে মহাজীবন (সন্যাসীদের গল্প)	৩.০০
সুজিত প্রদীপ (রহস্য উপন্যাস)	২.৫০

ভারতের দুর্ভিক্ষ ও কালভাতি (ছোট গল্প উপন্যাস একত্রে)	২.০০
মার্সাল ও মরণভিত্তিক ()	২.০০
কালো করাল ছায়া (গল্প)	১.৫০
ভিন্ন মর্গ (পিমানবেশে, মল্লোয়ার, জিন্দগিয়ার্গ। (নাটক)	২.০০
নবনাট্যরূপে গল্পচিত্রের : মার্সাল (নাটক)	২.৫০
নবনাট্যরূপে বিজয়লাল দাসের গ্রাম প্রভৃতি (নাটক)	৩.০০
Carey's Good Old Days (সম্পাদনা)	১.৫০
Glimpses of the Olden Times (সম্পাদনা)	

: যন্ত্র :

কেদারী সাহেবের কলকাতা (কোম্পানী আমলের কাহিনী-রূপে গল্প-ভারতীতে ক্রমাগত প্রকাশিত)	
Echoes from Old Calcutta (সম্পাদনা)	

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্থাৎ পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি অংশবিশেষে লেখক সরবরাহ করা হবে। যে-কোন
বাংলা বই-এর ভগ্ন পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রাহক-গ্রাহিকারা গল্প-ভারতী কার্যালয়ে লিখতে পারেন। আদ্যবধি সী
মার্ত্তি বিভাগ উদ্দেশ্যে লব্ধভাভাবে সাহায্য করবে।

গল্প-ভারতী কার্যালয় :

২৭২বি, চিত্তরঞ্জন আভ্যে, কলিকাতা-৬

এই সংখ্যায়

- বোরখা (গল্প)—মনোজ গুপ্ত
মিস্ট্রীলাল " —মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বৌদি " —মিহিরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
মেলায় —নির্মলেন্দু গৌতম
ন' লাথ টাকার মাতৃজ্ঞান—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেগমল-ভূকেশ্বরের নিত্য পরিচর্যা

হিমালী দ্বিসারিত সাবান

নির্ভূত ও মন্থন স্বক সৌন্দর্যের
মাপকাঠি। বছরের প্রতিটি দিনেই
এর পরিচর্যা করা উচিত। উপযুক্ত
উপাদানে প্রস্তুত হিমালী
দ্বিসারিত সাবান স্বক লাগনা
ও মন্থনতা বাড়ায়।



হিমালী
প্রাইভেট লি:
কলিকাতা-২



। কারকটি সাম্প্রতিক প্রকাশন ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের এয়ার প্রিয়শ্বদা

বিভূতিভূষণের সঙ্গাধীন অভিনব উপক্ৰাস "এয়ার প্রিয়শ্বদা" মহাকাব্য বাসিলভাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলা"র সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে এই আধুনিক প্রেমোপাখ্যানের তিন স্তর। (মিশ্রনাথের ডায়াব ও কী মাসকেটিয়াস, অর্থাৎ শকুন্তলা, প্রিয়শ্বদা ও অনন্যাস) বহন, মিশ্রনাথ ও অনন্যাস চরিত্রসমূহ নিকারো নায়ক লোকের মিশ্রনাথকে নিয়ে এক আকর্ষণীয় পরিবেশের মধ্যে পোস্তনা-করা বহনের বিভিন্ন চরিত্র ও নিবাসের উপভোগ্য কাহিনী কুটিলে তুলেছেন স্থপতি শিল্পী বিভূতিভূষণ তার মনো লেখনীতে। ●মূল্য : ছয় টাকা●

বুদ্ধদেব বসু

মাত্র ভায়ে বৃষ্টি

একটি নিখুঁত রূপস্বরূপে আছে এক অস্বাভাবিক বিদ্যায় পাণ্ডাশালি ভয়ে মনে-মনে যা ভায়েছে, তাই দিয়ে কাহিনী বহুদূর বহু ভয়ের সমস্ত বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার কাহিনী যত তুলেছেন অতি হৃদয় হারিয়ে, পরতে পরতে তাদের মন দুটিতে মিলে হয়ে। বাস্তবতার দর্শন মনস্তত্ত্বের উপক্ৰাস বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম।

●মূল্য : পাঁচ টাকা●

ভবানী মুখোপাধ্যায় অর্নবিত

জার্মানীর ছোট গল্প

যে জার্মানীর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি বিশেষ দৃষ্টকণে প্রচণ্ড পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে তার সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ছোট গল্প বিস্তারিত মহাযুদ্ধের কালে। ১৯৪৫-এ, যুদ্ধের অবসানে থাকা গেল, শুধু জার্মানী নয় তার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। মহা জার্মানীর সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধারের অবসানে খটল যুরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে যে ছোটগল্পের বিশেষ গুরুত্ব এসেছিল তার। মনুস দূরের লেখকের রচনায় পাওয়া গেল এক হৃদয় মনোবৃত্তি-বোধের পরিচয়, যার ক্ষেত্র খাঙে-চাপানে যুদ্ধের অভিশাপের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুগ ও বলিষ্ঠ প্রকাশন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যুদ্ধের গণতান্ত্রিক জার্মানীর কয়েকজন প্রতিনিবিশ্বাসীয় লেখকের ছোট গল্পকে, যুদ্ধের মারুৎ অগ্র রেখে, অগ্রবাহ করেছেন লক্ষ্যবস্তিতে অগ্রবাহক ভবানী মুখোপাধ্যায়।

●মূল্য : ছয় টাকা●

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪, বঙ্কিম চট্টোয়া স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

ইংরেজী কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ

Nimbus PUBLICATION
A POCKET BOOK
OF SPOKEN ENGLISH

By N.B. DAS



Nimbus PUBLICATIONS
23, LATIPAT ROSSARY LANE, CALCUTTA

। সাহিত্যের খবর ।

পল্ল-ভারতীতে দ্বারাধিকভাবে একাধি হওয়ার কালে যে-সেবা পাঠক-পাঠিকা মনো মজিকারের চাহিদার সৃষ্টি করেছিলো— মালের পর মাল করে যে-সেবাকে লক্ষিত করে বাংলা সাহিত্যের পাঠককূল অনেক অনেক চিঠি পত্রের আদান-প্রদান করেছিলেন বনামতর সাহিত্যিক এবং সম্পাদক উপেক্ষা নাহা মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি সেই সৃষ্টি-স্বপ্নিত কাহিনী :

অমিতকুমার ভট্টাচার্য

একজন আর কয়েকজন

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

আপনার লাইব্রেরীর জন্য আজই অর্ডার দিন।

। ডি. এম. লাইব্রেরী ।

৪২নং বিধান সরনি, কলিকাতা-৬

এই সংখ্যায়



বিশ্ব-সাহিত্য—

অপ্রত্যাশিত যুদ্ধবিরতি—মূল : এফ. ডিনাচেন—ভাষ্যান্তরন : মিতাই সাহাৰাট	১৬২
প্যারিসের নীল দাড়ি (রোমাঞ্চকর কাহিনী)—সৌদীশংকর দে	১৬৫
মাউসক—রত্নাকর	১৬৯
জায়াবানী—চিত্রমিত্র	১৭৬



**NATIONAL RUBBER
MANUFACTURERS LTD.**

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED
AUTOMOBILE TYRE COMPANY

**THE HOUSE OF
NRM**

THE LARGEST MANUFACTURERS
OF INDUSTRIAL RUBBER
PRODUCTS IN INDIA



**Inohet Tyres
Limited**

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.;

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,

Ex-Law Member, Govt. of India



আমি 'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করে দেখেছি
সত্যই ইহা বিকৃত ও বাত্যাগ্রহ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করে দেখেছি এটা ভাল
জিনিস।

শ্রীতুবারকান্তি ঘোষ

সম্পাদক—অনুভবাকার পত্রিকা।

'লক্ষী ঘৃত' ব্যবহার করিয়ায় সুযোগ হইয়া-
ছিল। ব্যবহারে পরিকল্প হইয়াছিল। এই
ভোজনের বাজারে এরূপ বাটি ও সুখাদ্য ঘৃত
পাওয়া শৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি।
এই ঘি বাজার চুল্লি উৎকৃষ্ট ঘূতের অন্ততম,
অনসাধারণ স্বাদে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ সুবোপাধ্যায়

সম্পাদক—বৃন্দাবন

'লক্ষী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার
প্রসিদ্ধ সাধারণ ঘূতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে
ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া
যেখানে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন
আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।
বিকার বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি,
ইহাতে প্রকৃত বাত্যান্নির আদ ভাল ও
সুগোচরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়—

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণ

বেলাতলা—ঐতিহ্যবাহিনী

চলতি স্থানীয়



আপনার কেশজঙ্ঘ
দীর্ঘ সুন্দর কর
আপনাকে রূপ-লাবণ্য
উজ্জ্বল করাব
বেঙ্গল কেমিক্যালের
স্বাস্থ্য

তিল তৈল

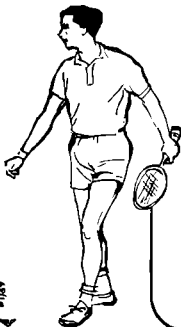
বেঙ্গল
কেমিক্যাল
ফিলিটাস • বেঙ্গল
কাম্পানি • লিমিটেড



পাইওতীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের
উপযোগী।

স্ট্রেচিং • সেবাইব • রেশমী • লাতসি •
পাইওতীয়ার কুল • লাইট আই •
'সিলভার আই' • 'ডাইটেক্স' • সিঅফিস
সুপার মাসিটেক ও ইন্টারলক প্রভৃতি
বিভিন্ন জ্যাগ-এর পাওয়া যায়।



* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেবিস সার্ট • চেন সার্ট •
ড্রয়ার ও ব্রীক প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্ভবত প্রণালীতে
যৌত ও প্রস্তুত।

পাইওতীয়ার তিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওতীয়ার বিল্ডিং, কলিকতা-২

॥ এই সংখ্যায় ॥

মেয়ে-মজলিস

বিকল্প খাত ব্যবস্থায় মেয়েরা—বেলা দে

খাওয়া বদল—হাসি ভট্টাচার্য্য

বিকল্প খাত—আভা পাকড়াই

বেলনা শুধু বেলনা নয়—তদিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয়তাবোধের জন্মকথা—



উজ্জ্বল চাঁদমা
ইলেক বাতাস
স্বাভাবিক জলে মলে পড়ে

সুসমা

সি. স্টেট এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

এবারের শারদ সাহিত্যের
সর্বশ্রেষ্ঠ অৰ্ঘ্য

গল্প-ভারতী

অভিন্নব পরিকল্পনায় সম্বদ্ধিত। শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকার রচনায় সমৃদ্ধ।
বহু নতুনতর চমকপ্রদ বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ।

॥ চারিটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ॥

॥ একটি নাটিকা ॥

॥ কুড়িটি ছোট বড় গল্প ॥

তা ছাড়া

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ—

তিমতি সচিত্র সংকলন

॥ যুগে যুগে রূপসাধনায় নারী ॥

॥ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রতারকা ॥

॥ রসমাধুর সেকাল একাল ॥

এই বিরাট অনুল্লীর্ণ গ্রন্থের দাম মাত্র চার টাকা।

ভাণ্ডার মাসিক ৭৫ পয়সা

একচেটপন অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে

সংগ্রহ অর্ডার বুক করুন।

গল্প-ভারতী

১৭২বি, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা—৬

ফোন : ৫৫-৩২৩৪



ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

আগুনখোলার কাছে রামচন্দ্রপুর ছোট একটি গ্রাম। এই ছোট গ্রামে বড় একটি মাহুকে বেবেছি। বড় মানে আকারে প্রকারে লম্বা চওড়া বড় নয়। মাহুটি বেবেতে ছোট, কিন্তু তার গুদায়টি বৃহৎ।

এমন গুদায়বান মাহুই আমি খুব কমই বেবেছি।

রামচন্দ্রপুরে 'বিজয়কৃত্য আশ্রমের' প্রতিষ্ঠাতা অশীমানন্দ।

অশীমানন্দই বটে!

সব সময়েই বেপি—আনন্দে অবীর।

কিসের এত আনন্দ?

বেপানে হুণে গৈত্র হাফাকার, মাহুই বেপানে আর্ন্ত এবং অসহায়—সেইখানে অশীমানন্দ। দৃষ্টিহীন মাহুই বেপানে একান্তভাবে পরনির্ভর, অর্থাভাবে বিপন্ন, কণর্দকহীন মিলন অশীমানন্দ এগিরে গেল তাদের হুণে দূর করতে। ক্ষুদ্র সেই গ্রামের ভেতর প্রতিষ্ঠিত হলো স্মৃৎক এক চতুর্ভুজিকংসালায়। দূর-ব্রাহ্মণের দৃষ্টিহীন অন্ধ মাহুই এলো অন্ধকার হাতড়ে। দৃষ্টি কিসের লাবার কোনও আপাই হানের ছিল না। তাদের প্রত্যেকেই কিসের পেলে তাদের হারানো দৃষ্টি। আনন্দিত মাহুই অশীমানন্দকে বিয়ে গেল তাদের আনন্দের আগে। দিগ্রে গেল অক্লান্ত আধিরায়!

এ বৎসর এনেছে এক নিদাক্ষণ সমস্ত।

এক দৃষ্টি অন্বেষ লভ ওষ্ঠাপতপ্রাণ মাহুইয়ের আর্ন্ত ক্রন্দনজনি বিচলিত করে তুললে। অশীমানন্দকে।

ভিক্ষা লবল অশীমানন্দ বরা ভিক্ষা করলো মাহুইয়ের বরবাধে।

বরা বেবে এলো অকণ্ড বারহে। কোন্ অক্লান্তলোক থেকে নেমে এলো তার লঙ্ঘান আনন্দো তুই সেই আনন্দহৃদয় মাহুইটি।

মাহুইয়ের হাত বিয়েই অশীমানন্দের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে দিলেন তিনি। রামচন্দ্রপুরে বোলা হলো অল্পসন্।

হাওয়ার বাক্যের ক্ষুধার্ত নয়নারী পেল তবের ক্ষুধার অম।

পেতে হবে আরও তিন চার মাস। এই নিমগুলি নিমজ্ঞ অত্যাধার দিন। প্রবাহ আছে—

এই সময় নাকি রাজার ভাতার খালি হয়ে যায়।

তবু দেখি হাদিসুখে এগিয়ে চললে অসীমানন্দ।

তার হুসারনের দীপা নেই।

হুসারসই ব্য বসি কেন?

নয় ও নারায়ণে তার জলন্ত বিশ্বাস।

বলে, মাহুদ হবে। না মিছে থাকতে পারবে না। দেবার অস্ত্রই সে করেছে। দেবার
কৃত্ত নয়।

ভালবাসা পেতে যত না আনন্দ, ভালবাসা মিছে আনন্দ তার শতগুণে বেশি। লোকে বলে
মাহুদ আর্ষণ্য। আর্ষণ্য এবং পরার্থপর দুইই।

মাহুদ আর্ষণ্য হয় আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে।

পরার্থপর হয় আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে।

আত্মপ্রকাশই মনুষ্যের প্রকাশ।

আজ মাহুদের এই চরমতম দুদিনে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন সেইরকম পরিত্রস্তারী মাহুদের একটি
প্রয়োজন, যে মাহুদ প্রয়োজন হলে দুই অসহায় এবং বিপদের কৃত্ত জীবন পর্যন্ত বিলম্বন দিতে পারে।

শ্রীমদ্রামানন্দ গুপ্তাশ্রী

বাইশে শ্রাবণ

আমাদের জীবনে বাইশে শ্রাবণ একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিন বাংলার কবি ভারতের কবি বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ মহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তিনি যে অকুরন্ত সম্পদ আমাদের দিতে গেলেন তার মধ্য দিয়ে তিনি চিরকাল আমাদের মধ্যে থাকবেন। আমাদের প্রাণের সঙ্গে চেতনার সঙ্গে তিনি অনিচ্ছাজ্ঞ বাঁধনে বাঁধা আছেন। বেঁচে থাকবেন চিরদিন। এই বিশেষ দিনটিতে তাঁকে স্মরণ করি মননতচিন্তে আবগাহপিত প্রদ্যায়। আর তাঁরই বাণী দিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাই :

ইঞ্জের ঔর্ধ্ব নিয়ে, যে বহির্জী, আছো তুমি ছাদি
ত্যাগীয়ে প্রত্যাশা করি, নির্দোষের সঁপিতে সন্ধান,
দুর্গমের পথিকের আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের ভক্ত সিংহাসনে। হৃদ্য হারা, লুপ্ত হারা,
মাংসপরে হৃদ্য হারা, একান্ত আত্মার গুণীহার।
অশ্রুমেঘ প্রাচুর্য, আবর্জনাযুক্ত তব ঘেরি
কীমৎস চৌৎকাহে তারা বাত্মিন করি ক্ষেপকেতি,
নির্লজ্জা হিংসার কণ্ঠে হানাহানি।

লোক যদি সাহিত্য চাইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার অস্ত্র কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইহুদ মাস্টারির তার লগ্ন নাই।— যদি কালিদাসের কথা ভালো হয় তবে লক্ষ্য হাহুকের অভ্যুত্থান। সকল কালের সাত্ত্ব্যে লক্ষিত হইল, আশঙ্কের সাধারণ হাহুয় হারা বৃদ্ধিল ন! কালকের সাধারণ হাহুয় হরতো তাকা বৃদ্ধিবে... কিন্তু কালিদাস যদি কবি না হইত। লোকবিতৈরী হইতেন, সেই পক্ষ লক্ষ্যাত্মীর উচ্চাচিনীর কৃপাধরের অস্ত্র হরতো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন।

সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কল্যাণিত্যই প্রকৃতির বখাবণ অস্ত্রভরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যেককে আদর্য প্রতীতি করি, সাহিত্যেও এবং ললিতকলার অপ্রত্যেক আমাদের কাছে প্রতীয়মান।

ভাববার কথা

—সদামসহ

অন্ধকার। দুটোটে কয়টি অন্ধকার। বেন প্রলয়-লঙ্কা ঘনিয়ে এসেছে পৃথিবীর বুক হৃৎ। কেবল হাতে হাতে ভাপসা কী হেথা বাজে। চারদিকে একটা অস্বাভাবিক বসন্তের তাপ। চোখ বপ্তে ভালো করে তাকাতোই দেবদুয় মাটি থেকে হাত করে উৎপন্ন এক দিরাট, বিশাল দারা অবস্থ। একপ্রান্ত থেকে অল্পপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত কালো বস্ত্রে আবৃত। অন্ধকারে চোখ ল'য়ে যেতেই আরো চোখে পড়ল বেন একটি পর্বতার ঠাঁয়ে নিজে চলেছে অলপন নর-নারী, অলপো বুক-দুয়তী নীরবে, নিশ্চেষ্টে। বীর-বীরে এসিয়ে চলেছে যৌন মিছিল। অন্ধকারের রক্ত-রক্তে কী এক অনুরীতি আতঙ্ক। তবে অস্থির হ'য়ে বানিককণ চোখ বুজে প'ড়ে রইলুম। আধার ঘন চোখ বুললুম দেবদুয় হস্তদুয় বুট চলে কেবল হাতের আঁঠু হাতের। লক লক কালো শিঁগড়ের মতো এক অস্তরীন মিছিল। এক বিশাল অন-সমুদ্র বেন সানিয়ে নিয়ে চলেছে ঐই ভয়ঙ্কর পর্বতার।

হস্তদুয় হ'য়ে কেবলি ভাবছি এ কী দেবচি! ইচ্ছা হল চিংকার করি কিংবদন্তি কথ। বেল না। কাকেই বা কিংবদন্তি করি? এর মধ্যেই ভাবিয়ে দেবি রাক্ষস, বাক্তি-বর, অন-সমুদ্র। পর্বতার ঘন আরো অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে। যে-দিকে তাকাই কেবল অন্ধকার, আর অন্ধকার। বেন নীচাচীন অন্ধকারের ডেউ বারবার এসে ভেবে পড়ছে অন্ধকারের উপকূলে।

তবে শু আপড়ায় আবার চোখ বন্ধ করতে হল। কেবলি ভাবছি এ কী দেবচি! কী এই পর্বতারের পরিচয়? মনে জোর এনে আবার তাকালুম। সেই একই দৃশ্য। সেই অন-সমুদ্র। নিভৃত, নীরব বীরগণের ঠাঁয়ে ক'রে নিজে বাজে দিরাট পর্বতার।

উপেক্ষের অজ্ঞ নেই, আতঙ্কের পেয় নেই। শুধু লাক্স ত'রে চিংকার করলুম: “ও-কার মুক্তবেহ? কোথার নিয়ে চলেছো?” জনতার কাছ থেকে কোনো উত্তরই এল না; বেন শুধু বাক-পজিহীন। তবে অন্ধকার তের ক'রে বেন এক বৈষম্যবাহী কানে এল: “মহুত্বের মুক্তবেহ, তুমি জান না, মহুত্বের অপসুত্ব। হেছে?” সেই বাণী এত জোরে আমার কর্ণহরে প্রবেশ করলে যে আমি অটোভক্ত হ'য়ে বিহানার দৃষ্টিতে পড়লুম।

বহুকণ পরে চেতনা ফিরে এলে উঠে দেবি দিবেশ আলো ঘরে প্রবেশ করেছে। তবে, কৌতূহলে বীর-বীরে আসলাম। বুলতেই চোখে পড়ল প্রতিদিন যেমন দেখা যায় আমণ্ড সেই একই

পুত : অগণিত মহ-মাত্রী চলেছে পব দিয়ে । কোলাহল সুবর্ণিত পৃথিবী । একইভাবে চলেছে মাহুয় ।
তাদের চাল-চলনে কোনো টেবলের চিলক নেই । কোন পরিবর্তনই নেই । যেন কিছুই ঘটেনি ।
যেমন নিবিড়তার ভেতনি চলেছে । তবে কি কিছুই হয়নি ? একটু আগে যা ,ববেছি সে কি শুধু চঃস্র ?
সে কি মিথ্যা ?

আবার কানে এসে সেই অশ্বীর্ষী বাক্তি : “না, এ অশ্রু নয়, মিথ্যা নয় ! সত্য, অশ্রু সত্য ।”

তবে এরা কারা ? এই বারী কোটি-কোটি লগোয় চলেছে পব দিয়ে ? মেয়ে-পুরুষ, ছোট-বড়
শিশু-বুড় ?

সবে সবে উত্তর এসে : “এরা মহত্ত্ববাহীন মাহুয় ।”

অনেকক্ষণ মনে-মনে ভেবে দেখলুম সে কি তাও কি হতে পারে ? কিছু পবকণ্ঠেই মনে হলো, না
শক্তি বলেছে, এ সত্য কথা । শক্তি মহত্ত্বের সূত্রা রয়েছে । তা নাহলে আজ সারা পৃথিবী ছুড়ে
দুর্নীতির এমন তাকবলীলা ? মাহুয় থাকলে তা কখনও হয় ! আজ সত্যতা নেই, আন্তরিকতা
নেই, বিশ্বাস নেই, নীতি নেই, ধর্ম নেই, আদর্শ নেই । আছে শুধু বার্ষণ্যতা, বিবাহ, কর্তব্যাহীনতা,
কণ্টতা, অকৃচ্ছতা, গাণ্ডিকতা, অস্বাঃ-অবিচার, মিথ্যা, নিষ্ঠুরতা, কুটিলতা, হিংসা । মহত্ত্বের অভাবে
যাদের অঙ্গ হয় সেইসব মাহুয়ত্ব ব্যাধি ।

হলতে পারেন এমন কোন শক্তি আছে পৃথিবীতে যা আজ মাহুয়কে এইসব স্রবকের ব্যাধির
হাত থেকে বাঁচাতে পারে ?

ଦୁର୍ଗତ ସହାୟତା



ଭିକ୍ଷାସ୍ଥାନ ନୈବ ଚ ନୈବ ଚ ।



দ্রব্যমূল্য

কে কোথায় যাচ্ছে,
বাঁচাও। বাঁচাও॥



দেশের কাজে—বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

বন্যা কন্যা

অষ্টকুমার সেনগুপ্ত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[পূর্বকথা : সরসিঙ্গ বহুবাজারের মেয়ে বনছায়া । বাপ বড়লোক বওয়া সবুও বনছায়া চাকরি করে, পর উপগ্রাস পেখে । বড় সাহিত্যিক হবার যশ পেখে । কখনও বা ভাবে কান্টালিস্ট হই যেহেতু আত্মকাল সাহিত্যের চেয়ে কান্টালিস্টমেই বেশি প্রাধান্য । সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই বহরম-বহরম করে । সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে পরিষেবে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাসে বিশ্বাস করে না । বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপত্যালিককেও ভালোবাসে । তার নাম সখীপ সেন । কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উদ্ভাস, সখীপ পাছাদের মতই বীরহির । সখীপও হুঃ কিন্তু আত্মনিষ্ঠ । হারিত্রা যেন তার অ'লর্গকে রান করতে না পারে সে লম্বাছে লম্বা । সখাপ । সরসিঙ্গ মেয়ের অন্তে হিম্মতে বোল নামে এক কুতী এজিনিয়ার ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয় । কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এম্বিরে আসবে ? সখীপ না সুবীর ? না, বনছায়া খেব লম্বা হিম্মতেকেই বরণ করবে । হিম্মত্তের বহু আর মুকুটি বেবকোয়টি ভৌমিক, যে অকিলে বনছায়ায় বল, তার লুটিও না কোন বনছায়ায় নিকে । বনছায়া প্রেমের অন্তে তেরির মাটি করবে, না কেরিরের অন্তে প্রেম ?

অতঃপর সরসিঙ্গের বাড়িতে টি-পাটিতে নিমন্ত্রিত হল হিম্মতে । বনছায়াকে পাজী হিসাবে বনোদীত করল । তার কার্ণে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে । সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিম্মতে, সুবীরকে চাকরি দিল । সুবীর তাবতেই পারেনি এমন অবটন ঘটতে পারে । আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের বোচিপ দিল বনছায়া । এ ব্যাপারে হিম্মতে অতকারে ।

হিমাতের সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের ঘোষণা
অন্তে সুবীণের সঙ্গে বিয়েটা বিবিয়ে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাতের
কাঁচ থেকে মিথ্যা অনুভূততে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে মিল বনছায়া। সরসিঅবাব
জানেননি হিমাতের নিজের সুবীণের সঙ্গেই তারিখটা লম্বা করছে। এমন বনছায়া
তবু তার আগেই সুবীণের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।]

॥ সন্ধ্যা ॥

বনছায়া কেবলই মনে হচ্ছিল এগারো তারিখটা আর এল না বোধ হয়। এ বেশ কমেডেরড
সেলে বলে টানির মিন গোনা।

কালিক ভো একবিশেষে মুক্তিই। যত শিগগির চুকে যায়।

বনছায়া কেবলই মনে হচ্ছিল এতট মধ্য কিছুর একটা ঘুঘুনা না ঘটে যায়। হঠাৎ
পহরময় হাল। পুরু হয়ে গেল, নরতো এম্ব-বেড, নরতো, ভগবান না কখন, কোনো পাক্তে আত্মীয়-
বন্ধন বেরিকের মত হয়ে গেল কট করে। একটা প্রচণ্ডতাপ্ত ভূমিকম্প হতে পারে না? তাহলে
যে কলির কলকাতাটা নিশ্চিত হতে পারে তলিয়ে। সমস্ত গর্ভবহুগির অবদান হয়।

কিছু না, শুটি শুটি পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেল হিমাতলি। এগারোই তারিখটা তোয়ের
আলোর আনন্দ দিয়ে উঁকি মারল। কি গো, যুগ তাকল? উঠবে না? একটু লাগলো কতবেনা?
এম্বি কি! এবেনা তো কয়েক বকী থাকি। কয়েক বকীতেই তো কত কিছু ঘটে যেতে

অকিসের মার হয়ে বেশ আগে-আগেই বেফল বনছায়া। বাই তাকাতাকি সুবীণকে বহি গে।
আজকের প্রথম আলোর একে নতুন করে দেখি। হঠাৎ প্রথম করে।

সরকার তকাতা অমেককণ হয়ে মড়ল বনছায়া। জানলা দিয়ে সুব বাড়িয়ে 'এই' বলে
ডাকবার লগ্ন ময় এমন। গেলে একটা শাঁখ বাজাত। নরতো ব্যাপগাইল।

'কুঁহি এবেনা বিছানার পকে আছে?' সরকারটা বুলে দিতেই বনছায়া কোলাহল করে উঠল।

'আজকে একটা বেড লেটার ডে, কী হলো, তাই না?' সুবীণ হু বাহর তরফে বনছায়াকে
নিমজ্জিত করল : 'আজ বিছানাতে একটানা গুয়েই সেলিড্রেট করব। কী হলো?'

একটু বুকি ঘেরি করেই ছাড়াম মিল বনছায়া। বললে, 'সে কী, অগিল বাবেনা?'

'না, ছুটি নিরোধি।'

'সে কী, নতুন চাকরিতে চুকতেই ছুটি?' একটু বুকি বা তহ-তহ তাব করল বনছায়া : 'পেনে
বল না চটে যায়?'

'না, না, বল খুব ভালো। একটু বুকিয়ে বলতেই ছুটি দিয়ে মিল।'

'বুকিয়ে বলতেই মানে?' বনছায়ায় কণ্ঠে ঘোরতর উবেগ ঢাক।

'বুকিতে বলতেই মানে তোমাকে যেই এক টুকরো ব্যবসা করে মিলাম, বল্ অমনি ছুটি মজ্ব
করে দিলেন।' সুবীণ গ্রাহ করেই জানলে হোসে উঠল।

‘একটুকরো বাবসা মানে ?’

‘একটুকরো বাবসা মানে এ পিল অব বিকনেস। বাপাহটা কী হল যোহো !’

তখনো বুঝে, প্রায় কষ্ট নিখাসে বনছায়া গ্রাসীকা করতে লাগল।

লম্বুনের বুঝে বলেই ছুটি নিতে চাচ্ছিল সুবীর, কিন্তু লক্ষ্যমোহা পরামর্শ দিল, নিশিত দরখাতই সমীচীন। দরখাতে লিপল অম এ পিল অব বিকনেস-এ বাপাহত থাকবে বলে এগারো। তারিখে ছুটি চাই।

দরখাত পেতেই হিমালয় সুবীরকে ডেকে পাঠাল।

সুবীর ত্রস্ত, হুটিত পায়ে ঘরে ঢুকল। ‘ভাবল দরখাত ইংরিজিতে লিখতে গিছে কোন তুল করেছে নাকি ? বাংলায় তুল করলে বহু পর্ব করে বলা যায় এটা আমার সজ্ঞান নিমিত্তি, কবির স্বাধীনতা, কিন্তু ইংরিজিতে তুল বেরলে কোন বেন বোকা-বোকা দেখবে।’

‘পিল অব বিকনেলটা কী ?’ পক্ষীর বুঝে জিজ্ঞেস করল হিমালয়ে।

‘বিষে, ভ্রাতা।’

‘বিষে ?’ নিজেই মনেই হাসল হিমালয়ে : ‘বিষে একটা বিকনেলই বটে। সেই বিকনেলটাই দরখাতে পাঠ উঠবে করম।’

তাই করল সুবীর। আগামী এগারো তারিখে বিষে অস্ত্রের একদিনের ছুটি চাই।

নতুন দরখাতে চোব দুসিয়ে হিমালয়ে জিজ্ঞেস করলে, ‘একদিনেই হবে ?’

‘একদিনেই বটে, ভ্রাতা।’ বুঝে একজন বাবা বিবীত কর্তব্যপরায়ণ কেরানির তালি করল সুবীর।

‘দাসিধিয়ে তুলখো—’

‘সমস্ত একদিনে, ভ্রাতা।’

‘তাহলে একদিনের গরাক।’ হিমালয়ে বুঝি একটু লক্ষ্য চোবে তাকাল : ‘কি, রেজিস্ট্রি বিষে নাকি ?’

‘হ্যাঁ, ভ্রাতা, ওতেই কম বরত। গরিব কেরানি—’

হিমালয়ে আর কথা বলল না। অধীনস্থ কেরানি কাকে বিষে করছে এ প্রশ্ন ওঠে না। এক দিনের প্রাবিত ছুটি বহুই করে দিল।

‘কার লগে বিষে হবে জিজ্ঞেস করলেম।’ বনছায়ায় ঘরে চাপা অস্থিরতা হুটে উঠল।

‘কই করল না তো। আইই বা সায়ে পড়ে বলতে বাই কেন ?’

‘তবে আবার জিজ্ঞেস করলে কী করে ?’ বনছায়া বুঝে হাসল। হালির তুলি তুলে।

‘মানে, আগে বিকনেল ছিল, বিকনেলকে বিষে করলাম, আর তাতেই ছুটি দিলম।’

জুসিই বদন আবার বিষে, তখন জুসিই আবার আবার বিকনেস।’ সুবীর আবার তরকারিত হয়ে উঠল। আবার উদার হয়ে বললে, ‘বিকনেলকে বিষে করাত যা, বিষেকে বিকনেল করাত তাই।’

আলিফনে বনছায়া মিথেকে আবার হস্ত মনে করল। বললে, ‘বীচলাম। আমি চেবোছিলাম না জানি কী।’ বনছায়া সুবীরের কপালের থেকে তুলগুলি মাথার বিকে তুলে দিতে লাগল।

‘কিন্তু আমি তাবছি জুসি ছুটি নিলে না কেন ?’

‘কই ছুটির কথাতো আমাকে বলোনি।’

‘হা, আমি বলতে বাব কেন ? তুমি তোমার নিজের হৃদিতে ছুটি বেধে। আকস্মিক দিনটা তুমি আর সব দিনের থেকে একটু আলাদা করে দেখবেনা ?’

‘কী হৃদিল, সেটা আমাকে বলবে তো ?’

‘আজও তুমি সেই বাসে-উ’মে পাড়িয়ে পাড়িয়ে আকিল বাবে, টোবিলে বসে কলম লিখে, বাজে লোকের লগে বাজে কথা কইবে—’

কেনন একটা স্বপ্নভার তব এসে বা’ল্লে নুহি। বনছায়া চুপ করল।

বনছায়ায় অচিৎ’র কাছে থায়াসে চুপচাপ থাকা। যতদূর সম্ভব পা-ঢাকা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেিয়ে যাওয়া। একেবারেই বাজনা না-বাঝানো কনকাবেল সন্দর্ভে হিমাতের কৌতুহল জাগিয়ে রেখেছে, ভেবেছিল সে কটা দিন ছুটি নিতে বাড়িতে বসে থাকবে, হৌমিসিদের বলবে, নতুন উপক্ৰাসের পেছটা লিখে ফেলব বলে ছুটি নিলাম। ‘ও’লে আবার সেব্যজ্যোতিক কৌতুহলী করতে বহ। কেন এই ছুটির প্রয়োজন ? বহা যদি পড়তে চর, এক হিমাতের কাছে অপরাধ করছে, তার কাছেই পড়া ভালো। বহা পড়লে ‘কখন না চর’ অল্প কোনো বাখ্যা বাড়ি করা যাবে, পরীর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল, পরী’র মত এমন ওজুহাত আর কী আছে, কিংবা না চর অল্প বকম বড় কলিয়ে বলবে প্রবন্ধটা এত প্রতিভা বহ যে সকল পাড়ির পড়ব এমন সাহস হল না। হিমাতের হৃদতা বহতো লম্বা বাখ্যাকেই মার্জনার চোখে যেনে নেবে। আর যেনে না নিলেও বা তব কী, পরিকার তারিখ তো ঠেলে দেয়া গেছে পিছিয়ে। সমস্ত এমায়ো তারিখের আগে তার হৃদতা তো লুহতা হতে পারবে না।

আমার বিয়ে—শেব সময় এই বলে ছুটি নিতে যাওয়া যাবে তো তব নৌকো পারে এনে জুবিবে বেওয়া। সুখী তো মিছিদিছি একটা বিশেষের মধ্যে পা বাড়িয়েছিল, বেঁচে গিয়েছে, কাকে বিয়ে করছে বিজেল করেনি—কিন্তু সেব্যজ্যোতির কাছে দরখাস্ত পেশ করতে গেলেই, প্রথম সন্যাসীন প্রবই বহ, কার লগে বিয়ে ? বাস, তা হলেই বিপর্যয়।

চুপিসাড়ে বিয়েটা ‘তে’ আগে সাহি। তারপর যখন বাব বা আনবার জেনে নিল। হঠাৎ একটা বৈ-চৈ করে প্রতিবন্ধীকে সুকোমল করে লাভ কী ?

‘আজ তোমাকে আকিলে বেতে দেব না।’ সুখী বেন একটা হুহু দেবার মত করে বললে।

‘কেন, কী করবে ?’ তরল হতে চাইল বনছায়া।

‘হুপুয়টা হুমনে একলগে বসে কাটা’

‘হুটোর লম্বা রেজেক্ট্রি আকিলে দাবার কথা যেন আছে ? তোমার লাকী বহুদেয় ভেদনি বলা আছে বেরাপ আছে তো ?’

‘সে তো হুটোর। এখনতো মোটেলাফেন’টা। লাকেন’টা থেকে হুটো’পর্বত’আমার অবিজি’

‘হুটোর পর থেকে অবিজি’

‘শোন, এখন থেকে হুটো পর্বত অবিবাল, হুটো থেকে সন্তে পর্বত বিয়ে, আর সন্তে থেকে তোমার ফলপা’

‘অবিবালে বহ-বই নুহি একলগে থাকে ?’ বটকা সেয়ে উঠে পাড়াল বনছায়া। হাসিমুখে বললে, ‘হুতরাং আমার আকিল বাওয়া বহ করতে পারো না ?’

‘আমি জুল বলছি। ‘আগে জুলখা’ পরে বিয়ে পরে আবিধান।’

‘জুল বলতে গিয়েও জুল কবলে। জুলখার আগের রাত কালরাত।’ বনছায়া বিদ্বিল করে হেসে উঠল: ‘(শোনাও দেউটা) ম’লাল আবার আকিলে গিয়ে স্লিপ পাঠাবে, তারপর হুখনে একত্র উপস্থিত হবে মলিলে লব্ধক থাকবে নো।’

‘তারপর কী হবে?’

‘তারপর জুদি জানো!’ নরজার দিকে যেতে-যেতে বনছায়া খানস:

ওখানে ঠিক সময়ে যাবে তো? নাকি চন্দ্রশতন ঘটাবে?’

‘হেবি, বলছি তো—‘কী রকম যেন ঠগত’ শোনাও জুবীরকে:

আপাত্ত করে নো।’

আকিলে বলে বায়েবারেই যদি লেপছে বনছায়া, আর তবলই মনে হচ্ছে একটা কিছু বিশরীত হুঁজি ঘটে যাবে। পেছালাটা বধন চুবন গিয়ে মূখে তুলেছি, ঠোট বধন প্রান্তটা ঝাঁক-ঝাঁক, বধন শুভ্র তত্ত্ববাহ্য বাবধান, ঠিক সেই মুহুর্তে পেছালায় ডাঁটিটা ডেঙে যাবে। চরতো আকাশনর থেকে রিম্মতে ইনকাক্তানির নিয়ে আসবে, এ বিয়ে রতে পারবে না, কিংবা চরতো ঘায়েলক-হেজিষ্ট্রাইই কোনো প্রয়োজনীয় নিবৃত্ত থাকবে। কিংবা কে জানে চরতো জুবীরই এলে পৌছুবে না।

আকী, দেউটা বাসন্তে মোটে পাঁচ মিনিট থাকি, এখানে জুবীরের লেখা নেই।

করতে পারে কিছু বনছায়া পারে না। না, একদিনও না। এক মুহুর্তও না।

দেউটা থেকে পাঁচ মিনিট। নিজের খেঁকই ঊঠে পড়ল বনছায়া।

না, বেহারার হাতে স্লিপ এলোছে। দেউজারকে আগেই বলা ছিল, বনছায়া প্রায় উড়ে বেরিয়ে গেল। জুবীর ঠিক এলোছে, সঙ্গে দুই কবি-বন্ধু। অল্পকণের মধ্যেই ট্যাঞ্জি পাওয়া গেল। বিয়ের আকিলে গিয়ে পৌছুতে, আকী, পণে কোনো হুঁজিটা ঘটল না। হেজিষ্ট্রাইয়ের মূখের দিকে তরে-তরে তাকাল বনছায়া। না, লেখানে কোনো নিবেদন নির্দেশ নেই। বেশ প্রসন্ন মুখেই লক্ষকে ডেকে নিলেন। কিছুকণের মধ্যেই লেখালেখি শেষ হল। হ্যাঁ, এইবার এইখানে লই ককন, আবার এইখানে। ‘আর আপনারা দাকীরা এই আরপায়।

‘হবে গেল?’ বনছায়া বেন হাঁক ছাড়ল।

‘তাহাজা আবার কী!’ জুবীরও বললে সংক্ষেপে।

‘তারপর?’ একবন্ধু বিজ্ঞেয় করল।

‘তারপর চল কোনো একটা বেপুয়ায়কে চুকি।’ জুবীর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করল।

‘তারপর?’ আরেক বন্ধুর বিজ্ঞালা।

‘তারপর গিয়েনা। যেটোতে টিকিট পাই।’ জুবীর আবার ট্যাঞ্জি তাকল।

এর বেশি আর হুঁজি কিছু ভাবতে পারছে না জুবীর। এত বেশি ভাববারই বা কী দরকার ছিল, বনছায়া ভাবলে। হুঁ পেছালা চা বাইরে বন্ধ দুটোকে বিহার করে গিলেই তো চুক বের। তাত্রা দাবী-ত্রী দুইজন এই ট্যাঞ্জিতেই কোথাও কোনো দূর পাল্লার পথ বেড়িয়ে আসত। তাদের এমন জ্ঞান সজ্ঞার মধ্যে দুটো। আগন্তুক চুক লম্বা রাতি করে দিল।

কিন্তু তাহাজা জুবীরের বন্ধ, দাকী-বন্ধ, তাহেবকে বখারীতি আপায়ন না করে তাকিয়ে দেওয়া

হায় না। তাহেই উচিত ছিল নিজের বেঁচে কেটে পড়া। কিন্তু কবিরের, বিশেষ করে আধুনিক কবিরের উচিত্যবোধ আছে এমন কোনো প্রমাণ নেই।

দিনেমা-হল বেঁচে যেতবার পর বন্ধুর কাণ্ডজ্ঞান আগল।

অশ্রুত হই।’

আরেকজন বললে, ‘আর তোরা বহু দিনে হরকার বিল দে।’

এক বঁরে ফিরে এসে হুরীর সত্যি সত্যিই হরকার বিল দিল।

এতাত হয়েও কিছু হুরীর তার কর্তব্যে প্রস্তুত উদ্ভাপ আনতে পারল না। বললে, ‘আলো নেই বাজনা নেই লোকজন নেই, বৈ-নৈ নেই, বেন বিয়ে-বিয়েই মনে হচ্ছে না।’

‘কিন্তু আমি তো আছি।’ বনছায়া দৃঢ় হয়ে চাইল।

কলম চোখে তাকাল হুরীর। বললে, ‘তুমি তো আছ কিন্তু তোমার লাভ নেই, লক্ষ্য নেই, বাস্তব-পলায় গমন নেই—সেই আকিলের মরল। পাড়িটাই গুচে আছে—‘আক্ষর্য’ অশ্রুতাপে নিঃস্বাক বিজ্ঞার বিয়ে উঠল হুরীর : ‘কিন্তু হুল আর মাল’ কিনে আনা উচিত ছিল। তুমি তখন মনে করিয়ে দাত নি কেন?’

‘হুল দিয়ে কী হবে? আচ্ছ তো জুলশয্যা নয়।’

‘যে শয্যাই হোক তাকে জুলশয্যাও বলা হবে না।’ হুরীর ঘোষণা করার মত বললে, ‘আচ্ছ তো তুমি আমার স্ত্রী।’

‘সর্বাপেক্ষে।’

‘আর আদকে প্রথম রাত্রি। প্রথম রাত্রির মত প্রথমতন কিছু নেই। এল।’ হুরীর বনছায়ার হাত ধরে আকর্ষণ করল।

‘গোনা, ছেলেমানসি কোরোনা।’ কিছু বৃত্তি বৃত্তির কথা পাড়তে গেল বনছায়া।

‘আমি আর ছেলেমানুষ্য নেই। ছেলেমানুষ্য বলে আচ্ছ আর তুমি আমাকে ঠেকাতে পারবে না।’ বিয়ের হলিলি লাইসেল বা পাড়িকিকেটটা হাওয়ার মাঝে লাগল হুরীর : ‘আচ্ছ আদি দ্বারী। যোল আনা লগোলক। লক্ষ্য সর্ব্ব দ্বারী। তোমার উপর আচ্ছ আমার অশ্রুত অবিকার। আমার দাবি মানতে হবে।’

‘গোনা, ঐ পাড়িকিকেটটা আমাকে দাও।’ বনছায়া হাত বাড়াল : ‘আমি ওটা কাল বাসকে দেবাই, বাড়ির লগাইকে দেবাই, তারপর লকলের কাছে বেঁচে বিহার নিয়ে আচ্ছাটানিক ভাবে তোমার কাছে চলে আসি।’

‘কিন্তু আদকের হাত? আদকের বাসর?’

নিশ্চয় চোখে বরের চারদিকে তাকাল বনছায়া। এই ঘর, ঐ বিছানা? আচ্ছ সাতারিন বৃত্তি ধরে হাঁট পড়েনি, অশ্রুত বিকলে পড়েনি, মেঝেতে কাটা কাগজের টুকরো, সিগারেটের ছাই ও হজাবশেষগুলো পড়ে আছে, মেঝেতে কালা-জুতোর দাগ, আর বিছানাটা বৃত্তি লকাল বেঁচেই পাতা, বহুভাঙ বৃত্তি পা জুলে বলে আচ্ছা দিয়ে গেছে এখানে। সবটাই গম্বিষেই কেন্দ্র বেন বেজুতো, হুতো তারও চেয়ে বেশি অপরিস্রব।

তবু ঠাণ্ডা গলার আরো একটু বৃত্তির কথা পাড়তে গেল বনছায়া। হুরীরের কাঁধে লগেদ হাত রেখে বনছায়া বললে, ‘বেবেতেই গাচ্ছ আমি বিত্তীর বজ্র আনিমি—’

ହୁଏର ବେଳେ କଥା କେଡ଼େ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏର ବଳେ, 'ଆମି ତୋହାର ବାନ୍ତେ ହାତ ଦିଅନ୍ତେ ଚାହିଁ ନା, ତ ତୁମି ନିରାଶରେ ହୃଦେ ଲଗିବେ ବାନ୍ତେ । ଆମି ଆମାମନ୍ତକ ଆମାମନ୍ତ ଶ୍ରୀକେ ଚାହିଁ ।'

'କିମିନିମନ୍ତ କିଛି ନା ନେଇ, ଟାକାଓ ଆମିନି ମଧ୍ୟ, ଆମାମନ୍ତେ ଆଜି ଏକବାର ବାଞ୍ଛି କିନ୍ତୁତେହି ବନହାରୀ ହୁଏ ହତେ ଚାହିଁ ।'

'କିନ୍ତୁତେ ହଲେ କିବେବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁମି ଆମାମନ୍ତେ କେବାନ୍ତେ ପାରିବେନା ।'

କଠୋରତର ହଲ ।

ବନହାରୀ ନିକେକେ କେମନ ସେନ ଏକଟୁ ମହାକୁତ ବଳେ ବୋଧ କରଲେ । ଅବତ ହୁଏତେର ଏହି ଶ୍ରୀବଳା ଏହି ଅମାହିତୁତାହି ତାଙ୍କେ ଏକଦିନ ହୁଏ କରେକେ । କିନ୍ତୁ ଏବନ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସେନ ହଲ, ବିହେର ମଧ୍ୟ ବନନ ଅବତ ଅବକାଶ, ବନନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅବାରଣ, ତବନ ଏକ ଅବେଶ ଏକବାରେ ଅନାବଦ୍ଧତ । ଆଉ କୁହାହି ମନନ୍ତ, ମରିବେନ କିଛି ନା, ମରିବେନ କିଛି ନା ଏବେନ ମହାକୁତ ମାନନ୍ତେ ଚାହିଁଲନା ବନହାରୀ । ମେଧକାଳେ କୌଣସିକେ ତାର ସେନେର କଥାଟା ଶ୍ରୀକାଶ କରେ କେଲନ । ବଳେ, 'କିନ୍ତୁ ବରତା କେମନ ନୋରୋ ଗରେ ଆଜି । ଆଉ ଶ୍ରୀ ବିହାରୀଟା—'

ହେଲେ ଉଠିଲ ହୁଏର, ହାମିର ସବୋ ଏକଟୁ ହୁଏ ବିଜ୍ଞାନ ସେନାମୋ । ବଳେ, 'ସେତାଲୋବାମାମର ଆମାମର ମାବନ କରେକି ମେହି ତାଲୋବାମାମାହି ମନନ୍ତ କ୍ରୀ ଅଗ୍ରାଜ୍ଞ କରନ୍ତେ ପାରେ ।'

ବନହାରୀ କୌଣସି ଶ୍ରୀକାଶ କରଲ, 'ଆମାମର ସେନ ସହ ତାଲୋବାମାମର ସବୋ ଏକଟି ମୋକାଶେର ବୀଜିତି ଆଜି । ମାହିତୁତାହି ମେହି ମୋକାଶ । ବା ଚକିତେ ମନନ୍ତ କିଛିକେ ମନୁଏ ଅଗ୍ରାଜ୍ଞ କରେ ଦିଅନ୍ତେ ପାରେ ତା ହାଲେ ଆକାଞ୍ଚା ।'

'ଆକାଞ୍ଚାହି ତୋ ଏକଦାମା ମନ୍ତା । ସେକେର ଆକାଞ୍ଚାଓ ତୋ ଆକାଞ୍ଚା ।'

ହାଲ, ବଳେ, 'ଏବନ ଆମାମରଓ ସେକ, ତୋମାମରଓ ସେକ ।'

ଏକତଳାର ଟ୍ରାଟି ବଳେ ଟାଣିର ବିକେର ଆନମାଟାଓ ବନ୍ଦ କରେ ଦିଲ ହୁଏର । ତାରମର ହୁଏତ ଅବ କରେ ସର ଅବକାର କରେ ଦିଲ ।

ବନହାରୀ ହୁଏତେର ଆଉ ନିରନ୍ତ କରନ୍ତେ ଚାହିଁଲ ନା । ନିରନ୍ତ କରାର ଅବେଶ ଆଉ ସେହି ତାର ଅଭିଧାନେ । ତାହାକା ଏହି ତୁହାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ଆହତିର କାତେହି ତୋ ମେ ଏକଦିନ ବରେ ତାର ମନନ୍ତ ଶ୍ରୀକାଶ ଶେଲେ ରେବେକେ । ଆଜି ମେହି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକନିଧାକେ ଦ୍ଵିମିତ କରେ ବାବଦାର ଅର୍ଥ ଚାହିଁ । ମନ୍ତାର ହୁଏତେ ମନମ୍ବେର ଦୁର୍ଘଟନ ଆନନ୍ଦନିଧୁତେ ତାହି ନିଶ୍ଚୟ ସେଲ ବନହାରୀ । ଏକତୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟା ବଟିତେ ଦିଲନା । ଆଉ ହୁଏର ତୋ ସ୍ଵାମି ହୁଏର ।

ତୁମେବତାରା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବେଳେ ମୁକାଶି କରଲ କହି ।

ମେହି ଅନୌକ୍ଷିକ ଆଲୋ କହି, ବାବଦା କହି, କହି ମେହି ଆନନ୍ଦସତ୍ୟତା ।

ବନହାରୀର ସେନ ହଲ, ଏହି ! ଏହି କାତେ ଏକ । ଆଉ ହୁଏର ତାବଲ ସେନଟି ଚେହେଲିମାମ ଏବେନ ତାର ଗେର ଅନେକ କମ । ଏ ଟିକ ବନହାରୀହି ତୋ ?

ସରସର ଅବକାର ସେନ ବଳେ ଉଠିଲ, ଏ ବନହାରୀ କିନା ଆମିନା, ଏ ତୋହାର ଶ୍ରୀ ।

ବନହାରୀ ବଳେ, 'ଏହୁନି ଆଲୋ ଶେଲୋ ନା ।'

ହୁଏର ହୁଏତେ ବେଳେ ହାତ ଲଗିବେ ଦିଲ । ବନହାରୀର କଥା ଶୁଣଲ । ସେନ ହଲ, ଏହୁନି ଆଲୋ ହାମିରେ ବଳେ ହୁଏ ଶ୍ରୀକାଶ କର ମନ୍ତେ ହାବେ ।

তারপর বনছায়াই লয়েত সুস্থুটি বেছে নিয়ে সুইচে হাত রাখল। তাহল আলো করে দিলে কী দেখবে? বাসর ঘর, না, একটা জেলখানার কুঠুরি?

আলো করে দিতে মধ্য সুখে হাসল বনছায়া। বললে, 'একটা ট্যান্ডি ডেকে দাও। আমি এখন পালাই।'

'পালাবে?' একটু কুচি মায়া হল সুখীরের, বললে, 'কুচি এমন একটা তাব করছ যেন চুপি কিংবা পালাচ্ছ চোরের থেকে।'

সেই রকমই কুচি অখতি লাগছিল বনছায়ার, তবু তার হাতে রঙের তাল আছে, সে তাই দিয়ে একটা জুজপ দিলে। বললে, 'পালোনা একটা কবকালের ডিম। পালায় কেবু কিংবা বাজ বিড়ানা কিনিলপত্র নিয়ে কাঁপিয়ে পড়বার কপে।'

প্রাণির সমুদ্র থেকে একটা শেষ আশ্বের ডেউ সুখীরকে উপহার দিল বনছায়া।

ট্যান্ডিতে বনছায়াকে সুখীর একা ছেড়ে দিলেন। কুচি এখন আমার খ্রী। তোমার কপে আমার হাফিফ এখন আদিশত। সুতরাংই আমাকেই পৌছে দিতে হবে।

গেট থেকেই সুখীরকে বিদায় দিল বনছায়া। বললে, 'এবার কুচি পালাও। রুম্মাক্সটা আমাকে দাও। আমি কাল লকালে এটা নিয়ে লম্বা লংসারের লম্বুনিং হবে।'

বিয়ের লাটিকিওটো বনছায়া তার ব্যাগে পুরল।

কিংবা বাসর সুখে সুখীর বললে, 'আমি শিখ পাশিয়ে যাচ্ছি। আমি আমার খ্রীকে বাপের বাড়িতে পৌছে দিয়ে আমার বাড়ি কিংবা যাচ্ছি। কাল বয়ং এলে আমার নিয়ে যাবে।' চোখে চোখে রেখে হাসল সুখীর, 'হিসেবে একটুও কব পড়তে হবে না।'

তবু হিসেবে সব সময়ই কুচি কম পড়ে।

লসলিফ পর্জন করে উঠলেন: 'কুচি এমনি একা বেরিয়ে যেতে চাও খেরিয়ে বাও। ঐ হারানকারাকে বরবার আমার সামনে এনে উপস্থিত করোনা। আমি লজ করতে পারব না। ওকে দেখলেই আমি গুটী করব। বন্ধু পরিবে কেলতে পারে, কিন্তু আমার গায়ের জুতা কেড়ে নিতে পারবেনা। না, বরবার যেন আমার সামনে না আসে। এটা কি বিয়ে, না, বীহরামি? লাইসেন্সের কপে লাইসেন্স?' বলে বিয়ের লাটিকিওটো: 'ছিঁড়ে কুচি কুচি করে কেললেন। বড় ছেসেকে ভাকলেন, 'কুচি হিমাত্তকে গিরে বলে, মামলা পরতে। হ্যাঁ, ড্যাংকেল কর রিট অফ কনট্র্যাক্ট—কুজিতদের কপে কুজিতপূরণ। হারানকারাকে নাকানিহুনি বাইরে দিল। হ্যাঁ, আমি বলছি কেল 'লাই' করবে। আমি হিমাত্তের গকে লাফী দেব। আর কুচি মিটার তৌমিককেও ববর দাও, বনির চাকরির যেন দকারক। করে দেয়—'

উদ্ব্রাজ হয়ে দিয়েছেন লসলিফ। শান্ত হবেন আশার আধো কতকণ অপেক্ষা করল বনছায়া। শেষে কুচল সে বাড়ি ছেড়ে চলে না গেলে বাবা শান্ত হবেন না। (ক্রমবঃ)

বোরখা

মনোজ স্তম্ভ

ববে মেল ছাড়বার আর বেশী সেরী নেই। বন্ধুদের মধ্যে যারা অল্পকে তুলে দিতে এসেছিল তাহা কেউ কেউ তাকে পাকীতে উঠে পড়তে বলছে, অল্প বন্ধুতা আরও একটু বেড়ে তাতে চাইছে। একজন বললে, "চলি তো কত দিনের ভাত্রে, যে টুকু পাবিল আশাদের সঙ্গে থাক।" আর একজন বললে, "তাছাড়া ওর দাঁহের হাওয়া লাগাত ভাল, যদি তালাটা ওর মত হয়।" সত্যিই ওর ভাষাকে ঈর্ষা করতে হয়। এই বয়েসে চলল আমেরিকা ত্যাগ বাণের পরসার নয়, স্বাভাবিক বিখ্যাত আমেরিকান হুনিভারসিটির অলাবিশি। নিজে। তাছাড়া বাওয়া অল্প ওর সম্ভব হত না। নিজের টাকার আমেরিকা দিয়ে পড়বার ক্ষমতা ওর নেই। সেটা ও নিজে খেদন জানে ওর বন্ধুতাও ঠিক সেই তরমুই জানে। দেখা পড়ার ভাল তাই বলে এত অল্প বয়েসে বাইরে থেকে টাকা পেয়ে পড়তে যেতে পারবে এ কথা কেউ জানে নি। মেহাজুই ঘটনাটকে একজন আমেরিকান টুটিটের সঙ্গে আলাপ হয়। তারতরব মেথার ওকে সতী হতে বলেন। ও বাজি করে যায়। ক'দিনের বসিটায় ওকে তাঁর ভাল লাগে। বিজ্ঞানের ছাত্র খেদন বলেন, "ওলে সে আমায় বেপে, অসুস্থত সুখোপ পায়ে।" অল্প বলে, "তা তো জানি কিন্তু বাব কি করে? তোমার বেপে পড়ার মত আমার আর্থিক সম্ভতি নেই।" উত্তরলোক আশ্চর্য হয়ে বলেন, "কন? পতর্ঘরটো টাকা বেবে না? তুদি পড়তে চাও টাকার ভাত্রে পড়তে পারবে না?" অল্প অনেক ভাঙে তাঁকে আমাদের বেপের পরিস্থিতি বোঝাতে চেষ্টা করে কিন্তু বোঝাতে পারে বলে মনে হয় না। বেপে কিংবাবার সময় তত্ত্বলোক ওর বিষয় সমস্ত লিখে নিয়ে যান। তখন অল্প তাবতেও পারে নি বেপে কিংবে তত্ত্বলোক ওর কথা মনে রাখবেন। ওকে আশ্চর্য করে দিয়ে তত্ত্বলোক থাকে থাকে চিঠি লিখতে লাগলেন। একবার একটা চিঠির লেখে একটা নামলাবা হুনিভারসিটির অ্যাপ্রিকেশন কর্ম পাঠিয়ে দিলেন। ও যখন কর্মটা গুটি করে কেহৎয়ের তখন লিখেছিল, 'আপনার চেষ্টায় ভাত্রে অসুখ্যে বস্তাবার কিন্তু কোন লাভ নেই, ওখানে চোকবার কোন আশাই আমার নেই।' যনের অস্তরালে যদি বা কোন ক্ষীণ আশা অব্যক্তক উক্তি দিয়ে থাকে তাও নিবুল হয়ে গেল যখন ছ'মাসের মধ্যে হুনিভারসিটি থেকে একটা যাদুলী প্রাপ্তি স্বীকারও এল না। বন্ধুদের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করে নি বলে ও ব্যতির বিখাল কেদল কিন্তু ও আমেরিকান তত্ত্বলোকের প্রভাব প্রতিপত্তির বিষয় কিছুই জানত না তাই যখন হুনিভারসিটি থেকে আদালৎ ওকে ডায়া মেবে আর পড়বার সব পরচ মেবে, তখন ও কিছুকণ নিজের চোখকে বিশ্বাস

করতে পারেনি। অল্প গুণ বাবাকে সব কথা লিখে জানাল। তিনি নিবলেন ‘তুমি আর ভগবানে বিশ্বাস আনি, অনেক দিন চাটাইয়েছি। সংস্কারের এটাকে গুণ দ্বারা নির্ধারণ বলে উচ্ছলিত হয়ে উঠবে। আমার সে কথাতাও নেই। আমার মানসিক বিকার হাতে তোমার গুণর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে তাই তোমার কাছে থেকে দূরে থেকেছি। একমুখ থেকে তোমার জীবন অগুণ। তাই বোঝার অল্প দিক থেকে সার্থক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা পাচ্ছি।’

অল্প তার বাবাকে কোনদিনই ঠিক বুঝতে পারে নি। বাবা তিরসনই বাইরে থেকেছেন আর গুণ জীবন কেটেছে হঠাৎ। কাল তরে যখন দেখা হয়েছে গুণ বাবা ওকে কাছে টানেন নি ও নিজেকে বিশেষ জ্ঞান অর্জন অল্পতর করেনি। বড় গুণ বাবাকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার কোন উপাধান পাচ্ছিল। নিজেও লম্বা গুণ বাবা কিছুই জানতে যেন নি। আত্মীয় লোকদের সম্পর্কে ও কোনদিন আসেনি, কেউ আছে কিনা তা জানেন না। ছোট বেলার জানতে ইচ্ছে হ’ত, বাবার দিক থেকে কোন উৎসাহ না থাকায় ক্রমশঃ একটা অতিমান গুণ মনকে আশ্রয় করেছিল। বড় হয়ে ও সব বিষয় তাইই হুড়ে গিয়েছিল—বন্ধুবান্ধবগণই গুণ আত্মীয় মননের অভাব পূর্ণ করেছিল।

অল্প আশা করেছিল গুণ চিত্রি গুণে হস্তো গুণ বাবা কলকাতার আসবেন আর তা না হলে ওকে যেতে বলবেন। অবশ্য এর আগে ওকে নিজের থাকবার আত্মপায় তখন নিয়ে যান নি তবু ও আশা করেছিল বেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলে হস্তো কাছে ডাকবেন। না ডাকতে ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল তারপর নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলে এই তাল পল। বেশ ছেড়ে যেতে যেতু কষ্ট হ’ত তাও হবে না। হস্তো আর কোনদিনই যেনে কিরবে না, কত ছেলেই তো কেবে না—তারের পল চেরে থাকবার লোক আছে তবুও কেবে না, গুণ তো সে সব বলগাই নেই।

গ্রীষ্ম দিগন্তাল হতে ও গাড়ীতে উঠে পড়ল। দরবার বাড়িরে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গাড়ী ছেড়ে দিল। দরকার বড় করে ও গুণ আত্মপায় এসে বলল। গাড়ীটার মধ্যে একবার চোব বুলিয়ে নিল। আর তিনজন বাড়ীর মধ্যে একজন হচ্ছেন সাহেবী গোবাক পলা জৌর, আর একজন বোহবা পলা মহিলা ও একটা মেয়ে। গাড়ীতে চোববার আগে যেনেছিল রিকার-তেলান স্প্রিং লেবা মিটার আমের জাও কামিলি। মেয়েটিকে যেনে ও একই অবাক করে গিয়েছিল—বন্ধ যেন চেনা কিন্তু আগে তখন যেনেছে বলে মনে করতে পারে না। তাছাড়া কোন মূল্যমান পরিবারের সঙ্গে গুণ সে বন্ধর পরিচয় নেই। নিজের কিনিষপত্র যেনে নিয়ে ও একটা বই খুলে বলল।

গাড়ী কিছুক্ষণ চলার পরে মিটার আমের বললেন, “গীরা লী-অক, করতে এসেছিলেন গুণের কথার বুলদাম যামেদিতা যাচ্ছেন। কি পড়তে প?”

“ইলেক্ট্রোনিक्स”, বলে অল্প হাতের বইখানা বন্ধ করে রাখল।

“বেশ কিছুক্ষণ এক সঙ্গে থাকতে, হবে, একবারে দুখবুকে সাহেবদের বত যেতে পারি না। এরা আমার যা-তা বলে...”

মেয়েটি বললে, “তাতে যেন তোমার কিছু যায় আসে।”

“বেশ গাড়ীতে আমরা মাজ চায়কন লোক, আমরা তিনজন না হয় নিজেরের মধ্যে কথা-বার্তা বলে সময় কাটাতে পারি কিন্তু ও খেচোরী কি এই এতটা পল দুখ বুঝে যাবে?” তারপর অল্পের দিকে কিরে বললেন, “আপনি বিরক্ত হন নি তো?”

অগ্রস্ত হয়ে অগ্রণ বললে, “না, না, বিরক্ত কেন এম। সত্যিই তেঁও নাথ
বুকে বাঙা বায় না। একটা অহুহোহ; আমায় আপনি বলবেন না।”

তত্ৰলোক বললেন, “খাচ্ছ তুমি। সত্যি কথা বলতে কি আপনি বলতে আমার একটু
অসুবিধেই হচ্ছিল কিন্তু আমকাল উপ- করে কাটকে তুমি বলতে সাহস কর না, তা সে ব্যেলে যত
ছোটই হোক না।” কথা শেষ করে আমায় সাহেব সিগারেট কেন ধার করে অত্ৰপের সামনে
বসলেন। অগ্রণ ইতস্তত করতে বললেন, “তুমি কি মনে করছ আমি বুড়ে হয়েছি বলে খেঁচি কচ্ছি
লাইস্‌ডু-বে কন য়েলেব-লেবরা সামনে সিগারেট বলে সজ করতে পারব না। আরে নাও, নাও,
লেট আপনি িল্যাক্সডু।” অগ্রণ সিগারেট নিয়ে বহাল। তত্ৰলোক বললেন, “অনেকদিন
আপেকার একটা পর মনে পড়ে গেল।” যেহেঁচি তার মার পারে চাত বাবল। তত্ৰলোক বললেন
“বুকেছি, ইলাবা হয়ে গেল। আচ্ছা আমি চুপ করছি।” অগ্রণ কিছু বুঝতে না পেরে ক্রমে দিকে
ডেরে গেল। যেহেঁচি বলল, “না, না বল। না বললে তো তোমার রাখে খুশ হবে না। তখন অবার—”
মিটার আমায় কিছু না বলে সিগারেট খেতে লাগলেন। একটু পরে যেহেঁচি কেঁচ এসে বাপের পাশে
বাড়াল। মিটার আমায় ঘন বেগেনে নি এইভাবে সিগারেট খেয়ে খেতে লাগলেন। যেহেঁচি ঠাণ্ডা কীয়ে
হাত রেখে বলল, “রাগ করলে বাগ্‌কান?”

“না।”

“তবে কথা বলছ না কেন? তুমি চুপ করে সত্যি হয়ে থাকলে তোমার একটুও মানায় না।”

“তা কি করতে হবে?”

“কি বলছিলে বল। আচ্ছা, একটু কচি বাবে?” অবারের অপেক্ষা না করে খাচ্ছ থেকে
কচি ঢেলে বিহার পড়ে বাবাকে দেখে না অগ্রণকে। এর অবস্থাটা বুকে নিয়ে মিটার আমায় বললেন,
“বমকে বাড়ালে কেন? ওকে বাঙা।” যেহেঁচি কচির কাপটা অত্ৰপের হাতে দিল। মিটার আমায়
বললেন, “কি অবা হয়েছ দেখ! ঐটুকু য়েই এর মনেও সাহেব কেপেছে তোমাকে কচি বিতে
পারে কি না। বিবা করছিল কেন আমি? বরি তুমি না নাও। আরে, ও বায়ামেরিকা যাচ্ছে এর ওলব
ক্রেজুডিল থাকবে কি করে? আচ্ছা, তোমার বাড়ী কোথায়?”

“কলকাতা।”

“আরে না না, সে বাড়ী নয়, দেখ।”

অগ্রণ বিপদে পড়ল। এ ব্যাপারটা তার কিছুই জানা নেই। বাবাকে কখন জিজ্ঞেস করবার
কারণও বটেনি। তাকে বিস্তার বেখে মিটার আমায় বললেন, “বুকেছি, আমায় ছাড় কীবনে বায়ের
আসল ক্যালকেনিয়ার বলভাম তোমরা তাই, অর্থাৎ তোমাদের পরিবার বহুদিন থেকে কলকাতার
হাতীভাবে আছেন, সেখান লগে কোন লস্কর নেই। তাহলে তোমার একটু বোকা হুঁক। তোমরা
তো বরাবর হিন্দু মূলধামের কলকাতা কবাই জনে আসছ। আমায়ের দিকে অর্থাৎ পূর্নবলে কলকাতা
হাতানারি হত কিন্তু তার ভেত্রে আখীরতার কোন হানি হত না। হলে চলতেই যা কি করে?
আমায়ের বাড়ীর হকিণে সত্যীপ শিলেমশায়ের বাড়ী, তাঁর বাড়ীর পক্ষিমে আমায় চাচার বাড়ী।
তার বাড়ীতে কবে কি রাত্তি হচ্ছে তাও সকলের জানা। একজনের বাড়ীতে হঠাৎ হুঁক এলে অত
বাড়ী থেকে দরকারী দিবিষয় বায়। মনে আছে, আমায় অহুহোহ বখর শেরে না চলে গেলেন,

আমাদের তার গড়ল সজীল শিশীমার ওপর। আমরা বুঝতে পারতাম না আমাদের না বাড়িতে নেই।”

তবু অরুণই অধাক হয়ে যায় না। যেটুকু চোখ বড় বড় করে তুলছিল।

‘আমি যেবার বাড়ী গাই তোমার দে নিশিমায়ে তো ভেবিনি।’

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমাদের সাহেব বললেন, “তিনি তো তখন বেঁচে ছিলেন না.....”

এতকথের মধ্যে এই প্রথম বোঝা গেল। মাহুয়াটিকে একটু নড়াচড়া করতে দেখা গেল। তার অতিথিটাই প্রায় লম্বাই তুলে দিয়েছিল। যেহেতু তাড়াচড়াটি তাঁর কাছে গিয়ে কি জিনিস করল। তার প্রশ্ন বা জবাব কিছুই শোনা গেল না। ‘আমের সাহেব বললেন, “তোমার আসা কিছু বলছেন?”

মেয়েটি বললে, “না।” ‘আমের সাহেব বললেন, “ওরই কথা। এভাবে একটা পথ যাওয়া।”

অরুণ বললে, “আমি এলে পড়ার আপনাদের অনেক অস্থিবে হচ্ছে।”

তাকে বাঁধা গিয়ে আমাদের সাহেব বললেন, “না, না, তোমার ক্ষেত্র নয়, জুনি না এসে অস্ত্র কেউ তো উঠতো। তাহাৎ।” কেউ না এলেও উনি ঐতাবেই যেতেন। ‘আমি ঠিক অস্ত্রটা গর্দায় তক্ত নই কিন্তু ওকে হাতি করতে পারি না।”

জিনারের সঙ্গে জিনেস করতে লোক এল। মিষ্টার আমাদের বললেন তাঁদের দরকার নেই। অরুণ কিছু বলবার আগেই মিষ্টার আমাদের বললেন, “কিছু যদি মনে না কর তো একটা কথা বলি। আমাদের সঙ্গে বেতে আপত্তি আছে?”

অরুণ বলল, “না, না, আপত্তি নয় তবে এ নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। আমরা তো এখন এইভাবেই চলতে হবে বা জুঁটবে তার লগে মানিয়ে তো নিতেই হবে।”

“তা হবে বলেই তো বলছি এ ক’বকী আর তা নাই বা করলে। বর্তমান আমাদের সঙ্গে ‘আহ আমাদের একজনই হবে যাও না। আচ্ছা, তেমনি পূরো নামটা কি? কার্টে তো লেখা আছে এ. বসু।”

“আমার নাম অরুণ সত্ত।”

মেয়েটি তার হাত কাছে গিয়ে বললেন, “আমি তোমার ঘন পেয়েছে, জুনি তুলছ। একটু ওয়ে গড় না।” তার পিঠে হাত রেখে তাকে নিরস্ত করে মহিলাটি আমাদের দাবা দিয়ে বলে উঠলেন।

মিষ্টার আমাদের মেয়েকে বললেন, “এই নামটা তুলি” মেয়েটি হেসে বাড়ি বাড়ি। হস্তটো অরুণ ঠিক ধরতে পারল না। ‘আমের সাহেব বললেন, “আপত্তি না? আমার মেয়ের নাম কি জান? রূপা!” তারপর মেয়ের দিকে কিয়ে বললেন, “তবে আর কি দাবা গাভিহে কেন? তোমার তো ও অভাবটা আছে।”

অরুণ বললে, “আপনার কি এই একটি মেয়ে?” ‘আমের সাহেব বাড়ি নেড়ে সাহা দিলেন। অরুণ রূপাকে বললে, “তাহলে পণ্ডিতটো একটু ভাল করে করা দরকার। যাতে বেগের বাহিরে গিরেও মনে করতে পারি এখানে আমার একটি ছোট্ট বোন আছে।”

এতকথের রূপা কথা বললে। টোট উল্টে বললে, “মনেই থাকবে না আমাদের কথা টেন থেকে নামলেই সব তুলে যাবেন।”

অরুণ একটু চুপ করে থেকে বললে, “তাই হচ্ছে যেমন যদি না আমার অবস্থা তোমারই হত আমারও তাই বোন কেউ নেই।”

কথাগুলোর বোঝা ছেঁড়াবার অঙ্গে আমের সাহেব বললেন, "শ্রোয়ানে তো দেখলান তুই বড় বাঁহব, আত্মীয়-স্বজন কাউকে দেখলান বলে তো যেন চল না।"

অরুণ বললে, "না কেউ ছিলেন না, কেউ নেই ও।"

আশ্চর্য হয়ে আমের সাহেব বললেন, "সে কি? আত্মীয় স্বজন নেই, এত বড় আশ্চর্য ব্যাপার। অবসার অস্বাভাবিকতার কথা বোঝাল হতে অরুণ বললে, "আছেন হঠাৎ তাই আমি জানি না। বাবা বাইরে থাকেন, ঘরবার হঠাৎ হঠাৎ কেটেছে..."

"তোমার বাবা এ ঘেন্দেই থাকেন তো না ঘোলের বাইরে?"

অরুণ নিজেকে লজ্জা কববার চেষ্টা করে বললে, "ঘেন্দেই থাকেন তবে কারও সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখেন না।"

"খুব রিভিউস্ বৃদ্ধি?"

"টিক রিভিউস্ বলতে যা বোঝায় তা হঠাৎ নয় তবে সাংসারের সঙ্গে বিশেষ কোন লক্ষ্য নেই।"

"বেশ ছেড়ে যাবার আগে দেখা করেছ তো?"

অরুণ আবার বিপদে পড়ল। তার বাবার বিষয় বাইরের লোককে বোঝান যায় না। তিনি যে দেখা করতে আসেন নি, আর একে বেতের বলেন নি সে কথা কাউকে বলা যায় না। চিন্তিতে যা লিখেছেন অস্ত্রের গুলে তা আরও অস্বাভাব্য। সোচ্ছলকি মিথ্যা করে দেখা হয়েছে তাকে বলতে পারেন না। তার অবস্থাটা কতকটা আশঙ্ক করে আমের সাহেব চুপ করে সেলেন। কবিরার অবস্থাটা একটু অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। যেন সেটাকে বদলাবার জেদেই রূপা বলে উঠল, "দাদা, লুডো খেলতে জানেন?"

আমের সাহেব মেয়ের কাছে কতক বোঝ করলেন, বললেন, "তুই আচ্ছা বোকা তো। লুডো আবার কে খেলতে জানে না।" রূপা এ লবের অঙ্গে, এমন কি অরুণের লক্ষ্যের অঙ্গেও অপেক্ষা না করে লুডো বার করল।

আমের সাহেব তবের খেলায় লুবিব করে বেড়ার অঙ্গে উঠে অপর বিকের সিটে গিয়ে বসলেন। ওরা খেলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ তবের খেলা দেখে মিষ্টার আমের চুপি চুপি খ্রীকে জিপেল করলেন, "বোরখাটা খুলে ফেললে হত। এতক্ষণ এইভাবে যেতে খুব বঠি হবে যে। ও তো গ্রাউ ছেলের হত।" মহিলাটি কি বললেন বোঝা গেল না, তবে তাঁর বোরখা খোলবার কোন লক্ষ্যই দেখা গেল না, যেমন বসছিলেন তেমনি বলে রইলেন। কিছুক্ষণ সেদিকে তেরে থেকে মিষ্টার আমের একটা হ্যান্ডা কিন নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।

তবের খেলা বেশ কমে উঠেছিল। কতটা সময় কাট বাজিল অরুণ তা বুঝতেই পারে নি। ট্রেনটা বঙ্গালুবে এসে থামতে তার বোঝাল হল। মিষ্টার আমের তাঁর খ্রীকে বললেন, "এবার বেয়ে নিলে হত না।" কতকগুলির কাছ থেকে কোন লাফা না গেয়ে কাছে গিয়ে গিয়ে বসলেন, "খুঁমিয়ে গড়লে না কি?"

তিনি দাড় বেড়ে জানালেন যে খুঁমোম নি। মিষ্টার আমের আবার বাখারের কথা বললেন। রূপা এদিয়ে এসে বললে, "আমি দেখা আচ্ছা?" ইশারার লক্ষ্যে দিগে তব মহিলা বলে

হইলেন। রূপা ঠার সামনে একটা ছোট গাথতে বসিল, ব্যস্ত করলেন। মিটার আয়ের কাছে গলে এসে জিপেন্স করলেন, “কি হল? বাবে না?” কোন বকমে সস্তা মহিলা হলেন, “পরে।” মিটার আয়ের জিপেন্স করলেন, “শুভী পাতাল চল নি তো?” ব্যস্ত নেড়ে অস্বাভাবিক হয়ে তত্বহিনী আগের মত বলে হইলেন।

বাতির আলোকান ঘেঁষে অল্প অল্প হলে দিতেছিল। সে ভুলেছিল বড় বরের মূলদখানের মধ্যে বাওয়া-বাওয়ার বিলাসিতার কথা। কিন্তু টেবিলের কাছবার এটী এলাচি বাগার আশা করে নি। একটা কিছুতে না বললেই আমের সাহেব বা রূপা আরও একটা নেবার জন্যে পীড়াপিড়ি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অল্প বলে, “এত বাওয়া অল্পের নেই, পারব কেন?”

রূপা বলে, “আচ্চা, তারি তো খান, আমি ওর চেয়ে বেশী খেতে পারি।”

অল্প বলে, “ভাললে খেলে না কেন?”

“সে কি বেলার তো—আপনার চেয়ে অনেক বেশী খেতে।” তারপর মনে পড়ল আশা খান নি। ঠাণ্ডা কাছে দিয়ে পাশে বলে বললে, “এবার কোব?”

তত্বহিনী ইশারায় তাকে নিরস্ত করলেন। রূপা দেখানোই বলে হইল। একটু পরে তার ঘুর এসে পেল সেবে মিটার আয়ের তাকে কাছে উঠে গুলে পড়তে বললেন। তার মা বাবা মিরে তাকে ওখানেই গুলে বললেন। অল্প মিটার আয়েরকে বললে, “আপনি এটাতে গুলে পড়ুন, আমি ওপরে উঠে যাচ্ছি।”

আয়ের সাহেব বললেন, “এখনি কিছু সহকারী ছিল না।”

অল্প বললে, “কাল সাবানিন ঘেঁষে ট্রেন হুবে, আচ্চা বড়টা পারেন বিজ্ঞান করে মিন। আয়েরের বেডিংটা ওর দিটে ঘেঁষেই উনি বললেন, “আরে, আরে ও সব ব্যাক পরে আরি বিছিয়ে নেব।”

অল্প বাবরর থেকে পারজানা পাঞ্জাবী গবে আলতে আয়ের সাহেব বললেন, “বা: তোমার প্রিন্সি হুটের আইডিয়া তো চমৎকার। ও বেশে দিয়েও কি এটী চালাবে না কি?”

“ইজ্ঞে তো আছে, সেবি শেষ পর্যন্ত পারি কি না।”

যাতে উঠে গুলে পড়ল বটে কিছু ঘুর এসে না। এলোমেলো কথা বাবার তেতর ঘুরতে লাগল—বাবার কথা, বড়-বড়ের কথা, হামেলিকান তত্বলোকটার কথা, আমের সাহেব, রূপা ও বোরবা পরিহিতা মহিলাসীর কথা। তত্বহিনী সত্যিই অল্পত। গবে চলতে সে বোরবা পরা মহিলাদের দেখেছে, একজন দুই বাছ কি করে ওভাবে চলতে পারে মনে প্রশ্ন উঠেছে কিন্তু আচ্চা তত্বহিনীকে এতকণ্টে তাবে বলে থাকতে দেখে সে খেন লাক্ষিতে উঠছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এ খেন একটা পাত্তি—মূলদখান ঘরে কল্পাবার পাত্তি। কিন্তু সব মূলদখান মহিলা তো বোরবা বাবরর করেন না। আয়ের সাহেব যোটেই বোকা বা প্রাচীন পদ্য নয়, তবে তাঁর স্ত্রী গবে এইভাবে কট মজ করে চলছেন কেন? একটাও কথা না বলে তত্বহিনী ততকণ থাকতে পারেন কে জানে? খেলেন নাই বা কেন? সবটাই কি তার উপস্থিতির জন্যে। তাঁর নিকটক অপরাধী মনে হচ্ছিল। তারপর তাৎপল আয়ের সাহেব তো ঠিকই বলেছেন, সে না উঠলে অল্প কেউ তো উঠতেই। তত্বহিনী নিজের আশা করেন নি বহু পর্যন্ত একটা জারগা বালি বাবে। আচ্চা, তত্বহিনী সেবে

কেমন? রূপার রতন কি? সম্ভবতঃ। কারও রূপ তার রূপের মত হবার মত নয়, আরেই মত নিষ্কর।
কি অদ্বৈত বাস্তবের জীবন! বাবা যেতে বলেন নি বলে মনে হুগে ক'ছিল। সম্পূর্ণ অপরিস্ফুট লোক
এই, কেমন সহজভাবে কাছে টানল। পথের অংশে, এর রাস্তা পথেই ফুল হয়ে গিয়েছিল ও তা
পারবে কি?

একবার কামরাটার চারদিকে দেখে নিল। আরেই সংসার ও রূপ অকাতরে ঘুরেছে।
তবু মহিলা সেই এক ভাবে ঘেঁষে আছে, অর্থাৎ কি ঘুমিয়ে বোকা হয়ে গেছে না। তারিয়ার হাত থেকে
বাঁচবার ক্ষেত্রে অল্প বই পড়বার আলোটা জ্বালল। তার ঘন ঘনে চল তবু মহিলা একটু নড়ে
উঠলেন। আলো জ্বালান কি তিনি বিরক্ত হয়েছেন? কিন্তু আলো তো ঠিক চোখে পড়ছে না।
অল্প কোর করে নিজেকে বইয়ের মধ্যে ছুঁতে চাইলেন।

কতকগুলো পড়েছে বেরাল নেই। টেপটা একটা টেপানে এসে থামল। ঘরে টেপানের নামটা
হাঁকছে—শাই গুনতে পাচ্ছে না মনে হচ্ছে বেন চেনা বস। অল্প অল্প আঙুলে নীচে নামল, হাতটা
নিপেয়ে সমস্ত সরঞ্জাম ঝিট ও বড়ঝিট মাথিয়ে গেল। এক ফলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে চোখে ঘুমে লাগল।
মুখ বাড়িয়ে চারদিকে চেয়ে টেপানটার নাম দেখবার চেষ্টা করলে, তারপর বাড়ি দেখলে। হাওয়ায়
পৌছবারই সময়। তবে কি এই ক্ষেত্রেই তার ঘুম আসছিল না? কতকগুলো গাড়ি কে জানে? একবার
নামের হাত। কি হবে নেন কে তার ক্ষেত্রে অংশে করে বলে আছে? হঠাৎ তার চিন্তা জোত
বাঁধা গেল—সরঞ্জাম মাথা সলিয়ে একটা লোক ভেতরে হেঁটে চেষ্টা করছে। মোটাকৈ দেখবার
ক্ষেত্রে নীচু হতেই তার নিজের অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, “বাবা!” সে ভাড়াভাড়া দরজা
খুলে নেমে পড়ল। মিটার আবেদনও উঠে বলেছেন। অল্প ও তার বাবা সরঞ্জাম নামেই গাড়িয়ে।
অল্প বললে, “এই রাস্তা ঘুরে কেন এলে?”

“না আসবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু না এগে, পারলাম না। মনে হল তুমি আমার আসতে
বলেছ। কোন হেঁটে বাজ্ঞ জা নামলে না কেন?”

একটু হুগ করে থেকে অল্প বললে, “একবার তেবেছিলাম, সোকা তোমার ওখানে উঠব
তারপর……”

অল্পের বাবা তার গিটে হাত রেখে বললেন, “তোমার আহাজ কবে?”

‘আহাজ নয়, মেনে যাব।’

“তবে কলকাতা থেকে না উঠে—” কলকাতা তিনি শেষ করতে পারলেন না। একটু বেয়ে
বললে, “তু’ একদিন এখানে থেকে যাওয়া কি সম্ভব? যদি ক্ষতি না হয়—আর দেখা হবে কি না—”

অল্প কোর কথা না বলে গাড়িতে উঠে নিজের জিনিষপত্র ওঠাতে লাগল। আরেই দাঁতের
বললেন, “টিক এই মুহুর্তে খোবার কাছে আমি এই প্রার্থনাই করছিলাম—তিনি যেন তোমার এই
জুড়তিই হেন।”

অল্প বললেন, “কলকাতা আর ঘুম থেকে জুসছেন না ওকে বলবেন আমেরিকা গিয়েও ওর
দাদা ওকে জুসবে না।”

মিটার আরেই বললেন, “গাড়িও, তোমার আমাদের টিকানাটা দিয়ে দিই।”

অল্প বললে, “সে কাক রূপা আসেই সেবে রেবেছে।” গাড়ী ছাড়বার হুঁসিল দিল।

অরুণ তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। মিষ্টার আমের গাড়ীর ভেতর দিকে দৃব ফিরিয়ে দেখলেন তাঁর স্ত্রী উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, “বাবু, বাঁচা গেল এবার তুমি কিছুক্ষণের ভর্তে আরাম করতে পারবে।”

গাড়ীটা ছুঁলে উঠল। মিষ্টার আমের সরল্য বদ্ধ করতে গেলেন, গেছেন থেকে তাঁর স্ত্রী এসে তাঁকে বাধা দিলেন। তিনি কিছু বোজবোজ আগেই তত্ত্ববিলা সরল্য খুলে ফেললেন গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে। মিষ্টার আমের বললেন, “কি করছ? গড়ে যাবে বে।”

সমস্ত ব্যাপারটার অস্বাভাবিকতায় তিনি যেন বিজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তত্ত্ব বিলা দুপছেন বেবে তার হাত বরতে গেলেন কিছ বরতে রাখতে পারলেন না, তত্ত্ববিলা চলত গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লেন। মিষ্টার আমের সঙ্গে সঙ্গে চেনে টারলেন। গাড়ী বেছে গেল। মিষ্টার আমের গাড়ী থেকে নেনে টেবানের দিকে এসিয়ে চললেন। ততক্ষণে বহুলোক নেনে পড়েছে। কয়েক জন চীৎকার করে উঠল, “এই যে, এখানে।” মিষ্টার আমের ছুটে সেখানে গেলেন। কয়েকজনে দিলে তত্ত্ব বিলা তার দেহটা প্র্যাটিকর্ষ আর গাড়ী মাস্তবান থেকে টেনে বার করল। বোরবা ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেছে, মাথা ও দেহের ডান দিকটা পিণে গেছে। বরাবরি করে দেহটা প্র্যাটিকর্ষে এনে রাখা হল। কৌতুহলী জনতার অলস প্রসেই অবাধ বেবার কমতা হারিয়ে ফেলেছেন আমের সাহেব। গাড়ীকে ঘেঁষে কোন চকনে বললেন, “আমায় ঘেরে একটু আগের কাঠ” জগে রয়েছে—গাড়ীটার আমের হাও ফ্যামিলির নামে রিকার্ভ কাঠ আছে—” তাঁর কথা শেষ হল না। অরুণ ছুটে এসে বললে, “এ কি?” তত্ত্বলোক কপালে হাত ঠেকালেন।

অরুণের বাবা কখন তার পাশে এলে দাঁড়িয়েছেন সে বেবতে পার নি। তত্ত্বলোক আন্তে আন্তে তত্ত্ববিলা র বিলা তার কাছে এসিয়ে গিয়ে ছুঁতে বা হাতটা বেবলেন। তত্ত্বলোকের আচরণে সবাই শুভিত হয়ে গিয়েছিল। তত্ত্বলোক উঠে আমের সাহেবের কাছে এসে জিপস করলেন, “সীমা, না?”

আমের সাহেব বললেন, “বা হাতে উড়ি দিয়ে ঐ নামই লেখা আছে, অনেক চেষ্টা করেছে, ওঠাতে পারেন নি। আপনি...আপনি একে ভিনজেন?”

তাঁর কথার অর্থ না নিয়ে অরুণের বাবা তাকে বললেন, “অরুণ তোমার মাকে প্রণাম কর।”

গল্প-মন্তব্য সত্য

“মিট্রীনান”

মল্লিকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্যাঙ্কি থেকে নেবে তাক। মিটিয়ে দেবার আগে পকেটে হাত নিয়ে দেখি, মানিব্যাগটি উন্মোচিত হয়েছে।

সেইরকম! বোটো রেজিস্ট্রিতে মিলিয়ে প্রায় টাকা পকেটের মত ছিল—কিন্তু টাকার পরিমাণটা এখন বড় কথা নয়, সমস্যা হচ্ছে, ট্যাঙ্কিতাড়া যেটাই কী দিয়ে? বড় সুখকিলে ফেললে হবে। পকেটে পয়সা নেই, অথচ ট্যাঙ্কি চাপার লব আছে, এরকম চালিতাত্ত্ব দুটো প্যাংকোর সম্পর্কে ট্যাঙ্কিওলা কী ভাববে কে জানে। বেছে কেলেকারীর একপেশ না কর।

কিন্তু ব্যাগটা কোথায় বোঝা যেতে পারে?

তেবেতিতে সাব্যস্ত করলুম যে, শিখারদার মোড়ে ঠালাঠালি কানটা থেকে এখন ঠেলাঠেলি ক’রে নাহি, সেই সময়ই নিশ্চয় কেউ পকেটটিকে হালকা ক’রে দিয়েছে, আমি টেরও পাইনি। তারপরে হট্ট লেনে ভারতাতাইয়ের বাড়ি হয়ে ফেরবার সময় ঠান্ডা কিংবা বাস না হ’লে বেহালবশেই ট্যাঙ্কি থেকে উঠে বসেছিলুম আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর বাড়ি ধাব বলে। বন্ধুর বাড়ির কাছ-বরাবর এলে ট্যাঙ্কি ছেড়ে দিতে বাধার মুখে মানিব্যাগের বাসীতবনটা বহা পড়ল।

তাই তো, এখন কী করা? বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ট্যাঙ্কিওলাকে বিনামূল্যে করতে হবে না কি? কিন্তু ধরো—বন্ধুর যদি এ সময় বাড়ি না থাকে! আমার লগে দেখা যে এখন হবেই, তার কোনও বিরতি নেই, কারণ আমি আসছি বে-এতলা। সেক্ষেত্রে ঐ ট্যাঙ্কিই ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ি কিংবা নিয়ে তাক। মিটিয়ে দিতে হবে আর কি! এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বিভ্রাটময়কের মত হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ইন্সটাইন্ট, পকেটে একবার। একশো টাকার নোট আলাদা ক’রে রাখা ছিল—কর্পোরেশনের টেক্সেস। আর ইলেকট্রিকের বিল মিটিয়ে দেবার কথা আমকালের মতোই—

তাকাতাকি হাত নিয়ে টের পেলাম, সেটা স্বহস্তেই বর্তমান। বাহ দিয়ে অম দাঁড়ান হেন। নোটটাকে বের ক’রে জ্বাইতারক দেখাতে গে বললে, অত টাকার আভিত তার কাছে হবে না। নিরর্থক কেনেও লাভের পানের বোঝানটার জিজ্ঞেস করলুম। বোঝানী বললে, “হাজার পাণ তো ওতনা খুঁজা নহী হায় বাবুজী। লেকিন ও-হি যে দেখছেন, উনুকে পাণ মিলতে চি পারে—আপ, গুহ, কর দেখিয়েন না।”

[illegible]

অবশ্য, এতে এক চ্যাঙো হোতা দেখিবে, একশো টাকার নোট ভাঙানির কথা এক বলে কী হবে! পানের দোকানী ঠাঁটা করছে নাকি? ইতিমধ্যে সে ছেলেটি খালি চায়ের গ্লাসটা হুঁড়ে কেলে নিয়ে ধাঁহাতে পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে দান মিটিয়ে নিয়েছে। তারপর রাত্তা পার হয়ে এদিকে এলিখে আসতে আসতে হাঁক দিলে—“এক পান লাগা দো তাই লাগা”

পানের হোকারের সামনে এসে থাকি। কত যেন্দু, না, হঠাৎ হোকারা ঘোষাছিল, আসলে
ও ভতটা নয়—বহল তিরিশের নীচে হবে না। বলি লম্বা হোকারা চেহারা, গায়ের রং মাঝা, এক-
দিকের হলে এতটা পক্ষীর ক্ষতচিহ্ন, মাথাও তেল-চক্কে লম্বা হুলে আসবার-কাটা টেরিহ বাহার।
পোখাকে চেপে ধরে কিছুক্ষণ; প্রথমেই একটা লিগারেট কিনে থালা। সৌক ক'রে জুজটান দিয়ে
অনেকটা হোকারা ছাড়া একসঙ্গে।

পান সাংকেত লগতে হোকাণী—ওহ পুরো বাহ সাধু সাই, পরে জেমেদিগুহ—বললে, “এতাই মিস্রিলে, এই বাবুলের একঠো পক কপোর লোট্ তাহিয়ে বিতে গায়ে? বাবুলী সুখকিলে পকে পেছেন।”

দ্বিপ্রদীপাল সিংহের ঘোঁরাই মতো নিয়ে একবার আশ্রয় দিকে তাকাল। তারপর গায়ে পড়ল। একে একে টেনে বের করলে একতড়া নোট। শুনে শুনে মনমোহন মল্লিকার নোট তা থেকে আলাদা করে নিয়ে আশ্রয় দিকে এসিয়ে বিয়ে বললে, “লিখিয়ে” আমি তো ব’। আড়চোখে বেবে নিলুম, তাকাতার আরো শত্রেয়ক টাকার নোট আছে বেকজর। কানভিটা আশ্রয় দিয়ে আস্ত নেটটা আশ্রয় লাভ থেকে নিয়ে তাকার ছকিয়ে ফের লকেটে গুলল। আশ্রয় বললে, “গ্রিক আছে, বাবলী” আমি খাত নেড়ে বললুম—হ্যাঁ।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে বন্ধুর বাড়ির দিকে পা বাড়াতে বাবু, যেখা কী—দিল্লীলাল হ'লানকে
পানের দোকান থেকে সরে এসে আনায়েই ছেড়ে দেওয়া ট্যাক্সিটায় উঠে বসল। যেখানে যেখানেই
ট্যাক্সিটা একদিকে অগ্রসর হয়ে গেল।

একটু অধ্যাক্ষাশন। হা'তিনপ টাংকা চোঙা প্যাণ্টের গলকেটে নিয়ে ঘোরে, এমন মাহির দৃশ্য বেশি দেখা যায় না। সেল আবার ট্যাঙ্কিচেপে। হরত কোন অবস্থানী বড়লোকের ছেলে।..... কিজ, কোন বড়লোকের ছেলে কি ছুটকে। হোকানে পাড়িয়ে পাড়িয়ে মাটির ভাঁকে চা বাগ ? কে কানে, হতেও পারে বা। বড় মাহিরের হরেক শেরাল।

আল্ফ্রেড হক্‌স্‌ট্যাট কিছু ব্যক্তি ছিল অনেক ।

কিছুদিন পরেই কথ।

পূর্বোক্ত বন্ধুর বাড়িতেই থাকিলুম। এখানে আর ট্যান্ডি নয়—ট্যাম স্টেপেনে নেবে গ্যারে
হেঁটে চলছিলুম বাড়ি পথটুকু। বন্ধুর বাড়ি থেকে দু'দিন বর্ষি হুবে হুটপাথের দ্বারে বটান্দ সময়
গেল আটকে।

কোনো বিষয়ই হয়না নিজের চোখকে । এটা কিরকম হল ?

সেই মিঞ্জিলাল।

কিন্তু আজ সম্পূর্ণ পটপরিবর্তন। বনপরিবর্তনও। ঘিড়েটারের ঐক্যে যেমন বেধা বাহ—
প্রথম দৃষ্টির রাবার ছেলে করেছটা কুত পথে ধীন, এনে আবির্ভূত!

ছোঁচোব বগড়ে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলুম। না,
মিঞ্জিলালই। ১৯৭২ দেখলে এ অবস্থার ভিনতে না পারারই কথা।

টেমিনিদের খাটের আয়তায় একটা লাভকটা কতখা। চোঁড়া খাটের ওপরে ময়লা খেঁটে
মুতি হাঁটুর ওপরে তোলা। ছোটো খাটা দিশাবেরই মত, ব্যক্তি বিড়। কুটিলারের ওপর কি একটা পেন্সে
বলেছে চারপাশে ছুতো সাহাবানের সরঞ্জাম ছবিতে।

ভেঁটাতা লোহার পানানিটার ওপর একটা ছুতো বো: 'বো পেন্সের টুকতে ব্যত।
পুণ্ডোবর মুতিব বেশ ও পরিবেশ।

বনকে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলুম ওর সামনে আগুন। পেকেই। একটু পরেই কাকের কাঁকে মাথা
তুলে ও চাইতে চোখোচোখি হয়ে গেল। বললুম, "কে, মিঞ্জিলাল না?" চোখ মেখে ঘোঁরা গেল, মনে
করাই ভেঁটা চলছে ওর ভেতরে। আবার বললুম, "ভিনতে পাছে? সেদিন সেও সাধু না কি, তার
হোকানের সামনে তুমিই তো আবার একবার একশো টাকার মাই তাকিয়ে দিয়েছিলে, তাই না?"

এবার ভিনতে পেরেছে। পরিপূর্ণ হাসিতে তারে উঠল ওর মুখ—"হী বাহু!" বেশ প্রথম লাগল
ওর হাসিটা।

একটু সময় আমি ওর লবল হাতদুখানায় কাক বেরলুম। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আর
কী বলা যতে পারে তবে গেলুম না। সেদিনকার ছবি আর আজকের ছবির মাঝখানে যোগদুটো
কোথায়, মনে মনে তারই হৃদয় খুঁজছিলুম, কিন্তু গেলুম না। ইচ্ছে হাঙ্গল কিজেল কদি, এটাই ওর
আদল পেশা কিনা। সেটা কেমন শোনায়ে, ও ভিতাবে নেবে, ইত্যাদি ভেবে হুগ ক'রেই রইলুম।
ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে মেখে মিঞ্জি একবার কিজেল করলে: "মুতি লাভাইয়েগা বাবুজী?"
সেই হাসি হাসি মুখ। আমি একটু বিরত বোধ ক'রে বললুম, "না, না, এখন আমার কিছু করতার
নেই, তাহাড়া লম্বক নেই, এক কারসায় বাজি এখন। আজ্ঞা চললুম।"

হাত দুটি তুলে মিঞ্জি বললে, "রাম রাম বাহু!"

আরো বানিক এগিয়ে গবেই সাধু সাটয়ের সেই পানয়ে
গাড়াগুম। সাধুকে বললুম কখাটা, কিজেল করলুম ব্যাপারটা কী।

"কী, ওহি ওর কাম আছে। কতো মুতিই আছে বাহু। তোবে ওর অনেক পরস", সাধু বললে।

"অনেক পরস! হোকগায় করে মুতিগিরি ক'রে?" আমি অধ্যাক না হয়ে পারি না।
পরসায় প্রমাণ সেদিন গেরেছি, কিন্তু ছুতো লাড়িয়ে কি অত হয় কারো?

"ও অপর একটা কী করে। হুহু বেতলা।" সাধু এবার আশায়।

বাবলা? কী বাবলা করে আবার? সাধু তা বলতে পারলো না, তবে জানা গেল, তাতেই
হোকসায় বেশি। মুতিগিরি ক'রে ও ভালই আর করে। আগের দিন কোথাও হাঙ্গল বোধহয়, হুত
কোন কাক, তাই অত গোবাকের তরিকং ছিল। আজ আমি বেগানে দেখছি সেখানে বসেই ও
লাম্বাশত মুতিব কাক করে।

সাবু সাউ পানওয়াল, বেগলুম, মিশ্রীলাদের অনেক খবরই আছে।

ও-তজাটেই মিশ্রী বাসা। তাড়াটে একখানা ঘর। বিহারে পুণিতার ওদিকে কোথায় যেন বেশ। সেখানে কে আছে না আছে সাবু জানেনা, তবে এখানে একাই থাকে। বয়স তিরিশ-বত্রিশ। বিয়ে-সানি কিছু হয়নি, করতে কিনা কোনদিন তা ও-ই জানে। লেখাপড়া সামান্যই করেছে। সাবু সার্টিফিকেট মিলে : মনটা নাকি মিশ্রীর খুব পাশা। তা ছাড়া, তত্ত্ব, মিটভাবী, নরম মেজাজের লোক, বুদ্ধি-বিবেচনাও যথেষ্ট আছে, কেবল একটু—। সাবু কথটা শেষ না করেই বেয়ে গেল।

কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক। বললুম, “কেবল একটু—কী?”

প্রথমটার বলতেই চায়না। একটু শিঁড়শিঁড়ি করার পর তবে ভাতে। একটা চোপ খুঁচকে খুঁটাকে ডাইনে বাঁয়ে বার করেই ক্ষত চালাচালি করে বলে, “যোক! ইবার উবার খুঁত! ছায়! কোরান মরম তো, তার উপর সাহি-উকী হোয়নি—সন্সালেন না বাবুদী?”

“সাহি-টাক বার নাকি?”

“না বাবু, হামরা তো কোনদিন মিশ্রীকে সাক্ষি পিতে কি মাতেয়াল্লা হতে দেখিনি।”

অতএব সন্সালে বেগি দেখি হলনা। কাছাকাছির মধ্যেই একটা বিশেষ পরী আছে, খানা সাবু সাউ সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে।

বন্ধুর এখানে বাবার সেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে আর ঝগড়ান না। সাবুর শেষ কথটার কেমন যেন একটু বিরূপ ভাব জাগল মিশ্রীলাদের ওপরে। এক কড়া ঘুবে শেষে এক কোঁটা চোনা!

সরজ বেমন, কৌতুহলও ভেমনি বড় বালাই। আমার সরজ ছিল না—কোথাকার কে মিশ্রীলাস কী করে ভীষন কাটায়, কি ভাবে ভাল আর তরে, খুখ্যাত পরীতে যার কি যায় না, তাতে আমার হরকাবটা কী। কিন্তু কৌতুহল অমোহিত লোকটির লম্ভে।

সলুম একদিন ওর ওখানে। সাবু সাউয়ের কাছ থেকে নিশানা নিয়ে খুঁজে পেতে যেত করলুম ওর বাসায়।—“এখানে মিশ্রীলাস থাকে?”

“মিশ্রীলাস? জুতো সাবায়?” একজন বললে।

“হ্যাঁ,” আমি বললুম। সে লোকটি হাত তুলে দেখিয়ে দিলে—“ঐ ঘর।”

আবার বেগে উদ্ভাগিত হল মিশ্রী—“আসেন বাবুদী আসেন। আপুনে হামার সর্বী-বানামে আসিয়েছেন,—আরে বা-বে বাপ! আসেন বাবু আসেন।” সত্যর্থনার ব্যস্ত হল মিশ্রী—“সেদিন হামার ডেরা আসলেন কী করে?”

“এই এলুম খোঁজ করে করে,” আমি বলতে বলতে বললুম, “একটু পরওগম করতেন। তুমি কী করছিলে? বেতবে নাকি এখন?”

“এনোন সুস্থ না।” লাতের কাকটা সরিয়ে রেখে বললে, “যেরোবো পোরে।” স্বল্পকালে দুপাটি বাতে পর হালিটা খুব আকর্ষক। সাবু গ্রিকই বলেছিল, মিটভাবী, নরম মেজাজের সাহব। এই একখানা ঘরেই ওর পোকা-বসা-বাক্য বা কিছু। এক কোণে খুঁটির সরকাহ। আরেক কোণে রামাখাখা। ঘরের অভ দিকটার চারপাইএর ওপর সাক্ষিও কিছু পরিচ্ছন্ন বিছানা। বিছানার

একপাশে চোয়ার লম্বের এক ছোট কাঠের টেবিল, অপরপাশে একটা ছোট বেতাক-আলমারি।
একদিককার কোণে হাড়ির আলমারি কিছু কামা-কাগজ।

পূর্ণিয়ার এক গ্রামে বাড়ি। কাত-বাংসা দুটিসিঁরি, তারসকে কিছু কিছু চাষ-আঁবাঁব—
নিষেধের অধি নয়, পথের অধিতে তাগচাং। কলসের একটা অংশ আলত বহরে। পৈশবে হাতে
বড়ি গ্রামের পাঁচশালায়,—বাঁবার ছিল হেলেকে লেখাপড়া লেখাবার লগ। পরে পথের কুলে ক্রাস
টেন অবধি পড়েছে মিঞ্জি। বাঁবার আর চাচার হাতের কাছ ছিল ভারি পোকা। বাঁবা-মা মাঝা
সিয়েছে, একটা তাই আছে, সে পাটনায় ঢাকরি করে। চাচা বিন্টু'রাম এখনো বেঁচে—সেও এখন
কলকাতাবাসী, তবানীপুরের ওধিকে দুটির কাম করে। বিন্টু'রাম অত্যন্ত ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক,
হাতের কাছ চমৎকার, হাতাতিবিক্ত মজুরীর চাহিদা নেই, অগ্রেই লম্বট, বের্তীক নীতিগরাক্তন মায়ুধ।
সানী-উরী করবনি, একাই থাকে।

“তুনি সানী কর নি?”

মিঞ্জিলালের চোখে বিবরতার ছায়া পড়ল—“না বাবু! সানীর আর হানার অকরং নেই,
বিহাতি নেই।”

সে এক অধ্যায়।

পথের কুলের ক্রাস নাইনের ছাত্র মিঞ্জিলাল কিশোরী মোতিয়াকে মন দিয়েছিল। মিঞ্জি
তখন সাতা-কোয়ান বয়স, প্রথম দৌবনের বক্ত সাঝা দেহে টস্‌বু' ক'রে ফুটছে। ক্রাস নাইনে লোকে
সাধারণত যে বয়সে পড়ে, সে বয়সটা বানিকটা গিহনে কেলেই এসেছিল, তার কারণ পথের কুলে পাঠ
শুধু কবাইটাই হয়েছিল দেখিতে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়—নানা বিকে তার প্রচুর ও লমান
উৎসাহ। কাতবাংসা দুটিসিঁরিকে সে অবজ্ঞা করতে শেবেনি যেমন, তেমনি শিবেছিল লেখাপড়াকে
ভালবাসতে। গ্রাম থেকে পথের চার পাচ ক্রোশ দূরে। কুছ পরোয়া নেই—কয়েক মাস প্রচুর বাটল
মিঞ্জি নানা বরপের কাছে। কিছু পরলা অবল হাতে। তাগচাংয়ের পাণ্ডনা কলসের অংশ বেচে যিহে
বাগ বাকি পরলার যোগ্য ক'রে দিল। কেনা হল একটা লাইকেল। নতুন বক্তৃথকে লাইকেল চালিয়ে
মিঞ্জিলাল পথের পড়তে যেত, তাইতে কেলেই কিরে আলত বহরে। এই তাবে ক্রাস নাইনে উঠল।

ক্রাস নাইনে ওঠবার কিছুদিন পরেই প্রেমের বেগতার শিকার হল মিঞ্জিলাল।

পাশের গ্রামে ছিল মোতিয়ার বাগের বাড়ি। মিঞ্জি লাইকেল চালিয়ে পথের বাঁবার পথে
আচমকা একদিন চারচোখের দুটিবিনিময় হয়ে গেল। এই প্রথম দেখা। তাগচাই চোখা, আউট স্বাধ্য,
এখনকার চেয়ে আরো ভাল দেখতে ছিল তখন তাকে। মিঞ্জিলাল ব্রেক কবে কেলেছিল—তার সেই
এক পা হাঠিতে ঠেকেনো দিয়ে লাইকেলের ওপর বাড়ি বসে থাক। দুগু তলীটা কিশোরী মোতিয়াকে
নুড় করেছিল। আর মিঞ্জিকে নুড় ক'রেছিল মোতিয়ার দত্তিরা বেগের বত লাংগাতরা হুংব
হুংবাণি। সেদিন ঐ পর্বতই, কিন্তু হুংবের কাগোই নুড়তে যেহি হয় নি, তারা কী বাঁধনে বাঁধা
পড়ে গেছে।

স্বাক্ষণের মেয়ে মোতিয়া। যিহে হয়েছিল প্রায় পৈশবেই। কয়েক বছর পরে স্বামীটি মারা
যায়, বিধবা হয়ে মোতিয়া ক্ষির আসে বাগের বাড়ি। সেট থেকে বাগের কাছেরই বাস। বেতকা
বেগের দ্বিতীয়বার যিহে হয়না ওধের বহরে, অতএব সে প্রায় নেই মোতিয়ার কেলে। কিন্তু কিশোরী

মনের দাবীকে অস্বীকার করে কী ক'রে মোতিয়া? দিল্লীলাল রাজনটাকেই দেখেছিল সেই বিধবা ঘরে, তার আতটাকে দেখে নি—তার বাতাবটাকেই চিনেছিল, আত-বাবলার দিকে চোখ ফেঁদে নি।

এক বছর হবে ওদের সোণান দেখালাকান্ড চলছিল। দিল্লী আনত, মোতিয়ার বাবা গোড়া বাবুন: বিধবা ঘরের পুনবিবাহের রীতিনীতি এই দেখানো, সেখানে হুটির ছেলের হাতে—হোক না সে বড়ই সুপুরুষ আর তন্ত্র—মোতিয়াকে দেবার আগে ঘরেকে বরং কেটে ফেলে দেবে সে। আর তাছাড়া এমিকে দিল্লীর নিষেধও সরকার জু'গারে ঠিকারার সঙ্গে একটু প্ররুতি। তারপর নিষেধ মনের মালুমকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে সে অস্ত্র কোনখানে। ততদিন একটু চেপেচুপে থাকাই ভাল।

কিন্তু তা আর হল না। দিল্লী রান টেনে ওঠবার পরে ওদের সুহৃৎ আনামানি হয়ে গেল। মোতিয়ার বাবা দেখে একটা করেছিল আপসেই, কিন্তু হাতে নাতে কোনদিন কিছু বরতে পারে নি। পাড়াপড়শীরাই একদিন কল্যাণ ক'রে কানে তুলে দিলে কথাটা।

তারপর সে অনেক ব্যাপার, অনেক হৈ চৈ। শেষতক হল এই যে, মোতিয়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ওর বৃহস্পতির এক চাচার বাড়িতে।

আমি প্রশ্ন করলাম, “তারপর?”

দিল্লী বললে, সেখানে এক চাচেরা ভাইয়ের কুনম্বর পড়েছিল মোতিয়ার ওপর। একদিন বধর এসে, মোতিয়াকে একদল স্ত্রী সুখ কাপড় বেঁধে তুলে নিয়ে গিয়েছে একলা গেয়ে। সেই ভাইও ক'দিন বাচ্ছেই নাগাড়া। অনেক বোম্ব-ববরও মোতিয়ার লন্ডান পাওয়া গেলনা আর। ভাইটার বিশেষ বোম্ব দিলে না কেউ। বললে, মেরেটাই ব্যাংগ, ছেলেটাকে সে-ই প্রয়োচনা দিয়ে বর ছেড়ে গেছে—ওটার কাহিনী অস্বীকার।

দিল্লী বললে, “হাসি সে কথা বিস্ময়গান করিনি। হাসিও বহু চুঁড়েছি। लेकिन মোতিয়াকে কুছ বদিশ দিলো না। লিবাগটি তুলে বেধে বেরিয়ে লন্ডান বিহার হুণ। হুতে হুতে শেষে কলকতা চলিরে এসাম।”

“তারপর?” আমি জানতে চাইলাম।

“ইখানে কিন্তু হুটির বেওলা গুরু করলাম। কাহ করি, ইবার-উবার জুনে বেড়াই, বদন বিখানে হোক থাকি। এইলাই বহু বরং কেটে গেলো। হঠাৎ একরোজ পাড়া মিলে গেলো মোতিয়ার। দিলে বড়ি দান্য লাগলো সেদিন। ব্যাংগ হয়ে গেছে মোতিয়া—ব্যাংগ পাড়ার বর গিরে থাকে।”

এ অকলে যে সুখ্যাতি গজাটা আছে, সেখানেই মোতিয়ার বর্তমান আত্মনা। দিল্লীলাল বধর গেয়ে গিয়েছিল সেখানে। অল্পর মধ্যে দিলে মোতিয়া অনেক কাহিনী বলছিল দিল্লীলালকে।

মোতিয়াকে স্ত্রী দিয়ে চুঁরি করিয়েছিল ওর সেই চাচেরা ভাই-ই। কোনও এক স্ত্রী ডেরার নিয়ে গিয়ে কুলেছিল। তারপর প্রয়োজন হুঁরিয়া গেলো বিক্রী ক'রে গিয়েছিল পাগের বাবলার এক আড়কাটির কাছে। বাড়িতে সমাজে কিত্তে বাবার তো কোন গব নেই, এই ঘটনার পরে দিল্লীও তাকে গ্রহণ করতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ আছে। তাছাড়া দিল্লীই বা এখন কোথায় তা কে জানে। এই সব ভেবে এই কীমনকেই যেন নিতে বাধ্য হয়েছিল ব্রাহ্মণের ঘরে মোতিয়া—মতিয়া বেলেয় বত জ্বলয় মেয়ে মোতিয়া।

চলো, কিরে চলো আমার লবে—বলেছিল মিজিলাল—তলতাতা পড়র পুখিরা নয়, এখানে জু'কনে বিয়ে ক'রে আদী-ক্রী হব, লগোর লাভব।

না, এ বেহ অনেক মোতির মতক হয়ে উঠেছে এত বছরে—মোতির! উত্তর দিয়েছে—বর্ষপতী হবার যোগ্যতা এর নেই আর। তাছাড়া বাহাব বিহার হয়েছে মোতিরার, যা এ লাইনে লক্ষ্যলভ্য—কোনক্রমেই সে রোগ মিজির শরীরে সংক্রামিত করতে পারবে না সে।

“তারপর?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“মোতির! উবানেই থাকে, হামি ইখানে। আজকাল উও বরিদারের পাট তুলে দিয়েছে, কাউকে পাতা দেয় না, সবচেয়ে ঠাকিরে হয়। হামি বাই আমি, দেবতালু'করি, বরচা-উয়চা সব দিই ওর। এক হোজ যে দিলু দিয়েছি উস্কো, সে তো আজ বে-তরুল যেতে পারি না। পারি কি বাবু'কি?” মিজিলালের চোখের কোণে ছোট্ট এক ফোটা জল চিক্‌চিকিরে উঠল।

“কিন্তু এত পরসাকড়ি শ'ও কোবা থেকে? জুতোর কাল ক'রে কত কামাও জু'কি?”

“বহুবাআরে একটা খদিচাচকে জু'কানমে পাটনার হইয়েছি এক বকালী বাবু'র সাথে। উস্করক থেকে কুছু হোজগার আছে, দুটির কাম করিয়েও কুছু কমাই। চমিরে বায় মোনা মিলে।”
 বোভা সেল, সাধু সাট পাটনারশিপ বিজনেলের ব্যাপারটা ঠিকমত জানে না। আরো বোভা সেল, শনিকাপতীতে মিজির বাতায়ানের আসল কারপটাও তার একবারেই অজানা।

নতুন এক লুট্রি নিয়ে আমি তাকাদুর মিজিলালের দিকে।

বৌদি

সিহিরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭ নম্বরে সাঙ্গিক্যাল ওয়ার্ডের ১৮ নম্বর বেড্‌ থেকে সন্ধ্যাপনের ভৌতুহলী গৃহী নিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখছি নতুন অঙ্গত। বাসিন্দারা অধিকাংশই শারিত বা অর্ধশারিত। বে ক্রমবর্ধনের অপারেশন হোয়ে গেছে তাইর মধ্যে অধিকাংশেরই হাতে লগানো রয়েছে ত্রাদাইন টিউব, নাকে অক্সিজেন আর লুক্সন পাইপ আর কত্থানে বিরাট ব্যাণ্ডেজ—অপারেশনের বিজ্ঞাপন। অঙ্গ বহুবার যে কাতব পোড়ানির লক্ষ মার্কে মার্কে বেরিয়ে আসছে, তা অপেক্ষমান অপারেশন পেনেটরের মনে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিভীষিকার আতঙ্ক। সাঙ্গিক্যাল ওয়ার্ডে আজ আমার প্রথম বারি। কত বকম ভাবাবি চিহ্ন ঘটনা আমার অঙ্গ ঠিক পেতে আছে কে জানে।

পার্শ্বের ১৭ নম্বর বেডের অমিতাভবাবু লম্বা কিছুকণের মতোই বেশ আলাপ হোয়ে গেল। ভ্রমলোকের বয়স আমারই মত—সাতাশ আঠাশ হবে। চিৎ সুখের ভেতর এমন একটা শিশুহুলত লম্বলভাব বিস্তারন, বা মনকে সহজেই আকর্ষণ করে।

কিছুকণ পর ওয়ার্ডের বড়িতে গটা বাজল। লাল বেন্ট পরিহিতা একজন সিষ্টার একে একে নিদ্রিষ্ট হোঙ্গীরে ইনজেক্শন দিহে চলে গেলেন। আলমারীর উপর পর পর বাবাবের খাল। য়েবে চলে গেল ওয়ার্ডের। বিছানার বসে কি করে লোকগুলো বঙ্কলে খেবে চলেছে তাবহি, এমন লম্ব অমিতাভবাবু আমার মনের তাব বুঝে নিয়ে বসে উঠলেন—কি মিঃ চ্যাটার্জী? তেবে আর কি হবে—এবার শুক করে দিন। হাসপাতালে যখন এলেছেন তখন আর আচার বিচারের কথা তেবে লাগ নেই। অবন্ত আপনাকে বলছি; প্রথম প্রথম আমারও ওরকম হোয়েছিল।

—গ্রিক বলেছেন অমিতাভবাবু। এমন থেকে আমার মনে করতে হবে, "That was when I was a man; now I am a number"—number 18 of the Surgical Ward—কি বলেন?

—আপনি তো বেশ রসিক লোক নশাই!

—হিসাব, তবে এ নীরল পরিবেশ যল-কল আদৌ বরদাও করবে কিনা যব্বৈ লম্বের আছে।

কিছুকণ পর কালো বেন্ট পরিহিতা একজন সিষ্টার এলে প্রডোকেটর গ্রাসে গুব দিহে গেলেন আর লাল বেন্ট পরিহিতা সিষ্টারটি খোঁক নিয়ে গেলেন পেনেটরের টিকসত ওবু খাওয়া হোঙে কিনা।

সিষ্টার দুজন ওয়ার্ডের বাইরে চলে গেল অমিতাভকে জিজ্ঞেস করলাব,

—আজ্ঞা, সিষ্টারদের দুজনের বেন্টের হুে দু'রকম, কেন বলতে পারেন?

—ও কিছু নয়; সিনিয়র জুনিয়র ব্যাপার আর কি। লাল বেণ্ট মানে
সিন্ধার—কালো বেণ্ট মানে জুনিয়র।

—অর্থাৎ কমিশন নন্ কমিশন-এর ব্যাপার। কি বললেন?

আমার কথা শুনে ১৬ নম্বরের মিঃ হস্তও হালিতে বেগে দিলেন। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বেশ
কিছুটা সময় কেটে গেল। আশে আশে ওয়ার্ডের অবিকণে সাইট অফ করে দেওয়া হোল। আবার
ভৌতিক পরিবেশে বইতে মনঃসংযোগ করার প্রচেষ্টার দ্বারা হোরে অগত্যা লম্বাচরিত্র গ্রহণ করলাম।

পনের দিন লকালে ভান হাত ধরে কে একটা স্ট্রাকুনি দিতে খুঁটো তেলে গেল। চোখ মেলে
আবিষ্কার করলাম একজন জুনিয়র সিন্ধার অর্থাৎ কালো বেণ্ট আমার পাশে দাঁড়িয়ে। হাতে
বার্দ্‌মিটারে। বিরক্তি চাপতে না পেয়ে লোকা বলে বললাম:

—ও—দাঁড়িতে একটু খুঁটোতেও বেধেন না?

—একটু কেন, আপনি সারাদিন বলে খুঁটোন।

করতে হবে।

সিন্ধারের দলার ঘরে কিছুটা বিশ্রামিত্রিত বিরক্তির ভাব স্পষ্ট অদৃশ্য করলাম। কিন্তু
চোখ তখন আমার খুঁটের রেণে বড়িয়ে আসছিল। তাই কথা আর না বাড়িয়ে বার্দ্‌মিটারটা
সিন্ধারের হাত থেকে নিয়ে জিকের তলার রাখলাম। মিনিট দুয়েক পর সিন্ধার মুখ থেকে ওটা তুলে
নিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে আবি গ্যাপ করে গুয়ে পড়লাম।

বীতিমত এক ঘুম দিয়ে উঠে বসে চোখ মেলেলাম তখন বড়ির কাঁটার চটা। একটু লম্বাচরিত্র
গড়ে গেলাম; কারণ সময় ওয়ার্ড কর্মসূচির ফোরে উঠেছে। একমাত্র আমি ১০ নম্বর বিছানার বলে
তখন হাই তুলে ঘুমেব ভাব ঘুর করার চেষ্টা করছি। কিছুক্ষণ পর ঘুমেব ভাবটা কেটে গেলে টুথব্রাশটা
নিরে বিছানার বসেই ব্রাশ করতে শুরু করে দিলাম। সিনিয়র নাগ মিস্ত্র ও ঘুমেব বাতাতো নিয়ে
ব্যানিয়ার এক এক ক'রে এগিয়ে বাজেন গেলেক্টের কাছে। আমাকে দাঁত ব্রাশ করতে বেগে বেলে
কেলেন এবং কিছুটা টিগনীর ঘরে টেনে টেনে বললেন, “কি মি: চ্যাটার্জী, ঘুম হোল?”

প্রত্যুত্তরে গুণুগুণু বেলে আবার ব্রাশ করতে আরম্ভ করলাম। মিস্ত্র ও এগিয়ে বাড়িলেন
পরবর্তী বেডের দিকে। হঠাৎ পেছন থেকে জুনিয়র নাগ মিস্ত্র সাহা ডেকে উঠলেন, “বৌদি, তাকাতাড়ি
এদিকে আসুন। ৬ নম্বর বেন কি রকম করছে।” মিস্ত্র ওর অন্তর্গত কীরে এলেন, আর মিস্ত্র সাহা
এই অদৃষ্ট সংঘর্ষে অবাধ্য হোয়ে আমি আর অসিত্যক্ত পরাম্বের মধ্য প্রত্যেকটি চাহনির বিনিময়
করলাম। বলে কি। বৌদি। একে মিস্ত্র ওর তারপর কপালেও সিঁহর নেই। অথবা এ নিয়ে জল্পনা-
কল্পনার কোন দরকার নেই এই ভেবে বখেরে কপালে মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু
অসিত্যক্ত হঠাৎ এক অদৃষ্ট কাণ্ড করে বলল: মিস্ত্র ওর কীরে আসতেই লোকা বলে বলল।

—আজ্ঞা বৌদি, সিঁহর না দিলে কি করে বুঝে বসুন তো যে আপনি আমোদের বৌদি?

—কি? বৌদি। আপনাম কি মাথা ব্যাথা হোয়েছে? সাহা তাকল, “ওহ মি:” আর
আপনি ভুললেন ‘বৌদি’। যেহি আপনাকে E N T-তে পাঠাতে হবে।

—বেশ আপনি বেগানেই পাঠান, ঐ সাহই এখার থেকে চাপু হবে। অন্তত: আমি ঐ নামে
হাড়া আর তাকি না।

—মি: ব্যানার্জী, খুব ব্যস্ত পড়ে কিস্তি। তাৎহেন শুধি কখন হাসতে পারে না, ভাই ন: ?
 মুখে সলজা দুই হাসির তার নিয়ে মিলু গুহ আমার বেডের কাছে আসতেই আর হাসি চাপতে
 পারলাম না। মুচকি হেসে বললাম—তাৎহোলে ডাকটো আপনাব বেষ মমত হোয়েছে; কি বলেন ?

—মি: চ্যাটোজী শের পৰ্বত আপনিক বোপ মিলেন ওর সঙ্গে !

—মাথা ব্যস্ত পোয়েছে। মনের উপর ভাপ বসানোর গল্পপাতী আমি কোন দিনই নই।
 'বৌদি ডাকের অধিকার থাকবে একমাত্র অমিতাভের—সর্বস্বলংকিত'

—না, এবার পাসাই। আর কিছুকণ আপনাবের কাছে থাকলে বেবদি মাথাটা ব্যস্ত না
 হোয়ে থাকে না।

মিলু গুহ এসিয়ে গেলেন পৰ্বতী বেডের বিকে। অমিতাভ আমার ভূমিকার লক্ট'হোরে
 একটা কৃতজ্ঞতার হাসি দিয়ে আমাকে লজ্জাপ জ্ঞানালো।

বেলা একটার খাওয়া হাওয়া হোয়ে গেল। মিলু গুহ বদানিধর কবুকের খাতাটা নিয়ে এক
 এক করে পেনেস্টনের কাছে নিয়ে বৌক বসে নিতে শুরু করলেন। ১৭ বছর অর্থাৎ অমিতাভর
 বেডের কাছে এসেই গুহ হেসে বললেন,

—আপনাবের কাছে তো আসাও বিপদ।

—কেন বৌদি! আমমা কি বাব তলু নাকি ?

—আপনাব ঐ ডাকটো বুঝলেন, বাব তলুকের ডাকের চেয়ে কম জীভিগ্রন নহ। আজ
 কেউ যদি ভনে কেস তাৎহোলে আমার লম্বচে কি ভাবে বসুন তো ?

ভাববার এই মাঝে কি আছে। আর তাছাড়া ও ডাকটো যদি আমার ডেবর থেকে বেরিয়ে
 আসে—আমার কিছু করার নই। সত্যকথা বলতে কি জানেন ঐ ডাকটো আমার সমস্ত মন গ্রাণ
 করিয়ে তোলে। আর তার একমাত্র কারণ ঐ ডাকের সঙ্গে আমার জীবনের একটা কতল
 অব্যাহত কড়িত।

—কি সেই ওকণ অব্যাহত? শুনি। তবে খুব সংক্ষেপে বললেন; নাৎহোলে বুঝতেই পারছেন
 আপনাব কাছে পাড়িয়ে এতকণ পর করলে অজান্ত পেনেস্টন্য কি ভাবে।

তার নই আমার বাবা বৌদির কোন বিপদ হবেনা। বলা নিগ্রহোলেম পতীর আগ্রহে
 নীরব প্রোভার ভূমিক। গ্রহণ করে জনহিলায় অমিতাভর কৃতজ্ঞ আর হাংক হাংক ভাবহিলায়
 এই সাম্রিক বুপেও এরকম সরল অকণট মাছের বেধা পাওয়া যায়! লজ্জা করলাম দুহুর্ন্তের মধ্যে
 অমিতাভর বুপ ঘেবে কেনন বৎবে আকার ধারণ করল। অমিতাভ শুরু করল—জানেন বৌদি,
 ছোট বেলার ৭৮ বছর পৰ্বত মাতের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিলনা। বাব জেবে—আমর বয়ে
 আমি মাত্রে বোয়েহিলাম, তিনি ছিলেন আমাংবের প্রভিবেশিনী এক বৌদি। বাড়ীতে যে আমার
 আমর বয়ের অতাব ছিল তা নহ; কিন্তু বৌদির বক্তাধীমনের নিঃসঙ্গ বাতনা বাকে করেছিল
 বেরবারত। তাই নিজের কোল থেকে অকণটে বা জুসে দিয়েহিদের আমাকে বৌদির কোল
 করিয়ে তুলবার জন্ত। কিন্তু ভাগ্যহীনার তপালে দুখ হারী হয় না। কিছুদিন পর বেশ বিভাগ
 লংঘোলমুহুর পূর্নবাল থাক। নিরাপদ নহ দুখতে গেবে বাবা আমি বাড়ী লব বা হানে পারলেন বিক্রি
 করে দিলেন। তারপর এক দিন বদিয়ে এল বিবাহের দুহুর্ন্ত। কয়েক দিন আগে থেকেই বৌদির

বাঁধা বাঁধা বক হোয়ে গিয়েছিল। বাঁধার প্রাঙালে মা দেখা করতে গেলেন বৌদির সঙ্গে। পুত্রশোকাভুত জননী'র মত বৌদি তখন মাটির উপর উলুড় হোয়ে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কঁদেছেন। সে স্তম্ভ আমি আর সহ করতে পারলাম না। হঠাৎ বাঁধের ভোঁকুর মত চোখ তেঁকে আমার মল এল এবং বৌদিকে বড়িয়ে ধরে হাট মাটি করে বৌকে কেললাম। কিছু কড় বাঁধের চোঁবের কলের কাছে নতি স্বীকার করেনা। তাই আমাকেও চলে আসতে হোয়েছিল সকলের সঙ্গে কলকাতার। বয়সিন বৌদির কোন বয়স পেলাম না। মা চিঠিপত্র দিবেও কোন উত্তর পেলেন না। তারপর এক দিন সংবাদ পাওয়া গেল আমাদের একজন জাতিব চিঠিতে। কিন্তু সে সংবাদ না পেলেই বেঁধে হয় ভাল ছিল। বৌদির সম্বন্ধে একটি মাত্র সংবাদ ছিল—বৌদি পাগল হোতে গেলেন। তারপর দীর্ঘ ২০ বছর কেটে গেল বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে। এক দুপ পরে শেষ পর্যন্ত আপনায় মঝেই যে বৌদিকে হুঁজে পাব, হাসপাতালে আসবার আগে তা কি একবারও ভাবতে পেরেছি? অবিকল আমার বৌদির প্রতিজ্ঞা। সেই রকম মাজার সমতার ভরা মূণ—সেই লাগু চাকনি—সেই রকম রাহুধার সিদ্ধ পতিতখী। আমি জানি একজন অবিস্বাসিতা মেয়ের পক্ষে এরকম সংকল্প লভ খুবই অসম্ভব। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনাকে বৌদি ডেকে আমার লম্বত মন প্রাণ জড়িয়ে ধার। আপনি ওয়ার্ডে এলে মনে হল প্রাণ কিয় পেলাম, চলে গেলে মনে হয় স্তম্ভ মকছুমিতে পড়ে ছইলাম।

—আপনার কাহিনী সব শুনলাম। এরপর আপনার বৌদি ডাকে সত্যি আর বাঁধা দেখ না। কিন্তু একটা অজুহাদ, সকলের সামনে এ নামে ডাকবেন না। জানেন তো এখানে আমাকে চাকরী করতে হবে।

স্বস্ত হোয়ে শুনছিলাম অমিতাভর কেসে আসা দিনের কাহিনী আর লক্ষ্য করছিলাম মিস্ ওয়ে'র দু'বে লম্বেরনার স্তম্ভর অভিব্যক্তি। স্তম্ভ বেঁধা বিরোপাত নাটকের দর্পকের অভিজুত ভাব নিয়ে মিস্ ও'হ এগিয়ে এলেন আমার বেডের কাছে। অজমিরের তুলনার অপেক্ষাকৃত নিম্নবায় হানিদু'বে জিজ্ঞেস করলেন।

মি: চ্যাট্‌লী, কেমন আছেন—ওম্বুগাত সব ঠিকমত যাচ্ছেন তো।

—আর ওম্বুগাত! চোঁবের লামনে যে বিরোপাত নাটক হোয়ে গেল আগে তার রেশ কাটিয়ে উঠি।

অনেক বিরোপাত নাটকই আমারের চোঁবের লামনে বাটে ধাব মি: চ্যাট্‌লী। আংবা! শু' নীরব দর্পক।

ওম্বুগের বাঁধা নিয়ে মিস্ ও'হ এগিয়ে গেলেন পরবর্তী বেডের দিকে আর আমি একদূরে তাকিয়ে দেখলাম ও'হ রাহুধার স্বচ্ছ পতিতখী। অমিতাভ ভাল অছরী। লম্বত মন প্রাণ দিয়ে থাকে সে স্বাক্ষরে ব্যবহে, সে বধাধী অজ্ঞাতবায়ের চেয়ে লম্বত।

কিছুদিন পর বাঁ—ও টায় ডিউটি শেষ করে চলে গেলেন মিস্ ও'হ আর জুনিয়র সিটার মিস্ নিজে'ল প্রাণবীরনতায় জিনিয়ে গড়ল ওয়ার্ড।

বালিশের ভলা থেকে বইটা নিয়ে পড়তে পড়তে কখন জুনিয়র পড়েছিলাম বেয়া'লই ছিল না। দু'ম থেকে:ও'হে দেখি বাবা আমার বেডের পাশে বলে রয়েছেন। তাকাতাকি বিছানার উঠে বসলাম

বড়ির দিকে তাকিয়ে খুশলান তিনটিং আওয়ার্ণের এক বকী কেটে গেছে। প্রত্যেক পেনেলেরই পাশে বলে রয়েছে তার আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব অথবা আত্মহে অপেক্ষা তরে পেনেলের। এই ছোটো বকীর মত—৪টা বেকে ৬টা, ছবটির মত অমতঃ প্রাণ কিরে পার খ্রিস্টানের সাহিবো তবু আমি আর অমিতাক ছাড়া।

৬টার পর তিনটিংলার চলে গেলে সিটায়রা কিরে এলেন ওয়ার্ডে। জুমির মিল্ হাস নিরম মাকিক পর পর পেনেলের বেসলীট উঠে নিয়ে গেলেন। আমার বেডের কাছে এলে আমি উঠে হাঁড়ালার বেডের পাশে। ঠিক কাকে দাড়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। ৪টাৎ হালিদটা লড়াতেই একটা বই বেচিয়ে পড়ল। বইটা খুলে কিছুক্ষণ দেখলেন মিল্ হাস। তারপর দুই ঘেলে বইটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। আমি কিছুটা আশ্চর্য হোব করলাম এবং একরকম প্রশ্নের প্রশ্ন করলাম—কি ব্যাপার হাসছেন বে ? বইটা নিজস্ব দাড়ে বলে মনে হোল আপননি।

বইটা দাড়ে। Osear Wilde এর Picture of Dorian Gray' বিশ্ব সাহিত্যের একখানা অমূল্য সম্পদ—এতো লক্ষ্যেই আসে।

তাহোলে বইটা খুলে হাসলেন কেন ?

—হালি গেল এই ভেবে যে আপনি স্বার্থেই সাহিত্য রসিক। তা না হোলে এই নীরস পরিবেশে এ বরণের বই কেউ নিয়ে আসে।

মিল্ হাসের বাচনভঙ্গীতে আমার মনে হঠাৎ একটা কৌতূহল উকি দায়ল। কিছুটা সংকোচের ভাব নিয়ে হালিদুগে বললাম—কিছু বহি মনে না করেন, তাহোলে একটা কথা বিজ্ঞেয় করতাম।

—মনে করুন কি আছে ! কি বলবেন, বলুন না।

—আপনি কোন পণ্ডিত পড়াতেনা করেছেন ?

—বি. এ. পাশ করে চলে এসেছি।

—আক্ষরিক ! বি. এ. পাশ করে তো সার্টিং সার্টিলে কেউ আসে না।

—কেন, সার্টিং সার্টিস্ কি অভ্যাস ব্যাপার কাজ বলে মনে হয় আপননি ?

—ব্যাপার কেন হবে। 'Service to the suffering humanity'—এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কি থাকতে পারে ? তবে কি জানেন, এটা ঠিক যে বি. এ. পাশ করে এ লাইনে বড় কেউ একটা আসে না। তাই একটু অস্বাভাবিক হয়েছিল।—

অস্বাভাবিক লোকের মোহাৎ কন হয় নি। হামা তো এখনও বলে, আমার মত কুল চাকুরী ঠিক করা আছে, তবু আমার মত হোসেই হোল। কিন্তু আমি মত দিইনি জানেন।

—তাহোলে দেখছি Florence Nightingale-এর আদর্শ এ দুগেও মেলে।

—অন্তর্যুৎ কথা আদর্শের দুগে লাগেনা ; তবে এটুকু বসতে পারি এখন পর্যন্ত আমার দুটি-তিনটি পান্ডারনি। বাক্ এখার চলি—গরে কথা হবে ; সিটায়-ইন্-চার্জ আসছেন।

মিল্ হাস এগিরে গেলেন নামনের পেনেলের দিকে। কিছুক্ষণ পর হাউস্ লার্কিনরা এলেন হাউসে। তাং সেন এবং তাং বে অমিতাকের কাছে এসে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তারপর হাউসে লেরে ওরা চলে গেলে অমিতাককে এসে বিজ্ঞেয় করলাম—

—কি ব্যাপার! কি এত কথা হোল?

—কথা আর কিছুই নয়—কাল সকাল ৯ টার আমার অপারেশন। বলে পেলেন রাতে কিছু ঘেন্না বাই।

—কিছু হল। কওয়া নেই, হঠাৎ অপারেশন ঠিক হোয়ে গেছে।

—অপারেশনের কথা তো অনেক দিন থেকেই চলছে; এবার ঠিক হোয়ে গেল আর কি। আসলে কি জানেন পেটে যে কি হোয়েছে ওরা বুঝে উঠতে পারছেন।

—কি আর হবে জুওভিত্রাস বা পেপেটিক আলসার—তার বেশী আর কি হবে? ওর কক ধাক্কাধার কিছু নেই—ওসব আত্মকাল অসম্ভাব্য। আর তাছাড়া চিন্তা কি, বৌদি আছেন কাল সকালে। বৌদির স্মিট হাতের বেওয়া মহিরা নিয়ে যাবেন অপারেশন বিয়েটারে, তারপর কিত্রে এলে দেখবেন বেডের পাশে বৌদির হাসি মুখ।

আমার কথাগুলো শুনে অসিত্যন্ত তুধু মুহু হালিল। সারা মুখে একটা অকামা আতঙ্কের ছাপ। পরের দিন সকাল ছিল ওয়ার্ডের সব চেয়ে কর্ণব্যস্ত সকাল। চারটে অপারেশন হবে এবং প্রায় প্রত্যেক কটাই বেকর। ৭ টার কিছুকণ পর বিল্ড ওর ওয়ার্ডে ঢুকলেন। সমস্ত মুখে একটা বদ্ব্যমের জাহ। আত্তে আত্তে অসিত্যন্তর কাছে এসিয়ে এলেন এবং অনেকটা অসিত্যন্তকে স্বাভাবিক করার চেষ্টার বদ্ব্যমন্তর হালিল। পলার বদ্ব্যমেন—কি, অপারেশনের কথা তুনেই দাবড়ে গেছেন তো!

—তা আদি পাইনি বৌদি। কিছু তারো কি আছে কে বলতে পারে? আচ্ছা বৌদি, বরন যদি আমি ঘরে বাই, তা হোলে আপনি কি করবেন?

—বুধ, আপনি যদি এসব কথা পেতে থাকেন, তাকোলে এজুনি আমি চলে যাব। আছে-থাকে না বকে লক্ষী ছেলেটির মত চুপ করে শুয়ে থাকুন। কিছুকণ পর ইলি আসবে—অতুন অপারেশন পাউন পরে লেকেক্ষে তরে পড়বেন। তারপর আমি ডান হাতে টুক করে একটা ইন্ডেক্সন দিয়ে বের। দেখবেন যেন হবে বেন্দার বয়েছে। অপারেশন হোয়ে বাকরার পর বরন চোব বেলবেন, দেখবেন হাসিমুখে আমি আপনার পাশে ঝাড়িয়ে।

লক্ষ্য করছিলাম মুখে সাহপ দিলেও বৌদির মুখের বদ্ব্যমের তাব আগের মতই রয়েছে। কিছুকণ ওয়ার্ড বর ইলি নিয়ে এলে অপারেশন পাউন পরিয়ে অসিত্যন্তকে ভইয়ে বেওয়া হোল।

আমি উঠে বদ্ব্যমন্তর অসিত্যন্তকে অতর দিয়ে এলাম বিল্ড ওর ডানহাতে ইন্ডেক্সন করলেন। কয়েক মিনিট ওকে ঐভাবে রেখে বেওয়া হোল। তারপর চোবে মুনের তাব এলে ইলি বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে মেইন অপারেশন বিয়েটারের দিকে। অসিত্যন্তর বর্গা আর ছোট বোন ওয়ার্ডের বাইরে ঝাড়িয়ে। সারাসুখে তুধু উৎকর্ষ। আর অসিত্যন্তর ছাপ। ইলি চোখের বাইরে চলে গেলে মনটা অত্যন্ত মুগ্ধে গেল। অপারেশন থেকে আসার পর বেওয়ার মরত ২০ দিন কোন কবাই বলে মনটা অত্যন্ত মুগ্ধে গেল। অপারেশন থেকে আসার পর বেওয়ার মরত ২০ দিন কোন কবাই বলে মনটা অত্যন্ত মুগ্ধে গেল। অপারেশন থেকে আসার পর বেওয়ার মরত ২০ দিন কোন কবাই বলে মনটা অত্যন্ত মুগ্ধে গেল।

বেলা বেড়াটা সাগর ওয়ার্ড হঠাৎ কর্ণব্যস্ত হোয়ে উঠল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। স্মিটার-ইন্টার্জ ওয়ার্ড বরকে কি বলে বের তাড়াতাড়ি চলে পেলেন। কিছুকণ পর ওয়ার্ড বর ১৭ নম্বর বেড, লবিরে লেখানো একখানা সাজিক্যাল বেড্ দিয়ে চলে গেল। একে কিজেল করে

কানিতে পারলাম অমিতাভর অপারেখন হয়ে গেছে। কিছুকণের মধ্যে ওকে নিয়ে আসা হবে। মনটা আমলে নেচে উঠল। হাফ—অপারেখন তাহলে successful। অবীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম ওয়ার্ডের দরবার দিকে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল টলি ওয়ার্ডের দিকে আসছে। সাহনে ওয়ার্ড বয়—গাশে জুনিয়র সিটার মিস্ সাতা ত্রালাইনের বোতল হাতে করে লগে লগে আসছেন। টলি আমার পাশে এসে দাঁড়াল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় চোখ বুজে পড়ে আছে অমিতাভ—মাথের মাথের অফ্ট সোডানির শব্দ বেরিয়ে আসছে। হাতে ত্রালাইন, মাথের অজ্ঞেয়ন চলছে। সাহনে সিটার-ইন্-চার্জ আর বাগাশে দাঁড়িয়ে বৌদি মিস্ ওর। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অমিতাভর যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে আর মাথের মাথের ত্রালাইন টিউব গ্রিক করে দিচ্ছেন।

বিকলে চটা নাপায় অমিতাভর জ্ঞান ফিরে এস। আরি আর ১০ নম্বর মিঃ মত ওর সাহনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন আমাদের চিনতে পারত কিনা। কিছু ওর অভিব্যক্তিহীন মূর্ত চাইনি বেঁচে কিছু বোকা সেলনা। কিছুক্ষণ ঐভাবে তাকানোর পর অমিতাভ আবার চোখ বুজল। আরি আর মিঃ মত ফিরে এলাম আমাদের বেঁচে।

৬ টায় ভিমিটিং আওয়ার্স শেষ হোয়ে গেলে Evening shift এর জুনিয়র মিস্ দাস চুকলেন ওয়ার্ডে। স্বাভাবিক বেতনীট অ্যারেঞ্জ করতে করতে আমার বেডের কাছে এসে লাফা সজাণ জানালেন এবং বুক হেসে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছেন? বুধদৈ টিক মত হোচ্ছে তো?

—কিছুই টিকমত হোচ্ছে না। ১৭ নম্বরের লজ মনটা অত্যন্ত ব্যাধাণ লাগছে।

—চিন্তা করে লাভ নেই, মিঃ চ্যাটার্জী। যদিও জানি ওর লগে আপনার অত্যন্ত বনিষ্ট লম্পর্ক পড়ে উঠেছিল। কিন্তু.....

—কিন্তু কি, মিস্ দাস? বাবলেন কেন?

—মিঃ চ্যাটার্জী, আমাদের লজ প্রভুত হোয়ে বাবুন। ওয়ার বড় কোর ৩৪ দিন আছে। সাহা পেট ক্যানসার। অপারেখন করার আর কিছু নেই—পেট open করেই আবার সেলাই করে দেওয়া হয়েছে।

মাথা নীচু করে চলে সেলেন মিস্ দাস, আর লজপ্রভু হুঃসংবাদটা টেলিগ্রামের মত মিস্ দাসের কথাকলো আনাকে শুদ্ধ করে দিল। পুরুষ বাস্তবের চোখে লল শোভা পায় না এই নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হোয়ে চোখের ললভলো কর ত পশিমবো জঘাট বেঁধে দিগেছিল, কিন্তু সংবেদনশীল দাইব্রীগুলো কিছুতেই বস্তা নীকার করলনা। তবে তার কতকণ মূর্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন আর কিভাবে হুটকুট করেছিলেন তার এক দায় নীরব সাধী ছিল লজবতঃ বেওরাণ বড়িটা। তাইশর এক সময় মিস্ দাস বখন 'ডক্ট নাইট' জানিয়ে চলে সেলেন, তখন বুধদায় রাত এগারটা। লমত ওয়ার্ড মিস্—কেগেছিলেন শুধু আরি আর বুধের ঐ বেওরাণ বড়িটা। বুধনেই পরম্পরের জংগলন অহতব করছিলেন আর আসার ভরাবব বুদ্ধের্তের কথ তেবে মাথের মাথের ঝেঁপে ঝেঁপে উঠছিলেন। তাইছিলেন কেন অমিতাভর লগে এরকম নিবিষ্ট লম্পর্ক রচনা করেছিলেন। বুধা মর্মান্তিক লগেব নেই; কিন্তু প্রিয়লনের বুদ্ধাকে দায়ব বে বেবনা অহতব করে, তার একাশেও কি অহতব করে অকানা—অচেনার লজ? রাতা দিয়ে শব্দেব নিয়ে সেলে মন বিবর্ন হোয়ে পড়ে লতি, কিন্তু পজিশেল হোয়ে কি বুক ধিবে থাকে?

হাসনিক বয়সের অবসর হোখে কখন বুঝিয়ে পড়েছিলাম ক'ল ছিল না। যুব ভাবলে বুঝতে পারলাম বেশ বেশা কোয়েছে। কিছুক্ষণ পর ওষুধের বাতাস নিয়ে বৌদি গ্রন্থেণ করলেন ওয়ার্ডে। আবে আবে ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এলেন, তারপর অমিত্যভর বেডের কাছে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি উঠে এলাম যদি অমিত্যভর সঙ্গে দেখাবারের মত দু'একটা কথা বলতে পারি বা মিস্ ওষুধের কাছে থেকে যদি কিছু ভুলতে পারি; মিস্ হাসলের কাছে যা শুনেছিলাম অতঃ তাই চেয়ে কিছু ভাল বখ। কিন্তু মিস্ ওষুধের বখবে যুবের দিকে চেয়ে আমি আর কিছু ভিজেল করতে পারলাম না। আমি পাশে এসে দাঁড়ালে একবার আমার দিকে তাকালেন; তারপর হুজবই আমার তাকিয়ে হইলাম অমিত্যভর প্রায় নিশ্চয় তৈলাক্ত যুবের দিকে। কিছুক্ষণ পর অমিত্যভ চোব খুলল। অতুট সোডানির বত যুব দিয়ে শুধু একটি পৰ বেরিয়ে এসে, 'বৌ...দি'। মিস্ ওষু এগিয়ে গেলেন ওষু মাথায় কাছে; আমি এগিয়ে গিয়ে ওষু বেডের আর এক পাশে দাঁড়ালাম। অলহার তহাউ দুটীতে একবার মিস্ ওষুধের দিকে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে ত্রাহিতে আবার চোব খুলল অমিত্যভ। আবে আবে আমি কিরে এলাম আমার বেডে, আর ত্রালাইন টিউবটা ঠিক করে নিয়ে বৌদি মিস্ ওষু এগিয়ে গেলেন আমার পরবর্তী গেলেন্টের কাছে। আবারের হুজনের মধ্যে একটি কথাও আত্ব হয়নি; তার প্রয়োজবও ছিলনা। কারণ হুজনের অতুটিই হুজনের কাছে শ্রুতগুণে থাক।

৭টা—১০টার ভিত্তিট কোয়ে গেলেন মিস্ ওষু বেরিয়ে গেলেন ওয়ার্ড বেডে আর আমি পঃ হইলাম দ্বিতীযিকার কগতে প্রবণা বিতে। কিছুক্ষণ পর ওয়ার্ডের বড়িতে ওটা বাবল। একে একে ভিজিটাবরা সব ওয়ার্ডে চুকলেন এবং অম সময়ের মধ্যেই ওয়ার্ডেবরা কোলাহল যুবর হোয়ে উঠল। অতাত্ব দিন এই কোলাহলের একটা মিলি বাহ আমি অজন্তব করতাম। কিন্তু আবেতের এই তীক— এই কথাবার্তা যেন আমার বাস বড় করে দিজিল। ১০টার সময় ভিজিটাবরা চলে গেলেন যন্তির নিঃবাস ফেললাম। কিছুক্ষণ পর মিস্ হাস চুকলেন ওয়ার্ডে, অমিত্যভর বেডের কাছে এসে কঃক মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে হইলেন; তারপর যধানিয়ম বেডের পাশ দিয়ে বাবার সময় মুহু হলে ভিজেল করলেন—কেনস আছেন মিঃ চ্যাটার্জী?

—ভাল নেই। বিরক্তি মিজিত তারি ববে উত্তরটা যেন অনেকটা স্বতঃকুর্ভাবে আমার যুব দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার মনের অবস্থা সম্পূর্ণ উপলভি করে মিস্ হাস মাথা নীচু করে আগে আবে চলে গেলেন পরবর্তী বেডগুলোর দিকে।

বিছানার ওষু পুত্রদুটীতে তাকিয়ে ছিলাম আর যেন যেন তহাউ চোবে পাশকিরে অমিত্যভর অবস্থা দেখেছিলাম্। একটা অধিরতার ভাব অমিত্যভর মধ্যে যেন ক্রমপই প্রকট হঃ উঠছে। আলর বীজীযিকার করাল মৃত্তির কথা ডেবে শিউরে উঠলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম মিস্ হাসের কাছে। আমার উৎকণ্ঠিত অবস্থা লক্ষ্য করে আমি কিছু বলার আগেই ভিজেল করলেন—কি হোল আবার!

—মিস্ হাস ১৭ নম্বর যেন কিরকম কবছে। আপনি সিটার-ইন্-চার্জকে বখর দিন।

—ঠিক আছে, আমি বখর মিছি। কিন্তু আপনি বেরকম অধির কোয়ে পড়েছেন, তাতে তঃ হোচ্ছে আপনি একটা কাত না করে বলেন। ত্রতগণে বেরিয়ে গেলেন মিস্ হাস ওয়ার্ড বেডে। কিছুক্ষণের মধ্যে একবকম ছুটে ছুটে চলে এলেন সিটার-ইন্-চার্জ—লাবে মিস্ হাস। অমিত্যভর বেডের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং অতাত্ব উৎকণ্ঠা এবং ব্যততার লাবে মিস্ হাসকে কি যেন নির্দেশ

হিলেন। একরকম ছুটে বেরিয়ে গেলেন মিস্‌ হাঙ্গ। মিনিট দুইরক পেরেই ওয়ার্ড বয় চুকল একটা। অজ্ঞানেন দিশিওর নিঃ—‘পছনে মিস্‌ হাঙ্গ। অজ্ঞানেন পাইপ লাগিয়ে হওয়া হোল অমিত্যতর নাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুখন হাউল সার্জিন এলেন অমিত্যতর কাছে। অমিত্যতর চারদিক ঘিরে লব ধাক্কিয়ে—‘হাউল সার্জিন, সিটাই-ইন্-চার্জ, সিটার, ওয়ার্ড বয়। অমিত্যতর মূখ আর দেবাগেল না। কিছুকিছুক্ষণ পর যে লবগুলো কানে আসতে লাগল তা আর বেশিকণ লক্ষ করতে পারব বলে মনে হোচ্ছেনা। অলঙ্ বহুবার হুট্‌হুট্‌ করছে অমিত্যতর আর মাঝে বলে উঠছে “ক……ল, বৌ……রি, ক……ল, বৌ……দি।” হাউল সার্জিনরা এখ: সিটাই-ইন্-চার্জ পরশরের মূখ ডাওয়াচোখি করতে লাগলেন। দুত্থাকালে ‘মা’, ‘বাং’ বা ‘তলবাং’ না বলে ‘বৌদি’ ডাক। দুর্বোধ্য ভাষার মত ডাকটা ক্রমশ:ই তাদের বিশ্বাসের নানা ব্যক্তিরে জ্বলল। কিছু আর্গনার ক্রমশ:ই বেড়ে চলল—আরও জোরে আরও ঘন ঘন। আর লক্ষ করতে পারলামনা। আত্রে আত্রে উঠে গিরে ধারঝার ইচ্ছা চেয়েই বলে উইলান। অল্পকালে কানে আসুল গিরে কতজন বলেছিলান। আমি। তারপর তর তর একবার গেছন কিরে তাকাতাই চোখ পড়ল অমিত্যতর চারদিকে ঘেরা লক্ষ পক্ষীটা। সব শেষ লব শব্দ—All quit on the Western front. আত্রে আত্রে উঠে গিরে তর পড়লাম বিছানায়। কিছুক্ষণ পর ঘন ঘন বৃত্তে পারলাম বতার ডোড়ে এই দুহুটে আমার চোখ ঘিরে নেমে আসবে কোন মুক্তিভর্ক ঘিরে তার পতিরোধ করা যাবে না, তখন তাকাতাঙ্কি আমার সামনের লাইটটা নিভিরে দিলাম।

হাজি তোর হোল। অমিত্যতর বৃত্তবহু হাসপাতালের সিরাহায়াবী বণা লমহে বেরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আর এক বটী পরে আরও বহু বটী—০ টার ডিউটি; বৌদিকে আসতে হবে ওয়ার্ডে। একবার তাবলায় বৌদি আসার আগেই ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যাব। কিছু পরকণেই ঘিরে করলাম না—পালিয়ে যাবনা। কিছুক্ষণের লক্ষ অস্তত: হনটাকে পাখরের মত লক্ষ করে রাখব। নিজে চোখে দেখে একটা বাতর বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অক্ষ। হোক তা কটলক্ষ, হোক তা মধ্যাতিক, তবু আমার জীবনে এর মূল্য হয়ত অনেক। ওয়ার্ডের ব্যক্তিতে টং টং করে বটী বাঘল। কয়েক মিনিট পর দেখা গেল মিস্‌ ওহ চুকছেন ওয়ুনের খাতা নিয়ে। বনবনে নির্বাক অতিব্যক্তি—চলার গতি অত্যন্ত দ্রুত। মিস্‌ ওহ এগিয়ে আসছেন ওয়ুনের খাতা নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। কিছুক্ষণ পর নাকী তক্ত হোয়ে গেল—‘১১ নম্বর বেড’, অগলক বৃত্তিতে ভাকিরে উইলেন বৌদি মিস্‌ ওহ। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম চোখ ঘিরে একটা একটা করে কৌটা পড়িয়ে পড়ছে। ওয়ার্ড তক্ত। সবাই অবাধ বিশ্বাসে দেখছে সেই মধ্যাতিক লক্ষ। তারপর হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা আর্গনার আর অলোজানের মত কোশান কানার লব গেরে সিটাই-ইন্-চার্জ তাকাতাঙ্কি ছুটে এলেন। মিস্‌ ওহের গণে এসে কিছুক্ষণ তক্ত হোয়ে দাঁড়িয়ে উইলেন। তার বতার জ্বলজ্বালান এবং ঘেঁষে ঘেঁষানো গলার বললেন—‘একি ওহ! এ কি কাণ্ড করছিল। আমারদের জীবনে এ ধরনের ঘটনা তো নতুন নয়। এ রকম ভাবে তেবে পড়লে কাল করবি কি করে। বে চলে গেছে তার লক্ষ তাববার ক্রমণ আমারদের সেই। বার আছে, তাদের দেখা-দোলা কন্‌ গিরে—বা।

সিটাই-ইন্-চার্জ চলে গেলে মিস্‌ ওহ ক্রমাৎ ঘিরে চোখ দুহুলেন। তারপর ওয়ুনের খাতাটা খুলে আত্রে আত্রে ওয়ার্ডের ভেতরে এগিয়ে গেলেন। চোখের অলেন হাঙ্গ গালে তখনও জ্বলন্ত নির্বাক পাখরের মূর্তির মত লক্ষ দেখছিলান এই মধ্যাতিক লক্ষ আর তাবছিলান অমিত্যতর বিবেহী আখ্যাটা। অস্তত: কিছুক্ষণের লক্ষ সেই দুহুটে সেই ওয়ার্ডে—তার বৌদির কাছে কিরে আসতে গেরেছিল কি ?

মেলায়

—নির্মলেন্দু গৌতম

ওরা সবাই মেলায় বাবে।

কথাটা সকলে বেলায় জানে এলো নিখিলেশের। আর তুণুর মনীষার বাড়ী যেতেই মনীষা নিজেই বললে : ‘আর আর খট্টা সময় দিচ্ছি, তৈরী করে আনুন।’

নিখিলেশ বহিঃ স্ট্রট্টে বৃষ্ণতে পারলো কী বৃষ্ণে তৈরী করে আসতে বলতে মনীষা, তুণু একটু অন্তরঙ্গ কথা বলবার লোভ নিখিলেশকে গেছে বললো। নিখিলেশ বললো : ‘তুঁঠাৎ এমন আবেশ ?’

‘গিরকার আছে।’

‘ভ্রমতে কি পারি না।’

‘নিশ্চয়ই পাবেন। মেলায় যাবো আশ্বকে।’

‘সে কী, যে মেলায় দিনরাত হারাজি তাতে কি মন ভরছে না আপনার ?’

‘আপনার ভেত্রে ফিঙ্ক বেহী হয়ে বাবে।’ মনীষা কথাটাকে পান কাটাবার ভক্ত তাক্কা দিলো।

‘হাজি। ফিঙ্ক নোটশিট বড়ো কম লম্বের।’ বেতে বেতে বললো নিখিলেশ।

নিখিলেশের মনের মধ্যে একটা খুসী হঠাৎ খেনো পিসু বিচে উঠেছে। অনেক দিন মেলায় যায় না সে—অনেকদিন। সেই কোন ছেলেবেলায় যেতো। এখন এই বৃষ্ণতে ছেলেবেলাটাকে অবস্ত ভীষণ কাছে মনে হলো নিখিলেশের। নিখিলেশ বৃষ্ণি হাত বাড়িয়ে তার ছেলেবেলার সেই মেলায় বাবার দিনগুলিকে ছুঁতে পারছে।

বাড়ী ফিরে এলে তৈরী হতে নিখিলেশের সময় লাগলো না। তৈরী হওয়া মানে পাটতাক্তা পাঞ্জাবী দিয়ে চাপিয়ে গেলটা প্যাণ্টে দেয়া। এতে আর কতোটুকু সময়ই বা লাগতে পারে। তুণু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো নিখিলেশ। তাক্কাতাক্কা বাঙাটা। কখন বাহাপ লাগলো নিখিলেশের।

ফিঙ্ক অপেক্ষা করাটাও খুব ভালো লাগলো না। অপেক্ষাটা হাতে স্নাত্তিকর হয়ে না ওঠে তার ভেত্রে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের বেকর্ড বাজালো। আরেকটা আছেকটা বাড়ির পাণ্টে দিলো।

ছুটো পোটকাতে দু'জন বন্ধুর টিকানা নিবলো। তারপর তাতে আর কোনো কাজ খুঁজে না পেয়ে বরজার চাবি লাগিয়ে খেঁজিয়ে পড়লো।

মনীষার গুথানে সোফাছবি দেখে না নিবিলেন। তাহলে আবদটা সময় পূরবে না। শেষে বাজানো রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরটুকু শুনগুন করতে করতে কিছুটা দুঃশেষে মনীষার বাড়ীতে এলো নিবিলেন। বহিঃ নিবিলেন গান গাইতে গিয়ে না। তবুও যাতে যাতে চেনা হরগলো শুনগুন করে গাইতে ইচ্ছা হয় নিবিলেনের। নিঃশেষ কানে সে সুরটুকু ধারণা লাগে না। মাঝে মাঝে অবশ্য নিবিলেন ভাবে গান আনলে মন হতো না।

মনীষার বাইরের ঘরটা একরশ খোবনের প্রাণ প্রাচুর্যে ঊর্ধ্বল উঠছে। লক্ষ্যই এলে গেছে। নিবিলেনের দৃষ্টি থেকে হঠাৎ রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরটুকু যল পড়লো।

মনীষা বললো : 'আপনার ঝেঁই আপেকা করছিলাম।'

'যদি মিলিয়ে দেখুন, ঠিক আবদটার মাঝার এসেছি।' নিবিলেন বাড়ীটা তুলে ধরলো মনীষার চোখের সামনে।

'আবদটা বলেছি বলেই কি আবদটা লাগিয়ে দিতে হবে?' মনীষা বললো।

'ভক্ত হতে গেলে ও সন্ধ্যটুকু সেপেই থাকে।'

'ভারি তো একটা পাছাবী গায়ে চড়িয়ে এসেছেন, তার সঙ্গে আবদটা কিছুতেই লাগতে পারে না।'

'যাক্ সে, এখন আমার উঠতে পারি।' ওপাশ থেকে দেহব্রত উঠে দাঁড়ালো সুব আড়াল করা গগনধ্বনি সরিয়ে।

'আমরা তো তৈরী আছি উঠবার জন্য।' মনীষাই বললো।

নিবিলেন তাকালো দেহব্রতের দিকে। গ্রীক ভাস্কর্যের ঝাঁক একখানা উজ্জল সুব। আহোমল বটেই। দুই চোখে প্রশান্ত ঔজ্জল্য।

কথা বলবার আগে দেহব্রতকে লক্ষ্য করেনি নিবিলেন। সময় সময় নিবিলেনের মনে হয় দেহব্রত অলক্ষ্যে থাকতেই ভালোবাসে। সে এক স্বাক্ষর ধারণা নিবিলেনের। দেহব্রতের সঙ্গসঙ্গীতের আনবাক্তিযের কাছে নিজেও দুর্বল মনে হয়। সময় সময় কোনো একটা শক্তি আহরণ করতে চায় নিবিলেন দেহব্রতকে অতিক্রম করবার জন্য—অতিক্রম করেও যায় হয়তো! তবু মনে হয় দেহব্রত অনতিক্রম।

বাইরে পা দিয়ে নিবিলেন মনীষার দিকে তাকিয়ে বললো : 'হেঁটে বাবেন বলেই ঠিক করেছেন নাকি?'

দেহব্রত মনীষার হয়ে বললো : 'হাটবার কণার জয় পাচ্ছেন নাকি?'

'না।'

'বেশা কিন্তু অনেক সুখে।'

'মাইলার হিসেবে তিন মাইল হবে। নিবিলেন বললো : 'তিন মাইল হাটবার কণার আনি ভয় পাই না।'

দেহব্রত আর কিছু বললো না। একটুখানি হেসে এগিয়ে গেলো। ওর পেছনে কলধনিত সুবর করে হাটতে থাকলো আর সবাই। নিবিলেন আর মনীষা পেছিয়ে থাকলো কিছুটা।

হেঁটে হাওয়াটাই ভালো লাগছে নিখিলেশের। দেবপ্রভ এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনীষার খুঁ কাছাকাছি হলো নিখিলেশ। এতো কাছাকাছি যে কেউ হাওয়া এলেই মনীষার পাড়ীর ঝাঁপল নিখিলেশের শরীর ছুঁয়ে বেবে। যদি সত্যি এমন দ্রুত একপাল ভেদে যতো হাওয়া আসত ততলে ভীষণ ভাবেই খুঁ হতে পারতো নিখিলেশ। মনীষার পাড়ীটা ইচ্ছে করেই অনেকখান ছুঁইয়ে রাখতো শরীরের সঙ্গে।

মনীষাকে নিঃশব্দিত ভাবে কাছাকাছি পেতে নিখিলেশের দায়বদ্ধি আছে। কিন্তু মনীষা আর তার মাথাবনে যে বন্ধ তবুও মনে হওয়াটা একটা অব্যবহৃত রয়েছে সেটুকু যেহেঁত্রে জানিটের হতো নক। সেটুকু তেঁতে অথবা এড়িয়ে যেতে পারছে না নিখিলেশ। নিখিলেশের মনে হয় এটা তার মানসিক দুর্বলতা। মনে হয় ইচ্ছে করলেই সে, সে-অব্যবহৃতটুকু তাত্তে পারে। দেবপ্রভই যেহেঁত্রে সে ইচ্ছের দুখোদুখি হয়ে তাকে পেছিয়ে দেয়।

নিখিলেশের মনে হয় দেবপ্রভ মনীষাকে ভালোবাসে। কিন্তু এ কথাটা বিশ্বাস হতে চায় না। আবার পুরোপুরি অবিবাহিত কন্যার হতো পূর্ণ জুনিও নেই তার পায়ের তলায়। দেবপ্রভ মনীষার কাছাকাছি আসে না। মনীষাকে লক্ষ্যও করে না সে যেমনটি করে। এমন কি কোনো মুহূর্তে ভালোবাসার কোনো প্রকাশও হয়নি দেবপ্রভর মধ্যে। তবু নিখিলেশ ভাবে এ সমস্তই দেবপ্রভর অন্ধুত ভালোবাসার লক্ষণ। কিন্তু মনীষা তো নিখিলেশকেও কোনোরকম পরিচয় দেয় না।

আজ এই মুহূর্তে এই যে দু'জনে এতো কাছাকাছি এসেছে—মনীষা তো সরে যাচ্ছে না, অথবা ক্ষত হেঁটে দেবপ্রভর পাশাপাশি পৌঁছাচ্ছে না। ধরা অচুত পলায় নিখিলেশের সঙ্গে কথা বলছে। অবশ্য কথাগুলো ভেতন সোপানীয় কিছু নয়। যে কেউ শুনেতে পারে। তবু অচুত ভাবে সাধারণ কথাগুলো মনীষাকে অনেক কাছাকাছি বলে ভাবাচ্ছে।

বীষ বরে এসোলে পথটা কিছু ছোটো হয়। হাইলার হিলেবে অবশ্য বাগা করনি। তবু কিছুটা যে ছোটো হয় তা নিশ্চয়ই। ওরা সে অস্ত্রে বীষের পথ বরলো।

শরীর ব্যয় বেলে এঁকেবেঁকে গেছে বীষটা। আজকে মেলায় বাগার লোকের পারের চিহ্নে নয়র বাসভলো এগিয়ে গেছে। চরলটা পারে ব্যাক। সবেও নিখিলেশের মনে হচ্ছিলো যেহেঁত্রে গালিতার ওপর বিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চরলটা পা থেকে খুলে বাসি পারে হাইবার ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু অপোজন লাগবে বলে আর চরলটা খুললো না নিখিলেশ।

‘অনেকটা বেতে হবে কিন্তু।’ মনীষা নদীতর এবং লগবেবে দীর্ঘ বীষটার দিকে চোব রেখে বললো।

‘তিন তিনটে হাইল চার্টপানি কথা নয়।’ উত্তর হলো নিখিলেশ।

‘কেবলার সময় বিজ্ঞা করে ক্রিয়তে হবে।’

‘না ভীড় বিজ্ঞা পাওয়া নক হবে কিন্তু।’

‘ওনা, তাহলে কিরবো কেরন করে।’

‘হেঁটে।’

‘হেঁটে—তাহলে ওখানেই হাত কাটিয়ে বেবো।’

‘বেলার বেবেরা হাত কাটাযে শুনেলে হাসি পার।’

‘হা’লি শেলে আর কি হবে। চ’রাইল একদিনে হাটলে আর বাঁচবোই না।’

‘এ কথাটা আগে তাৎপরে হতো।’

‘বেব্রতবাহু কি আর কিছু তাৎপরে দিয়েছেন?’

‘ওঃ, তাহলে একটুও তাৎপরে হবে না। বেব্রতবাহুই একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলবেম।’
একটু হাসলো নিবিলেশ।

‘সেই স্তরস।’ না হলে একফাৎ নিয়ে নেবো মেসার মবোই।’ বলেই মনীষা পুঙ্খবালি তথী

মনীষার পুঙ্খবালি তথীটুকু ভালো লাগলো নিবিলেশের। মেয়েদের পুঙ্খবালি তথী যেথতে নিবিলেশের ভালোই লাগে।

‘একটু কোরে হাটুন। সেখুন না ওরা সন্ধ্যাই কতোটা এগিয়ে গেছে।’ নিবিলেশ বেব্রত এবং আর সন্ধ্যাইকে দেখিয়ে বললো।’

‘তাইতো! ওরা তো আমেরকাটা এগিয়ে গেছে।’

জ্ঞাত হাটতে শুরু করলো মনীষা। নিবিলেশও।

হাটতে হাটতে মনীষার নিঃশ্বাস জ্ঞাত হলো। কোমল বুৎকটা আন্দোলিত হতে থাকলো—
বিন্দু বিন্দু ঘাম ভরে উঠলো কপালে এবং নাকের ওপর।

নিবিলেশ তা দেখলো। হোঁসাকিত হলো এবং শেখ পর্বত বারিগে ফেললো নিজে।

মেসার পৌছে একফাৎ হলো লবাই।

বেব্রত বললো: ‘আগে কিছু খেয়ে নেয়া থাক।’

নিবিলেশ বললো: ‘গ্রিক বলেছেন। অস্তিত্ব একফাৎ চা তো দরকারই এখন।’

‘বা খেয়ে এসেছি সব স্বপ্নম হয়ে গেছে। শুধু একফাৎ চায়ে হবে না।’ মনীষা কপালের
ঘামটুকু কমাতে আলতো করে মুছতে মুছতে বললো।

সমর্থন করলো আর লবাই।

কাজেই আর অপেক্ষা নহ।

একটা চটের ছাউনি দিয়ে ছাওয়া মোটাসুটি বড়ো বকরের চায়ের বোতানে ঢুকে পড়লো ওরা।
দিনের আলো রান হয়ে গেলোও নিজে বারনি একেবারে। তবু একটা পেটোম্যাক্স আলোবায় চোঁটা
চলেছে বাইরে।

নিবিলেশ ইচ্ছে করেই মনীষার হুঁচকুনি দিলো। বেব্রত খামিকটা হুঁচকু লবায় লগে
বললো। রান আলোর আর পথের সাহায্য পরিষ্কমে বেব্রতের হুঁচকু ওপর স্রাতির মেসার
আত্মতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা আরো অনেকখানি গ্রীক ভাষ্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে
বেব্রতকে। নিবিলেশের নিজের হুঁচকুনা একবার বেব্রতের ইচ্ছে হলো। কিন্তু মনীষার কাছে তার
ছোট আরনা চাইবার লজ্জা ভাঙতে পারলো না নিবিলেশ।

তাছাড়া মেসার মধ্যে নিজেও বেবা যেনো বিসম্বল। নিবিলেশ আরো ভাবলো।

চায়ে ঢুকে দিয়ে মনীষা বললো: ‘মেসার এসে এমনি চায়ের বোতানে ঢুকে একটা বিন্দু
আছে, কি বলেম?’

নিবিলেশ বললো : 'নিশ্চয়ই। এখানে সাঝানো গোছানো ছাত্র পেটানো চাষের দোকান দেখানানও হতে।'।

মনীষা একটু

আগেছিলো আনন্দ।'

'আগেচালা। আনন্দ—তখাটা। খুব জুজব হলেন কিংবা।' নিবিলেশ বললো।

'কেহে বলিনি।'

'জুজব কথা দেবে বলতে চরনা।' নিবিলেশ একটু হেসে বললো।

'তাই বুঝি।' মনীষাও হাসলো।

পেটোয়াখোর আলো স্বপ্ন অস্তরকর। সেলো ওরা চাষের দোকান থেকে শব্দ উঠলো। আলোর আলোময় হয়ে গিয়েছে মেলায় প্রাকনটুকু। আনন্দ আলো আর বসে মাঝমাঝি হয়ে এক পথের রাজ্য হয়ে উপলে উঠছে মেলাটা।

ওরা পথপথ পথপথের কাছাকাছি থেকে প্রাকনটুকুর মধ্যে নিজেরের ডকিয়ে ছিটিয়ে হাতিয়ে ফেললো।

মনীষা ঠিক বলেছে—যেদাটা বেবো আগেচালা। আনন্দ। আগেচালা। আনন্দ বৈকি! ভাইনে ধীরে সামনে গেছেন যেখানে খুশী আনন্দ প্রবাহটাকে বইয়ে লাগে—প্রবাহটা উত্তরোত্তর স্তীতকার হয়ে হয়ে বাবে। বাসবে না—গমকেও পাড়াবে না।

নিবিলেশ অনেকখানি সময় পরে কথাগুলো সংলো।

হঠাৎ নিবিলেশের কি বেরাল হলো, একটা বড়ো পুতুল কিসে ফেললো। আর কিনলো একরাশ গ্যাস বেলুন।

পুতুলটা মনীষাকে উপহার দিলো, মেলায় রাজার তীর্থেই যথো একটুখানি নির্জনতা খুঁজে।

মনীষা বললো : 'সে কী আমাকে পুতুল দিলেন যে।'

'ইচ্ছে হলো।'

'খুশী ভেবেছেন যাকি আবার?' উজ্জলকণ্ঠে বললো মনীষা।

'না। পুতুলের মধ্যেই আকর্ষণ মেলাটা প্রতি হয়ে থাক।'।

'আর সে প্রতিটা আবার রক। কবতে হবে এইতো। ভালো সবজান পেয়েছেন বাহোক।' মনীষা পুতুলটা ফোলের কাছাকাছি রেখে বললো। হাসলো নখ করে। গ্যাস বেলুনগুলো নিজের কাছেই রাখলো নিবিলেশ।

অল্পকণ পরেই বেবরত এলো কাছাকাছি। বললো : 'অনেক ঘোরা হয়েছে, এবার কিবে যাওয়া উচিত।'

'তাইতো অনেক রাত হয়েছে।' বড়িটা চোখের সামনে বরলো মনীষা। 'পতি পতি এখন কেবা স্বরকার।'

জুতরাং সবাই কিরে পাড়ালো এবার ঘরঘুরো ব্যক্তি ভক হবে।

'বিজ্ঞ মিলবে তো?' মেলায় প্রান্তে পৌছে ওবালা মনীষা।

'না।' বেবরত বললো, 'আগে ঠিক করিনি বলে বেটেই কিরতে হবে।'

‘লবন্য! অতোবাণি অ’বার হেঁটে কিবতে পারবে না!’ হতাশ গলায় বললো মনীষ।
আর লবাই তার প্রতিধ্বনি করলো।

‘খুব পারবেন। নিজেই পক্ষিতে অবস্থান পাপ।’ বেব্রত লম্বুঘরে বললো :
নিখিলেশবাবু অহুবিধে হবে নাভো?’

কথাটা নিখিলেশের গৌরবে আঘাত করলো। কিন্তু ভুজ হলো না নিখিলেশ। লম্বুঘরে
‘না।’

যেলার আলোর শেষ রশ্মিটুকু বেবানে শেষ হয়েছে সেখানে থেকে অন্ধকারের তাক্ষরতক।
সেখানে এসেই বমকে দাঁড়ালো মনীষ। দেবব্রত আর আরো ক’জন এগিয়ে গেছে।

মনীষ তর তর গলায় বললো : ‘ওমা কী অন্ধকার!’

‘তর লাগছে নাকি?’

‘নীষণ! দেবব্রতবাবুকে ডাকুন না!’

‘তর কি? চলুন না আমার সঙ্গে।’

‘না, না; দেবব্রতবাবুকে ডাকুন, প্রিয়—’

নিখিলেশ আলোর শেষ রশ্মিটুকুর মাঝার দাঁড়িয়ে জোরে হাঁক দিলো : ‘দেবব্রতবাবু—’

উত্তর এলো : ‘আসছি।’

আর কয়েক মুহূর্ত পরেই দেবব্রত এলো একা।

‘হা অন্ধকার! নীষণ তর লাগছিলো। চলুন এবার।’ কেটে কেটে ভর-ভর হাসি বেলে
বললো মনীষ। তারপর দেবব্রতের পাশাপাশি অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। নিখিলেশ যেলার শেষ
আলোর রশ্মিটুকুর মাঝার দাঁড়িয়েই যেখানে ওরা প্রায় গিয়ে পা মিশিয়ে বিলীন হয়ে গেলো।

নিখিলেশ অনেকক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর কিবে তাকালো যেলার
দিকে। কী মনে করে হাতের পাশ বেগুনগুলো উড়িয়ে দিলো।

এবার আলোর শেষ রশ্মিটুকু থেকে উৎসের দিকে ছাড়া করলো নিখিলেশ—বেবানে আনন্দ
বিকি হচ্ছে।

.....কিন্তু এ ক্ষেত্রে কর্তা গণনা করে ‘লম্বু গজের’ আঁচু নির্ণয় করা যায় না। লম্বুগজ
বাণো ভাষায় মোড় কিয়রে দিয়েছিল। এমনকি যে সাধন যে-কতিয় প্রকাশ করেছে
তার সম্পূর্ণ সৌরভ একা প্রথমবারের। এর পূর্বে সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবেশ
একদমের বে ছিল না তা মনে কিছু সে ছিল বিতর্কিত ব্যাপার দিয়ে অন্ধর মহলে।

ন'লাখ টাকার মাতৃশ্রদ্ধ

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Piles of spices, the produce of all the betel tops of Bengal disposed of in heaps, pottery that rivalled Babel, Himalayas of brass vessels and Alps of gold and silver things, all the shawls and cloth of Burrabazar, vast pyramids of sweetmeats and lakes of liquid sweets wore an imposing aspect.

শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, আশিষ্কাতি এবং চৌরবৃত্তির দ্বারা ইংরেজ বণিকরা যখন এখানে, এই বাংলাদেশে, পাড়িগজা কেলো রাজসিংহাসনের দিকে দ্বিধিত হলো তখন জেজ টাকার লোভে আর ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির আশায় তাবের মনঃ দিচ্ছেলেন এই বাংলাদেশেইই কয়েকজন দিগ্গজ ব্যক্তি। এবং তার ফলও তাঁরা পেয়েছিলেন—অর্থাৎ টাকা তাঁরা করেছিলেন। টাকা আর সম্পত্তি। জেজ কোড় টাকা আর বিশাল বিরাট কবিদারী।

তখনকার দিনে সেইসব নানী বাবাজীমের মধ্যে রংলা নবকৃষ্ণ ছিলেন অন্যতম। ইষ্ট ইতিহাস কোম্পানীর মুদীসিবি করে, পোনা দায়, তিনি নাকি চল্লিশ কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। দেফালের প্রায় সমস্ত মুতানিট গ্রামটার কবিদার ছিলেন তিনি।

কলকাতা তখন তিনটি গ্রামের সমন্বয়—মুতানিট, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর।

বদার পুর্দিক, বর্তমানের উত্তর কলকাতার ছিল মুতানিট হাট। সেখানে তাঁতের সুতো এবং কাপড় বিক্রি হত। জাইভের মুদী নবকৃষ্ণ যখন শোভাবাজারে এসে বসতি স্থাপন করলেন, তখন সাতা উত্তর কলকাতাটাই ছিল যেন গ্রন্থবন। কাপড়পত্র লাগুয়া দায় ১৭২০ সালে কীরকিরা বিশেষ করে কাবাচার ফিরিঙ্গি খালদায় এই তলাটে এসে পুর দাগাদাগি করতো।

শোভাবাজার নামের উৎপত্তি লক্ষ্যে ঐতিহাসিক নগেন ঘোষ লিখেছেন, ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা ছিল ভারি সুন্দর। সেই অহুলায় নাম হয় শোভাবাজার।

আর একটু দূর হজে, নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রদ্ধে যে অকল্পনীয় বিরাট লুণ্ডা ও লম্বাবেশ এখানে হয়েছিল তাই বোকেই এর গ্রন্থের লুণ্ডাবাজার তারপর ক্রমে শোভাবাজার নাম হয়।

নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রদ্ধ গ্রন্থে যে বর্ণনা ইংরাজ লেখকদের কাছে বোকে পাওয়া গেছে এবং নবকৃষ্ণ কীবনী-লেখক নগেন ঘোষ ও দীকার করে নিয়েছেন তা পড়লে মাথা ঘুরে যায়।

এই ব্যাপারে তাঁর লব্ধে লেখা হয়, তিনি তখন হাইডের দুলা ছিলেন এবং মাইনে সেভেন বাট টাকা। যারশমান নামে তখনকার হিনের বিখ্যাত লেখক স্পট্টই লিখে গেছেন যে নবকৃষ্ণ অলকত উপায়ে কোটি কোটি অধিরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে নবাব সিরাজউদদৌলার কোষাগার লুটের ব্যাপারে সুবিদ্যাবানের একজন বিশিষ্ট মূল্যমান লেখকের একটি লেখা ক্রমশঃ হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"After the victory [of Plassey] Colonel Clive met with Mir Mahomed Jafar. They congratulated each other and went together to Moorshedabad. On their arrival at the palace, the nobles of the city and the Government officials were called to a durbar. Colonel Clive took Mir Jafar's hand led him to the Masnad. At the same time salutes were fired to indicate the transfer of the Subahs of Bengal, Behar and Orissa to Mir Jafar. After the durbar, the new Nabob, Colonel Clive, with a few Englishmen, the Dewan Ram Chand, and Nobokissen, the colonel's Moonshee, inspected the treasury, where a sum of more than 20 millions of rupees, in silver and gold, was found."

"It is also well known that besides this treasury there existed another in the Harem, which fact Mir Mahomed Jafar concealed from Colonel Clive, at the instigation of the Dewan and Clive's Moonshee. The value of the gold and silver articles and of the jewels found there was not less than 80 millions of rupees. The whole was divided among Mir Jafar, Ram Chand, Amir Beg and Nobokissen. This transaction is indeed very probable, as Ram Chand left a fortune of 12½ millions of rupees at his death, ten years later, whilst Nobokissen could afford to pay 9,00,000 rupees on the occasion of the death of his mother. Yet both men were in receipt of only 60 rupees per month at the time of the division."

নবকৃষ্ণ জীবনী লেখক এম. এন. ঘোষ (নগেন ঘোষ) অবশ্য নানাতাবে এই অপব্যয় বণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, কামরুপজে পাতিয়া গেছে যে হেষ্টিংস সাহেবের বলে আমলা সমাপোষিক সিং নামে একজন ফেরানী তাঁর বাহিরে খাড়ে বাতোলাব টাকা বরত করেছিলেন। নবকৃষ্ণ নন।

তা সে হাই হোক, আরহা। আবারের প্রসঙ্গে কিরে আসি। এরকম দানসাগর মহাজ্ঞাৎ বাংলাদেশে আর হয়েছ কিনা লব্ধে। এক একজন ব্রাহ্মণ পেয়েছেন বেলাহাঠী বাট, সোনাডপোর বড়া, মর্শা। অহুদারে কেউবা পেয়েছেন নগর দুহাখার টাকা, ভগোর বালা, পানের বাটা, ভগোর কলের আগ ইত্যাদি। আর প্রত্যেকে পেয়েছেন কান্না মুক্তি। যার দান দশ থেকে পনের টাকা প্রত্যেক বান।

অন্যোক্ত কাল ছিল একমাস। সেই একমাসের মধ্যে সারা বাংলাদেশে রটে গেল যে রাজা নবকৃষ্ণ মাকুল্লাজে বসন্ত বস করছেন, কোন প্রার্থী বিদূষ হবেন।

মুন্সিভিলা বেহার অস্ত্র এবং অস্ত্রবিহীন বাসগিনা ও আনন্দদানের অস্ত্র হুতানটি এবং তার পার্শ্ববর্তী অকলকে চারটি বেঞ্চে ভাগ করা হোল এবং প্রতি বেঞ্চে যোগেশ্বর আহার্য যোগানের ব্যবস্থা করা হোল।

এখনে আসতে লাগলো তিব্বাতীর মন, পরে পরে হাফরে হাফারে। তারের সঙ্গে এলো হাফার হাফার নিয়মব্যবস্থা এবং মধ্যমি সঙ্গীতসাহ। তারা একা এলোনা, অ'তো-বাতো-তিম সমেত লম্বা পরিবারকে তারা সঙ্গে নিয়ে এলো। বেন লম্বা হালোত মক'বল কলকাতার এসে কেন্দ্রীভূত হোল।

বালোবোনের বত পত্রিত ছিলেন বিশেষ আশ্রমে তাঁরা এলেন। এমন কি হু'ব বারগণী থেকে বহু পত্রিত বিনম্রিত হয়ে সেই বিরাট বজ্রে যোগদান করলেন।

কিন্তু এত লোককে থাকবার আশ্রয় দেওয়া তো সম্ভব ছিল না। মাঠে মাঠে মনে বসাত্তরে তাঁর পতল, ছাতিনি দেওয়া হোল। আশে পাশে অঙ্গলের ভিত্তরকার বাধ, শোয়াল আর কেউএর মন অগ্নুতি মাহুবেত কোলাহলে চকিত কীত হয়ে বাধকরি সঁতার কেটে পলা পার হয়ে পালিয়ে গেল।

এতোক ব্যাটিতে একশ দু'শ পাচক সারাদিনরাত রাগা করতে করতে হিমসিম খেতে লাগলো। দেশের যেখানে বত মাটির ভাঁড়-দু'বি-পেলাস ছিল সব ক'জ্রে ক'জ্রে ভড় করা হোল। কলাগাছের পাতা আর রইলনা।

মল্লার পাহাড়, তু'পাকতি পান, কপেত, পাড়ী, খাল, গোখালার পিয়ারিত, কীর-বই মিটারের হুকাছড়ি—সে এক অতুতপূর্ব দৃশ্য।

আঁড়ের এবং বজ্রলেনই বা সে কী অতুইপূর্ব আভরণ। লারা মাটেন্দিত, একাত উঠান এবং তার আশপাশের বারান্দা—সব আরগার বয়ে বয়ে আঁড়ের জিনিষ লাগানো। পঁচিশখন পুরোহিত আর গ্রাম গ্রাম তরবারক বলেছিল আঁড় করতে।

আয়োজনের কার্পস ছিলনা, কিন্তু সেই বিরাট জনসমুহের তরককে ঠেঁকিতে রাবা হাকা নবকর পকেত অসাধ্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর ঠিঠকীনের পরামর্শ অহুলায়ে তিনি সাময়িক বাহিনীকে তলব করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কলে, কেল্লা, বদনমে আর বাতাকপুয়ে বত গোট। দৈন্ত ছিল, তারাও এসে হাকিম হোল। সেই অমাকীর্ণ বজ্রহলে।

শেষ পর্যন্ত মশবিন ব্যাপ্তি সেই বজ্র কোন বিশেষ ছুঁটনা ব্যতিরেকেই লম্বা হয়েছিল। লটিক অত না জানা পেলো, অহুমান, ন'লক টাকা লেগেছিল নবকর মাতৃযা হুকাছড়িরে।

প্যারিলে পুতের নিউজিয়ারের অধ্যাককে একবাড়ি গ্রন্থ করেন: আপনি তো আটের লম্বুজের মাতৃধামে আছেন। কিছু পেরেছেন বলুনতো ? অধ্যাক বহু হেলে বললেন: মালকাবারে করেক পত ক্রান্ত—আট অত্র কিছু আবার দিচ্ছে না।



অপ্রত্যাশিত যুদ্ধবিব্রতি

রূপ: এফ. ভিসচেন

হায়াৎসলবৎ: নিভাই সাহা দ্বারা

১৯৪৪ সাল। জার্মান-বেলজিয়াম সীমান্তে লড়াই চলছে। আচেন বোমার বিক্ষুব্ধ স্থানে, শৈতন্য বসন্তবাড়ী ছেড়ে মিটার ফ্রিটস স্ত্রী পুত্র নিয়ে আবেগের একটি কুটীরে আশ্রয় নিলেন। বনের মধ্যে এই নির্জন ডেরাটি ছিল ঐ তত্ত্বলোকের সপ্তাহান্তিক বিশ্রামস্থল। শিকারের বাই ছিল বলে ছুটির দিনগুলি প্রায় নিয়মিত ভাবেই এখানে কাটাতে। সুতরাং ডায়াডোলের মধ্যে এই নির্জন কুটীরটিকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করে তত্ত্বলোক পরিবারবর্গ নিয়ে এখানেই উঠলেন। এঁরা জার্মান।

তত্ত্বলোক দিগন্ত ডিকেলের কাছার পার্শ্ব। হাইল চারেক ঘুরে যকৌ নামে একটি কাছার পার্শ্ব তখন কর্মরত। ছেনেলের বয়স তখন বছর বার হবে। যা তাকে নিয়ে ঘরে বসেই লেন।

এদিকে সপ্তাহ বানেক বাবৎ সুতরাং তীক্ষ্ণতাও চরমে উঠেছে। বাবার উপর বিবাদের চরম-বাণের আর গুলিগোলায় আড়াল নেই। তবুও যুদ্ধের অন্ধকার হুঁকে লড়াই আন্দোলন এখন তরঙ্গী চালাতে থাকে তখন তবুও লড়াই ঠাঁটা বিয়ে উঠে বৈকি।

তবুও কথায় কথায় বাবৎ লড়াই লে যাবে তাবতে পারেনি যে একটা পরম বিশ্বাসের ঘটনা তাবের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। হেরম্যান সম্পর্কে যা আর ছেনেলের কথায় ছিল। হেরম্যান হলো এবের গোলা-বোম্বার। ক'দিন বাবৎ বাড়তি বানি খেয়ে লে বেশ পুষ্ট হয়েছে। ঐটমাস ইতের ছুটিতে বাবা বাড়ী এসে সেদিনকার পারিবারিক ভোজে হেরম্যানকে ব্যবহার করা হবে—এই ঠিক ছিল। কিন্তু বাবা ছুটি পেলেন না—তাই পরবর্তী ছুটি পর্যন্ত তাকে বানি হুঁসিয়ে বাণের সিঁদুর নিলেন মা-ছেলে মিলে।

ঐটমাস ইতের পুণ্য রাত। তখন লবেমাত লড়াই পড়িয়েছে। এমন সময় হঠাৎ বরফের আঘাতের শব্দ হলো। বরফ পড়ে মা-ছেলে বিশ্বাসের সঙ্গে দেখলো বাইরের বরফঢাকা পাছপালায় পটভূমিতে অপেক্ষাস্থ লোহার টুপি-পরা দু'জন শৈনিক—অতঃপর বরফের উপর পড়ে থাকা আর একজন। এরা যে আমেরিকান পত্রদল তবুও লিখা হুঁতে গেলে হতবাক হয়ে ঠাঁয় থাকিয়ে বসে। শৈনিক দু'টি বা বসছিল, যা লে তাবার কিছুই বুলেন না। তবে তাবের কান্ড হুঁতে

যে ভাষা ছিল তা সহজেই অজ্ঞান করতে পারলেন। অসহায়দের আশ্রয়ের রায়ে বিমুগ্ধ করা চলে না। যা এদের ভিতরের পথ ধেখালেন। আহত বহুটিকে নিয়ে তারা ঘরে এলো। মারের নির্দেশে তারা আহত সংজ্ঞাটর লৈনিকটিকে পুরের বিছানার তইয়ে দিলো। গুলির আঘাতে রক্তপাত হয়ে বেচারার লাগা পতীংটাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। অণুহুটিও আহত, ত্রিষ্ট। মারের সান্নাৎ বা ক্রাল জানোছিল তাকে কথা বলে এদের সম্পর্কে বা জানতে পারলেন তাহলো—এরা নিজেদের ব্যাটালিয়ান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিসম্মিন ধারণ বনে অরণ্যে পুত্রছে কার্ধানদের নজর এড়িয়ে। প্রত্যেকের পালঙ্করা দাড়ি পৌক—কামাখ্যা অবকাশ যেলেনি। তাহলেও এখন তারা কোটের বহর পূলে কলার এছেরকে সহ্যে হেলেনাভূষ ধেখাছিল। যা এদের সঙ্গে সেইভাবেই কথা বলছিলেন। একবার ছেড়া কাপড়ের টুকরা নিয়ে তিনি আহত ছেলেটির পায়ে ব্যাণ্ডেজ ধিেব দিলেন। অস্ত্র হুটিও প্রাথমিক পরিচর্যা করলেন।

অতিথিকে অতুল রাখার কথা এই পুরাতনে তারা যং না-তাই লাসান্দ্রিক পরিচরনার প্রথম পরিবর্তন করতে হলে: হেরমানকে দিয়ে। রাগা শেষে খেতে বসার উত্তাপ চলেই এমন সময়—দরজায় আঘাতের শব্দ হলো। আরও কিছু বলছুট আমেরিকান সৈন্ত এলছে অতদান করে ছেলেটি বরজা পূলে দিল। মাও এগিয়ে গেলেন। কিন্তু বাইরে সলঙ্ঘিত চারজন কার্ধান সৈন্ত অপেক্ষা করছে দেখে তাঁরা প্রহার জনলেন। বয়ল কম হলেও যের নক্স সৈন্ত রাখার অপরায় যে নিশ্চিত বৃত্তান্তও একথা: তেবে ছেলেটি পর্ধ্যত বিদূত হয়ে গেল। তথাপি একটা অকানা পক্ষিতে তর করে যা এগিয়ে দিয়ে লৈনিকবের তত্তেজ্ঞা জানালেন। লৈন্তেরা প্রতি-তত্তেজ্ঞা জানালো। এদের কর্ণেয়ালটি তারপর জানালো যে অছকাবে বিপদের সুঁচি না নিয়ে তারা রাতটা এখানে কাটাতে চায়। অতি বীর ও ঠাণ্ডা পলার যা সম্মতি জানালেন এবং বললেন যে যের সময় থাকার যা আছে তারও তারা অস্বীকার হবে। আঘোলো-বরজা যিহে মালের যে বেশবাই তেলে আনুছিল তাতে লৈনিকেরা যুং পুন্ডী হলো। যা এবার তাঁর ব্যক্তব্যের সঙ্গে অতিও কিছু যোগ করলেন। বেশ কঠিন কর্ঠই তিনি জানালেন যে তাঁর যের আরও ভিনজন অতিথি রয়েছে: ঈষ্টমাল ইন্ডের রায়ে তাদের সঙ্গে নক্স-বলন্ত আচরণ তিনি কিছুতেই বরলাভ করবেন না। “তাহলে সেই অতিথিরা কি আমেরিকান সৈন্ত?” কার্ধান কর্ণেয়ালটি সহজ লম্বেই প্রকাশ করলো। উত্তরে যা বললেন, “যেং বাপু তোমরা আমার ছেলের বরসি: ভিতরে যারা আছে তারাও তাই। এদের একটি গুলীতে আহত হয়ে বৃত্তায় লগে দূছে—অস্ত্র হুটিও বলছাড়া, জুভিত, ত্রিষ্ট—যেমন তোমরা। আশ্রকের রাতটার বাছারা হানাহানি জুলে যাও।”

অজ্ঞান লতা মনে হওয়ার বরোমোঠ কার্ধান কর্ণেয়ালটি বৃত্তিতে উজ্জাপ হুটিতে লংগলো। আর কিছু কথা হওয়ার আগে যে সুহৃৎকটা কাটলো তা যেন শেষ হছিল না। শেষ পর্ধ্যত যা এই অসহ্যিক পরিবেশের সমাপ্তি ঘটালেন। তিনি বললেন, “জাখো বাছারা সময় নষ্ট না করে তোমরাও ভিতরে এলো: তৈরী রাখারগুলো অস্ত্রকারো তোপে লাদার আগে লেগলো যের তুগ হও—ঈবর তোমাদের বদল করবেন।” মারের নির্দেশে তারা বাধ্য ছেলের মতো ঘরে এলো এবং লকের গিলল, বহুত, হাফা। বেলিনগান ইত্যাদি সব হাতিয়ার পত্র এককোণে কাঠের রাখার উপর রাখলো। মারের নির্দেশে আমেরিকান সৈন্ত কটিও তাদের হাতিয়ার পত্র তাঁর কাছে করা দিলো। ছোট বহুটিতে প্রায়

পরস্পর পা খেলে এরা সব হাসেছে, যথেষ্ট হাসেছে মুখ তুলিতে তবে গেল। অপরূপ মুখ-বিরতি—দাময়িক হাসেছে অতুলনীয়। যা যেন দেখাচ্ছিল কিরে এগলেন। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, “শিগ্গির তুমি ফিরে যেতে কিছু আশু আর অই এনে দাও বাবা : ছেলে কটা বসে জুবার্তা : উপোশী মাছ কুচ হবে নৈকি !”

বাক্তি মুখজালোয় ব্যবস্থা করতে যা হাঙ্গামার কিরে খেলেন। আহত আমেরিকান ছেলেটি সেই খেকে ঘরনার দায়ে নাকে পোতাছিল। যেতার অতটা বিধিরে গেছে কিনা, একটি কার্খান সৈন্ত আসল কাত দিহে খেটা পতন করছিল। ব্যাটারটা অবন্তি নাহের নকর এড়াইনি। ছেলেটি সেবারলের কহী হতে পারে মনে করে যা আগ্রহের সঙ্গে তাকে তার পরিচয় খিজালো করলেন। ছেলেটি জানালো: যে সে সেবারলের কহী নয় তবে চিকিৎসা-বিভাগ সম্পর্কে তার কিছু পড়া আছে। তার দায়বা অতটা বিধিরে হারনি অতিরিক্ত বক্তব্যের কলেই এমনটা হয়েছে। এখন এই প্রয়োজন ভাল বাবাই আর বিশ্রাম। এল কথাবার্তার মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি সম্মেল তাবটা ক্রমেই উবে যেতে লাগলো। এল ঘটনার যা চোখের জল ধরে রাখতে পারলেননা। তিনি ঈশ্বরের কৃপার প্রশংসা করলেন। ঈশ্বার ইন্ডের পূর্বে যাপ-মা-ছাড়া ছেলে কটার চোখের বাশ্পারিত হলো।

বলবর্ত খাবার পেরে আহত আমেরিকান ছেলেটি রাখেই বেশ চাড়া ধরে উঠলো। তখনও ভোয়ের আলো ফোটেনি সুতারা হুঁএকটা পানী লবেহাও ভাঙতে শুরু করেছে। লকলেই হুঁসো বিহারের কণ উপস্থিত। আহত আমেরিকান ছেলেটিকে ধরে বেওয়ার অস্তে দুখানা খুঁটি আর একটি চায়ের সাহায্যে একখানা স্ট্রটার তৈরী করা হলো। যা এদের লকলেরই অঙ্গপাতি কেবল দিলেন। কার্খান কর্পোরেশনটি দ্যাপের পারে ছোট একটি নদী বেধিরে এদের স্থিতিরে বিলো যে ঐ নদী দ্বাধর বেশ বানিকটা এগলেই তারা নিজেদের ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। যা এদের লকলকে সেবারের মতো আশ্বাস করলেন। কার্খান আর আমেরিকান সৈন্তেরা পরস্পরের কনসর্ভন করে, হুঁসল হুঁসে রওনা হলো। ছেলের হাত ধরে যা ঈশ্বরের অসীম কৃপার কথা বারবার স্মরণ করতে লাগলেন।

•

বিববিখ্যাত ছাত্তল্‌ক এলিলকে একজন তরুণী একবার প্রশ্ন করেন : আচ্ছা মহাশয়, আগনি পুত্র হারও নারী মনের অত সোপান রহস্ত জানলেন কি করে ?
ছাত্তল্‌ক এলিল যুহু হেসে উত্তর দিলেন জানবার সমরটাতে আমাকে নারীই হতে হয়েছিল যে। অর্থাৎ নারীর সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম।

প্যারিসের নীল দাড়ি

গৌরীশঙ্কর দে

(হেনরী লতু, বোম্বের এ-বুকের সব চাইতে ভয়াবহ অঙ্গরাবী। ১৯২২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী অক্সফোর্ড সিলেটিনের নিচে তাকে মাথা পেতে দিতে হয়। স্বপ্ন জন স্ট্রীলোক এবং একটি বালককে ঠাণ্ডা মাথাধা খুন করার অভিযোগ আসে তার বিরুদ্ধে। বালকটির দেহ সে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে স্টোনের আগুনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে। হেনরী লতু-লজিনী করে মোট ২৮৩টি স্ট্রীলোককে।

বীতিহাসে পরিচরিতা অঙ্গরাবী সে পাঁচ বছর ধরে প্রেম ও হত্যা-কাণ্ড চালিয়েছে। কোনো মহিলা নির্যাতন হয়েছে, পুলিশকে বধরও দেয়া হয়েছে। কিন্তু নিকেন্দেব রক্ত অসীমায়িতই থেকে গেছে। পুলিশের মনে হয়েছে প্রতিটি নিকেন্দেব ঘটনার পেছনে পৃথক-পৃথক অঙ্গরাবীর হাত। সব অঙ্গরাবের নামক যে আসলে একজনই পুলিশ তা কল্পনাই করতে পারে নি। শাই কোনো স্ত্রেরই লজান পায়নি।

প্রথম মহাবুদ্ধি বিপ্লবত নৈগমিক নীধন। এই বিপ্লবেরেয় সুযোগ নিচ্ছিলো লতু,। অনেকের দ্বারী চলে গেছে লীমাতো হুঁ করতে। কারো দ্বারী হুঁ করতে গিরে দাতা গেছে। স্তব্ধতা বিয়ের প্রত্যয় অনেকের পকেই তখন দোতলীয়া।

তারপর, একেবারেই আকস্মিকভাবে নিকিষ্ট এক ব্যক্তিকার যোন প্যারিস সহরের পথে একদিন বেধতে গেলো লতুকে। গিছে-গিছে গিরে বেধে এলো তার আগন্তা, তারপর বধর দিলো পুলিশে। পুলিশ লবে লবে লতুকে হাঙতে পুরলো। তখনো কিছু পুলিশ জানেনো অজ্ঞাতে থাকে তারা ধ'রে কলেজে অঙ্গরাব অঙ্গতের সে এক বাবব-বোয়াল।

কৈশনে বাবার পথে লতু, মোট একশাটা মোট হুঁ হুঁ দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বোয়েদ্বারী লবে-লবে তা হুঁড়িয়ে নিলো। তখনই প্রথম উল্লসিত হলো এক চাকলাকর, তারাবব ইতিহাস। লতু, যে সব অঙ্গরাব করেছে তার প্রত্যেকটির উল্লেখ হয়েছে ওই মোটহুঁকে। যেন কোনো ব্যবসায়ী সাংকেতিক ভাবার লকেগে গিবে যেথেকে তার বাবলায়ের বিবরণ। মোট হুঁকে যেদলজন স্ট্রীলোকের নাম পাওয়া গেলো, ১৯১৫ সালের পরে তারা লুকনই নিকিষ্ট।

বিভিন্ন বিকল্প ঘটনা ও হুঁ একত ক'রে পুলিশ বীরে-বীরে এক ভয়াবহ কাহিনী উদ্ধার

করলো। জানা গেলো লণ্ডন-এ-পর্বত প্যারিস শহরের এগারে। আরপার এবং শহরের বাইরে দু-আরদার বাস করেছে। আর এ-পর্বত সে ব্যবহার করেছে পনেরোটি নাম।

লণ্ডন বাহা ছিলেন প্যারিস শহরের এক ট্যাক্সি-ড্রাইভার। তাকে প্রতিবেশীরা বেশ প্রভা করতো। অজান্তে কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন। প্রথম যৌবনে লণ্ডন ছিলো স্বাভাবিক, উজ্জল। গড়ভান্না করতে ভালোবাসতো। কিন্তু বয়স বাড়বার লম্বা-লম্বা তরে ঘরো দেবা দেহ অপরাধ-প্রবণতা।

ছোট-খাটো প্রভাবের অভিযোগে বার দুই সে জেল যাচ্ছে। ১৯১৬ সালে সে পাইকারী হারে প্রেম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বয়সের কাসমে 'শাবী চাই' এবং 'আলবার পূজা কিনতে চাই' এই দুই রকম বিজ্ঞাপন দিয়ে সে অলংঘ্য ব্রীলোকের সম্পর্কে আসে এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে উদ্বাহ প্রেমে লিপ্ত হয়। তখনো কাউকে পূজ করার কথা সে ভাবে নি। কেবল তাদের ঠিকিরে টাকা নিতো।

প্রেমের অভিনয়ে হেনরী ছিলো অভ্যস্ত নিপুণ। বিতীর্ণতার, কি ভূতীয়দারের সাক্ষাতেই সে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারতো। তার ভায়েকী থেকে জানা যায় একই সঙ্গে অনস্বতক ঘরের সঙ্গে সে লীলা চালিয়েছে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আদান-প্রদান করেছে দীর্ঘ ও অছত্রাপতন প্রেমগত। হেনরীর এক ব্যক্তি থেকে পুলিশ এ-বকর এক শুদ্ধ চিঠি আবিষ্কার করে।

ওই সব অপরাধ অচর্চানের সময় লণ্ডন তার স্ত্রী আর ছেলোমেয়েদের রেখেছিলো। আলবার এক বাড়িতে। দামী এবং পিতা হিসেবে সে ছিলো আর্য। বাহে-বাহে অবত সে বাইরে থাকতো। তবে বাবার সময় বাড়িতে ব'লে যেতো ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে সে যাচ্ছে। কী যে তার ব্যবসার স্ত্রী বা ছেলো-মেয়েরা তা একবারেই জানতো না। না কেনেই তারা লণ্ডনকে সাহায্য করেছে দুতাদের জিনিসপত্র বিক্রি করে কেনতে।

আগাগতে লণ্ডন বিচার শুরু হয় ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে। প্যারিস শহরের লোকেরা তাকে গেলে তখন টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে কেনে। লণ্ডন, কিন্তু বিবিকার। আদালতে কোনো কথাই সে বলছে না।

একদিন লণ্ডন নিজে থেকেই ডেকে পাঠালো বিচারককে। সে সাক্ষি অল্পতপ্ত। সব দোষ কবুল করতে চায়। কিন্তু বিচারক হাজির হতেই লণ্ডন তবু দীর্ঘশ্বাস কেনে বললো, "২৮শী ব্রীলোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আমার স্ত্রীর প্রতি যে অনিবার্য কাম করছি তার মত আমি অল্পতপ্ত।" আর একটি কথাও সে বললো না। তার কথা শুনে আদালতে কানির হজোড় উঠলো।

তদানী শুরু হলো আদালতে। এক একটি হত্যার ইতিহাস উন্মোচিত হতে থাকলো।

লণ্ডন প্রথম বিচার এক সস্ত্রান্ত বিবদ। সাহ কুটেট। বিয়ের বিজ্ঞাপনের টোপ কেনে লণ্ডন তার সঙ্গে আদান করে। তার প্রচণ্ড প্রেমে বিজলা মহিলা লণ্ডন সঙ্গে চলে যায় শহরের বাইরে এক বাড়িতে বাস করতে। সেখান থেকে চিরকালের মতো উদ্বাও হলো বিবদা এবং আঠারো বছরের ছেলোট। বিবদার আলবার ঘনে গেলে লণ্ডন নিজের বাড়িতে। পুলিশ এখন লণ্ডনকে প্রেপার করে তখন তার স্ত্রী এবং ছেলের প্রেমিকার পায়ে ছিলো ওই বিবদার অলকার।

লণ্ডন বেশির ভাগ বিচারই বিবদা। তবে ১৯ বছরের একটি কুমারীও সন্ধান পাওয়া গেলো। লণ্ডনকে এখন পুলিশ প্রেপার করে তখন ২৯ বছরের একটি মেয়ের আত্মদে ছিলো তার ঘেরা আটি।

ব্যবস্থানের আরক। এই আগে আরো ন'জনের আত্মলে সে এই আটি পরিচয় দিয়েছে এবং প্রত্যেকেই তার হাতে গ্রাণ হারিয়েছে।

২২ বছরের তরুণী কার্ণিও লিওটে হেনরী বুদী পরিচয় জানবার পরেও তার বিকছে সহাসরি সাক্ষী দিতে রাজী হলো না। বয়স বললো : "হেনরীর কাছ থেকে আমি পেরেছি আত্মবিক্রম প্রেম ও জ্ঞান। আমিও তাকে ভালোবাসতুম, শেষ-পর্যন্ত তাকে বিরোধ করতুম।" আ'বালতে যখন হাঙ্গির হতে হলো কার্ণিও একবারও হেনরীর চোখের দিকে তাকায়নি। যখন তাকালো সঙ্গে-সঙ্গে হুজিত হয়ে পড়লো সাক্ষীর কাঠগড়ার।

অপরোধের প্রমাণ হিসেবে একজন বিখ্যাত অপরোধতত্ত্ববিদ প্যারিস শহরের হাইকোরার একটা বাড়ির স্টোর থেকে ২৪৮ বানা নর-অবি উপহিত করলো। পরীক্ষা ক'রে জানা গেলো ওই অবিগুণি অস্বস্তি তিনজন যাদুঘরের। আরেকজন বিশেষজ্ঞ চিম্নীর মূল পরীক্ষা ক'রে জানালেন তাতে চরিত্র তাপ অত্যন্ত বেশি। যেরূপের অস্বস্তির বোতাম আরো-সলিত অবস্থার পাওয়া গেলো বাগানের মধ্যে। যে-কোষ ঠঠ করা হাত এমন তরল পদার্থ তথা কিছু বোতল পাওয়া গেলো এক জায়গার। প্রতিবেশীরা লাফা দিলো রহস্যময় বাড়িটার চিম্নী থেকে প্রায়ই তারা দুর্গন্ধী, ঘন ঘোষা বেরিয়ে আসতে দেখেছে।

যে-সব চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকেরা লণ্ডকে পরীক্ষা ক'রে যেখান তারা নিঃসন্দেহে স্বীকার করেছেন লণ্ডর প্রতি যেরূপের অস্বাভাবিক আকর্ষণের কারণ তথ্য একেবারেই বুঝে উঠতে পারেন নি। বৈজ্ঞিক দৌলৎ বলতে যা বোঝায় লণ্ডর তা ছিলো না। কেবল তার চোখ দুটো ছিলে অস্বাভাবিক। বড়ো বড়ো চোখ। সাপের চোখের মতো উজ্জল আর স্থির। যথেষ্ট ৪২। মাথার টাক। আর বুখে প্রাচীর আলিঙ্গিতার লোকদের মতো হাড়ি। ওই হাড়ি সম্পর্কে লণ্ডর পর্ববোধ ছিলো।

কী ভৌপলে এত নারীকে সে ছয় করেছে—লণ্ডকে বহুবার এই প্রশ্ন করেছিলো প্যারিসের লোকেরা। উত্তরে লণ্ডর রহস্যময় হাসি হেসে বলেছে : "আমাদের সম্পর্ক ছিলো মূলত ব্যবসায়ের। আর যা ব্যক্তিগত সম্পর্ক তা তৃতীয় পক্ষকে জানাতে চাই না।"

বিচারকের হায়ে স্থির হলো ১৯২২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জার্সাইয়ের কারাগারের নামনে লণ্ডর শিরচ্ছেদ করা হবে।

ওই দিন ভোর চারটের সময় বিখ্যাত অজ্ঞান আনাতোল তেবলার সিলোটিম ঘর সহ হাঙ্গির হলেন। হু'শ ক'রে চার প' পৈত্র পথের দুই প্রান্তে মোড়ানেন। হাতা টিকেট বেগুনে পরেছে কেবল তামেরই চুকেছে। হাতায় সাহায্য করেকটা ইলেকট্রিক লাইট। আর যে সব মজুর সিলোটিমের বিভিন্ন অংশগুলি ছুঁতে ঘরটাকে প্রস্তুত করছে তাহের লঠন থেকে যা আলো আসছে। অন্ধকার ঘর না হয়ে আরো ঘন বেড়ে গেছে।

সিলোটিমের চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রায় পঁতাধিক সরকারী কর্মচারী এবং সাংবাদিক।

লণ্ডর কালো হাড়ি আগেই কানানো হয়েছিলো। কারাগার থেকে বহর এলো লণ্ড এখন নতুন ক'রে হাড়ি-সোফা কানিয়ে নিতে চাচ্ছে। বলেছে : "এতে মহিলারা খুশি হবে।" তার

পায়ে বে আসা তার কলার কাটা। পরনে ঘন রঙের সস্তা টাউন্সবার। পাবে হোঁকা বা জুতো কিছুই নেই।

বিমলকল চোখের আলো সবো জুটে উঠেছে এমন সময় গিলোটিন যন্ত্রটির কয়েক ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়ালো বোড়ার টান' মত একটা গাফি। ডেবলারের লহকারীরা গাফি থেকে টেনে বাঁক করলো বোতের দুটো ফুটি। প্রথম পোল ফুটিটা তাবলো গিলোটিন যন্ত্রের সামনে। এদই মধ্যে পড়বে কাটা মাথা। আর ককিনের মতো চোকারির বিতীর ফুটিটা পাতা হলো যন্ত্রটার পেছন দিকে।

হঠাৎ কাবালারের কাঠের বিশাল হরকাটা লগবে খুলে গেলো। বেরিয়ে এলো তিন সূতি। তারো ক্ষত এগিয়ে আসছে।

সাতখানে লণ্ড, আর দু দিক থেকে তার বাহ চোপে ব'রে আছে দু'জন কারা-রক্ষক। লণ্ডুর হাত পিছনোড়া ক'রে বাধা। সে যাতে প'ড়ে না যায় এমন তাবে তাকে ব'রে সামনে খোর পায়ে এগিয়ে আসছে কারারক্ষী দুজন। ঠাণ্ডা পাখরের হাতা দিয়ে লণ্ডু বালি পায়ে এগিয়ে আসার সময় লম্ব হচ্ছে। তবে তার হাট্টি ঘেন তেজে পড়ছে। দুখ মনে হচ্ছে মোমের তৈরী। আর তরাবহ গিলোটিন যন্ত্রটা চোবে পড়তেই তার দুখ থেকে লম্বা রক্ত ঘেন উবে গেলো।

কারারক্ষী দুজন একটুও দেহী না ক'রে লণ্ডুকে ঠেলে দিলো লামনের দিকে। সে প'ড়ে গেলো অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি একটা কাঠের কলতের ওপর। মাথা একটুকুও নাকুবার ক্ষমতা বইলো না। চোখের পলক কেলতে না কেলতে উপর থেকে নেমে এলো স্বকক্ষকে ইল্যাতের কল। বগ ক'রে একটা লম্ব হলো। পোল ফুটিটার ভিতরে গড়িয়ে পড়েছে কাটা মূত। মল্লা'য়ের লহকারী মূতহীন বেহটায়ে জুলে নিয়ে ককিনের মতো ফুটিটাতে বাবতেই—পিচকারীর নল দিয়ে ঘেন দুটে এলো রক্তের বীভৎস বাতা।

বিতীর লহকারী ছোট পোল ফুটিটা জুলে মূতটাকে বাধা কপির মতো গড়িয়ে দিলো বড়ো ফুটিটার মধ্যে। তারপর ফুটিটাকে জুলে দিলো গাফির ভিতরে। গাফির ঘরখা বন্ধ হয়ে গেলো। বোড়ার পিঠে চাবুক মেরে গাফি ছুটিয়ে দিলো ঢালক।

কারাগার থেকে লণ্ডু বধ্যভূমিতে আসার পর মাত্র ২৮ সেকেন্ড কেটেছে। এদই মধ্যে কখন শেষ হয়ে গেছে রাজ্যাক নাটক।

*

৭

*

কলকাতা সহরের বক তখনও পাথরে বীধান হয় নি। অনেক বাসি কীচো ছিল। ভেলকলের বোঁহার আকাবের সুখে তখন কালি পড়েনি। বীধা নালা বেয়ে গবীর কল স্বপ্নার মতো করে পড়তো। আরাবের যক্ষিণ বাগানের পুতুবে, মাঠে মাঠে গলি বেদে পাকী বোঁহারার হা ই হ হ লম্ব আসতো কানে। সন্ধ্যা বেলায় মলত তেলের প্রদীপ। তারি কীণ আলোর হাড়র পেতে ফুঁ দাগীর কায়ে তবতুন ভগবদা।

রবীন্দ্রনাথ

নাট্যমঞ্চ

চতুর্থ

রক্তমণ্ডে আঁরা মাঝে মাঝে দেশের
 মাস্তুলে বেধিত লাই—বর্ষা ম'তন,
 ম'ল্লের মত ম'ল্লিখ।
 এবং বধন সেই সাক্ষাৎলাভ হয়
 তখন আঁরাধের অঙ্গের পুলক প্রভা সালবাস।
 প্রকৃতি ভাবের লকার হয়।
 এই দিক দিয়া
 রক্তমণ্ড দেশের ও আঁতির বিশেষ ল্পল।

বন্ধিমল্ল

যুগ-চিন্তা

রক্তমণ্ড পরিগ্রহণ। যে স্থান চাইতে বর্ষা-উপবেশ,
 ম'ল্লকলা, ম'ল্লিকা-র প্রলম্ব দেশবাসী ভূমিতে পান—
 সে স্থান কি অপরিচয় হইতে পারে—না, সে স্থান অপরিচয় করিলে
 যা অপরিচয় করিলে রক্তমণ্ড ম'ল্লিখ ব্যক্তির মঙ্গল হয় ? সামান্য
 হোতাকে কথা বলিলে—বর্ষের টাট। প্রত্যহ বর্ষের টাটে অর্ধ
 আদিলেই সর্বদা—যে নাটক অভিনয়ে অর্ধেক প্রায় স্থান করিতে হয়, বর্ষে অভক্তি এবং উপবাসে
 অবস্থান করায়, যে নাটক অভিনয়ে সলোনের কতি, সলোনের অমঙ্গল, দেশের অনিষ্ট, গ্রীষ্মকালের প্রকৃতি
 সুসংজ্ঞার উপস্থিতির সত্যবনা,—অভিনেতা-অভিনেত্রী বা রক্তমণ্ডের কর্তৃপক্ষ বা সলোনের মঙ্গল
 কোন কালেই সেরা নাটক রক্তমণ্ডের ক্রিয়ামাত্র আগিতে দিখেন না।

বিশ্বমল্ল

জীবনী ও স্মৃতিকথা

শিশিরকুমারের স্মৃতিচারণায়
রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

শিশিরকুমারের শেষ জীবনে নাট্যকার ভারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ভারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের “জীবন রঙ্গ” ও “প্রান্ত” নাটক দুখানি শিশিরকুমার জীবনকালে অভিনয় করেছিলেন। এই দুয়ে বহুদিন ভারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিশিরকুমারের অনেক কথা হয়েছে, অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী উপলব্ধিও হয়েছে। এই সংখ্যায় প্রবন্ধোত্তরের মাধ্যমে ভারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্র প্রসঙ্গ পরিবেশিত হল।

“আগরি কবির লগ বেশ গেরেছিলেন, না?”

“গেরেছিলুম। রাবসে গারিনি।”

“কেন? বাবা ছিলো?”

“আমারই দোষ। অজ্ঞত: অনেকবারি।”

“বাড়িটা?”

“গারিগারিকি।”

“বদুর না, তুমি। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না তো?”

“না, না। কথা বলতে না গেরে মনটা আরম্ভা হয়ে আছে। আমি যে ব্যক্তির তাড়ুড়ি তাকে না জানে? কথা কইলে বেঁচে বাই করেফটা দিন।”

“রবীন্দ্রনাথ আগনার ‘পীতা’ দেখেছিলেন জানি। কিছু বলেন নি?”

“নিশ্চয় বলেছিলেন। আমার বাচনভঙ্গির অকুঠ প্রণেসা করেছিলেন আমার লাবনে। গেরে-বোধ্যাকেও বলেছিলেন।”

“আগনি নিশ্চয়ই পরংতন্ত্রের কথা বলছেন?”

“হ্যাঁ, পরংতা তাঁর পদ্ধতি নাটক করিয়ে আমার করতার বাচাই করতে কবিকে বিজ্ঞাসা করেন।”

“কি বলেন তিনি কবিকে?”

“বলেন, ভুলেব, শিশির কেন বল? অভিনয় করে কেন? তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ওর বাচন-ভঙ্গি অপরূপ সুন্দর, সম্পূর্ণ নিজস্ব।”

“পীতা দেখে কবি কি বলেছিলেন?”

“নাটকটাকে তিনি নাটক পদবাচ্য করতে চাননি। আর বলেছিলেন, পীতারক কিছু বলবার আছে। আমি তোমাকে পীতা লিখে দেবো আর অর্জুন। তাহাঁত! আরো দু-একবার নাটক তোমার লগ লিখবো।”

“আগা-হা : এমন অর্ধবর্ণিযোগ হায়াপুদ আমবা।”

“আমায় মোবে।”

“কেন?”

“দেবা করবে কে? অবসর তো মনে খেয়ে কলেন। অবসর আমি প্রত্যাহ মন বাইনা, তবে যখনই বাই না কেন, একটানা চলে কিছুদিন। তাতে সাক্ষাৎকারে বাবা ঘটতো যেতি।”

“পারিশাবিকের বাবা বলছিলেন কিছু আগে?”

“সব কথা বলে বলবে। আমি বেবে-ডেকে বলার লোক নই এবং সেইজন্য অন-অগ্রিয়।”

“আপনি অন-অগ্রিয়?”

“নই বিশিষ্ট তাহুতি অনগ্রিয়, কিন্তু ব্যক্তি বিশিষ্ট তাহুতিক বিশেষ কষ্ট পছন্দ করে না।”

“রবীন্দ্রনাথ করতেন তো?”

“এতোটুকু লক্ষ্যে হয়নি।”

“তবে বাবা ছিলো কোথায়?”

“একবার হুঁচকদিন রক্তপানান্তে গিয়ে পড়েছিলুম বোলপুর। মজলিলে ছিলেন কবি। একটু ভকতে ছিলাম। লম্বিত হয়ে বসিনি। বললেন কবি, এগিয়ে কাছে এসো হে। তুমি যে অমৃতের বন্ধু তুমি আমি।”

“কেন? ঠাণ্ড কথা বললেন কেন?”

“ঠাণ্ড লম্বা আমি শুকখাটা আমি। বাইরের অনেকই জানে না। তবে আমি বুলুল তিনি হুঁততে গেরেছেন কেন আমি বুঝে বলেছিলাম।”

“কবি আপনাকে ভালো বাসতেন?”

“বাসতেন। এক লম্বা আমাকে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করবার আমন্ত্রণ আনিয়েছিলেন।”

“আপনি কি উত্তর দিয়েছিলেন?”

“আমি কেবেছিলুম হুঁচক না হয় ঠাণ্ড অমৃতের মতোই ঘরে বলে বাবে; কিন্তু টাকাকড়ি যা সেবেন আমায় তাতে চলবে কি করে? আমার নিজের বহু হুঁচক মত পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব আছে। পরিচয় বন্ডি হলে হুঁতবেন আমি আলনা হলেও বাতিবজানকী নই।”

“সীতা নাটক ঠাণ্ড পছন্দ করি?”

“তবেন কিছু নয় নাটকবাদি, তাই বলেছিলেন। আমায় সে বলে নাট্যকারে যোগেশনা ছিলেন হাজির।”

“বেবেবে!”

“হ্যাঁ! আমি তো যহা অগ্রহস্ত। কবি যোগেশনাকে ডেনেন না। কামেই অলান বহনে নাটক বিচার জানালেন।”

“যোগেশনাবাহুর হয়েছিলেন তো?”

“কীতিমতো, গবে আমায় কাছে কেঁবে বললেন, ‘শিশিরবাহু আমবা না হয় ববিঠাকুর নই, তা বলে’—আমি যোগেশনায় উত্তর অগ্র হোব করবার অজ্ঞ বললাম, যোগেশনা, ববিঠাকুর, ববিঠাকুর।”

আর কেউ একথা বলেনি। তাহুড়া আপনাব নাটক লোকের এলোমেলো বেশিরকম পেয়েছে। টাকাদ কম হয়নি ওর বোলতে।”

“এবার গল্প ‘পোড়ার গলগের’ কথা।”

“তুমিও নিশ্চয়! আকুল আগ্রহে শুনো।”

“পাণ্ডিত্যবোধে দুদিন তরুণি তখন। পোড়ার গলগের নাটকরূপে নিয়ে আসিবে। কবি লিখে বেবেছিলেন, আবার পোনালেন।”

“সবটা?”

“হ্যাঁ। তুমি চুপ করে আছি বেবে বললেন, ‘কি যে, গল্প হয়নি?’ আমি বললাম, ‘অপছন্দ হবে কি করে? তবে ‘চেন্দ্র’ আনাতোই লাগতে হবে। তাই অল্পতব করছি ওকে মাকবানে ছাড়লে ঠিক করতে পারবে না নাটককে।’ কবি বললেন, ‘লব কথা খুলে বলো।’ আমি সবিস্ময়ে বললাম। কিছুকণ শুধু থেকে বহীজ্ঞাষ, আপন রচনার অভ্যাস মনোবাহারণ বহীজ্ঞাষ, কাল। কাল। কয়ে ছিঁড়ে ফেললেন পাতুলিগি।”

“বলেন কি? বিখ্যাত হয়না যে?”

“আবার-ও এখন বিখ্যাত হচ্ছেনা। নিভাত শুককে দেখছি তাই কুলবোনা কোনোদিন।”

“তার পর?”

“পরদিনই চায়ের টেবিলে ডাক পড়লো। সেলাম। চায়ের পানি চবা-চোত সারা হলো। জানেন কি, কবি লিখে যেতেন, প্রয়োজন শু কতিমতো, কিছু টেবিলে যা পরিবেশন করা হতো তা লাবাক করতে একটা পাঁচ শাকবুলী বিশিষ্ট উটের ব্যবহার হতো। আমার অভিজ্ঞতা তাই। অজ্ঞে কি লাফা বেবে আমি না। অবশ্য একটু হয়তো বেশি কতে বললাম। তিনটে শাকবুলীর মতো আরোজন আর কি।”

কথাটার দুজনেই হেলে উঠলুম। পরে আমিই প্রথম কথা কইলাম। বললাম, “তারপর?”

“আভোপছ রচনা করেছেন কবি সাহা বাসি বহে। নিখুঁত। আশ্চর্য।”

“আমিও তুমি আশ্চর্য হচ্ছি অভ্যস্ত।”

“বললেন কবি, পোড়ার গলগ ছিলো, শেষরক। হলো। এর নাম হোক ‘শেষরক।’।”

মুকের মৌরাস। এলো বহীজ্ঞাষের নাটকের কথা এলে পড়লো। কথা এলো।

“যোগাযোগের ব্যাপারটি বলি। (শিশিরবান্ বলতে লাগলেন) প্রথমে বলি কতাব কথা। ‘হুমুদিনী’ চরিত্রে কতাব অভিনয় তাঁকে খুশি করেছিলো। অভিনয় শেষে বলেছিলেন বহীজ্ঞাষ কতাবে, তুমি যে মোটা সে কথা জুলিয়ে দিচ্ছেছিলে।”

এই এলো শিশিরবান্ বললেন, “জানেন, মশাই কতাব প্রথম বহন এলো তখন তার যোগাটে পড়ল। হুমুদিনীর পক্ষে লাগল। তারপর মুটরে গেলো।”

“যোগাযোগের মটাকপ দেখতে ইচ্ছা করে।”

“সেখানে। সেখানে। পরে। অভিনীত সংস্করণটি আছে নিশ্চয়ই জুইব কাছে।” জুইবেশ তাঁর অল্পতম জ্ঞাতা বিয়েটার চলোনের বাগানে তখন রাত। অমূল্য তিনিও পরলোকগত।

শিপিংবাহু লিঙ্গারের ঘন একটি ঝলক উল্কার করে আগ্রহের একটি বহিত রাত্রি বিকাশ করে বললেন, “সে তারি যজ্ঞ। যোগাযোগের শেষটা বলতে চাইলুম। কবি হাজি নন আরো। আমি বললুম, অপরাধিতা কুল দিয়ে কুহুদিনি দাবী কামনা করে, সেই চিরকালে লতীকে বিজোহিনী করবেন কি করে? কবি বললেন, ‘কুহুদিনি আমার কুহু-কে ম’লুণী তি’লুটি করতে চাপে।’ ওর লম্বা বিশ্রাসকে পুনিসাং করে জীবনের নাকীতে এসেছে বিস্ত্রোহ। এ তোমার লম্বার বিজোহিনী নয়।”

একাত্ম আগ্রহে বললুম, “শেষগণ্ডি বললো কতোবুট?” শিপিংবাহু বলে চললেন, “আমি তখন বললুম, তাকে একবার মনুষ্যবৈদ্য ঘরে যেতে কোরবে? তখন কবি খুব কপে গেলেন। বললেন, ‘তা তো ঘাবে। ঘাবে কি খসবার ভক্ত? ঘাবে কিরে আলার ভক্ত।’

একটুখানি ধায়লেন শিপিংবাহু। ঝাঁক একটি ভূইমিহি হাসি ঠোটে ঠেকে বললেন, “আমি তখন বললুম, ঐ মনুষ্যবৈদ্য ঘরে ‘তার পথে গড় হয়ে প্রণাম করবে কুহু।’ দূত শেষ হবে। কবীটার আরও উগ্র হয়ে কবি বললেন, ‘কখনো নয়। তা হবে না। হতে পারেনা,’ আমি বললুম, তাই যদি হয় তবে সমগ্র বর্ণক সমাজ খুঁজি হবে। আমি হজিবাটা ভালো গাথো। তখন কবি কিয়কম ঘন অতল গভীর হলেন। পরে বললেন, ‘কুহু তো খুঁজি লোক কে।’ উত্তরগত বললেন, ‘খা খুঁজি করোপে। তোমার যোগাযোগ লোকে কদিন মনে রাখবে? আমার যোগাযোগ দ্বারাব্য থাকবে।’

অর্থাৎ ববীজ্ঞান ঘন অনিচ্ছা শেষেও মত দিয়েছিলেন।

শিপিংবাহুর কথায় তাইই আতাল পাওয়া গেল।

পুরোনা কথা

শিপিংবাহু বাংলা বিয়েটার মানসবাহা
বুঝিয়ে যে হাজি সারা জীবনের

দব সত্ত্বা নিঃশেষ করেছিলেন, ঐরা প্রতাপ

ও প্রতিপত্তির কাছে ঐরা শিপিংবাহু কিছু

শিপিং-অমরেন্দ্র-লড়াই

দিন নিশ্চয় হয়েছিলেন, নিজস্ব দ্বারায়, কাউকে অত্যাচার না করে, নিজের প্রতিভায়

অভিনয় করে বহু চরিত্রে তিনি অপরাধের ও অবিশ্বাসের কীতি বাণশ করে গেছেন

সেই বনামবস্ত বিরাট পুরুষ অমরেন্দ্রনাথ রক্ত বহন বিয়েটার মালিক হন তখন

শিপিংবাহু তাঁর অধীনে কাজ করেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথকে তিনি বলতেন “বাহু।”

হাফে হাফে অমরেন্দ্রনাথের লগে শিপিংবাহুর বিরোধ বেবেছে। এবং এমনও

ঘটেছে যে অমরেন্দ্রনাথ শিপিংবাহুকে বাক বিজ্ঞপ করেছেন। পরে অবশ্য সে বিরোধ

হিটেছে। তেমনি একটি বিয়েটার কাহিনী শিপিংবাহু করা হল।

শিপিংবাহুর বহন বৌবন প্রায় উজ্জীর্ণ অবস্থার পূর্বে তেঁকে তিনি অভিনয় করে চলছেন, ঠিক

তখনই অমরেন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন। নিজেকে তিনি অবিশ্বাসিত প্রতিভাধর অভিনেতা

বলে মনে করতেন। সুযোগ পেলেই তিনি শিপিংবাহুকে অপদহ কথায় চোঁড় করতেন।

একবারের কথা বলি। গিরিশঙ্কর সে সময়ে মিনার্ভা রুমকে নিয়মিত অভিনয় করছেন। তিনি নীতারাম নাটক খুললেন। অমরেন্দ্রনাথও কিছুতেই হাত ছাড়া করতে চাইলেন না এই নাটকটি, টপট তিনি ড্রামটিক ঐ নীতারাম নাটকই খুলে দিলেন। কলকাতার দুটি বকরক মিনার্ভা এবং ড্রামটিক থিয়েটারে নীতারামের অভিনয় চলতে থাকল। কিন্তু বকর করেই অমরেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হলেন না, প্রতিদ্বন্দ্বী বিপত্ত্যেবন নটরক গিরিশঙ্করকে বাধ করে নানারকম প্রচারপত্র বিলোতে শুরু করলেন তিনি। একটি প্রচার পত্রে তিনি লিখলেন :

“নট, নটকী এবং বাণিত এই তিন জন চরিত্রের পার হইলেই কাজের দার হইয়া যায়। ড্রামটিকের নীতারাম দৃশ্য হুয়া, সুবির মতঃ।”

কোন কোন প্রচার পত্রে নানাবরণের কাহিনীও জাঁকতে লাগল। একটি প্রচার পত্রে জাঁক হোল একটি দাঁড়িয়ার। তার একদিকে গিরিশঙ্কর হাতা করে পাঞ্জার ওপরের দিকে উঠে গেছেন আর অমরেন্দ্রনাথ তারী হয়ে নীচের দিকে নেমে রয়েছেন।

নটরক গিরিশঙ্করকে নিয়ে এ আভিহর বাস্তবান্ধন অনেক ভাল চোখে দেখেন নি বা লক্ষ্যন করেন নি, অনেক প্রকাশ্যে অমরেন্দ্রনাথের এ বরনের আচরণের নিন্দাও করেছেন। তবে নীতারামের ভূমিকার অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে যে গিরিশঙ্করের অভিনয় ব্যতিক্রম হইল সে বিনেত পেরেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। কেননা অমরেন্দ্রনাথের পূর্বেই আচরণের সমালোচকরাও নীতারাম চরিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রেটবের কথা মুকুর্ভে বীকার করেছিলেন।

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের বহু শিল্পী গিরিশঙ্করের দত্ত প্রতিভার বিরুদ্ধে কোন এই হীন আক্রমণ চালালেন এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এই আক্রমণের পেছনে কিছুটা যে আক্রোশ ছিল তা বুঝতে পারা যাবে নীচের ঘটনা থেকে।

গিরিশঙ্কর ড্রামটিক থিয়েটারেই নিয়মিত অভিনয় করছিলেন, ড্রামটিকের অনগ্রহতা বাস্তবিক কারণে খুবই বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সামান্য কারণকে উপলক্ষ্য করে গিরিশঙ্কর হঠাৎ ড্রামটিক ছেড়ে দেন। অমরেন্দ্রনাথকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে তিনি তাঁর হলদল লুকলকে নিয়ে একবারে মিনার্ভার দিগে ছোপ দেন। অমরেন্দ্রনাথকে এর ফলে খুবই লজ্জার মধ্যে পড়তে হয়। ফলে গিরিশঙ্করের ওপর তিনি বাস্তবিকভাবেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং লজ্জাত আক্রোশ বশেই তাঁকে বাধ করেছিলেন, এবং প্রকাশ্যে এইভাবে অপবহ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

এই ঘটনা যে আক্রোশবশেই তিনি ঘটরেছিলেন তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় গিরিশঙ্কর ড্রামটিক থিয়েটারে ফিরে এলে গিরিশঙ্করের প্রত্যাধর্তনের পর অমরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ এক প্রচারণা প্রকাশ করেন। তিনি ভাঙতে লেখেন :

“পূজ্যগাম শ্রীমুক্ত বাহু গিরিশঙ্কর যোগ মহাপ্রভুর লল বিদ্যার নিষ্টিয়া দিয়ারে। বাহলায় যে করেটি বাহী হলক স্থাপিত হইয়াছে, ললললললিই সুবিক্তা গিরিশঙ্কর। প্রায় ললল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই গিরিশঙ্করের শিক্ষার গৌরবাধিত। তাহাদের মধ্যে আধিক একজন। গিরিশঙ্কর ললিত বিদ্যার করিয়া নিত্যই গুণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বহুই প্রবেশ বিষয়, ললল লনোমালিত্ত অদর হইতে মুছিয়া কেশিয়া তাঁয়ার বেহদর কোলে আবার তিনি আবারে টানিয়া লইয়াছেন।”

এইভাবেই সে বাস্তব অমরেন্দ্রনাথ ও গিরিশঙ্করের মনোমালিন্যের বহু পরিদর্শন ঘটে।

হারাবন ক্ষুব্ধতা

নব-নব রূপে

মৌসুমী। দুর্গাপুত্রের এই শিল্পী-দ্বন্দ্বী সম্প্রতি অভিনয়
করলেন রবীন্দ্রনাথের 'শুধু বক্ষা'।

সমস্ত রায়চৌধুরী পরিচালনা গ্রন্থাগার, গবেষণা, বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ ও অভিনয় সুযোগাযোগ, মতামত, বক্তব্য, তত্ত্বাদি চৌধুরী, শ্রীমতী অমল, অমল সুযোগাযোগ, তত্ত্বাদি বক্তব্য ও পি. ক. সু-অভিনয় করেন।

সি. সি. ইন্ডা স্টারস। তখন নাট্যকার তাপস দাসের 'অপেক্ষা' নামের নাটকটি এঁরা
রক্ষা করলেন এ. বি. টি. এ. রক্ষণ। নাট্যকার যখন নাটকটিকে পরিচালনা করেন। বিভিন্ন চরিত্রে
রক্ষণের মনোভাব করত সমর্থন, বিশেষ পাণ্ডিত্য, লাবণ্য, কথ, প্রবণ মিত্র, প্রবীণ মিত্র ও
অন্য চৌধুরী।

শিল্পীশ্রী। সম্প্রতি শিল্পীশ্রীর সত্যতা হাওড়া টাউন হল অভিজিৎ রচিত 'বঙ্গভাষা' নামের
নাটক অভিনয় করে গ্রন্থাগার অংশগ্রহণ করেছেন। অদীশ ওহর মক পরিচালনা নৈপুণ্যের পরিচায়ক।
অভিনয়ে যত্ন যত্নসহায় ও সত্যেন সুযোগাযোগ বিশেষ উৎসাহের স্বাক্ষর রাখেন।

শিল্পকার। নবীন নাট্যকার জ্যোতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা নাটক 'মুহুর্ত বা মোহন' নামের
অভিনয় হল গত রাতে হাওড়া ই. আই. আর মক। পরিচালনা ছিলেন বাণী বসু মল্লিক। অভিনয়ে
রক্ষণের সীমিত লাভ করেন বাণী পাল, মন্দিরা^১ সেন, পঙ্কজ সুযোগাযোগ ও রমণী মল্লিক।

চারণ শিল্পী। বিহারকের 'ভাষার নামটি রক্ষা' আর শৈলেশ ওহর নিরোপী 'ক্যান্সন' এই
দুটি নাটক সার্বজনীন লবে অভিনয় করে চারণ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য রক্ষণের আশু অভিনয় লাভ
করেছেন ওঁদের মধ্যে আছেন, মিশ্রণ বার, পুন্দিয়া পাল, অজয় সান্দুলী ও অজিত ভট্টাচার্য।

জ্যোতিষী। চাকরার এই নাট্য সংস্থাটির নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা ওই দিককার বাসিন্দাদের গ্রন্থাগার
লাভ করেছে। সম্প্রতি এই সংস্থার সত্যতা জীব বোঝামীর 'স্বপ্ন বিলাস' নাটকটি রক্ষণ করেন।
বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন, অতুল বার, তুহিনা ভট্টাচার্য, সখী কথ, সুনীল সুযোগাযোগ, সখ্য
মিত্র ও অজিত সত্যকার।

লোকসভা। সম্প্রতি মক অংশগ্রহণ করে এঁরা তিনটি একাধিক পরিবেশন করেন—বিহল বের
'চিঠি' অংশগ্রহণের 'চুমকি' এবং সুনীল সুযোগাযোগের 'উলু স্টেশন'। তিনটি একাধিকার
অভিনয়ে ঠাণ্ডা লবচেরে কৃত্রিম গ্রন্থপন করেন ওঁরা হলেন রত্না বাসুগুপ্ত, বিহল বের, সুনীল সুযোগাযোগ
ও মনি ভট্টাচার্য।

কামপুত্র বাচ্চ সঞ্জয়সী। শ্রীমতী বে. অং। বোম, বসন্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, তুয়ার
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সুযোগাযোগ, সখী বসু গ্রন্থ কৃতী শিল্পীর নিষ্ঠা পটীত ফলস্বত্বের এই
প্রাচীন সাংস্কৃতিক সংস্থা সম্প্রতি তাঁর মক পটীত সেনগুপ্তের 'অনন্য' নাটকের অভিনয় করে রক্ষণের
প্রত্যক্ষ আনন্দ দান করেছেন।



ফরাসী অভিনেত্রী ফ্যালকোনেত্তি

অভিনেত্রী ফ্যালকোনেত্তির নাম আজ প্রায় অশ্রবিত। অনেকেই তাকে বেবেননি। অনেকের দৃষ্টিতে তাকে বেবার হুংস কখনোই হবে না। লাতাকীধনে মাত্র একটি ছায়াছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁর জীবনী একবারও প্রকাশিত হয়নি। অ্যাকাডেমী পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম কখনো উল্লিখিত হয়নি। তবু যে তাঁর নাম চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে তাঁর কারণ একটি মাত্র ছবিতেই তিনি যে অনন্ত সাধারণ অভিনয় করেছিলেন তা অস্বাভাবিক নয়। যে ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁর নাম 'মি প্যামেল অব ফোয়ান অব আর্ক'। ১৯২৭ সালে ফ্রান্সে এই ছবিটি তৈরী হয়।

ফোয়ানের সুন্দর্য্য যে ফ্যালকোনেত্তিকে বেবা গিয়েছিলো তিনি মোটেই ভগ্নসী মন, কোনো রকম যৌন আবেগনও তার নেই। চোখ দুটো তেমন বড়ো-বড়ো, আর নবো ময়লা। কিন্তু যে অভিনয় তিনি করেছিলেন তা অপূর্ণ। সেই অভিনয় এমনই ব্যতব হয়েছিলো যে ভগ্নসী মন স্বর্ণাক্ষরে মনে হয়েছে তাতা সুখি স্বচক্রে লেট ফোয়ানকেই দেখছেন, পাঁচ ন বছর আগে বিনি অস্বাভাবিক নির্ধাতন কোণ করেছিলেন তাঁর মরণ চাক্ষু্য প্রত্যাক করছেন।

ছায়াছবিতে বেবা গিয়েছিলো ফ্যালকোনেত্তির ষাটো। তুল কেটে মাথা ভাঙা ক'রে বেবা হয়েছে, লজ্জা তার না থেকে বন্ধ ক'রে গড়ছে, তার মুখে খুঁ খুঁ ছিটিয়ে বে'ধা হচ্ছে। তাকে ভোগ করতে হচ্ছে অকণ্য ব্যভ-বিকণ আর লাভনা। শেষ পর্ব্বত তাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে আতে আতে।

'মি প্যাসন অব বোয়ান আর্ক' আন্টেরিকার মুক্তি পাওয়ার লগ্নে লগ্নে লেখানে চাকলোর দৃষ্টি হয়েছিলো। ক্যালকোনেভির অভিনয়ের প্রণালীর সুখর হয়ে উঠেছিলো 'মি হ্যা ইট' ওয়ার্ল্ড টেলিগ্রাম', আর 'মি কিলডেলিকিরা লাবলিত লেজার'। অর্থাৎ আর্ক ক্যালকোনেভির নাম গল্প-উপকল্পের নারিকার নামের মতোই মনে হর কাল্পনিক। একালে বোয়ানের কৃষিকার অভিনয় ক'রে নাম করেছেন জুলি জারিল। তিনি বলেছেন, "বোয়ানের কৃষিকার ক্যালকোনেভির চাইতে উৎকৃষ্ট অভিনয়ের কথা আরি কল্পনা করতে পারি না।" চলচ্চিত্রের বিখ্যাত সমালোচক হারমান মি ওয়েনবার্গ বলেছেন, "কপালি পর্গার ক্যালকোনেভির চাইতে প্রেষ্ঠ অভিনেত্রী আর্ক পর্বত বেধা যায় নি।"

এই ক্যালকোনেভি কে? কোথা থেকে এসেছিলেন? কোথায় আবার মিলিতে গেলেন? মাত্র একটি ছায়াছবিতে কেন তিনি অভিনয় করেছিলেন? তিনি আর্ক জীবিত না মৃত?

গেলে কী ক্যালকোনেভির জন্ম ১৮৯০ সালে। প্যারিসের কাছে। প্যারিস কনসারভেটরীতে পড়াশোনা করেন। আঠারো বছর বয়সে অভিনয় করেন প্রথম। রমমকে। লগ্নে লগ্নে চারমিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিভাময়ী নাম। ১৯১৯ সালে কপালি পর্গার তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। ছবির নাম 'মি লাইক অব বোয়ান'। মাত্র ৩১ বছর বয়সে লাভ করেন অভিনেত্রী লগ্নের সমস্তপদ যা ৬৪ বয়সে পূর্ব তর অভিনেতা অভিনেত্রী লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু অভিনয়ের বর্ষেই জুগোপ না পাওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি এই লগ্নের সমস্তপদ ত্যাগ করলেন।

এই সময়ের জাগে এসে হাজির হয়েছিলেন ভেনবার্গের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক কার্ল ড্রোয়ার। বোয়ান অব আর্কের জীবনী অবলম্বনে একটি ছায়াছবি তুলতে। বোয়ানের বেশ জাগের পটভূমিকার ছবি তুলবেন এবং কোনো কপালি নেথেকে দিয়েই বোয়ানের কৃষিকার অভিনয় করাবেন এই ছিলো তাঁর ইচ্ছা।

নারিকার লগ্নেনে কার্ল ড্রোয়ার যালের পর মাস দুয়ে বেড়িয়েছেন প্যারিসের রমমকল্লিতে। শেখ-পর্বত আবিষ্কার করেছেন ক্যালকোনেভিকে। কিন্তু প্রথম লাক্ষাতে জেপেছে ধিরা এক দিয়ে কী ভালো অভিনয় হবে? অভিনেত্রী হিসেবে ব্যক্তি আছে ঠিকই কিন্তু এর সুখে যে কী রমম তরল কালি বেয়েটি বকো বোই বনী আরি বিলাসী। কিন্তু ভালো ক'রে তাকাতাই পরিচালক উপলব্ধি করলেন ওই হালির আড়ালে উকি দিচ্ছে আরেকটি সিঁহিহাল প্রকৃতির যেরে; ক্যালকোনেভি বিলাসী পরিবেশে বাস করলেও জুগ-কঠোর জীবনের লগ্নেও আছে তাঁর পতীর পরিচয়। কপালি নারিকার সুখের জিত্তরে পরিচালক বেথতে গেলেন লোথেনের এক কৃষক কস্তার সুখ। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর পর্গার নিকের সুখ যেরে প্রথম চমকে দিয়েছিলেন ক্যালকোনেভি, "আর্মি কি এমন সুখনিং বেথতে?" নিকেকে অসুখর বেথতে, প্রচার করতে কোনো যেরেই চায় না। ক্যালকোনেভি প্রকৃত শিল্পী ছিলেন বলেই তা পেয়েছিলেন।

ছবি নির্মাণ শেষ হবার পর বতরিন না তুল পকাজে ক্যালকোনেভিকে থাকতে হয়েছে পরচূলা প'রে।

এর পরে আবার তিনি কিংরে আসেন বকে। আসলে যে তিনি বকের শিল্পী। প্যারিসে নিজেই একটা রমমক কিনে ফেলেন। নিত্যজ ব্যবসায়ী রমমকের মালিকেরা যেনব নাটক মক্হ করতে যোটেই আগ্রহী ছিলেন বা তিনি লে দব নাটকই মক্হ করতে তক করেন। ১৯২৯ সালে তাঁর

যক বেগ লাফলাই অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তারপরই শুরু হলো বিপর্যয়। আর্থিক দিক থেকে তিনি প্রায় সর্বনাশ হলেন। নিকটের আর আগের যতো অভিনয় দল দিতে পারলেন না।

নাথানী বাহিনী দল ক'রে নিলো ফ্রান্স। ফ্যালকোনেভি ৮'লে গেলেন সুইজারল্যান্ডে, সেখান থেকে রেভিলে। ছাত্রী পড়িয়ে, পান আর অভিনয় ক'রে করতে গেলো আরেজ সংস্থান।

প্যারিস যখন নাথানী বাহিনী ক'ল থেকে মুক্ত হলো, স্থির কালেন অধোণে ফিরে এলে আবার রত্নকে খোঁজাখনি করতেন। তাঁর পুত্রাণা বন্ধু লুইসার তাঁর একটি নতুন নাটকে অভিনয়ের জন্য ফ্যালকোনেভিতে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু সে আমন্ত্রণ তক্ষা কখনো আসেই ১৯৪০ সালের সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে ফ্যালকোনেভির বৃষ্টি গেলো।

ফ্যালকোনেভি ছিলেন নিখুঁত অভিনয়ের পক্ষপাতী। একটি কনাসী নাটকে যাত্রা একটি ইয়েকী ব্যক্ত্যে নিখুঁত ক'রে বলবার জন্য তিনি জন কয়েক ইয়েক শিক্ষকের কাছে থেকে পাঠ নিয়েছিলেন। অন্য একটি নাটকে কয়েক মিনিটের একটি নাচ দেখাবার জন্য তিনি ব্যালো নাচ শিখেছিলেন। আর তাকে চোট পেয়েছিলেন পারের আঙুলে।

তবে তাঁর চরিত্রে কয়েকটি দোষও ছিলো। বৈধ কাকে ব'লে জানতেন না। এক রত্নক থেকে আরেক রত্নকে, এক শিল্প থেকে আরেক শিল্পে, এমন কি এক দেশ থেকে আরেক দেশে অববর্তন বান পরিবর্তন করেছেন ফ্যালকোনেভি। বোম্ব হা অভিবিক অহুতপ্রবণ ছিলেন। সহজেই আনন্দিত আবার সহজেই আহত হতেন। কলে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা খুব কঠিন কাজ ছিলো। একবার বন্ধু হলও তা টিকিয়ে রাখা ছিলো কঠোর ব্যাপার।

ফ্যালকোনেভির রত্নক ভগ্ন পরিবর্তন ক'রে বর্তমানে একটি প্রেক্ষাগৃহ। যাত্রা তাঁর অহুতী বর্ণক ছিলো তারাক বিসত। তাঁর নাম মাঝ উপকবার মাত্রিকার নামের যতো। একটি মাত্র ছাত্রাছবি 'দি প্যাসন অব মোহান অব আর্ক'-এ চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো অসাধারণ রমণী অভিনয় কনতা। সেই ছাত্রাছবিটিও আজ কালে-তরে কদাচিত্ প্রদর্শিত হয়। প্রতিভা প্রকাশের মাধ্যম সেপু-লয়েভের কিতা ব'লেই াংক হয় ফ্যালকোনেভিচিন-বর্ণকদের কাছে আজ প্রায় অপরিসিত। তাঁর প্রকাশের বাহন বহি হতো সাহিত্য বা শিল্প তাত'লে কি তিনি এক অজবিনের মধ্যে এমন ক'রে বিমুগ্ন হতেন।

ছাত্রাবাণী সংবাদ

সত্যজিৎ রায়ের নতুন সন্ধান

আবেগের সঙ্গী তথা-চেন নির্বাণ করেছেন সেই তৃত্বের স্বীকৃতি এই পুরস্কার। ম্যাগসেলাই পুরস্কারের আর্থিক পরিমাণ ১০,০০০ আমেরিকান ডলার।

পুরস্কারের ববর যখন প্রথম পৌছায়, শ্রীয়া তা তখন আনন্দিত নিকটই হয়েছিলেন, কিন্তু অব্যক্ত হয়েছিলেন তার চাইতেও বেশি। অপ্রত্যাশিত ব'লে।

যখন শ্রীয়ায়কে বিবেচন করা হলো এই পুরস্কার পাওয়ার পরে তিনি বাহুবের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে

ম্যাগসেলাই কাউন্সেল আন্তর্জাতিক
ম্যাগসেলাই পুরস্কার-এ-বছর দিচ্ছেন শ্রী
সত্যজিৎ রায়কে। বাংলা দেশের সত্যিকারের
রত্ন মণালী গর্ভার ভগাশিত ক'রে তিনি যে মানবিক

আমরা ছবি তুলেব কি না? উত্তরে সত্যজিৎ বললেন, “মাস্কের জুখ-কটকে আমি সিন্ড্রেট চাইটিয়ে ২৫৫ উপকীৰ্য্য ব’লে বনে কবি। কিন্তু তা ব’লে একটু বিখ্যে ব্যতব্য ছবি তুলতে চাই না। আমার চরিতে আসবে নতুন-নতুন মাস্ক। তবিত্তে আমি বিভিন্ন বিখ্যে বিভিন্ন চবি তুলতে চাই। আন্তর্জাতিক চিত্রা, মাস্কের জুখ-কটক। হবে এর অনেকগুলির উপকীৰ্য্য।”

সত্যজিৎ ব’রের আগে ভারতে যোগদেলেই পুরাতন পেয়েছেন আচার্য বিনোদাচার্য, চিঃ অধ্যাপক নন্দীচরণ, চিঃ অধ্যাপক চৌধুরী এবং মিসেস কলমসেনী চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীঃ ব’র পরেই চবি ‘কলী ব’য়েন, বাবা গায়েন।’ ‘চিত্রাখানা’ চবিটি লেখ হবার পরেই তিনি এই ছবির নির্মাণের কাজ শুরু করবেন। তাৎ পরের ছবি বিস্তৃতি জুগ বন্দোপাধ্যায়ের ‘অশ্বিন সংকেত।’

রাজক্যপুত্রের ডিলেমা লাভ

সোবিয়েত চিত্রায়োদীষের কাছে রাজক্যপুত্র এখানে একটি গ্রি় নাম। এই ছেলে তাঁর অনুগ্রহতা অপরিসীম। মস্কোতে সম্মতি অচ্যুত নকর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রীক্যপুত্র যোগদান করেছিলেন। এই অচ্যুতের তাঁর অনুগ্রহতার প্রমাণ নতুন ক’রে পাওয়া গেলো।

কণ দেশের যোবানেই শ্রীক্যপুত্র গিয়েছেন সেখানেই অরে গেছে রিক্ত, ভনতা তাঁকে আনিয়েছে আন্তরিক অভিমুখ। তাঁর কাটা বহু সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায় ও নতুন ক’রে ছবি ছাপতে হয়। চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত ‘স্টুডিন্ট’ গ্রন্থের প্রচ্ছদে জাপা হয় শ্রীক্যপুত্রের রঙিন ছবি। গ্রন্থটি হক ক’রে বিক্রি হয়। শ্রীক্যপুত্র ছাড়া এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াহিদা রহমান, সুকেশ ও. পি. বলহান ও হীনাকুমারী। ওয়াহিদার লেখ গিয়েছিলেন তার যোম সেখিবা।

অল্লীল লুতা প্রদর্শনের ঐশ্বর্য

সত ২৫শে জুলাই অল্লীল লুতা প্রদর্শনের কাজ তিক্তি পূর্ণিত মিল হয় ও তি শামুগারকে ২০৪ আর্ট পি. সি. বাবার প্রেরণা করে। পরে তারের আধিনে বুদ্ধি বোঁধা হয়।

কানা গেছে সত ২১শে জুলাই তারিখে এই ধরণের আপত্তিকর নাচ সেবার সময় কিছু লক্ষ্য হকে ওঠবার চেষ্টা করে। নর্তকীঘের একজন লক্ষ্যদের বিকে তাকিয়ে অল্লীল আন-ভকী করেছিলো।

সত করেকমাল ধ’রেই এই বহুদকে অল্লীল লুতালীলা চ’লে আসছে। চলচ্চিত্রের পান গ্রামোফোনে বাজতো আর তাঁর লেখ তাল দিয়ে নাচতো। সতেরো আঠারে বহু বয়সের শ্রুতিনটি যেরে। অর্ধ-নয় অঘট্য। এই নাচ দেখতে খুঁই ভিত্ত হতো। লক্ষ্যদের বেশির ভাগই ছিল জুল কলেজের ছাত্র।

চলচ্চিত্রের উৎসবে প্রদর্শিত সোবিয়েত ছাত্রাছবি

সম্মতি মস্কোতে অচ্যুত নকর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে উদ্বোধনের বেশ করেকটি ছাত্রাছবি প্রদর্শিত হয়। ‘অোসিরা’ আর ‘কার্মালিট’ ছবি দুটি পোক্তি স্টুডিওতে তৈরী। এই উৎসবেই বইয়ের লক্ষ্যেরা লক্ষ্যের পথচিত্ত হয়েছেন ওকণ সোবিয়েত চিত্র-পরিচালক মিখাইল বোলিন-এর লেখ। তাঁর পরিচালিত ছবি ‘দি টু’ বুদ্ধি পাওয়ার লেখ-লেখ চাকলোর পট্ট করে। এই ছবির চিত্র-নাট্যকার পরিচালক লিখে। চিত্র-পরিচালক লার্গেই পেয়ালিখক অপেক্ষাকৃত পরিচিত নাম। উৎসবে প্রদর্শিত হয় তাঁর পরিচালিত ছবি ‘কার্মালিট।’

জাপানী চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ

সংসার চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ স্বর্ণপদক লাভ করে পেরুজীর হারাহবি 'নো জোয়ন ইন সেলতা'। চলিটি বক্তিন। এ ছাড়া পুরস্কৃত হয় জাপানী হারাহবি 'দি বিপ হোয়াইট টাওয়ার' আর সুগোহাচ্চিত্রার ছবি 'অন্তাত ওয়াটশিং'। টিউনিসিয়ার ছবি 'ডন'ও পুরস্কৃত হয়।

নট-নটী

জাপানী বন্ধু

মোহন সুখ'র। এতে অভিনয় করেছেন রাজেন্দ্র কুমার এবং সায়রাবাঈ। এক ভারতীয় চল্লি আঁত এক জাপানী তরুণীর প্রেম এই ছবির কাহিনীর মূল বিষয়।

বিয়ের পরে আটলকোর নাম হয়েছে সুনীতা। শ্রীমতী চৌকিয়া বিবিত্তালয়ের গ্রাফুয়েট। চৌকিয়ার নির্দেশ সিনে আর্টস কেন্দ্রে তিনি এতদিন কাজ করেছেন।

সোফিয়ালোরেন মকে!

ইতালীয় বিখ্যাত চিত্র-তাত্ত্বিক সোফিয়া লোরেনে জাপানী পর্গায় অভূতপূর্ব লাকলা লাভের পরে মকে যোগ দিয়ে যেকোনো চাক্ষুসে সেখানেও সহান লাকলা স্বর্জন করতে পারেন কি না। শ্রীমতী লোরেনের বয়স এখন ৩২। ইতালীয় আর কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাঁর মতো ব্যাতি স্বর্জন করতে পারেন নি।

তিনি প্রণবী নাটকসমূহে অভিনয় করবেন কি না বিসেস করা হ'লে শ্রীমতী বলেন অন্ততঃ ইতালীয় নাটকে তিনি অভিনয় করবেন না। তিনি আমেরিকার আধুনিক নাটকের অল্পপ্রাণিনী। তাঁর মতে মাকিনী নাট্যকার টেমিলী উইলিয়মস খুবই বড়ো নাট্যকার। তাঁর নাটকে মারী চরিত্রগুলি শুধু যে লক্ষ্য তা নয় মাল্লব বিসেবেও তারা মহান। সোফিয়া এতওয়ার্ড আলদীর নাটকও পছন্দ করেন। তিনি বলেন, "মু। ইথর্কে বংকার সময় আমি প্রায় রোজ 'হু ইজ আফ্রিক' অব 'মাকিনিয়া উলক' নাটকটি দেখেছি। নাটকটি চমৎকার। তবে এত আমেরিকান যে আমার পক্ষে এতে অভিনয় করা কঠিন।"

সোফিয়া এবারো টেমিলী উইলিয়মসের সঙ্গে পরিচিত হননি। তিনি বলেন, "তিনি (টেমিলী) আমার পছন্দ অপরূপের কথা হরতো জানেন না, তবে আমি আমার মক-কোথন শুক করব তাঁরই সেবা একখানা নাটক দিয়ে।"

মকে যোগদান করলেও সোফিয়া জাপানী পর্গা একেবারে তাগ করবেন না। জাপানী পর্গায় তাঁর আত্মপ্রকাশ মাত্র ১৪ বছর বয়সে।

ক্যামেরাম্যান হলেন অভিনেতা

হলিউডের ক্যামেরাম্যান জেকস উৎ হো 'দি লিজেও অব লালপা' ত্রয়ার' হারাহবিতে অভিনেতা ভূগে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ছবির প্রযোজক ও পরিচালক রবার্ট এডরিক। তাই ছবির অন্তত ভূমিকার অভিনয় করবেন কিম মোতাক, গিটার কিমট, এরনেস্ট হোপেনাইল এবং মর্ক কেনেডি। প্রথম মহিলা চিত্র-পরিচালক

বাংলা হারাহবির প্রথম মহিলা পরিচালক বন্ধু বে। আর মারাঠী হারাহবির প্রথম মহিলা পরিচালক মোতা ঘোটে। পরিচালকরূপে তিনি কৃতিক্ষেত্র পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পরিচালিত ছবির নাম 'চিকুলা পাখল।'

ব্যাপার যা চলছে

চক্রপাতি

(যতাবতের ক্ষেত্রে গল্প-ভাষ্যকী সম্পাদক হারি নন)

কয়েক দিন আগে একটি পত্র পেলাম।
পত্র লিখেছেন আমার সেই বন্ধুটি
বিনিময়স্বার্থে সহন ধোয়াও করবার প্রস্তাব
দিয়েছিলেন এবং গত মাসে কলকাতার
হাওয়ার টমেলস হাউসে গিয়ে দেখে
আমার কাছে এসে মিণোটি করেছিলেন।
পত্রটি বড়ই উদ্ভূত করে দিলাম।

পৃষ্ঠা ১০৫ অংশে, ৬৭।

প্রিয় বন্ধু,

ঠাণ্ডা এই পত্র পেয়ে বোধ করি কিছু অস্বস্তি মানছেন। 'তা হানো, আপত্তি নেই। কিন্তু আমি
চলে এসেছি এখানে পলকাল। চলে এসেছি বললে ভুল হবে, পালিয়ে এসেছি।' কী বুঝবেই যে
সেদিন তোমার কাছে গিয়ে টমেলস ঘরে দেখার পর করেছিলেন আর তুমি তা ছাপিয়ে
দিয়েছিলেন। তারপরেই ত'দিনের মধ্যেই ঘটল বিপদে কাত। তোমাদের ভাগ্য যে এত লোক,
বিশেষ করে এত বেরেলোক পড়ে তা কে জানতো। আর বেরেলের কী কুটুন্ডির পরিচয়!
মাতাধারিকের তারা হার মানিয়েছে। কী করে যে আমার সন্ধান তারা পেল তা রীতিমত
বহুসূত্র। বহুত তুমি বোকা বললেছো কাকের কাছে, অথবা তোমাদের কাঁধের থেকে আমার ঝিকান।
তারা যেমনে। হাই হোল, তোমাদের আবার লখ্যো প্রকাশিত হবার হুঁচকার দিন পরেই আমার
বাকীতে লকালবেলা তিন চারটি ঘরে এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, আপনি যেরেবের পোষাক
নিজে বা তা বদলা করেছেন কেন? বললুম, আমি? তারা কবে উঠল, হ্যাঁ, আপনি। আহতা সব
জানি। আপনি একটা চৌকর, কেবল লতা লতা কথা বলেন, মহামাতি লবন ধোয়াও করবে, জান
করব ত্যাম করব। তা পে হায়া করুন বে, করব বে। কিন্তু আরোহের পোষাকের ভগ্ন কটাকপাত,
আমাদের ব্যক্তিবাহীনতার হস্তক্ষেপ, ক্ষয় হস্তব্য? এ আহতা সইব কেবেছেন? যুগু মেবেছেন,
কীষ বেবেন নি। এইবার টের পাবেন মজা। বেবেবেন, ধোয়াও কাকে বলে? এই বলে তারা চলে
গেল। উকি মেয়ে বেবেলুম, হাতার কয়েকজন ছোকরা গাড়িয়ে। তারা বোধ হয় যেরেবেরই মনে।
কিছুক্ষণ পরে সবাই একসঙ্গে চলে গেল। তার পরেই আমার তাইগো বয়স মনে এলো 'কালু,
তবে এলুম এইমজা, কাল বেকে তুমি ধোয়াও হবে।' সে কীবে? লভে বললুম। তাইগো বললে,
'হ্যাঁ, একদল ছেলেমেয়ে মোড়ে গাড়িয়ে তোমার কবাই বলছিল।' প্রায় কয়লুম, কী বলছিল?
তাইগো বললে, 'কাল লকালবেলা বেকেই তোমার ধোয়াও করবে? আপনি বেতে বেবে না। বব

থেকে বেঁকে যেবে না। চান থাকুক। কিছুই করতে দেবে না। পরপর পাঁচদিন। তার মধ্যে তুমি যদি নাশকবৎ হাও আর মাথা কামিয়ে কেনতে রাখী হও তাহলে তোমার ছেড়ে দেবে। নচেৎ ঘোড়াক চলবে। জুড়িজন ঘোরে পালা করে ঘোড়াক চালাবে।' শুনে আমার আশ্চর্যম তো। শিল্পের ছাড়া হল। লব্ধনাশ। সবচেয়ে দারাজুক মনে হল ঐ মাথা কামানোটা। বাপ মা কবেই সটকেছেন। এখন আমার কোন মায়ে মাথা মুড়বো? কী কালকে বোঝ! এরকম বিপদে যুদ্ধের সময় চাটিলও বেঁধকর পড়েনি। তাহলে তাহলে এই সবই জেয় বিবেচনা করলুম। চুপিচুপি কেটে গড়া হাফ! তাহলে কিস্থিনি গেল যেখানেই গরম নিশ্চয়ই জুড়িয়ে যাবে। এই মনে করে সেদিন রাতেই পোঁটলা পুটলি নিয়ে সোজা পুঠী। রাষ্ট্র-মাথনের সঙ্গেই তালই আছি। আর তাছাড়া কলকাতার তো বাস করবারও আর উপায় নেই, শুভ দিয়ে চা আর জুসি বেতে বেতে তো এমনতেই দুশ্বাসে হাফ করতে আর বিশেষ বেদী নেই! তারপর আমার ঐ ঘোড়াক। বাপের! তুমি বলবে, ঘোড়াক কখনও কে না পড়ছে, এমন কী আমাদের নতুন মন্ত্রী চিরকুমার প্রহর ঘোষ মণ্ডাই নিজের মনের দ্বারা তাড়ায় ঘোড়াক। অস্ত্র গেরে কা কবা, ঐ যে বায়ে-বোথকে কহুনিই বলপতি দুশ্বাসে, তিনিও তাঁর মনের লোকের দ্বারা তাড়ায় ঘোড়াক—তিনিও নাকি নরম হয়ে পড়ছেন, মনের অগ্রহাণ। বাপস। আশুন করানো আশুন থাকুক। দুশ্বাসেও নরম? তাহলে গরম কে? এবং তিনি কী রকম গরম, কে জানে। এখন এই নরম গরমের খেলা চলেছে কলকাতার এমন বেগবোরা তাহে যে কোন ট্রিক নেই কে কার গরম কখনও গণিয়ে পড়বে। জুসি দুই লাফানে থেকে। কালকে বাড়ীতে আসতে বলো না। তিনি হয়তো একমন্ডের, জুসি দে মনের নও। বাস, আর দেখতে হবে না, কেন তোমার বিপদ মনের লোক তোমার বাড়ীতে এলো? ঘোড়াক বলে জুসি। আমাদের জাপানী নিশিই হুতুর অগ্রহাণ। যব। অপরদেহের মধ্যে তাঁর এককালের যন্ত্র বিহরাবী মনের চাই বগেন হাফগুণ তাঁর মনে যোবা করতে তাঁর বাড়ী গিছলেন। যেই না সে ববর পাড়ার রাষ্ট্রি বওয়া, অমনি ইন্সপেক্টর, দাওজু জিন্দাবাদ, করতে করতে বায়ে বোথকের হল এসে হুতুপূর ঘোড়াক করলো। কেন বিহরাবী গালের গোষা আপনায় বাড়ীতে? চুকলি হচ্ছে? চলবে না—চলবে না। জাপানী জাকি জাকি করতে লাগলেন। অস্ত্র হলও চলে এলো বন্দেমাতরম্ বলতে বলতে। দাওবাক্সা বৈপতিক দেবে মেরে পড়লো। এই এখন কলকাতার চোরা। ব্যক্তিগতবীনতা? দে আমার কি? মনের কাছে কোন দ্বারীন নথ্য নেই। বাড়ীর অন্তরম্বলেও জুসি দ্বারীন নও। আর একত্রে তোমার হুকক কেউ নেই। লাংবগণানে আমরা নৃত্তি, যে বেশে বা নব্বের বাস করছি তথাকার পালাকগোজীই আমাদের অস্তিতাবক। আমাদের আগনে বিপদে তাঁরা আমাদের রক্ষা করেন, সাহায্য করেন, নতুন প্রেরণার উৎস্ব করেন। কিন্তু তাঁরা কোথায়? অনেকগুলি মনের মাথা নিজেদের মন্যকায় খেয়েখেরি হুতু করে অনহিতার একটি নতুন ন্যায়গিত মনের হুতলে পালনভার গ্রহণ করেছিলেন। সেই প্রথম বিনটির নৃত্তি বড় মধুর, যেদিন তাঁরা লগব নিলেন। মনে হয়েছিল বিশ বছরের গুণগ্রহণ পর সেদিন যেন নতুন এক লফাল যোবা দিল এই মনুললটি বাংলাদেশের হুক। কিন্তু মারে কেউ রাখে কে। কিস্থিনিদের মধ্যেই যোবা গেল তের ইন্ডিতে ঠোকাঠুকি মেগেছে, লাও, দাওবাক্সি হুক হয়ে গেছে। শুধিক থেকে আমার কলকাটি নাকি ট্রিকই চলেছে। বিশ বছরের পুরোনো ব্যক্তিগ বেলোয়াক্সি আমার ল্যাংগেট্ট এটে মারে আমার উত্তাপ করছেন। এবিধে বাত মদ্য বিকট

রাজ্যের মতো তাহান দেশটাকে গিলে ফেলেছে, মিছেদের দলের অজস্র লবিক বাহ-নেতার ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা বরাবর। পরতাপগজ পেশ পেরে প্রত্যাখ্যান। দুবাহরীর কোভ। দলের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি উদ্ব। ও অবিশ্বাস প্রকাশ। অবস্থা এমন ব্যক্তিগত যে শালকবা নিজেদেরই বলাবলা, তাঁদের কে সাহায্য করে তার ঠিক নেই, তাঁরা এখন অজস্র সব ভাও জুলে নিজেদেরকেই সাহায্যে রাখ। অতএব প্রজাপুত্রের দুর্ব্যাসামোচন করবার বা সে লক্ষ্যে চিহ্না করবার তাঁদের সময় কই। ফলে কলকাতার মতো সর্বত্রও ব্যক্তিনিরাপত্তা নেই। তবে আর কি হবে কলকাতার ব্যক্তিবো বলা?।

কবি সত্যেন বসু যে-বাংলাদেশকে বন্দনা করেছিলেন সে দেশ হয়ে কৃত হয়ে আজ তিনি বেঁচে থাকলে সে কবিতা আর লিখতেন না :

বাঁধের সঙ্গে বুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেবে খেলাই, নাগেবি মাঝার বাঁচি।
সবস্তুর হরিণি আমরা দারী নিয়ে দর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিলে অগস্তের ঢাঁক। পরি।
বীর লক্ষ্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে অগস্তের,
বাঁদালীর ছেলে ব্যায়ে বুঝতে ঘটাবে লম্বার।
বাঁদালীর কবি দাখিল অগস্তে মহামিলনের পান,
বিফল নহে এ বাঁদালী-অনম বিফল নহে এ প্রাণের

জুল লিখেছেন কবি সত্যেন বসু। বিফল বাঁদালীর কীবন, বিফল বাঁদালীর পণ, বিফল বাঁদালীর আশা। পলায়নের চলেছে তাহান বাংলাদেশটা। সেই মহাবাজার পণ থেকে কি আর কি হবে এই দেশ? নত্যা হবে কি পাকাত্য মনীষীর সেই বাণী :

“Disappointment. after disappointment, discontentment after discontentment, mis-rule after mis-rule lead but to one inevitable conclusion.”

সেই ঘটনার প্রত্যাশার রইলুম। সেই অবশ্যই যদি ঘটে তাহলে জুনি নিকট বেবেবে আরি লবাগে গিয়ে কলকাতার বৃক্ক ভাঁপিয়ে পড়ছি। ইতি—

বেহাওয়ার-ভয়ে তোমার ভাগলুবা বসু।

বিশ্ব-স্বপ্নরী রুপ্তি। দ্বিত্য কারিয়ার বেহাল। শিক্রে ছিঁড়ে বিশ্ব-স্বপ্নরী আশা। গেয়ে চপলমতি পলকট মেরেটা তার বালালদের বয়সে পড়ে কড়া চুক্তি অগ্রহাণী নাম। আরগার নিখের বেহ দেবিরে বুয়ে বেড়াঙ্কিল। কিন্তু সেই ব্যাপারে তার হাঙ্কির হাল হোয়েছে বলে সে নিজেই কোভ করেছে। সে ঘোষণা করেছে, সে আর বিশ্ব-স্বপ্নরী বলে নিখের পরিচর বেবে না। তার অতিযোগ, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়নি। তার লব্বের ব্যবহার অত্যন্ত লব্ব। কিন্তু তার বালাল কোলালি মতা লিমিটেড, লব্বপাত্য নয়। তার বলেছে, চুক্তিসত দ্বিত্যকে নাকে বড়ি দিয়ে ঘোড়ানো হবে, অজ্ঞায তার নামে দামলা হুঁকে তাকে লিবা করা হবে।

বেশ রয়েছে !! তবে ওসব মেয়েদের তো লক্ষ্যসিদ্ধি আত্ম-সম্মানের বালাই নেই। তাই সে চুক্তি চাপিয়ে রাখে ঠিকই। তবে হ্যাঁ, বেলা বেগালে বটে রিক্সা কারিগর। প্রথমে নিজের হেণ্ডের খলবান লোকে, তারপর লিখ বুঝা শুকুনালগুনানী। এখন তবুও দেশের লোক ছেড়ে এক যাকিনিকে গাড়িভেড়ে। আশ্চর্য হবেন? যদি কিছুদিন পরে তুমি সে কোন শিল্পের লোক আছে, এবং তারপর যদি তুমি যে সেই বিশ্ব-শুল্কী বিশ্ব-বাণিজ্যিকার পরিণত হয়েছে।

মহাদিল্লীতে লোক-সভার অধিবেশন বলছে, ঘটাৎ একজন কংগ্রেস-সদস্য চিংকার করে উঠলেন—পরিবার-পরিচরনা! মহীকে খেটে ছুটুকরো করে কেনা হোক।

তার পূর্বে তখন সবাই হতচকিত। ব্যাপার কি? কেন খেঁবেট হুজা ঐ রকম একটা উত্তর দিচ্ছিলেন? প্রস্তাব করলেন? লক্ষণে তার বিকে ভাঙতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও বিভ্রান্ত বিভূত হোব করতে লাগলেন।

বেঙট হুজা নিজের জুল দ্বুতে পারলেন। সভার প্রচণ্ড হাত্তরোল উঠলো। বেঙট হুজা বললেন, আমার আপনারা যাপ করবেন, আমি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিচরনা মহাবল্লভকে বিতর্ক করার কথা বলেছিলাম, মহীকে নয়।

আবার হাত্তরোল। প্রধানমন্ত্রী হেসে বললেন, তাই হলু! আমি তো তার পেয়ে সিহলাব।

অব্যাপক-বন্ধ হয়ে চুকেই বলে উঠলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনীতিতে রপ্তা বেশ জমে উঠেছে, কি বলে?

বললাম, কি রকম? বন্ধ বললেন, আর কি রকম। প্রকৃত্তেই হলীর লড়াই শুরু হয়ে গেছে। বাম-কমিউনিস্টরা লোকাহুজি বলে দিয়েছেন বাত এবং বহাউয়ীরা, অর্থাৎ অমহাবানু ও গ্রুহুহবানু এ হাত্তরোল লক্ষ লক্ষের জন্তে রাহী। উক্ত মহীয়ার নাকি কারেনবী বার্ণের চাপের কাছে আত্ম-বিক্রম করেছেন। জু তাই নয়, জানা গেছে বাম-কমিউনিস্ট পার্টি এই ছুই মহীয়ার বিক্রে পণ্যমাখোলন পক্ষে তুলে এঁদের আভেল দেবার লিডাভক নিয়েছেন। বাস্। এবার লেগে যা শুয়ো।

বললাম, কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের কি সুবিধা হবে?

বন্ধ বললেন, বুজোর সাধারণ মানুষ। তাহের কথা ভাবে কে? বল আগে না মহিহ আলে? বললাম, তা বটে। Quo vadis, the common man of Bengal!

বন্ধ বললেন, হ্যাঁ, এই একটা কথার মত কথা বলেছ! এই আগুহাট্টা জোর তুলতে পার?



ক্রীড়াভির্ষ

ভারত ক্রীড়া ইংলণ্ড দল : তৃতীয় টেস্ট

একাদশদিন মার্চ : আরম্ভ : ১৩ই জুলাই, ১৯৬৭।

প্রাক-কথন

দ্বিতীয় টেস্টে লক্ষ্যকর পর্যায়ে পৌঁছান ভারতীয় বোলাররা যেন মনোবল কতকটা হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তী ছোট বেলারগুলি তাঁরা খেলেন বটে কিন্তু বোলার মধ্যে যেন গ্রাণ ছিল না। তবু আশা করা গিয়েছিল যে তৃতীয় টেস্টে (ভারতের পক্ষেই টেস্ট) ভারতীয় দল চাকা ঘোঁরাতে পারবে।

প্রথম দিন

ইংলণ্ড টেস্টে প্রথম দিনে ২২৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলো। ভারতের শ্রম বোলাররা বিশেষ লক্ষ্যের সঙ্গে বল করলেন।

ভারতের প্রথম দুজন বোলার ইন্ডিয়ানরা ও ক্রমশঃ খেলতে নেমে যিনা উইকেটে ন-রান করলেন।

দ্বিতীয় দিন

ভারতের ব্যাটসম্যানেরা মাত্র ২২ রানে মধ্যাহ্ন বিরতির আগেই সবাই আউট হয়ে গেলেন। কী অভাবনীয় বিপর্যয়! ভারতীয় বোলারদের এভাবে পছন্দ হবার কোন মুক্তি নেই। তাঁরা যেন টেস্টে ব্যাট চালানোর উপযোগী সামগ্রিক প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নাছেন নি।

ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন ভারতকে কল্যাণন না করিয়ে নিজের দলকেই ব্যাট করতে আবার বাধ্যলেন। দিনের শেষে, সাত দিনের ব্যাট, তিন রানে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো।

ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেনের ভারতকে কল্যাণন না করানোর সিদ্ধান্তকে অনেক সমালোচক অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করলেন। ত্রাশন জোখের এ কী ধরনের বদ্বিত্য! এটি টেস্ট খেলা না প্রদর্শন! দুই দেশের মধ্যে লড়াই। তার মধ্যে কোন আগ্রহের তাব থাকে চলবে না।

তৃতীয় দিন

৪০২ রান হাওয়ার নিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা খেলতে নামলেন এবং নিম্নলিখিত সময়ের প্রায় নয় মিনিট আগেই ২৭৭ রানে আউট হয়ে গেলেন। পাঁচদিনের খেলা তিন দিনেই শেষ। তৃতীয় টেস্টে ভারত ১০২ রানে পরাজিত হলো।

স্কোর বোর্ড

ইংলেণ্ড : প্রথম ইনিংস

জিওফ ব্রডকট টাঃ ইঞ্জিনীয়ারিং ব বোর্ড	২৪
কলিন মিলবার্গ ক ওয়াশিংটন ব ওয়েলথ	৪০
কেন ব্যারিংটন ক ওয়াশিংটন ব ওয়েলথ	১৪
টম গ্রেন্ডলী ক ডেভিডহামব্রন ব ওয়েলথ	১০
ডেনিস অ্যাডাম ক ওয়াশিংটন ব ডেভিডহামব্রন	৪
ব্রাহ্মান স্কোভ ক সুরক্ষণাম ব ওয়েলথ	২৬
জন মারে ক সুরক্ষণাম ব ওয়েলথ	১৭
রয় ইলিংওর্থ ক ওয়াশিংটন ব ওয়েলথ	২
ডেভিড ব্রাউন রান আউট	০
জস বো ক ইঞ্জিনীয়ারিং ব বোর্ড	১০
রবিন হবস্ অপরাধিত	১৪
অতিরিক্ত	১০

মোট ২২৮

বোলিং—সুরক্ষণাম ১০—২—২৬—০, স্কম্ব্রন ৪—০—১০—০, বোর্ড ২৭—৬—৭৬—২, ওয়েলথ ২২—৮—২৪—০, ডেভিডহামব্রন ১০—০—২৬—১, ওয়েলথ ২০—৪—৪১—০।

ইংলেণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

ব্রডকট ক সুরক্ষণাম	৬
মিলবার্গ ব বোর্ড	১৪
ব্যারিংটন ক স্কম্ব্রন ব ওয়েলথ	১০
গ্রেন্ডলী ক সুরক্ষণাম ব ওয়েলথ	১৭
অ্যাডাম ক ওয়াশিংটন ব ওয়েলথ	৪৪
স্কোভ ক ওয়েলথ ব ওয়েলথ	৪৭
মারে ব বোর্ড	৪
ইলিংওর্থ ক পাতোমি ব ওয়েলথ	১০
ব্রাউন অপরাধিত	২২
বো ক ওয়েলথ ব ওয়েলথ	০
হবস্ ক ওয়েলথ ব ওয়েলথ	২
অতিরিক্ত	৬

মোট ২০০

বোলিং—সুত্রধার ৪—০—২২—১, পাতোদি ২—০—৮—১, বেবী
চক্রপেথর ৩০'৪—৬—১০—৩, প্রেস ২৪—২—৬—৪, ডেফটগ্রাফন ২—১—৪—০

ভারত : প্রথম ইমিংসে

ইকিনীয়ার ক প্রেতনী ব ড্রাউন
কুন্দরন ব ড্রাউন
ওয়েলেকার ক এ্যামিল ব মো
বোরসে ব মো
পাতোদি ব ড্রাউন
হুমমত সিং ক এ্যামিল ব ইলিংওয়ার্থ
সুত্রধার ব হবস্
ডেফটগ্রাফন অপরাধিত
প্রেস ব ইলিংওয়ার্থ
বেবী ক অ ব হবস্
চক্রপেথর ট্যাঃ মারে ব হবস্
অতিরিক্ত

৮
মোট ২২

বোলিং—মো ১২—৩—২৮—২, ড্রাউন ১১—৬—১৭—৩, ইলিংওয়ার্থ ৭—৪—১৪—২,
হবস্ ৬'০—১—২৫—৩।

ভারত : দ্বিতীয় ইমিংসে

ইকিনীয়ার ক ব্যাট্টিংটন ব হবস ২৮
কুন্দরন ক মারে ব ক্রোজ ৩০
ওয়েলেকার ক বরকট ব ইলিংওয়ার্থ
বোরসে ব ইলিংওয়ার্থ
পাতোদি ক হবস ব ক্রোজ ৪৭
হুমমত সিং ক মিলবার্থ ব ইলিংওয়ার্থ ৬
সুত্রধার ক মিলবার্থ ব ইলিংওয়ার্থ ৪
ডেফটগ্রাফন ক হবস ব ক্রোজ ১৭
প্রেস ব হবস ১৫
চক্রপেথর ক বরকট ব ক্রোজ ২২
বেবী অপরাধিত ১৫

অতিরিক্ত ১০
মোট ২২৭

পরাভয়ের প্রতিজ্ঞা

ইংলও লক্ষের গিরে ভারতের এবারকার খোচনীর ব্যর্থতা সেপে বিবেশে নানা যত্নের স্বত্ব তুলেছে। তার সমস্তটাই ভারতের পক্ষে বেশনসাম্যক। ভারতের সমালোচকরা অহঙ্ক্যা বেধিয়ে বা বলেছে তার অর্থ হাড়ার এইরকম: আহা, ভারতের খেলোয়াড়রা তেমন শক্তি নহ, খের বল বেধলে তাদের ব্যাটস্থাননা ভয় পায়, তিক্তমতন ব্যাট চালাতে তুলে যায়। আর তাদের খোরে বল দেবার স্বত্ব বোলার নই। তাই তারা অমন পোহাট্রান দেয়েছে। তবুও তার মধ্যে ট'এক জন মন খেলেনি। এই বরনের অহঙ্ক্যা মেনানো সব উক্তি, বা আম'দের পক্ষে কাটা যারে প্রনের ছিটের স্বত্ব বোধ হয়েছে।

এখানে বেশক যত্নবা পোনা গেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে খোরাপো সমালোচনা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড সম্পর্কে। এদেশের ক্রিকেট বোলার টেক্স্যাচের অন্তে যে পিচ তৈরী করা হয় তা বোলারদের কোন লাভায্য করে না। ব্যাটে করে খেলা পাঁচদিন পর্বত চলে, দু'পক্ষেরই অনেক রান হয়, প্রত্যেকদিন অনেক লোক দেখতে আসে তাইই বার্ষে এই তরফ ব্যবস্থা। অর্থাৎ প্রতি টেক্স্যাচের কেন্দ্রের কর্তারা এই খেলাকে রীতিমত ব্যবসায় পরিণত করেছেন এবং এই ব্যবসা কৃতির অস্বস্তম পরিচয় আমরা তো কলকাতার মাঠে পেয়েছি। যতদিন আমাদের মধ্যে বোলার পিচ সত্যক এবং সঙ্গ্রাণ না করা হবে, যতদিন পর্বত আমাদের মধ্যে কাঠি বোলার তৈরী করবার স্বত্ব পর্বপ্রায় ছোঁ এবং ব্যবস্থা না হবে ততদিন আমরা বিবেশে এনিভাবেই লাভাশাষ হবে। দু'একজন এমন যত্নব্যক্ত করেছেন যে এভাবে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করে বিবেশে গিরে লোক হাসানোর চেয়ে ভারত আদানী বণ বহর ক্রিকেট লক্ষ বহু রেখে নিজেদের বর লাখলাক এবং উপযুক্তভাবে নিজেদের প্রস্তত করক। দু'চারজন সমালোচক এই মুখে ভারতীয় খেলোয়াড়দের লখুনোবুদ্ধির কথাত উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় বল ইংলও গেছে। সেই বলের কাপ্তানের উপর অত্যন্ত গুরু বাগ্মিত্য, রীতিমত যরণ-বাচন লম্বা, বেশের ইচ্ছা বন্ধার গ্রন—কিন্তু যেখা গেল কাপ্তানের পিছনে পিছনে ভারত বেধে তার এখমিনীও ব্যত্যা করলেন দেখানে। আর কাপ্তানও খেলা ছেড়ে তাঁকে অতর্কনা জানাতে ছুটলেন বিমান বন্দরে। এ বরনের ঘটনা বর্ধার লড়াইএর পক্ষে অহঙ্কুল নয়। তা হাতা এর দ্বারা অস্ত্রাণ খেলোয়াড়দের অনেক রদিন এবং দাতা প্রতিজ্ঞার স্বষ্টি করতে পারে, বা একাই অনতিপ্রোত। অত্যা ভারতের মাটিতে টেক্ট বোলার মাঠে যে বরনের প্রকাশপতির মেনা খেবা গেছে এবং সেই খেলায় খেলোয়াড়দের বোম্বারনের কাহিনী পোনা গেছে তা যে টেক্ট লড়াইএর অত্যন্ত কড়িকর হয়েছে তা অনস্বীকার্য। এই অবস্থার অন্তে কর্তব্যকর্তারা বোধকরি সবচেয়ে বেশি দারী। তাঁরাই এই খেলাকে নিজেদের বার্ষে ব্যবসায়ীতে এবং কৃতির খেলায় পরিণত করেছেন। অতএব ভারতকে যদি ক্রিকেটজনতে লম্বানের আসন পেতে হয় তাহলে এর ব্যবস্থাপনার আলু পরিবর্তন প্রয়োজন।

ভারত ইন্ডী অস্ট্রেলিয়া ব্যবস্থা। একথা মনে হলেই অত্যন্ত লজিত বোধ করছেন অনেকেরই। দেখানে ভারতের কী হাল হবে কে জানে। যোটের ওপর ইংলও লক্ষের ভারতের লক্ষ্যাকর ব্যর্থতা এখানে ক্রিকেট অহঙ্ক্যীদের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ এবং হতাশার লক্ষ্য করেছে।

ইতিমধ্যে ইংলও পাকিস্তানের লক্ষ্য হুক হয়েছে। যে কয়টি খেলা তারা ইতিমধ্যে খেলেছে তার মধ্যে তাদের খেলোয়াড়দের যরণ-বাচন বৃদ্ধ মনোবলের পণ্ডিত পাওয়া গেছে। পাকিস্তানের লক্ষ্য

যদি সাক্ষ্যময় হয় তা হলে ভারতের লক্ষ্য আশংক্য থাকবে। অবশ্য বাংলা দ্বারা ক্রিকেট অফিসিও তারা পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের প্রাপ্য প্রশংসা বিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

হাঃবের দ্বারা সাধনার কথা এটী যে ভারতীয় ক্রিকেটবল এবছর ইংলণ্ড লঙ্করে পর পর খেলার জাল কল দেখাচ্ছে।

ভারতীয় সফরের কিছু পরিসংখ্যাম নীচে দেওয়া হল—

ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল ১৬০ রানে বিজয়ী।

উইস্টাইন্ডের লক্ষে বেলা অধীরাংসিত।

ক্রিকেট ক্লাব কনকাবেল লনের লক্ষে বেলা অধীরাংসিত।

কেটের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল ৭৬ রানে পরাজিত।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় লনের লক্ষে বেলা অধীরাংসিত।

ওয়ারউইকশায়ার লনের লক্ষে বেলা অধীরাংসিত।

এম সি লি-র লক্ষে বেলা অধীরাংসিত।

মন্সটারগানের লক্ষে বেলা অধীরাংসিত।

বর্ণাটনশায়ারের লক্ষে বেলা অধীরাংসিত।

সাংঘের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল ৮ উইকেটে পরাজিত।

ল্যাডশায়ারের লক্ষে বেলা অধীরাংসিত।

এবম টেস্টে ভারত ৬ উইকেটে পরাজিত।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৪০ রানে বিজয়ী।

ক্যাম্পশায়ারের লক্ষে বেলা অধীরাংসিত।

যির্ডায় টেস্টে ভারত এক ইনিংস ও ১২৪ রানে পরাজিত।

ডার্বি শায়ারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল ৬৬ রানে বিজয়ী।

ইর্ক শায়ারের কাছে ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৬ রানে পরাজিত।

বার্টিংহামশায়ারের লক্ষে বেলা অধীরাংসিত।

লিঙ্গারশায়ারের কাছে ভারতীয় দল ৭ উইকেটে পরাজিত।

কৃতীর টেস্টে ভারত ১০২ রানে পরাজিত।

ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের সেকুদী

১৭৪—ডি অলিভেরা (উইস্টাইন্ড : ভারত)

১০১৪—এ ডিজন (কেট : ভারত)

১০৮—জন এডরিস (সাংঘ : ভারত)

২৪৪০—বিওক বরকট (ইংলণ্ড : ভারত, এবম টেস্ট)

- ১০২—ডি অলিভেরা (ইংলণ্ড : ভারত)
 ১০২—রহা মার্শাল (ক্যালিফোর্নিয়া : ভারত)
 ১০৩—ইম গ্রেন্ডিন (ইংলণ্ড : ভারত, দ্বিতীয় টেস্ট)
 ২০০০ ইয়ান সুর (নটিংহাম : ভারত)

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সেঞ্চুরী

- ১৪৪০—গভৌরি (ভারত : অস্ট্রেলিয়া)
 ১৪৮—গভৌরি (ভারত : ইংলণ্ড, ১ম টেস্ট)
 ১০৪—লাকেশাই (ভারত : ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
 ১১৪০—বার্গে (ভারত : ক্যালিফোর্নিয়া)
 ১১৭—কুমার (ভারত : ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

ইংলণ্ডে টেস্ট আভারাজ

ইংলণ্ডের ব্যাটিং

	খেলা	ইনিংস	নং. আঃ	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	অ্যাভারেজ
বি. বরকট	২	৩		১৭৭	২৪৬৪	১০৮'৪০
অলিভেরা	২	৩		১৬৬	১০২	৮৩'০০
ম্যারিটেন	৩	৫		৩২৪	২৭	৬৪'৮০
গ্রেন্ডিন	৩	৪		২৫১	১৪১	৪০'২০
ক্রোফ	৩	৪		১০২	৪৭	৩৪'০০
মিলবার্ন		২		৪৪	৪০	২৭'৪০
এমিস		৩		২২	৪৪	২৬'৩০
বার্গে		৪		২২	৭৭	২৩'০০

ইংলণ্ডের বোলিং

	ও	মে	রান	উইঃ	অ্যাঃ
ইনিংসওয়ার্থ	১৪৪'০	৬৮	২৬৬	২০	১৩'০০
ক্রাইস্ট	৩৬	১২	৮২	৬	১৪'৮০
ক্রোফ	৬০'৪	২০	১৪৪	৮	১৮'০০
মো	১১২'৪	২২	২৬৪		২৬'৪০
হবল	১১০'১	৩৪	২৪২		২৮'৭৭
অলিভেরা	৩৪	১৪	৮২		১২'৬৬

ভারতের ব্যাটিং

	বেলা	ইমিংস	মঃ আঃ	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	আন্তঃসেঞ্চ
পতৌদি	৩	৬		২৬০	১৪৮	৪৪'৮৩
ওয়ার্নের	৩	৬		২৪২	২১	৪২'৩০
ডেকটরার		২		৩৬	১২৬	৩৬'০০
ইমিংস		৬		১২৬	৮৭	৩২'৬৬
বল্লভ লিং		৪		১০০	৭০	২৪'৭৪
কুমার		৪			৪৭	২৪'৪০

ভারতের বোলিং

	সে	রান	উইঃ	আঃ
প্রদেব	৩০	৪০২	১৬	২৭'১৮
ডেকটরার	৪		১	৩০'০০
বোঁ	৩৬	২০৬	৭	৩৩'৭১
মুতি	১২	২২	২	৪৬'০০
প্রদ	৩২	৪০০	২	৪৭'৭৭

০ নট আউট-এর চিহ্ন।

বিলাতে ভারতের ইস্কুল পড়ুয়া ক্রিকেট দল

আমাদের দেশের নামজাদালা চালিচালি মনোভাবদলশর, বিশাশী, আদর্শপ্রাইট টাই বেলোজাকবের নিয়ে যে ক্রিকেট দল এবছর বিলাতে খেলতে গিছল তারা ভারতের মুখে ছুপকালি বাধিয়েছে। এই অগমানের মধ্যে কিছু সাধনার কথা এই যে, এ দেশের স্কুলের ছেলেরা ওহেপে দিয়ে চবৎকার খেলছে। এবং ওখানকার সব তরুকের প্রাণশো অর্জন করেছে। শিট চাপকানো প্রাণশো নয়। এ প্রাণশো তারা আহার করেছে।

ভারতীয় স্কুল দল এ পর্বত দল বারোটি ম্যাচ খেলেছে এবং তারা একটি ম্যাচেও হারেনি। এ লাকলো উৎসাহিত হয়ে তারা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে প্রথম 'টেস্ট' ম্যাচ খেলার অঙ্ক অপেক্ষা করছে। প্রথম টেস্টটি খেলা হবে লন্ডনে ওয়েলস স্কুল দলের সঙ্গে। এ হাফিও এবারের লক্ষ্যে তারা আরও দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে।

ক্যাম্পশাটার ও সাসেক্সের স্কুল দলকে হারিয়ে ভারতীয় দল লন্ডনের স্কুলেই উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখে। এরপর তারা হারিয়েছে ওল্ড হাইটসিকটানল, ইতিহাস ভিহধান। ও এম সি সিং লন্থিলিত স্কুল দলকে। ওল্ড হাইটসিকটানল দলের অঙ্কতম খেলোয়াড় ছিলেন ইংলণ্ডের প্রাক্তন টেস্ট তারকা বনম স্মারাক।

ভারতীয় দলের ক্রীড়ামান এখানে লবাইকেই চমৎকৃত করেছে। দলের ম্যানেজার ব্রিহ্ম অধিকারী বলেছেন, ভারতীয় স্কুলের খেলোয়াড়েরা প্রতিটি ম্যাচেই যে উৎসাহ দেখাচ্ছে, তাতে তিনি অত্যন্ত খুশী।

এ পর্বত প্রত্যেকটি খেলাতেই তাদের কিংবদন্তি, ব্যাটিং ও বোলিংয়ে দক্ষতার স্বাক্ষর পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে প্রথম দিকের ব্যাটসম্যানেরা তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেলে দলের ব্যাটসম্যানেরা লম্বোপযোগী লুচুতা দেখাতে পছন্দ করত।

অধিকারী আরও বলেন যে, দলের সহ-অধিনায়ক এল ক্রিসম্যান, লক্ষণসিংহ ও জুবিলার অধিনায়ক ইতিমধ্যেই প্ৰত্যাহিত হান করছে। এল অধিনায়ক, রামা সুখান্নী এবং দলের অধিনায়ক অমিত্য নায়েকও ধারাবাহিকভাবে ভাল ব্যাট করছে।

এই প্রসঙ্গে অধিকারী উল্লসপূর্ব্বক বলে বছর বহুত খেলোয়াড় লক্ষণসিংহের বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, সিং লবাই দলের লাইনের গিঁড়ে গাড়িতে বেলে এবং তার মধ্যে যে প্রতিভা আছে তার স্বাক্ষর স্পষ্টতভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

বোলিংয়ে অধিকারী লবাইয়ে নায়েককে করেন লেনগ্রেড বোলার বীণকর লরকারের। লরকার এ পর্ব্বত দলের মধ্যে লবাইক উইকেট লগ্রেড করেছে। সুইং বোলিংয়ে অমিত্য নায়েক ও তি স্বাধীনকর লাকল্যক উল্লসযোগ্য।

অনিবাস্ত ব্যাটিং

কুচবিহারের মহারাজার ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন ও বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটার ফ্র্যাংক ট্যারাক্টের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। তাঁর আর একটি কৌতুক্য জানানো যেতে পারে। ট্যারাক্টের দল বোম্বাই-এ বেলেতে গেছে কিন্তু জিহ্বানার বিকড়ে। অনিবার্ণ হার সামনে হাঁ করে আছে। ট্যারাক্ট আউট হন নি তখনো।

কিন্তু দলের আর লবাই আউট। শেষ ব্যাটসম্যান এল. আরকৎ বেলেতে নেমেছেন। তিনি আর কতকণ? ইমিকে তখনো একশের ওপর রানের ব্যবধান। সময় অটল। কুতবায় হায় কে ঠেকায়? কিন্তু ঠেকালেন আরকৎ। হাটি কায়ডে বেলেলে নাপাড়ে বেকবটী। হান করলেন মাত্র পাঁচ। আর ট্যারাক্ট প্রতি ওভারের শেষে হান নিয়ে নিয়ে নিয়ে লেজুর করলেন এবং প্রতিগকের হান সংখ্যাকে অতিক্রম করলেন। সে এক লজাই অনিবার্ণ খেলা। হু'জনেই শেষপর্ব্বক নট আউট।

চলতি দুনিয়া

বলাৎকার ও মুক্তাঙ্গ

আমেরিকা মুক্তাঙ্গের কয়েকটি রাজ্যে বলাৎকারের অভিযোগে অসংখ্য অপরাধীকে মুক্তাঙ্গের দণ্ডিত করা হয়। এই রাজ্যগুলির নাম: আলাবামা, আরকানসাস, ক্রোভিডা, জর্জিয়া, কেন্টাকি, লুইসিয়ানা, ম্যারিল্যান্ড, মিসিসিপি, মিসৌরী, মেন্সাস, নর্থ ক্যারোলিনা, ওক্কাহোমা, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, টেনিসী, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়া। তাছাড়া, কলম্বিয়া জেলাতে ওই শাস্তি চাপু আছে। বলাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের অপরাধে ক্যান্টিকোনিয়াতে মুক্তাঙ্গও দেয়া হয়। ১৯৩০ সালে চেসম্যান-এর প্রাণদণ্ড এর বিখ্যাত উদাহরণ।

আমেরিকা ছাড়া আরো কয়েকটি দেশ যেমন উত্তর যোগেন্ডিয়া, নিয়ালান্ড, দাহীমতাবাহী চীন, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ওই একই শাস্তির প্রচলন রয়েছে।

বলাৎকারের শাস্তি হিসেবে মুক্তাঙ্গের যৌক্তিকতা নিয়ে সমাজিক আমেরিকার বিতর্কের গড় উঠেছে। গকে বিপক্ষে শোনা যাচ্ছে নানা কথা। তবে মুক্তাঙ্গকে যারা সমর্থন করে তাদের বলটিই জোরদার। এরা বলে কাকে বেহ দান করবে আর না করবে তা বিচারকের অধিকার এমন কি রাজ্যের একটি মেয়েদণ্ড আছে। যে সব মহিলা বন্দি হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুক্তাঙ্গ বলবৎ রাখার পক্ষপাতী। কারণ নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তাদের সাহায্যবান তা মনের উপর চেপে থাকবে দুঃখের মতো। আর যে অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে মুক্তার সঙ্গে-সঙ্গেই হবে তার যন্ত্রণার অবসান। আমেরিকার একজন বিচারক বলেন, "সমুদ্রে যে আলোকপাত করে সেই বাতিঘরের মতো মুক্তাঙ্গ হলো এক হুঁশিয়ারী। আদালত জুরির ঘটনা আমাদের কানে আসে, কিন্তু বাতিঘরের আলো আগে থেকে সতর্ক করে দিয়ে কতগুলি দাবাংকে বাতালে। সেই থবর আমরা রাখি না।" আরেকজন বিশিষ্ট আইনজীবী মনে করেন কিছু অপরাধী সমাজের গকে সমাজের কারণে বিপজ্জনক; তাদের আর কখনোই সমাজে ফিরে আসতে দেয়া যায় না। শারীরিক ভাবে বেঁচে থাকলেও তাদের মস্তিষ্ক মৃত। পৃথিবী থেকে তাদের চিরতরে

সরিষে ফেলাই উচিত। দেখা গেছে বলাৎকার ব্যাধি করে তারা আগে থেকে ভেবে চিন্তে পরিকল্পনা মার্কিকই করে থাকে। বলাৎকার আর যদি হোক আকস্মিক অগরাহ বা অনিচ্ছাকৃত অগরাহ নয়। এই কারণে অগরাহকে সহ্যভূতির ভাষে দেখা অসম্ভবের পক্ষে সম্ভব নয়।

মাত্রী-মুক্তি না ক্ষত্যা

আধুনিক ক্যালিফোর্নিয়ার মেহেরা নিজের গায়ে দাঁড়িয়ে অর্থ উপার্জন করে, খুশি মতো রাজনৈতিক মলকে সমর্থন করে, মৌশলচাপের দিগ্‌ থেকে পুরুষের সমকক্ষতা দাবী করে এবং মাথা ধরলে বেহন আদর। অ্যান্‌লিগিটিন বাই তেমনই স্বপন-ভবন জন্ম-নিরোধক বটিকা গলাধঃকরণ করে থাকে। এই কথা বলেছেন লস এঞ্জেলসের মনস্তত্ববিদ ডাক্তার জর্জ বাক। মেহেরা ওখানে স্বাধীনতা পেয়ে বেলামাল হয়ে পড়েছে। কী করবে ঠিক করতে না পেরে তাদের হতবুদ্ধি অবস্থা। সেই অল্প ক্যালিফোর্নিয়া প্রতি তিনটি বিয়ের মধ্যেই দুটাই বাজে তেলো। বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ওখানে তরাংহ।

যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি বৌনতা

হল হেকনার আমেরিকাতো গ'ড়ে তুলেছেন এক সাম্রাজ্য। তিনি বাস করেন প্রাচ্যের বিপদ ঘিনের জলতানবের মতো। তার বয়স মাত্র ৩২। কিন্তু এইই মধ্যে তিনি অসংখ্য ঐক্যের মালিক। তিনি বাস করেন শিকাগো মালন-এ। ৬ই বাড়িটা কিনেছেন ৮০০,০০০ ডলারের বিনিময়ে। বাড়ির ভিতরে সুইমিং পুল, স্টীম রুম, প্রাইভেট বাথ ইত্যাদি সবই আছে। এ ছাড়াও তার আটো কয়েকটি বাড়ি এবং একটি বন্দরক আছে। আধুনিক আমেরিকার কোটিপতিদের একজন হেকনার। আর হেকনার এই বিপুল ঐক্যের অধিকারী হয়েছেন মাত্রী হেহকে মূলধনরূপে ব্যবহার করে। 'গ্রে বয়' পত্রিকা, ড্রাব ও আরো নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি উপার্জন করছেন লক্ষ-লক্ষ ডলার।

অবশ্য, আমেরিকার বাসিন্দা মাঝেই আক ঘন বেশি রাজার খুঁকে পড়েছে বৌনতার দিকে। কিন্তু সেই আমেরিকাতোই আবার হেকনার হলেন উগ্রগণী। তিনি প্রকৃতই বৌনতাকে লম্বল করে ধেমে পড়েছেন অর্থ উপার্জনে। হেকনার প্রকাশিত 'গ্রে বয়' সাময়িক পত্রে নর মাত্রী হেহের অসংখ্য ছবিতে থাকেই; তাছাড়া থাকে ভোগ স্রবধারের গন্ধে বহু গ্রন্থক। বিয়ে না করেও বৌন উপভোগকে 'গ্রে বয়' নর-মাত্রীর প্রকৃত বাস্তবের লক্ষণ বলেই মনে করে। হেকনার বলেন, "বহু লোক মুক্ত বাহু অল্প আত্মপূজু করছে 'গ্রে বয়' তাদের অল্প উচ্চুত করে দিয়েছে বিভক্ত অস্ত্রিজন। তাই লক্ষ্যেই ভিত্ত করে এভাবে কেরিগেটের দিকে।" হেকনার নিজেও মুক্তিলাভ বলেই মনে করেন।

বৌনতাকে লম্বল করে হেকনারের বিপুল পার্শ্বকতা ও ঐক্যবের সুরাপাত ১৯২০ সালে। শুই বছর তিনি বাতিশিন মনবোয় নগরহেহের ছবি লম্বলিত ক্যালিফোর্নিয়ার বার করেন এবং কেরকবনের কাছ থেকে আদিক সাহায্য নিয়ে প্রকাশ করেন 'গ্রে বয়'-এর প্রথম সংখ্যা। এই সংখ্যাটিতে কোনো তারিখ ব্যবহার করা হয়নি। কারণ নিশ্চয়তা ছিলো না। কিন্তু 'গ্রে বয়' বেকবার লম্বল-লম্বলই বিক্রি হলো ৪০,০০০ কপি। বর্তমানে এই সাময়িক পত্রিকাটির ৩০ লক্ষ কপি প্রতি মাসে বিক্রি হয়।

হেকনারকে মা' জানলে 'মে বয়'-কেও জানা সম্ভব নয়। তাঁর শিখাংশে মানসনে কক্ষের লেখাও ৬৮। কিন্তু তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তি থাকেন সমস্ত সমস্ত। তাটান হাত তিনটি কণ্ঠে। এট তিনটি কক্ষ এখনভাবে পড়া দিয়ে যেহে। যে লেখানে হিন্দুজিব বাগদান নই, সর্বদাই যেন লেখানে সমস্ত স্মিত। এই 'মঠ'-এর চিত্তের যেক্ষের উপর ছড়ানো। ছবি ও লেখার মা'ফানে নলে নয় নারী, যেক্ষের ছবি কী ভাবে বাবল্য করলে দখ চাইতে বেশি আকর্ষণীয় হয় সে সম্পর্কে অবিরাম ভেবে চলেছেন হেকনার।

ওই আকর্ষণ অত্যাশ্চর্য থেকেই হেকনার পরিচালনা করেছেন তাঁর 'মে বয়' সংস্করণ। প্রতিগঠন 'মে বয়' তার হাতে তুলে দেয় ২০০ লক্ষ ডলার। এ ছাড়াও হেকনারের আয়ের অংকো কয়েকটি উৎস আছে।

'মে বয়'-এর অস্ত হেকনার কঠোর পরিচর্য করেন। এমন কি এক মাগাতে ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত। নিজস্ব বর্ণন প্রচার করে কান্ডে প্রবন্ধ লেখেন নিরন্তর। জীবন, মৌনতা ও নীতি বিষয়ে নানা রচনা নিয়ে 'মে বয়' প্রকাশিত হচ্ছে তিন বছর ধরে। সারা সর্বদাই সুবর্তী পরিবেশিত করে থাকতে ভালোবাসেন মূলতঃ সেই সব বনৌ সুনারের (ব্যাচেলর) ক্ষুদ্র এই সাংগঠিত লজ। হেকনার বলেন, "মে বয়"-এর মূল বাণী এই যে, বৈধে থাকাই জীবনের প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য। আর দুঃখ-কাঁঠের চাইতে আনন্দই জীবনের কাব্য। কী বরণের জীবনধারণে সেই আনন্দের লক্ষ্যন পাওয়া যেতে পারে তার হৃদয় দেখাই 'মে বয়'-এর লক্ষ্য।" মৌনতা বিষয়ে ত্রিটোয়িত মূলের অপর্যায়বোধ নিয়ে বাবা হেকনার ও তার কণ্ঠের নিদ্রা করেন হেকনার তারের তাঁর সমালোচনা করে থাকেন। তিনি যেন করেন মধ্যমিত নীতিবাসীপরাই আনন্দিকার সন্ধান করছেন। সুহার অবস্থার 'মে বয়' নির্দেশিত পথে জীবন তোপ করলে বিবাহিত জীবন হবে সুখের।

১২ বছর বয়সে মে বয়'-এর একজন ব্রিসলিনসিঙ্কের কাজ নিয়ে সিংহিল ম্যারী হয়েছেন। তখন মিস্টার হেকনারের সঙ্গে দেখা করতেও সে এর পাচ্ছিলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই মারী সুখে পারলো হেকনার কত লক্ষ্যন। হেকনারও মারীকে বিলো বিপ্লিত হন। ওই ঘরেটির মাঝি ছাড়া পথে তার আর চলে না। হেকনারকে সমস্ত কাজে সাহায্য করাই হয়ে উঠলো তার পূর্ব আশঙ্ক্যের বিষয়। কিছুদিন ম্যারী হেকনারের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতো না। এখন সে অজ্ঞাত পুত্র বহুদের সঙ্গে বাইরে বেরোয়। আর তা জানতে গেছে হেকনার বিষয়ই বোধ করেন।

বয় হেকনার তার কান্ডে এবং তার বর্ণন নর-নারীর সম্পর্কের বা কিছু ভালো ও পরিচ্ছন্ন দিক তারই অন্ধান করেছেন। তিনি বাবল্য এক-কণ্ঠই প্রচার করেছেন; নর-নারীর সম্পর্কের সব চাইতে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও খেত অধ্যায় হলো অবিবাহিত নর-নারীর মৌন-সম্পর্কের হিন্দুগতি; অস্ত বহি এতে দু'পক্ষের লগতি থাকে এবং তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কতিব কোনো সম্ভাবনা না থাকে।

হেকনার নর-নারীর সমস্তার কথা বলেন। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনে ও তার কাগজের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে পুত্রবহুই প্রাথমিক লক্ষ্য করা যায়। হেকনারলগ্য-এ নারী আসলে পুত্রবহু পদ-বর্ধার প্রতীক। যেটির গাতি কিংবা বানী দ্বন্দ্ব হ্রদ্যর মতো। পুত্রবহু আনন্দের অস্ত নারী।

হেকনার বিষয়ে ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী নয়। তিনি বলেন, "আমার কাছে বিবাহিত জীবনের নিরাপত্তার চাইতে বৈজ্ঞানিক, প্রাণ-বক্তা, এবং দুঃসাহসিক অজ্ঞতা অনেক বেশি কাম্য।" হেকনার জীবনে অস্ত একবার পাটহুকা বেঁধেছিলেন। বিষয়ে করেছিলেন কলমে পড়ার সময় এক

সহপাঠিনীকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। হেকনের-এর দুটি সন্তান আছে। কিন্তু তিনি কন্যাটিং তারের দৈবতে যান। হেকনের বলেন "আমি যে শিশুদের অপছন্দ করি তা নয়, তবে বয়স্কদের আমি বেশ পছন্দ করি।

দেয়ী ভয়ানকের নিঃস্বার্থ মনোভাবই তার প্রতি হেকনেরকে আকৃষ্ট করেছিলো দিহিরা ম্যাক্স। 'প্রেরণ'-এর প্রচ্ছদপটে চারবার তার ছবি ছাপা হয়। বর্তমানে সে ওই কাগজের কাঠ'ন বিভাগের সহকারী সম্পাদক। ১৯৪৮ সালে টাইপিষ্ট হিসাবে সে কাজ নর। তখন সে লেবে মূল ছেড়েছে। দিহিরা বয়স তখন ২০ আর হেকনেরের ৩৪। প্রায় আড়াই বছর তাদের সম্পর্ক স্থায়ী হয়। দিহিরা নিকেকে তখন মনে হতো বিবাহত চিত্তভাবকার মতো।

হেকনের সিনকে রোমাঞ্চিক প্রেমিক বলে মনে করেন এবং তার চোখে নারীর মূল্য অনেক বানি। কিন্তু তিনি যদি সত্যি-সত্যি কারো প্রেমে পড়ে থাকেন তবে তা তার কাগজেই। দিহিরা কিন্তু বলে হেকনের তার কাগজে বেবনের জীবনের অঙ্গকে প্রচার করেন তার নিজের জীবন ঘোটেই সে-রকম নয়। তিনি বিচিত্র ব্যক্তি ও প্রচার সমর্থকগণ। অথচ তার কাগজের চরিত্রগুলি তাই। হেকনের-এর কাছে সব থেকে মূল্যবান ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

— — —

মূল মাহুদের চিরদিনই প্রায়। মূল ভালবাসেন। এমন মাহুদেই মললেই হয়। বিবাহের পর মধুমাষিনী (Honeymoon) সব বেগেই হয়। কিন্তু আমৃত্যল বৈজ্ঞানিকেরা মূলকেন্দ্র নানাকারণে বাহ বিতে চাইছেন। বিশেষতঃ তাজিকালে কোন রোগীর পরে মূল রাখা সুখই অতিক্রম তাই এমন মূল রোগীর পর বেগে সরিয়ে ফেলতে হচ্ছে। মূলের মনোরম গন্ধ এমন আর রোগীরে আনন্দ দান করে না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে লেবু (Lemon) হচ্ছে রূপচর্চা একটি প্রাচীন উপকরণ। রূপের উজ্জলতা বাড়াতে, বেহের স্বচ্ছ কোমল ও কমলীয় করে তুলতে লেবুর মত লবক প্রাণ্য জিনিস আর কিছুই নেই। অনেক পৌষর্গ্য রুচি করে, যৌবনের আবেগনকে অকুর রাখতে সেবুর তুলনা নেই। লেবুর এইলন শুধু আছে জীবনীর পর বেগে পৃথিবী ক্ষুদ্রে পৌষর্গ-পণ্যমহা। সেবুর অব্যাপার হয়েছেন।



বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থায় মেয়েরা

বেলা দে

আমাদের বেশে বিকল্প খাদ্য অভ্যাস করতে যদিও বেশ কিছুটা সময় লাগবে; তবুও এ অভ্যাস বদল করলে চলবে না। পুষ্টির বাস্তবতা কেবল পরিচিত ও কতকগুলি খাদ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না যেহেতু নতুন ধরনের খাদ্য থেকে যদি কিছু উৎপন্ন করা যায় তার অল্প বিশেষজ্ঞতা গবেষণা করে চলেছেন। এই গবেষণার ফলে ভারতীয়দের চিত্রায়িত খাদ্য-অভ্যাসের অনেক কিছু বদলে যাচ্ছে বলে বলা হয়। ভারতের অনেকগুলি গবেষণাগারে নানাবিধ শাকসবজি ও অন্নদান বা এ্যানিম্যাল প্রোটিনের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার হতে পারে এমন ব্যাবস্থাদিও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। খুব কম পরচে কিসায়ে মাছের অন্নদান বাঁচিয়ে বাস্তবায়ন হিসাবে মাত্র তৈরি করে রাখা যায়, সে কথাকে এঁরা ভাবছেন। ভারতের বৈজ্ঞানিক দলের পরিকল্পনা অল্পখাদ্য তাকে এদিকের পেলো বাস্তব উৎপাদন বাড়াবে। আদিক অবস্থারও উন্নতি দেখা দেবে। সম্প্রতি মাস্তানের বই ফুলে ছোটদের মধ্যে যে খাদ্যটির বহুল গ্রহণ হওয়ায় সেটা হল বাঁহান ও ছোলা এক সঙ্গে মিশিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে মধ্যস্থ আহারের ফলে লাগানো হচ্ছে। এছাড়া কচি, মুচি বা চাপাটীর ক্ষেত্রে তালের ব্যালন, চীনাবাদামের আটা, সুবিধামত তাল করে মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। কখনো বা আলু, মাল আলু, বানকচু, পানিকলের আটা বা বরফ ব্যবহার করেও বেশ সুখাদ্য খাদ্য করা যায়। চীনাবাদাম একটা বিশেষ পুষ্টির খাদ্য অণুচ লভ্য এবং সহজলভ্য। চীনা-বাদামের তেল ব্যবহার করে আগে এর বোলা বা বীতি কোনো কাকে আসত না, এখন চীনাবাদামের বীতি থেকে ময়লা তৈরী হচ্ছে। এই ময়লা ভারত সরকারের গবেষণাগারে গ্রহণ একইরকম কিছুটের উপাদান হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। প্রোটিনজাত বলে চীনাবাদামের আটা ময়লা বেশ ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণ আটা ময়লায় লম্বে ১০ ভাগ এই ময়লা মিশিয়ে সুখাদ্য গ্রহণ করা যায়। কোয়েবাইট ও বোকাইতে চীনাবাদামের আটা ময়লা প্রচুর তৈরী হচ্ছে।

এ ছাড়া লয়াবীন, ট্যাপিওকা, কামাখাস, বাইলো, রাগী, ছাতু, ছোলায় তাল, ছুটা, বাজরা

একলোক নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বিকল্প বাস্তব হিসাবে। প্রাথমিক ভাবে মত লেখ করে তাতে লক্ষ্য মিশিয়ে ক্যান না কেলে বাঁধা যায়। সাধারণের নানাবিধ মিলিত তৈরী হচ্ছে। ট্যাপিওরা সাধারণত ঘেঁষে কাঁচ লাগে। পানিকল ছাড়িয়ে গলে যেতে তার সঙ্গে ছাড়া মিশিয়ে অ'ল', লক'বাটা, হুন মিলি দিয়ে ঘিরে নাকচাড়া করে খালি টেলে বোকার মত কেটে নিয়ে লেজ কাটা করা যায়। সুইচ অ'টার সঙ্গে সুস্থর ভাল মিশিয়ে একটা উপায়ের বাস্তব তৈরী হয়।

বাগার ব্যাপারে এক্ষেত্রে কোনো বাধাবস্থা নিয়ম না থাকার কথা। হোক দু'বেলা তাত বা কী যেতেই হবে এমন কি কথা আছে? আমার মনে হয় একই ভোজ্যবস্তু একই অঙ্গ-বঙ্গ করলে তার প্রতি আকর্ষণ বাড়বে এবং তৃপ্তি করে যেতেও ইচ্ছে করে। কেবলমাত্র বাস্তব বিজ্ঞানীরা ছাড়া সবাই জানেন, এই তৃপ্তিটুকুই যে কোনো ব্যক্তির সবচেয়ে বড় পুষ্টি। এর আশেই বনেন্দ্রনাথ ইন্দ্রোত্তর লোকেরা ব্যক্তির ব্যাপারে পরম্পর হবার অল্প তবু আত্মীয় ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গ্রাহ্য শেষ করে দিয়েছে। তার ফলে থাকে শ'ক সবজি, ছব, দুগ্ধাত বাত, আদিত্য প্রভৃতি।

আমাদের ভাববর্ধক অস্ত্রান্ত্র এমনে তাত বাগার রীতি খুব কমই চোখে পড়ে। তাত একমাত্র বাঙালীকেই প্রিয় ও প্রিয়ান বাত হিসেবে চলে আসছে। কিন্তু আজ আমরা এই তাত বাগার ব্যাপারে একই চিন্তা করব। প্রয়োজন হলে সাহস কি না করতে পারে? বর্তমান পরিস্থিতিতে চাল, গম বা আটার পরিবর্তে কি বরণের বিকল্প-বাত ব্যবস্থা করা যায় তাই এখন আমাদের আশঙ্কের প্রায়শঃ পরিবেশন করতে হবে। অতি সাধারণ বাস্তবলোকে যাকে যাকে ভিন্নতর রূপ দিয়ে নিত্য নতুন পরিকল্পনা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

আমার মনে হয় নানাবিধ পথের আবিষ্কার প্রয়োজন অনেক। অগতঃই সত্যনামই বেশী, তাই আর দু'একটা প্রকার বাত্বা হলোই যথেষ্ট। যেমন বকন, যাকে যাকে রাখানো যে হুজি পাওয়া যায় তাই ঘিরে আমরা লাগু ও মোহনভোগ করে থাকি। কিন্তু ইচ্ছে করলে সেই হুজিকেই লাভবান লাভ বকন করে রান্না করা যেতে পারে। তিনি যথেষ্ট হুন খাল দিয়ে হুজির 'ভিক্সা' করা যায়। গম বস্তুর সঙ্গে ব্যবহার করবেন তার মধ্যে তবু কটী, লুচি না বেয়ে ঐ গমকে আবেশণ করে নিয়ে দুগ বা দুগর ভাল সহযোগে বিচুড়ি করতে পারেন; যাকে বলে ডালিয়ার রান্না। আমার আবেশণা গমকে শুক বা তিনি, ছব ও এলাচের ভাঁড়ো দিয়ে পারেন করতে পারেন।

কিন্তু কথা হচ্ছে এমনও হতে পারে হয়তো চাল, গম, হুজি, অর্থাৎ তবু আত্মীয় কিছুই পাওয়া গেল না; অথবা পাওয়া গেলেও এত অল্প যে লাভা সপক্ষে হুলোতে পারলেন না, তখন কি করবেন যখন তো? বিবেচনায় যথেষ্ট যে অল্প বাগার রীতি আছে সেটা বাস্তবের বেশেও চালু করা যেতে পারে। বকন, ভাল তো খুবই পরিবারের নিরামিত বাত্ব। এই ভালের সঙ্গে যদি সেই সময়ের যে তরকারী পাওয়া যায় সেগুলো সেদ্ধ করে মিশিয়ে বাওয়া যায় তাহলে ভাতের বদলে কিছুটা প্রয়োজনীয় বাগার সম্ভব: সংগ্রহ করা যায়। বাকারে আর বাবে কিছু টেংরি (বাংলার বাত্ব ইত্যাদি) এনে তাতে আর পেঁয়াজ আদা ও সোলমরিচ ভাঁড়ো, একই বাগন মিশিয়ে বেশ হুগ তৈরী হয়। এই অংশের সঙ্গে আলুর হু'খানা কী আর কিছু সবজির তরকারি হলোই রান্নার বাগার হয়ে সেদ।

আমাদের বেশে গ্রীষ্ম অবিকালে বাড়িতেই ভাল রান্না ছাড়া ভালের পোঁকা, ভালের কচুই,

ডালপুতী এগুলো হয়ে থাকে এবং আর বিস্তর লতাপেটই এদের প্রস্তুত প্রণালী কিছু কিছু জানা আছে। কিন্তু ডাল দিয়ে মাংস হাচার প্রণালী রহস্য সকলের জানা নেই। এতে বলে 'ডালগোস্ত'। আর সেহ দিউলি ডাল পরিষ্কার করে গুয়ে আশ্বাকুঁমত জল দিয়ে সেদ্ধ করতে দেবেন। সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নেবেন। ছোলায় ডাল দিয়েও হতে পারে। এবারের আবেলত আশ্বাক মাংস একটী লাভে সেদ্ধ করতে দেবেন। একটু বিড় দিতে পারেন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে ডাল ও মাংস একসঙ্গে মিশিয়ে তেত-তিতে করে আবার উত্তনে ঢড়িয়ে দিন, উত্তনের ঐতাবেন আর থাকে। এইলকে আশ্বাকমত হুন, মিলি, আর হুদুবাটা মিলেই হবে। বেশ ঘন ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে ঐদবে কয়েকটি বনেপাতা কুচো ছড়িয়ে দেবেন। এর সঙ্গে ভাত বা কচী থাকহার দরকার হয় না। আর একটী বাবারের কথা বলছি। এতেও ভাত কচী, লুটির দরকার হবে না। এর নাম 'চাও চাও'; এটা ইংরেজি মাংস, চিড়ি মাছ অথবা ভিজের দরকার হয়। মাংসের হাড়ের মুকুয়া লাগবে এক পোয়া। বাজারে চাও চাওয়ের প্যাকেট (সিদাইয়ের মত দরজত) পাওয়া যায়। এই প্যাকেট কিনবেন চারটে। কিছু পানত, কেকবীম, পেঁয়াজ, কড়াইচটী আর বি ও হুন এই হচ্ছে উপকরণ। প্রথমে সব সেদ্ধ করে রাখতে হবে। পেঁয়াজ মিহি করে কাটবেন। ছোট চিড়ির বোলা ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে নেবেন। এবারের কড়াই বা তেতটিতে বি দিয়ে পেঁয়াজ কুচো জালতে থাকুন। এই সঙ্গে মাছ, মাংস বা ভিজের কুচো ছেঁকে দিয়ে এখন ভাবে জল দেবেন যেন 'চাও'গুলো বেশ সেদ্ধ হয় এবং জল ফেলতে হবে না, স্বরস্বরে হয়ে যাবে। এর সঙ্গেও ভাত কচী বাবার দরকার হবে না। সঙ্গে একটু চাইনী থাকলেই হবে।

সত্যি কথা বলতে কি হাতের গুণে সামগ্র্য ও সাধারণ উপকরণ থেকে বেশ সুস্বাদু ও সুগন্ধ প্রস্তুত করা যেতে পারে। আমি এই বিষয়ে বাগানভরে আরো কিছু বলব।

বাগুয়া বদল

হাসি ভট্টাচার্য

(দে) বাবীন হওয়ার পর নানা সমস্যা আল আমাদের বিপর্যত করে তুলেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে 'অসচ্ছিতা ভাবনা'।

বাবীনতার পাওয়ার পর থেকে জাতীয় সরকার দেশ পঠনে অনেক পরিশ্রমসাধ্য গ্রন্থ করেছেন, কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী বেশে চাষাবাদের সমস্যার এতটুকু গর্ভত সহাবানে আমরা এগুতে পারিনি।

কলে বৃষ্টি না হওয়ার বন্ধন অসম্ভাব্য, বরং আর অধিক বৃষ্টিতে প্রাধান্য,—'হায় বৃষ্টি' নিয়ে সেই অরপ্যে যেমনই আমাদের তাগালিপি। বাগুয়া-বাগুয়ার ব্যাপারে আমাদের বেশ স্বল্প সম্পূর্ণতা লাভ করেছি। কেন করে নি—তা নিয়ে নানা মত। আবাহী জমি বাড়তে পারা যায়নি, বহি-পত্রের কলম অপর সেনের দ্বারা বহুদূর অধিকার করে করে তোলা যায়নি, সেচের কাজে সেন

অগ্রগতি হইল; কৃষক জমির মালিক নন,—প্রকৃতি সম্রাট। তা ছাড়া দেশ বিজ্ঞানে কৃষিযোগ্য জমির অভাব, আর ভ্রমসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া,—বাড় সম্রাটর তীব্রতা। কল, দেশের বাড় দেশে নেই, বিদেশী কান্ডে ভিকার কুলি নিয়ে আমাদের বাড়-সম্রাট ঘেঁটেতে হচ্ছে। এ সম্রাট আজ আমাদের অগণিতসীম।

এমন দিনে বাড়-সম্রাটর তথু সম্রাটর সমালোচনার কালক্ষেপে না করে,—আমরা নিজেরা নিজেকে বর-সংসারে এই সম্রাটর সমাধানে ক'তটুকু কি করতে পারি,—তা ভেবে বেধা আর একাত্তই প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের কথাই আজ শ্রবণ করিতে দিচ্চেন গল্প-ভারতী পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। এর ক্ষেত্রে তাঁদের ইচ্ছা জানাচ্ছি।

পত্নী সংসারের গল্প-ভারতীতে এ-সম্পর্কে দু'টি আলোচনার খাড়াভাষ্যের দিনে পরিপূরক-বাড় এবং বিকল্প-বাড় নিয়ে প্রবেশ। বোলাদি (শ্রীমতী বোলা দে) এবং শ্রীমতী বীনা পেনের আলোচনার কিছুটা সমাধানের ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি।

এ-বিষয়ের সাধারণ ভাবে বিকল্প বাড় সম্পর্কে আমাদের দু'চার কথা বলতে বলা হয়েছে।

প্রথমেই বলা রাবি, সম্রাটর জাত, ডাল, তরকারি আর বাড়, ছব আমাদের দেশের এই বাড় পূর্ণাঙ্গ পরিমাণে প্রতি গৃহস্থ সংসারেই ছিল। কেননা,—পত্নী প্রায়েই ছিল আমাদের বলবান। বেশি দূর যেতে হবে না, এক পুরুষ, দু'পুরুষ আগের কথাই ভেবে দেখুন—আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন গ্রামের রাজহ। গ্রামের জীবনে গোলা জতা বান বাড়ির অল্পনে তরিতরকারি আনায়ে কলন আর কলগুলের গাছপালা, গোয়ালে গরু, গুহুবে বাছ—এ কোন গৃহস্থের সংসারে না ছিল?

বাংলার ব্রহ্মদেব শোনা যায়, 'গোয়ালে গরু মহাই-এ বান, তাতে লক্ষীর অধিষ্ঠান।' এই লক্ষীর অধিষ্ঠানই আমাদের গ্রাম-বাংলার গৃহস্থ সংসার। নগর আর এ-সংসারে গ্রাস করেছে।

কিন্তু সে আক্ষেপে এখন বরষ সম্রাটর সমাধান হবে না—তখন আর তা করে লাভ কী?

বরষ এখন কী ভাবে আমরা বাড় সম্রাটর এই ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠতে পারি সেদিক থেকেই আমাদের প্রত্যেকের সক্রিয় ভাবে সম্রাটর সুখোমুখি হতে হবে।

বোলাদি আবারে কচি পরিবর্তনের কথা বিশেষ করে বলেছেন। আমরা তা যেতে অভ্যস্ত, তা না গেলে আমরা আর কি যেতে পারি এইটাই হচ্ছে প্রধান কথা। অর্থাৎ বাওয়া বল।

চাল জুয়াপা,—মূল্য। পত্নী পূর্ণাঙ্গ পাওয়া যায় না। চাল, গরু, ছব, বাছ, ডিম, মাংস—এগুলি বাড়ভণ্ডের। কিন্তু না গেলে কী করা হবে? বিশেষ করে এমন কি বিকল্প-বাড় গ্রহণ করা যায় যা পরিচ দেশের লোকের গ্রাণ-ব্যয়নের উপযুক্ত? সেই দিক থেকে আসুন,—আমরা বাড়ির মেয়েরা সবাই কিছু কিছু উপায় খুঁজে বার করি। গৃহ সম্রাটর আক্ষেপের দিনে বাঁধা করা হুলাওয়া। তবে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সংসারে যেটাটুকু কম ব্যয়তে উত্তরী করা যায় এমন দু'চারটে বাবারের কথা বলি।

এই বর্ধার দিনে এক বক্তাবের সাধারণ কথা যেতে পারে—বার মতো বাড়ভণ্ড আছে।

আলু ওলের কাব্য

এতে লাগবে আলু ১ কিলো। ওল, ছা, ওল ২০০ গ্রাম, ময়ূন ৩ কোয়া, পিঁরাফ ১০০ গ্রাম ; আলাফ মত আদা, ঝাঁটা লম্বা, ছন আর লামান্ন মিষ্টি।

প্রথমে আলু ও ওলকে বেশ ভালো করে সিদ্ধ করে নেবেন। সিদ্ধ হয়ে গেলে খোঁসা ছাড়িয়ে মোলায়েম করে চটকে নিন। এবার পিঁরাফ, ঝাঁটা লম্বা আদা একলক্কে বেশ মিহি করে বেটে চটকানো আলু ও ওলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন ভালোভাবে। তারপর হাতে লামান্ন একটু বি মিশিয়ে সেই মত থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে রাখুন। তারপর সেগুলিকে চাটুর ওপর রেখে নেড়েচেড়ে বেশ করে আত্তনে সেক্কে নিন। খানিকক্ষণ পরে সেগুলি কড়ার ছাকা বি কিংবা তেলে বেশ লাল লাল করে জামবেন। যখন পরিচ্ছন্নদের সেগুলি বেতে দেবেন তখন জ্বিরে জামার শুঁড়ে ও লেবুর রস তত্রে ওপর ছড়িয়ে দেবেন। যেখান, এতে উষ্ণ পরিপুতি এবং রসনা তৃপ্তি চুই-ই হবে। আর এই খাদ্য বাত্বাকরও বটে!

আলুর ওয়েজ

আলু ১ কিলো, ময়ূন বড় চামচের চুই চামচ, বড় ডিম ১টা, মাখন ১ চামচ।

প্রথমে আলু সিদ্ধ করে ময়ূন, ডিম, মাখন ও পরিমাণ মত ছন দিয়ে বেশ মিহি করে রাখুন। ইচ্ছে অনুযায়ী গোল মরিচের শুঁড়ে অথবা কয়েকটা ঝাঁটা জ্বিরে মিশিয়ে নিন ঐ লক্কে। এবার হাতে করে গোল আকার চ্যাপ্টা মত করে লাড়ুন। ১ টকি আলাফ লুক করবেন। প্রায় ৮-১০ টা ওয়েজ তৈরী হবে।

ফ্রাইপানে অর বি বা তেল দিয়ে ঐগুলি বেশ লাড়তে করে ভেজে নিন। মাখবারে সোচ্ছাচ্ছকি ভাবে ঐ ওয়েজ জ্বানান করে কেটে দিন প্রত্যেকটা। এই জ্বানান: কয়া ওয়েজ টমাটোর চাটনী দিয়ে সবাইকে পরিবেশন করুন।

আলুর গোলাপ জাম

আর সেহ আলু, কীর ১ পোতা, ময়ূন বড় এক চামচ, আর সেহ ডিম, এলাতি, গোলাপ অল একটু, অর বি ভাজবার অস্ত্রে।

প্রথমে আলুগুলি বেশ সিদ্ধ করে সরষ খাততেই জল থেকে তুলে নিয়ে তলে করে রাখুন। এবার কীর ও ময়ূন মিশিয়ে নিন ঐ লক্কে। অর খানিকটা ডিম দেবেন। আর কিছুক্ষণ ভাল করে রাখুন।

একটি গায়ে ঐ ডিমের রস (বেশী বন নয়) তৈরী করে রেখে নিন।

আলু দিয়ে ছোট ছোট গোল তৈরী করে ঐ দিয়ে ভেজে রস ফেলে নিন। যেখান একটার উপরে আর একটা এভাবে বেশী চাপা লাগড়ে। সবগুলি রসে যোগ্য হয়ে গেলে একটা চ্যাপ্টা চামচ দিয়ে আত্তে আত্তে সেক্কে নিন ও গোলাপ জল ছিটিয়ে দিন উপরে। এলাতিগুলো দানা বেহ করে ডিমের বা শুঁড়ের রস ছুটিয়ে নামাখার সময় দিয়ে দেবেন।

ভালিয়ার বড়

একপোয়া পুহ, একছটাক কলাই ভাল আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রাখুন। পেরেরদিন সকালে জলবেকে কুণে ভালো করে জল ছরিয়ে নিয়ে সেগুলি বাটতে হবে। পরে হুন, লড়া, হিং ও কালোজিরে গিড়ে ফেনিয়ে নিতে হবে। তারপর ভালের বড়ার মত ছোট ছোট করে গিয়ে লাল করে তোকে নিতে হবে। এই বড়া চায়ের লেখেও ব্যবহার চলে।

তন্দুরী কুটি

আটা গিয়ে কুটি, লুচি, পরোটা তো সবাই করতে পারেন। কিন্তু তন্দুরী কুটিতে কুটি, লুচি, পরোটার মত সবটাই আটা লাগবে না। আর ওখানে তারি বলে পরিমাণও ব্যবহার কমবে। অথচ তন্দুরী কুটি আকার হিসাবে পুষ্টিকর আর খেতেও ভালো।

তন্দুরী কুটি করার প্রণালী হচ্ছে সবুজ লিচু করে আটার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে যেমনভাবে কুটি তৈরী করতে হয় তদনুসারে করুন। তবে তন্দুরী উনান তৈরী করার ব্যাপারে সায়েলা আছে। তার মরফার ১) ২) মাটির ভাওরাত্তেও এই কুটি তৈরী করা চলে।

বে-বাংলার কথাগুলি এখানে বললাম—তা পুহ ব্যবহার নাহ; অথচ এগুলি বাত গুণবৃত্ত এবং সুস্বাদু। বেশাদি এখানেও বহুভাবে ব্যবহার করা কিছু বলেছেন। আরি গুত্র সঙ্গে আরো কিছু বেগ করলাম। পরের বাবে গল্প-ভারতীর পাঠিকারিও এগিয়ে আসুন না—আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কিছু কিছু ভাবি। সমস্তাটোতো আমাদের লকলোই।

বিকল্প বাত

আজা পাকড়াই

সুখলাং হুলাং পুত্র ভায়লাং আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে দেশে বিশেষে রপ্তানী হত নানা ধরনের নানারকম চাল। কত বা তাড়ের নাম: কামিনী ভোগ! পোপাল ভোগ! এমন আরও কত! যেহন তার খাদ্য আর তেরনি প্রকৃত সেই সব চালের পুহ। কিন্তু আজ আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে সেই দেশে বসেই আমরা একটু ভাল বাবার ভক্ত লালাহিত! ছোট ছেলে পাইল বাবার বাহবা বহলে সামান্য আস্তান চালেও অত্যাধিক তার সে লাগটুই মেটাতে পারিনা। পুহ-বিজ্ঞের নৈবেদ্য হয় না। অথচ অত্যাধিক। বাতীর কণ কোন হাটুকে পথি করতে দুটি ভাল দিতে পারিনা। একি আমাদের পক্ষে কম হুংবেব। আর সবচেয়ে আকস্মিকের কথা যে এই পুত্র ভায়লাং বাংলা যারের সম্ভাবন হয়ে আজ অত্যাধিক আমাদের ভাবতে হচ্ছে বিকল্প-বাতের কথা। কিন্তু এই বিকল্প-বাতও এমন প্রক্রিয়ার তৈরী করতে হবে যাতে করে পরিণাক হয় লজ্জা আবার যেন কোন বিশুদ্ধ না ভেঁকে আসে। তাই সেজন্য কয়েকটি সহজ আর সুপাচ্য বিকল্প বাত পরিবেশন করছি। তাতে তিটামিনও

বাক্যে বর্ণিত পরিমাণে। বরং ভাতের শর্করা আতীত ভিটামিন একটু কম থাকায় গ্রাম লতলের পক্ষেই এটি উপযোগী হবে।

হালিমা—একটি সুপাতা বাত। এটিতে নোনতা মিষ্টি সব রকম বাতই তৈরী করা যায়।

প্রথমে হালিমা তৈরী করার উপায় বলে দিই। চার পাঁচ কিলো সম বেশ করে বেড়ে বেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে কাঁচ পোলায় চমকে দিন। বেশ একটি চাখা লত বেতলে নামিয়ে দিন। এবার সম চাকিতে মোটা মোটা করে তাকিয়ে দিন। তারপর একটি সুব বন্ধ টিনে তুলে রাখুন। যেমন ব্যবহার হবে তেমনি ব্যব করে নেবেন। এতে প্রচুর ভিটামিন রয়েছে। পিত্ত রোগী আর সাধারণ দাত্ত সবাই ভাতের এই বিকল্প সহজে গ্রহণ করতে পারবেন। পেট ভরে খেলেও কোন রকম অসুখ করবে না।

হালিয়ার বিচুড়ি—(কণ্ঠদেব বা পিত্তদেব ক্ষত) উপকরণ—আড়াইশো গ্রাম হালিয়া, আড়াইশো গ্রাম সুগ বা সুহুরির ডাল, ত্রিভিন্নটি লবঙ্গ। এক চামচ তালে ঘি বা মাখন। একটু আদা কুচি একটি কাঁচালতা কুচি (কচি অল্পবাড়ী) ধনেপাতা কুচি, সামান্ত ছন।

প্রণালী—বিটু চকিয়ে তাতে ঐ লবঙ্গ কোড়ন দিন তারপর অল্প দিন এবার চালের রস করে বুয়ে হালিয়া দিয়ে দিন। অল্প সময়েরই লেহু হয়ে যাবে। ছন দিন, আদা কুচি লতা কুচি দিন। নামাবার আগে আগে ধনে পাতা কুচি দিন। ইচ্ছে হলে একটু মিষ্টিও দিতে পারেন। এটি বেশ সুস্বাদু আর সহজ পাত্য।

হালিয়ার ভাদি বিচুড়ি—

উপকরণ—আড়াইশো গ্রাম হালিমা। আড়াইশো গ্রাম সুগের বা সুহুরির ডাল। একশো গ্রাম পিঁয়াজ। একশো গ্রাম জৈক বীষ। একশো গ্রাম মাসে। বড় চামচের দুটামাত্র ঘি। এক গলা তেল। সামান্ত জিহে লতা আদা ও হলুদ বাটা, অল্প প্রথম মশলা বাটা, ছন, চিনি একচামচ।

প্রণালী—হালি সুগের ডালের বিচুড়ি করতে চান তাহলে ঐ একগলা তেল দিয়ে তাতে সামান্ত দুটি জিহে কোড়ন দিয়ে কাঁচাসুগের ডালটি আগে তেবে দিন। তারপর পিঁয়াজ ভাল করে ভেজে ঐ হালিমা বুয়ে ছেড়ে দিন আর ভালও ঐ লেহু দিন। লিঙ্ক হোক। মাসে ছোট ছোট করে কেটে নিয়ে ঐ বাটা মশলা দিয়ে বিয়ের সঙ্গে করে নিয়ে তাও ঐ বিচুড়ির মধ্যে দিন। জৈক বীষ ছোট ছোট করে কেটে ওষু মরো দিন। ছন মিষ্টি দিন, রসে পেলে নামিয়ে ঘি সরমমশলা দিন। এই ঘরায় হিসে জারী প্রথম সুগেরাচক আর ভিটামিনপূর্ণ সম্পূর্ণ বাত এটি। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকেও অনায়াসে পরিবেশন করতে পারেন।

এবার নোনতা আর মিষ্টি দুটি অলবাবারোধ কথা বলি।

দুধ হালিমা—

উপকরণ—আড়াইশো গ্রাম হালিমা, আদামিটার দুধ, লক্ষণ গ্রাম কিসমিল; ছয়টি ছোট এলাচের ভাঁড়ো, চিনি যেতুশো গ্রাম, কেওড়া দুচামচ।

প্রণালী—দুধের সঙ্গে অল্প হালিমে তাতে হালিমা দিয়ে লেহু করুন। ঐ লেহু কিসমিল দিন। হালিমা পলে পেলে তবে চিনি দিন। এবার নামিয়ে এলাচ ভাঁড়ো আর কেওড়া দিন।

এটি বাছাঘেব অতি প্রিয় ব্যক্তি; তাছাড়া থাকেই পরিবেশন করবেন তাঁরই ভাল লাগবে। দালিয়া শুধু বলে লেজ করে দুধের সঙ্গে পরিমাণ মত করে মিশিয়ে রোগীকেও পরিবেশন করতে পারেন।

ক্রাইড দালিয়া—(ক্রাইড হাটসের বিকল্প)।

উপকরণ—আড়াইশো গ্রাম দালিয়া। দুটি ইঁদুর ডিম, পকাশ গ্রাম ত্রেক বীর, পকাশ গ্রাম পাকর, একশো গ্রাম আলু, পকাশ গ্রাম শিলাক, আদা আর কাঁচা লড়া কুচি, ছন, বড় চামচের তিন তিন ছ চামচ ঘি ও গরম মশলা একটুখানি।

প্রণালী—দালিয়া ছন আর গরম মশলা দিয়ে বলে লেজ করে নিন। আনাচ মত জল বেধেন—যেন বেশ ভর করে থাকে। আলু লেজ করে ডুমে কুচি কটুন। বীর আর পাকর কুচি করে লেজ করে নিন। ডিমের হামলেট তেলে কুচি করে নিন। শিলাক কুচি করে কটুন। এবার ঘি চড়ান, একটি ছোট এলাচ কেটে কোড়ন নিন। তারপর শিঁতাগুলি লাল করে ভাজুন। এবার অল্প লবঙ্গগুলি একটু তেলে নিন তারপর দালিয়া ছেঁকে ভাজতে থাকুন। আদা, লড়া কুচি নিন। সামান্য আলু হামলেট কুচি দিয়ে মেখেচেড়ে দালিয়া মিশিয়ে নিন। ক্রাইড হাটসের বিকল্পে এটি ব্যবহার করতে পারেন। জল খাবারের পক্ষেও যথেষ্ট উপযোগী। বীর, ডিম, দালিয়া সবটা মিশিয়ে অনেকটা ভিটামিনও থাকবে।

এবারে এই ক’টি রান্নার অভ্যাস হয়ে নিন; তারপর দালিয়া ছাড়াও অল্প বিকল্পের ব্যাপার আবার পরে পরিবেশন করুন।

খেলনা শুধুই খেলনা নয়

কলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

কি রকম হাতে বড়িন খেলনা কী খোঁজার সৃষ্টি করে তা কবিত্বের স্বীকৃতিতে জানতেন, তাই তিনি তা নিয়ে কবিতা না লিখে পারেন নি। ব্যক্তিবিশিষ্ট, শিশুর হাতে খেলনা যেন কবিত্ব হাতে কবিতা; সে-স্বপ্নমিতা, সে-আনন্দ হুঁচোব স’রে বেধেও পুঁ। উপযুক্ত চোখ যার আছে, সে-ই বেধেতে পারে এই দুই কবিত্বের বর্গ সমান পরিবেশ।

খেলনা শিশুর হাতেই। খেলনার মূল্য শিশুর কাছেই। আমি টাটপাহাড়ার নিঃশেষ মূল্যের কথা বলছি না, এক্ষেত্রে সে-মূল্য অস্বাভাবিক—আমি বলছি এই যে, খেলনার প্রকৃত মূল্যায়ন বা কবিত্বের হাতে তত নয়, ছোটদের কাছে, শিশুর কাছে বসে। আপনাদের পরমা বয়স বা-ই হোক না কেন সেগুলো খেলনাটি দিয়ে যদি আপনিস আপনায় ছেলে কি মেয়ের মূখে আনন্দ, চোখে হাসি সৃষ্টিয়ে জ্বলতে পারেন, তবে আপনাদের নিজেরই মনে হবে যে, অর্থব্যয় আপনাদের লাভকর হয়েছে।

শিশুর মনোরঞ্জনের তালিকায় খেলনার উৎকৃষ্ট বা জগৎ। যা দিয়ে খেলা বা কৌতুক করা যায়, তা-ই খেলনা বা কৌতুকক। সে-খেলনা হতে পারে কারিগরের হাতের তৈরি; অথবা হতে পারে প্রাকৃতিক (বাস্তুজ) যে কোন বস্তু। বস্তুত, শিশুর মনোরঞ্জিত বস্তু খেলনার মধ্যে দিয়ে আনন্দ পেতে

চার জন তা'বেলনা অর্থাৎ উপাশাসনের জেই, মুসা বা উৎকর্ষ বেতার করেন। 'য' কান তুজ জিনিস—খুশি-নাটি, বাঁশ, তড়ি, ঢোল, ককি, মাটির তাঁড়, বেলসাইয়ের বাজ, ডাঙা বাসন, ইট্টা কাকড়া, অথবা বাহার দাড়ি কানার তুলন, ঠাণ্ডার চপ্‌মার বাগ, কটেনসের হাটির পুত্, প্রটিকের বেলগাড়ি, নানার ব্যাডমিটন ব্যাডেট, দিহির বট্টা, কাকার ঠেজুতা মা'র সো'মালি তাত ক'রা ক্রায়েল—তার বেলার পক্ষে যথেষ্ট। সে-বেলার মাথাখুচু আপনি-ক'র্ম হ'য় হুহুতে পারবে না, দেখিতে তাকিয়ে হুহু বা হাসব, কিন্তু তবু একথা ঠিক যে, ওদের ঐ বেলার সঙ্গে এরা নিহমতি, মুক্তিপুর্, কল্লাপক। ওদের বেলার কহুলা আপনার কাজের কহুলায় যেহে কোন দিক থেকেই মগনা নয়।

চেয়ে দেখুন, আপনার বাবুল ঐ ওবারে বাঁশের মাথার কতগুলো কাটি আর লাগর মিলে বাজ পাফা হাতের খুঁল্লাহানা ওর নেই, একটা জিনিস পচকরত কবে তুলতে হ'য় মগনার নেই হেত হাছে, তবু ওর একটা নিম্বন প্লানি আছে, যৈষ আছে, অ্যাবলার আছে। ও কত ঐ মগ্নে উপকরণ মিলে কখনো মগ্নিব পড়ছে, কখনো 'ক্রিক'-'টেনেস' হ'য় আছে, কখনো পুত্ কখনো মগ্ন পাঁচিল তৈরি করছে। ওকে সাধারা কখন, নানারকম 'আইডিয়া' পান, বাততি কিছু বেলনা কিনে এনে বিন। ওকে 'মেকানো' দিহে হুহুত দেখবেন—ইজিনিয়ারিং বুদ্ধি ওর কত দক্ষ। ওর বেলনা ঐ জাতীয়ই হওয়া দরকার—পুতুল আর বল আর বাঁশিতে ওর প্রতিভা খুলবে না।

শিওর বাবা মা'র পক্ষে এই জিনিসটা দেখা দরকার—কার কান্না দিকে ছোঁক। সেটা বুঝে তাকে সেইমত বেলনা ও উৎসাহ দিতে হবে। অধিক্তি এই একটা বিশেষ বয়স যা 'স্টেক' থাকে—খুঁবছরের বাচ্চাকে দেখানো দিলে কি আর সে তা থেকে বকমারি জিনিস পড়তে পারবে? প্রথম শৈশবে তাই হুহুতে বেলনা চাই।

আপনার নিজের যদি হাতের কাজের বা পা'বেশিতা থাকে তাহলে বাড়িতে বসেই খুজ উপকরণ দিহে জুখর জুখর বেলনা তৈরি ক'রে দিতে পারেন বাচ্চাদের। এতে তাদেরও খুশি হালি হুটবে, আপনারও মন ক'রে উঠবে সঠিক ও তৃপ্তিসানের আনন্দে। সবীজ্ঞানের সেই পল্লট মনে করুন—বেচারী গরিব বাগ উৎসব উপলক্ষ্যে ছেলের বেলনা কিনে দিতে পারতেন, সে সামর্থ্য তার ছিল না; কিন্তু কয়েকদিনের পরিস্রমে নিজের হাতে তৈরি ক'রে দিহেছিল পাল-বাগ-গাড় সামত গুটি নৌকো দুই ছেলেকে। মধ্য জিনিস দিহে হাতাক অগ্রাম পেল আর পরে গ্রীতাদের ডা কথাই নেই।

সেইরকম আপনিও করতে পারেন। দোলা, কাদ, কেন্ট, গিস্‌বোড, কাকড়াফালি (পরিভার), কাঠের ও বাঁশের টুকরো, ক'পেটের ফালি, বেলসাই কাটি ও বাজ, তুল, কুলা, ইট্টা'র টুকরো-টুক'রা ফেলা-ছড়ার জিনিস দিহে মনোহর বেলনা তৈরি করতে পারেন। মাটি দিহে নানারকম ফল-ফুল, লজ-আনোয়ার, পুতুল, পাড়ি, খোঁকা পড়তে পারেন।

আর তার জুগে না থাকলে সাধ্যমত বেলনা কিনে দিন ওদের। সেই সঙ্গে শিক্ষা বিন বেলনা না তেজে ব্যবহার করতে। শিওরের কাছে হ'য়তো এ শিক্ষা বা উপদেশ বুঝা, কেননা জিনিস ডাঙা ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবু চোঁটা করা দরকার। সব বাচ্চাই 'আব'খুটে' হ'য়না, (তাছাড়া প্রবৃত্তি) অনেকের মধ্যেই খুব কম থাকে। তাবিত-জীবনে তারা সমাজ পড়ার কাজে

লাগতে পারে বৈকি। আর যাদের আরহা অংকুটে বসি অনবরত বোতালে-খেতালে তাহেরও ভাঙন প্রযুক্তি অনেকটা ভরষে যেতে পারে।

বেলা ও বেলাবার মাঝ্যানে শিত্তহের শিকারানের পদ্ধতি আদ্যকাল শক্তি বশে ও বাণিজ্যর জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচলিত হয়েছে। মটেলরী ও কিতারগাটের প্রণালী বলে,—আনন্ড ও বেলাব্দ্যের মারফতে শিত্তমানে তাহের উপযোগী নানান্ খোবাক যোগাতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাহের বুদ্ধি-বুদ্ধিক জাদিরে তুলতে হবে। হীতিটা হাল-আমলে আমাদের দেশেও প্রচার লাভ করতে চলেছে। ক.জি নাল'রী প্রতিষ্ঠানগুলির মূল অবলম্বন হচ্ছে লগাহুত্বেলস্পার স্তাব্যবহারিকতা হল আর প্রচুর 'বেলন'।

পাশ্চাত্য 'শ্রমশিল্পে শিত্তহের বেলন' মিরে আদ্যকাল অনেক সংবেষণা, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ওদেশের লোকেরা বেলনার সঙ্গে শিত্ত মনস্তাত্ত্বের সম্পর্ক অনবরত আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে চলেছেন। এই চেষ্টা জিনিগতে এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করছেন তাঁরা। নতুন নতুন শিকাগ্রহ বেলনা তৈরি করা হচ্ছে সেখানে। শিত্তমানে বেলনার প্রভাব ও গুরুত্ব যে খুবই বেশি তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। এই ধরণের প্রচেষ্টা ও সংবেষণা আমাদের দেশেও শুরু করার সময় এসেছে। শিত্তমনস্তাত্ত্বিকরা হত ভাড়াভাড়া এথিকে বন বন ততই বহল।

আমরা যাচা খেঁচা, জারা যেন ভবনো জুলে না হাই যে বেলনা শুধুই বেলনা নয়।
হানে অনেক কিছু—অদ্বত শিত্তহের কাছে।

পার্কের কোণের বেঞ্চটার বলে কবিতার বাতা পড়ছিলেন আবেশিকার কবি হুইটম্যান।
মন তাঁর খুঁই চকল। হইবানায় কি মায় বেওয়া যায়।

ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে তিনি উঠেবো উঠেবো করছেন এমন সময় একটি বহর
হলেকের মত ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বেল। করতে লেগে গেল।

ছোট ভাই বড় ছুট। সে সেখানে বাংলার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মিসির গায়ে হুকিবে
হিচ্ছিল।

মিসি যেনে দিয়ে বলে—ছি: নটন বড় বোঝো তুমি, ওলব কি কছ? যে মিসির কেউ
হোয় না তাই মিরে তোমার বেল।?

কি মিসির? ছুট, তাই নটন জিজ্ঞেস করল।

কেন ঐ 'Leaves of Grass'. হুইটম্যান সব দেখছিলেন; এইবার তিনি বড় বেশে
বইয়ের নাম ঐ মিলেন।

জাতীয়তাবোধের ভূমি-কথা

উনবিংশ শতকের আগে ভারতে জাতীয়তাবোধ ছিল না। কাজেই ইংরেজ ভারতীয় রাজ্য-সংস্কার এবং ভারতীয় সিপাইদেরই সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অংশে এত সহজে প্রকৃত স্থাপন করতে পেরেছিল। উনবিংশ শতকে দর্শনমূলক ভারতের প্রতিটি প্রান্তে প্রাপ্তি হলে জাতীয়তাবোধের বীজ। আর সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিলো বিভিন্ন জাতি-বাহু ও হাওয়ার সংস্পর্শে এসে।

জাতীয়তাবোধ প্রথম স্পষ্ট রূপ নেয় বাংলা দেশে। এখানেই প্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গুলুদ হয়ে ওঠে বলে, সাম্রাজ্য শিকার প্রবর্তন জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে তোলে। ১৮১৭ সালে কলকাতার হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই কলেজ স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এ দেশ মুসলিম ভাবধারার প্রাতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবধারার ও প্রসিদ্ধিমানতার ব্যয় ও ব্যয় ছিলেন হিন্দু-কলেজের ছাত্ররা। স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার ও দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক হেনরী লুই ডিভিয়ার ডিরোজিয়ার (ভারতীয় পত্রিকা)। তাঁর সংস্পর্শে এসে হিন্দু কলেজের বহু ছাত্র দেশপ্রেমে দীক্ষিত হন। হিন্দু কলেজের ছাত্র কাম্ব্রিজের যোশ ফেল্ডের উপদেষ্টা হয়ে ১৮৩০ সালে অনেকগুলি দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করেন। রসিকতাক্ত মল্লিক এবং মল্লিকারজন সুযোগ্যব্যায় হিন্দু কলেজের আর দুজন বিশিষ্ট ছাত্র এই বিষয়ে তৎপরতা দেখান ও লেখাপ্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে দেশপ্রেমের প্রতি আকর্ষণ ও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রথম সূত্রিত হয় হিন্দু কলেজের অঙ্গনে। অল্প সময়ের আঁকিতে।

বিতীর্ণত, প্রাচীন হিন্দু জাতির দৌর্য ও মহান ঐতিহ্য সংস্পর্শে নতুন জ্ঞানলাভ ও গবেষণার কলে জাতীয়তাবোধ সেদিনে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে রেখাপাত করে। ভারত-ইতিহাসের চর্চা, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও গবেষণা ইংরেজী শিক্ষার শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে উদ্ভোচিত করে দেয় প্রাচীন ভারতের পরিচয়। তারা উপলব্ধি করে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ছিলো প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতার মতোই মহান। মোকদ্দমার, পোপের হাওয়ার এবং অজ্ঞাত মনীষীদের চোখের আলোকে ভারতবাসী আত্ম-বরণ আবিষ্কার করে। একদিন সন্ধ্যা অপেক্ষের সাম্রাজ্য তবু ভারতে নয় আকর্ষণীয়ভাবে গর্ভিত বিদ্যুৎ ছিলো, বৌদ্ধ ধর্ম একদিন ভারতের তৌল্যেগিত নীমা অতিক্রম করে দশম-ধর্মে পরিণত হয়েছিলো, বুদ্ধের এক প্রাচীন সভ্যতার আত্ম ইত্যাদি তথ্য জানার সঙ্গে-সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে দেখা দেয় অকৃতপূর্ণ জাতীয়তাবোধ।

উনিশে শতকের প্রথমার্ধে ইতালী ও গ্রীসের স্বাধীনতা লাভ, আয়ারল্যান্ডের মুক্তি আন্দোলন ইত্যাদি যুরোপীয় ঘটনার তরঙ্গ তরিতরঙ্গে এসেছে পৌঁছায় ও ভারতের নব-জাগ্রত স্বাভাবিকভাবেই পুষ্ট করে তোলে। মুক্তা-বস্ত্রের প্রচলন ও শত্রু-শত্রিকার প্রকাশ ও প্রচার এই বিষয়ে সুইই লগ্নাহতা করে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কঠোর রূপও ভারতবাসীর স্বাভাবিকভাবেই প্রেরণ করে তোলে। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণে লাগরণ বাহুদের ক্রম-বর্ধমান দারিদ্র্য, ক্ষুধার্তের ঘন-ঘন শব্দস্রোত, দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের নৃশংস, ভারতীয় ও খোঁচাঘেরের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুঃখানু-দুঃখানু তীব্র বৈষম্য, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ইত্যাদি বানো কাণে ভারতের প্রতি প্রেয় মাত্রই ক্রমশ ইংরেজ-বিবেচনা করে ওঠে।

বেঙ্গল ও বঙ্গীয়ের চলাচল ও ইংরেজী ভাষার প্রচলনের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সক্রিয় যোগাযোগ ও ভাবধারার আদান-প্রদান শুরু হয়। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গের মানুষের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান ক্রমশই লোপ পড়ে থাকে ও এক অঞ্চলের মানুষ অল্প অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে থাকে। ‘আমি নব ভারতের জনতা; এক জাতি এক প্রাণ একতা।’

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণের সংমিশ্রণের ফলে উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলা দেশে একত্র জাতীয়তাবাদের উদয় ঘটে। এই জাতীয়তাবাদের প্রথম পুরোধিত ছিলেন হিন্দু কলেজের একজন পুত্রোদ্যোক্তা ছাত্র রামনাথায়ন বসু। পাকাতা শিক্ষার শিক্ষিত হয়েও তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম ও যুরোপীয় সভ্যতার চেয়ে হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতাকেই প্রেয় আগ্রহ দিতেন। তাঁর এই ভাবধারা অচিরেই লক্ষিত হিন্দুদের মনে প্রতিফলিত জাগ্রালে। ১৮৬১ সালে নিজের ভাবধারাকে রামনাথায়ন পুত্রিকায় প্রকাশ করে ও একটি লম্বা গল্পের প্রস্তাব করেন। সেই সংস্কার কাল হবে পাকাতার অল্প অল্পকণ প্রতিরোধ, ভারতের প্রাচীন ভাবধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার, দেশীয় চীতিতে শত্রুর চর্চা, ভারতীয় সংস্কৃতি, আচার্য্য, বাঙালী বানো, গোষ্ঠিক পরিচয় প্রভৃতির প্রচলন। রমোজনাথ তাঁর অল্পচরিত্রে বলেছেন যে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা রামনাথায়ন বসু গঠিত এক গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন এবং এখানে থেকেই তাঁদের ভারতকে স্বাধীন করার সূত্রা ভাগে।

রামনাথায়ন বসুর ভাবধারাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেন নরগোপাল মিত্র। তিনি হিন্দু-মেলার প্রবর্তক। প্রায় বছর বোলা বলিয়ে তার মাঝে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা মনোভাব সৃষ্টি করতেই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। দেশপ্রেমমূলক সংস্কৃতি ও কবিতা পরিবেশন, বক্তৃতা, ভারতের বয়ী, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেরণ ও দেশীয় শিল্প ও কারিগরী চিনিদের প্রেরণী ছিলো হিন্দুমেলায় প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে মোট চৌদ্দবার হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। শেষ অবিশেষের পরে গঠিত হয় হি ভাণ্ডারাল সোসাইটি।

জু বাংলা দেশে নয়, মহারাষ্ট্রেও জাতীয়তাবোধ আত্মপ্রকাশ করে। আর তাই হোতা ছিলেন বাল শিবায়ন তিলক। তিনি-শিবাজী উৎসব ও শ্রবণতি-পূজা প্রবর্তন করে জাতীয়তাবোধকে লক্ষ্যবানী করেন।

বাংলা দেশে জাতীয়তাবোধের বিকাশের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যের অবদানও সামান্য নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মাঝে একসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের দেশপ্রেম

মূলক বাংলা অতীতপূর্ব পরিত্যক্ত দেশ। সেই বহিঃশক্তির রচনা, তাঁর 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' ইত্যাদি উপভাষা ও বহুসংস্করণে মিলে।

উনিশ শতকের মধ্য বর্ষ আন্দোলন জাতীয়তাবাদের এক নতুন রূপ দেয়। প্রায় সমস্ত ও আর্য সমাজ ভারতবাসীর মনে জাগিয়ে তোলে আপন ঐতিহ্যের প্রতি প্রভা ও আত্মনির্ভর। রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেন ভারতীয়দের স্বাধীনতা বহু করে তাদের মনে লক্ষ্যিত করেন নতুন দিনের, নতুন জীবনের, নতুন ইতিহাস রচনার আকাঙ্ক্ষা।

ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের নাম সর্বপ্রথমে লিখিত থাকবে। ১৮৯০ সালে চিকাগো শহরে অচলিত বর্ষ মহাশয় প্রথম তাঁর অগ্রগত ধর্মী বিবেক ভারতের মান যে উন্নীত করেছিলো তখন তা নয়, স্বাধীন স্বাধীন ভারতবাসী নতুন করে শিখেছিলো স্বাধীনতা গাশে বহু থাকলেও সে অদৃশ্যের সত্য, যেখানে ছিলো আত্মপতির উদ্বোধন লক্ষ্য হলে অচিরেই চূর্ণ হবে দেশ-জন্য বহু নৃশূল। এমনি করেই আমাদের দেশে তিনি স্থাপিত হয়েছিলো জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদের। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর নিবেদিত অগ্রগত পরিচয় ও আত্মদানের দ্বারা জাতীয়তাবাদের মনে জাতীয়তাবাদ বহু হলে। এবং ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বোপিত হয়। কালক্রমে সেই বীজ মহামহীকরণে সমস্ত ভারতবর্ষে লক্ষ্য প্রসাধ্য বিস্তার করে। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও পত্রাবলী পাঠ করে পরবর্তীকালে বাংলার তথা ভারতের মুক্তকণ্ঠ উদ্ভব হয়ে দেশকে স্বাধীন করার মহান ক্রমে আত্মনিয়োগ করে।

এই প্রদর্শন স্বামী অতঃপর স্বাধীনতার নামে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুতাই স্বামী অতঃপর জাতীয়তাবাদের নির্দেশে পৃথিবীর প্রান্ত সর্বত্র বিশেষ করে আমেরিকায় ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার করে ভারতকে গৌরবের আলনে প্রস্তুত করে পেয়েছেন।

বিবেকানন্দের পত্রাবলীস্বরূপ করে তিনিও দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবাদের জাগিয়ে ছিলেন তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব দ্বারা। আমেরিকা থেকে একদা কলকাতায় এসে স্বামী অতঃপর স্টার বিয়েটারে এক জালাবদী বক্তৃতা প্রদান করেন। তার সেই উদ্ভটমতী ভাষণ শুনে দেশপ্রেমিক কানাইলাল বসু এমনি উদ্ভট ও অপ্রত্যাশিত হন যে তারপর তাঁর জীবনের মোড় ফিরে যায়। এবং তার ফলে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি হয়ে অপর কীর্তি লাভ করে গেছেন।

কিন্তু জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা যে বহু একদিন লক্ষ্য দেশকে গাথিত করেছিল তার উৎস হল—সেদিনের রামকৃষ্ণ দিশন। সেবা থেকেই এলোছিল স্বাধীনতার আবেগ। একদিন যোহাই শহরে হাজারের এক মহতী সত্য ঐশ্বর্যবিশ্ব বসেছিলেন, যেদিন তখনকার হিন্দুধর্মের ঠাকুর ঐশ্বর্যবিশ্ববিশ্বের আবির্ভাব হয়েছে সেদিনই বৃন্দাম ভারতের স্বাধীনতা আর খেঁচি মুখে নয়।

পুস্তক সমালোচনা

নিঃ শেষে গ্রাণ ে করিবে গান কর নাই তার কর নাই—এ শুধু কবির কথোক্তবা বা কথাবিলসে
নয়, আত্মিক জীবনে প্রমাণিত একটি অবগত প্রত্যয় বাহ্যে বাহ্যে প্রত্যক্ষ অস্তিত্বতা
হয়েছে স্বর্গে স্বর্গার, ভূতিকে স্বর্গার, স্বাক্ষরার্থে স্বপানে, রাষ্ট্রবিপ্লবে। নেতাকী সূতাব্যক্তের কাহিনী
তারই স্বরূপ, তারই স্রষ্টা, তারই জীবিত প্রতীক, স্রষ্টাব্যবস্থার মনসিক ভাবার হাতে বলা যায়—
legend and symbol। ইতিহাসের চলৎপ্রক্রিয়ায় ঘটনার চক্রবৃত্তিতে, আত্মিক জীবনের এক
অন্তিমপূর্ণ সত্যিকণে এরনি একটি পুঙ্খ-প্রবর্তকেই বোঝে হয় তারত ইতিহাস ভাগ্যবিধাতা খুঁজছিল।
মনে পড়ে বহুসংসার ভগ্নায় হতে স্রষ্টা স্বীকৃত্য একদিন তাঁর সারস্বত ভগ্নভার স্রষ্টার আসন হতে
স্রষ্টাব্যবস্থাকে নন্দতার জামিয়েছিলেন যে ভূমি বাক্যে শুধু মেশবৎ নয় অবশ্যস্বার স্বাক্ষরিত।
সূতাব্যক্ত সত্যকে সে কথা বলা যায় যে তিনি মেশের হয়ে অসুস্থ আশায় সত্যের সৌন্দর্যপূর্ণ প্রকীর্ণ
ভাবায় “পূর্ণ স্বরূপে থাকে তব। জীবন উজ্জীবন”র পূর্ণ অবিকার চেয়েছিলেন। লেখক গিটই বলেছেন
যে সূতাব্য-প্রচেষ্টা বিপ্লবের নতুন ভাষা, শুধু স্বাক্ষর-লেনিনের মতও নয়, খুঁজা স্বাক্ষর পথও নয় (পৃ ১০১)
অকপ্রজ্ঞার বিলম্বভূমি স্বাক্ষরভারের প্রজ্ঞা বনভগ্ন।

উদাহ-চিত্রা প্রজ্ঞা-আলোকে আত্মিক সত্যের (পৃ ১১)

মেশিতে মেশার মর-মারামের পরম স্রুতিটিকে (পৃ ১০১)

প্রকৃতির স্বাক্ষরে মেশি মুদ্রণ হবে ভাল থেকে কালান্তরে গড়ে বিস্তার স্বাক্ষরকার অলম্বনের
মর্ম সোনার সোণ বিধে হৈকে যায়—সোণ যে দুয়ার খোল—কিন্তু সে স্বাক্ষর কালের সত্যের মরমে পলে
ক’জনায়?

ব্রিটিশ-চক্র শোষণের কারাগার

ব্রিটিশ-স্বার্থে পুঁজিগতির স্রষ্টার বারবার (পৃ ০১০)

সূতাব্যের মন অস্ত্রার নারি গড়ে, সারের স্রুতি তাঁর ব্যানে ভেলে ওঠে—মা যা ছিলেন, যা এখন
যা। ভেলে ওঠে সূতাব্য। কোটারাকী স্বাক্ষরিতস্রুতী কথজীব স্রুত। কিন্তু তাঁর সত্যতা তো—মা যা হয়ে—
বক্তব্যেমানিনী জ্যোতির্ময়ী। তাঁর পথ—জীবন পথ নয়, আয়ে। কিন্তু—ভক্তি—যে ভক্তি উৎস্রুতী অসি-
শিবা, ভক্তি হতে যায় ইতন। তবানী স্বাক্ষরের পরিকল্পনায় এই কথাই বলেছিলেন স্রষ্টাব্যবস্থ।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাত্মক এলেন্দিল—তান হাতে দাঁত বক্স এনে দী লাভ করে খেতাবদণ্ড, কিন্তু সে বক্স কেবলকবি ভুলখোলেরতায়ার—

কত দুসের কত হোমের শিবা

এই ে দাঁত কয়কুনি, এই বে আমার নুকে

ভাবতবর্ষ—বাক্যবিশেষে পোষিতভক্ত্য।

নেতাজী হুতাশের শেষ চেষ্টা—

আজাদ হিন্দ কৌল শক্তিহ আশ্রয় উত্তাপে (পৃ: ৫০৪)

নব পত্নীর আশা-আশ্বাস মানস-অভ্যাস (পৃ: ১৭২)

কিন্তু তারও ভিতর আছে শিব-শিবানীর মহাব্যাক্তির দ্বিধি-সাধন—

জৈবদী আবার দ্বিতীয় মাদুরীও (পৃ ৫২৬-৫২৭)

এই আশুমা, এই প্রতীক, এই দীপ মুক্ত মহাকাব্যে চিত্র তরে নিয়ে তাকে কেন্দ্র করে এক বিরাট চিত্র ঝাঁকতে চেয়েছেন সুপদী কবি শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য। তিনি ইতিপূর্বেই আমাদের তসিয়েছেন পাকীকীদান পাখি, নিয়ে গেছেন নব নব চারণক্ষেত্রে, মহার্ণবের ধারে সমুদ্রতীরে দীঘার, চট্টগ্রামের জালালাবাহে। মহাকাব্য দেখা লক্ষ, কিন্তু সেই এশিঙ্ক মনকে প্রতিষ্ঠাত করা প্রায় হু:সাধ্য। কালীদাসদ্বারা সেই অসাধ্যসাধন করেছেন। তাঁকে আমরা সাধুবার জানাই। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথমধূপ হতে আজ পর্যন্ত আর্থার, হউনিসিন্ রামরায়ণ, সুপদাও, সাবিত্রী প্রভৃতির কথা ও কাহিনী নিয়ে কতো গুরুপতীর মহাকাব্য রচনা হয়েছে। কিন্তু আজ প্রের টেরেই যে মহাকাব্যের দিন কি ছুরিগেছে? এখন গতিত যুগ, প্রগতির দিন, সে দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস নেই, কীবনে এসেছে বহু সমস্তা বহু শিবা, কীবিকার কল্প হারাকার। এখন কি আর বসিয়ে করিয়ে গুয়ে বলে তাহে ভাবার মহাকাব্যের কল্পনাবিশাল চলে, সে সময় নেই, সময়ও নেই, নেই যেনে উজ্জ্বলী আভিভাষ্য, নিবিধ্যাসন্। যখন বেখি সুবস্রবার নামে কীবনবোধের ব্যাখ্যা হিসাবে হাজার হাজার পাতার ভব্যকবিত উপস্থাপ কাদিনীকাকনের রাজকীক। পরে সপর্বে সপৌরবে সাহিত্যক্ষেত্রে “সিমরোলাস” গোলাভে—তাড়, তাড়, তাড়, কাহা আঘাতে আঘাত কর—তখন তাবি আন্যেহের অপরিমিত মন বা অঙ্ক ভষ: প্রদিশক্তি’ সে কী আর উতান হবে আদর্শবাদের আশ্রমিষ্ট উপাখ্যান? তাই লতয়েই কালীদাস ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টাকে বেনখোই অভিব্যয়ন জানাই। লরখতীর কনকমনের আত্মহুতু গীর বান যদি না হয়, তবে বলবো, এই বাঙ্ক আগে কই আর। নাহুয়ের জৈব বিকায়ে বা বাটেছে তা যেমন সুপদাবে লতা, কামল ইতিহালে তার যেমন দায় আছে তেমনই বা বাটেনি, বা বাটা উচিত ছিল, বা বা আন্যেহের অন্তরেহ অন্তরতম মিতুতে রোমন করেহে প্রতিকায়েহ আশার, যে আদর্শ শুধু ‘হুদি’ বা ‘ইকস’ নয়, নাহুয়ের জৈব আলেবোর পিছনে অন্তরতমের সোপান তার প্রতিপাদনও যে বহুকার। একজনও যদি গড়ে তাও ভালো, কারণ কে জানে কোন সময়ক্ষেত্রে সে বীজ উর্বর হবে, সুপদলে গলেই বনপ্রীর ভাবাকল ভবিতো দিতো পার্থক্য হবে।

জানি, এই বিরাট কাব্যে নিয়বন্ধ ও অগ্রপ্রেরণা হাড়াক আছে হুনের খঁচার, ভাবের বিভ্রাল, জগদ্বাদের চিন, কল্পনার প্রাচুর্, চিত্তার প্রবরতা, অসীম বিজ্ঞার আর তাবের পাকীক। কাব্যের

প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য ও ধারণা দিয়ে বিচার করলে এর মধ্যে কিছু অসঙ্গতি দেখা দেবে। আর এটিও কৃত্তিকার তুলতে পারেন। এক কথায় ভিত্তি ভিত্তিমূল করা যায় যে আশ্চর্যের মূলে এ ধর্মের কাব্য শুধু 'archaic' নয়, কিছুটা অচল। সেবার ততী ও রচনাবৈলী মূল্যমানকে প্রতিফলিত করে কিনা এ বিষয়েও তর্কের অবকাশ থাকতে পারে, বীর্ণগরিবি কাব্যের স্বরূপ সন্ধান দাওয়া দৃষ্টি করে ইত্যাদি। কিন্তু ইয়া এইসব কথা বলেন তাঁরা তুলে যান যে আশ্চর্যের বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার পাঠক সৃষ্টি সহকার, কণ উল্লেখ্যমাত্র চাট্টিয়া মেটানোই জীবনের সব চেয়ে পুণ্যকর্ম নয়। রসোত্তীর্ণতার মূল্যনির্ণয় (values) পাঠকের প্রবেশ মনে নিবিধ্যমোঃ। সেই পাঠকগোষ্ঠী চৈতন্যী হোক বাসেব মন আপাত মনুষ্য চক্ষুর্বা অস্ত ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি সাধন বা মনোমস্তব সোজেনোঃ। সত্যের কাকন মূল্য বা অস্তরূপ সন্ধিলাভই বাসেব কাছে সাক্ষ্যের শেষ কথা। হবেনা, থাকবে কিছু তার পরেও যখন অজ্ঞান মন প্রস্তুত হবে ততঃ কিং। কাব্যের সাক্ষ্য বর্ণন ইতিহাস ও সাধনার কিছু তথ্য, তথ্য, ও মূল থাকলেই কি মহাকাব্যের অস্তিত্ব হয়? একমুখ ইতিহাস প্রাণাভ্যাস ভাষ্য পুণ্যকর্ম কেন্দ্রে করে এই কাব্যের বিচার গরিবি স্বরূপ করলে লেখককে স'মুদায় দিতেই হয়। আমি শুধু মনে রাখাও প্রিয়বিশেষ কথা—When it is not understood, it is because the truths it expresses are unfamiliar to the ordinary mind or belong to untrodden domain. It expresses a vision by identity i.e. by entering into it.

একটি মহাকাব্যের মহাপ্রবেশের প্রবেশাবিকার লাভ করেছেন ও সেই অবস্থাকে সৌভাগ্যবশত চিনিছেন এই কৃত্তিকার নৌব প্রবেশ প্রকাশ্য ভাষ্যমূল্যের।

ইলাহী যে মূর্তে হংসীন যমানী

আজ্ঞা কর মূর্তকে ইলাহুতে মানী

যে ইলাহ লাভ আমাকে বর্ণোন্মত্ত ভাষা

সেই সাক্ষ্য দাত তার জ্যোতির্ময় আশা।

শ্রীমুখ্যশ্রেষ্ঠমহোদয় ব্রহ্মসংঘ

• আজাদ হিন্দ নেতাজী (মহাকাব্য) প্রবেশ—শ্রীকালীপুর ভট্টাচার্য

দ্বি ইতিহাস ইকনমিষ্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১০। মূল্য দুটি টাকা।



স্বলেথা
ঐতিহ্য
যেথ
•
বিশেষ
সমাল দ্বিত

স্বলেথা

ভাট্টাউল পেল-এর অঙ্গি

এই লব্ধ পেল।
ই. হ্যাথ • ই. হ্যাথ • ই. হ্যাথ
হেড • গ্রীন • জার্মান
স্বলেথা ওয়ার্কস লিমিটেড
স্বলেথা পার্ক, কলিকাতা-৩২



Pragmatica SVV-518



কোলে

▲ ডেনিস

▲ অ্যাসটেড

লজেন্ড ও টফি

স্বপ্ন • প্রত্যাশা • চিত্র • উদ্দেশ্য
 সত্য • চিন্তা • কল্প • স্বপ্ন
 আশা • কল্প • সত্য • চিত্র
 উদ্দেশ্য • প্রত্যাশা • স্বপ্ন • সত্য



কোলে চিট্র কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
 কলিকাতা-১০

শেড়া..... কাটা..... শোকার কল

এই সব ঝুঁকির

ছুঁচটনায়



শিশুর কোমল ত্বক
পুকেও নিরাপন্ন
দাগ লাগে না



এ্যাক্রিসেন্ট

নিরাপন্ন ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবদ্ধিত এ্যাক্রিসেন্ট মল
সকল প্রতিরোধক
সুস্থ অরামদায়ক

বিশ্বব্যবসায়িক কোম্পানী



১৮৮২

সাল থেকে

ঐতিহ্যের একটি
সৌন্দর্যের ধারা
বহন করে চলেছে



বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস

৮৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ডাবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭১২৪৮

মোকদ্দাস প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা
ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার
সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত খোলা
থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্কাধিকার :-
বীরেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বপ্ন
সত্য
হলো



এখন তিনি জন্মলী। প্রায়োগে প্রস্তুত হওয়া
'সাধনা অশোকারিষ্ট' নাম অটুট স্বাস্থ্য
কিভাবে এনে তাকে জাতি জনমীর গোহবে
প্রতিষ্ঠিত করেছে।



সাধনা অশোকারিষ্ট



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যাপক ডোমেনগো বোব,

এম. ডাক্তারগারী, এম. সি. এস.

(লন্ডন) এম. সি. এস. (মাদ্রিদ)

ডাক্তার অস্কার অগাস্টো

ব্রুসেল, বেলজিয়াম

কলিকাতা-কেন্দ্র

ডাঃ মহেশচন্দ্র বোস,

এম. বি. সি. এস. (কলিকাতা)

পারুঝাঙ্গা,

25 DEC 1971

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের
আধার



লক্ষ্মীঘি

বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত খাদ্য

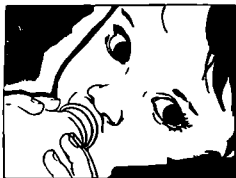


গল্প-ভারতী

ত্রয়োনিংশতিতম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ অক্টো ১৩৭৪

এই সংখ্যার আকর্ষণ—

বাক্য সংকটের সমাধানে—নাংলার মহিলা সমাজে
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বক্তাবলী (উপস্থাপন)
চলতি প্রিয়া
ব্যাপার যা চলছে
অন্তরীক্ষে
এই প্রথম



শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য

লিলি বাবলি

বিজ্ঞান সম্মত
প্রাণীকৃত
একক



সুস্থ, অসুস্থ
সব অবস্থাতে
সমন
উপকারী

লিলি বাবলি মিলস প্রাইভেট লিঃ কলিকতা-৩

ঘরে বাইরে যেখানেই

বেশভাষাই আপনার
মর্যাদার পরিচায়ক



ভারতের সিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলংকার।



আমাদের রূপস্বক শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী মানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অকুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কনজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে,
মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে

নিম এর উপকারিতা
হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে হিতকর বস্তুগুণ পরীক্ষিত
মহোপকারী **নিম** -এর মৃত্ত অথচ সক্রিয় উপাদান-
গুলি **নিম** টুথ পেস্ট-এ আছে। তাছাড়া
নিম টুথ পেস্ট-এ রয়েছে 'ফ্লুরাইড' এবং
আধুনিক দন্ত বিজ্ঞান সম্ভবত অস্ত্রাস্ত্র উপাদান।
নিম টুথ পেস্ট-এর হিতকর কেনা মাড়ী সবল
করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁতের ক্ষয় ও প্যারোডিয়া
নিবারণে সাহায্য করে ও দাঁত স্বচ্ছ করে।

নিম টুথ পেস্ট-এর সর্বগুণ সমন্বিত মার্গোফ্রিস
টুথ পাউডারও পাওয়া যায়।



ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কর্পোরেশন

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

খ্রিঃ ১৯৭৩, SEPTEMBER, 1967

মোটাবিৎসপতিঃ ৭৭—৩৪ লংখা



প্রতি লংখা—এক টাকা
বার্ষিক লংখা টাকা

সম্পাদক লৈলজানক লুখোলাখ্যাত
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ লুখা

ঐহুখাও লুখা লুখা তৌলুতী কর্তৃক ভারতী লাহিতা লখন প্রাইভেট লিমিটেডের লক্ষে
২৭৩ বি, চিহ্নলললললললললললল, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও লললল প্রেস, প্রাঃ লিঃ,
২, লিখলালললললল লেন, কলিকাতা হইতে লুখিত।



আমার সারাদিনের साथী

লডেব জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা
মনোহর লডেব মুখে পড়লে শরীর ও
মন মিটি বসে ভরে যায়। মনে হয় যেজিউ
এক বয়সে বাই।



লডেব

লডেব ও টফি

জেম্‌স লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ

৬ লি কা জা - ১



**NATIONAL RUBBER
MANUFACTURERS LTD.**

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED
AUTOMOBILE TYRE COMPANY

**THE HOUSE OF
NRM**

THE LARGEST MANUFACTURERS
OF INDUSTRIAL RUBBER
PRODUCTS IN INDIA



**Inohok Tyres
Limited**

1952/53

এই সংখ্যায়

•

সম্পাদকীয়

ভবিষ্যৎ কথা

দুর্গত মহাদেশ (কাটুন)

বজা বজা (উপহাস)—অভিন্যাক্ষর সেনগুপ্ত

এ এক অজ নদী (গল্প)—সমর বসু

পিছনের আনন্দ—কটকেশ্বর শর্মা

আনন্দ ডায়মন্ড
ক, হোডের
প্রসাধন সামগ্রী

ক. বার ২৩ ক্রাং • কলিকাতা - ১০

শেফা কাটা শোকার কাল

এই সব আকস্মিক

দুর্ঘটনায়



শিশুর কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
ভাগ লাগে না



হাতের কাছে
রাখুন

এ্যাক্রিমেন্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চরিত্বজিত এ্যাক্টিসপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সর্বত্র আত্মায়দায়ক

বেকল ইন্ডিবিট্রিন তৈরী



এই সংখ্যায়



বঙ্গ ভঙ্গ (গল্প)—সুনীল চক্রবর্তী

তুই বাঘের লড়াই—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুপ্তচর কাহিনী

রহস্যময়ী—গৌরীশংকর দে

বিজ্ঞাপন বিচিত্রা—মৃদুলায় ভরদ্বাজ

মটমক—রত্নাকর

বেগমদাস তুয়েস্‌ নিত্য পরিচর্যা

হিমালী গ্লিসারিন সাবান

নিৰ্বৃত্ত ও যক্ষণ স্বক সৌন্দর্যের
মাশ-কাঠি। বছরের প্রতিটি দিনেই
এর পরিচর্যা করা উচিত। উপযুক্ত
উপসাহায্য প্রস্তুত হিমালী
গ্লিসারিন সাবান স্বকর লাভ্য
ও যক্ষণতা বাড়ায়।



হিমালী

প্রাইভেট লি:

কলিকাতা-২





উন্নততর জীৱন কল্যাণৰ প্ৰদায়ক অসমতৰ আলো

অসমীয় নিগমত প্ৰতিটো লক্ষ্যৰ সন্ধান হৈছে জীৱনৰ প্ৰতিটো
আপোনাৰ ঘৰৰে অসমতৰ আলোৰেই হ'ব। অসমত
নিগমৰ প্ৰতিটো আলোৰেই আপোনাৰ ঘৰত
আপোনাৰ আলোৰেই আপোনাৰ আলোৰেই
আপোনাৰ আলোৰেই আপোনাৰ আলোৰেই

S&C
Osram

একটি আলোৰেই আপোনাৰ

S&C আপোনাৰ
আলোৰেই

স্বদেশী

গল্প-ভাৱতীৰ দ্বিধা লেখক

অমৰেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়ৰ

বহুপ্ৰশংসিত ২৫নামী

৥ সত্য প্ৰকাশিত ৥

চালি চ্যাপলিন (আন্তৰ্ঘ আত্মকাহিনী) ৩.০০

গল্প-ভাৱতীতে প্ৰকাশকালে যে ২৫নাম পাঠক-
মহলে বিপুল ঔৎসুক্যৰ সৃষ্টি কৰেছিল।

অন্তঃস্থ এষ :

ঘাট্টা হ'ল শুভ (উপন্যাস : চলচ্চিত্ৰে স্থাপিত :

৩য় সংস্কৰণ) ৩.১৫

নব নব ৰূপে (স্বতন্ত্ৰ গল্প কাহিনী) ৩.৫০

বীৰবল ৰজ (আত্মকাহিনীৰ সত্যৰ বীৰবলৰ

বিশ্বকৰ বুদ্ধিমত্তাৰ কাহিনী) ৩.০০

আত্মকাহিনীৰ পৰমৰূপ (উপন্যাস) ৩.০০

পুৰণিগৰ (গল্প) ২.৫০

বিশ্বকাহিনী (গল্প) ২.৫০

হে মহাভাৰত (মনোবীৰ্যৰ গল্প) ৩.০০

স্বপ্নৰ প্ৰদীপ (বহু উপন্যাস) ২.৫০

ভাৱকাৰ দ্বন্দ্ব ও কালবাৰি (৪টি বহু উপন্যাস

একত্ৰে) ২.০০

স্বাৰাজ্য ও স্বাধীনতা (.) ২.০০

কালো কালো ছায়া (বহু উপন্যাস) ১.৫০

ভিন্ন সৰ্গ (পিয়ানো, মেলোডী, স্ক্ৰিপ্চাৰ্ণ)

(নাটক) ২.০০

নবনাট্যৰূপে গিৰিগুপ্তৰ স্বাধীনতা (নাটক) ২.৫০

নবনাট্যৰূপে বিজয়লাল ৰায়ৰ স্বাধীনতা (.) ৩.০০

Carey's Good Old Days (সম্পাদনা) ১৫.০০

Glimpses of the Olden Times (.) ১০.০০

: অন্তৰ্ঘ :

কেৱল সাহেবৰ কলকাতা (কোশানী আত্মকাহিনী-ৰূপে গল্প-ভাৱতীতে প্ৰকাশিত)

Echoes from Old Calcutta (সম্পাদনা)

গল্প-ভাৱতী কাৰ্যালয়ে অৰ্থাৎ পাঠালে উদ্ধৃতিত বহুপ্ৰশংসিত গল্প-সংকলন কৰা হৈছে।

গল্প-ভাৱতী কাৰ্যালয় : ২৭২/বি, চিত্তৰঞ্জন-আবেদন, কলিকাতা-৬

এই সংখ্যায়

৬

চলতি দুনিয়া

জায়াবাণী—চিত্রমিত্র

খেলাধুলা—ক্রীড়োত্তির

একটা আদম জাতির উপকথা—নির্মল দত্ত

বাণীর যা চলছে—চক্রপাণি



আপনার কেশজঙ্ঘ
দীর্ঘ সুন্দর তপস
আপনাকে রূপ-লাবণ্য
উজ্জ্বল করাব
বেঙ্গল কেমিক্যালের
স্বাস্থ্য

তিল তৈল

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা • কেমারি
কামরূপ • দিল্লী



। কলকটী সাম্প্রতিক প্রকাশন ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের এবার প্রিয়স্বপ্ন

বিভূতিভূষণের সাংস্কৃতিক অধিবেশ উপন্যাস "এবার প্রিয়স্বপ্ন" ময়াকবি তারিখসম্বন্ধে "অভিজ্ঞান শতদ্বার" নামে কোণার বেহা মিল আছে এই অধুনিক প্রেমোপাখ্যানে। হিন্দু সতী (মিশ্রনাথের ভাষায় ও পী. মাসকেটিচাঁদ, অথবা শতদ্বার, প্রিয়স্বপ্ন ও অনন্য) বহন, মলিনা ও কলকটী উপন্যাস নিকারী নায়ক মোকেশ ও মিশ্রনাথকে নিয়ে এক আকর্ষণীয় পরিবেশে মল্লিকা-কলকটী বহনের বিভিন্ন ভাবে ও বিবাহের উপলক্ষ্যে কাহিনী ছুটিয়ে তুলেছেন মুখোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ তাঁর মতো লেখক। ●মূল্য: ছয় টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর মাত ভ'য়ে ঘুঁড়ি

একটি নিখুঁত বর্ণনামূলক এবং অস্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতা পালাপালা করে মনে-মনে বা' ভাবে, তাই নিয়ে কথাবিশিষ্ট বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় সমস্ত বিবাহিত জীবনের কার্যকর কাহিনী গড়ে তুলেছেন অতি দৃষ্টিভঙ্গি, পরোক্ষভাবে তাদের মন ঘুঁড়ি খুলে ধরে। স্বাভাবিক গভীর মনঃস্বল্পক উপলব্ধি বাহ্যিক সাহিত্যে এই প্রথম।

●মূল্য: পাঁচ টাকা ●

ভবানী মুখোপাধ্যায় অনুদিত কার্যাবলীর ছোট গল্প

যে ভবানীর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি বিশেষ মনকে প্রভাবিত করে মুগ্ধিত করে রেখেছিল তাঁর সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ছোট গল্প দ্বিহীন মধ্যযুগের কালে। ১৯৪৭-এ, যুদ্ধের অবসানে বেহা গেল, শুধু ভবানী নয় তাঁর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদ বিলুপ্ত। মধ্য ভবানীর সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে অবদান ঘটল যুগোপিত সাহিত্যের ঐতিহ্যে। যে ভাবের বিপর্যয় ঘনিষ্ঠে এসেছিল তাঁর। নতুন যুগের লোকদের হঠাৎ পাওয়া গেল এক মূগ্ধতার মানবতা-বোধের পরিচয়, কোর করে ঘাড়-চাপানো যুদ্ধের অভিশাপের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুগ ও বলিষ্ঠ প্রকাশনকর্তা। আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তিসম্পন্ন যুদ্ধের যথার্থ্যিক ভবানীর কয়েকজন প্রতিনিবাহনীয় লোকের ছোট গল্পকে, যুদ্ধের মাধুর্য অগ্রহে, অনুবাদ করেছেন লক্ষ্যপ্রতি অনুবাদক ভবানী মুখোপাধ্যায়।

●মূল্য: ছয় টাকা ●

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ৥ ১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ইংরেজী কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ

Nimbus PUBLICATION
A POCKET BOOK
OF SPOKEN ENGLISH
By N.B. Das



এই বইটি
এক প্রকার
সহজ ও
সুন্দর
ভাষায়
কথন
শেখানোর
সুযোগ
দেয়।

Nimbus PUBLICATIONS
22, LATAPAT ROSSARI LANE, CALCUTTA

। সাহিত্যের খবর ।

গল্প-ভাবগত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হওয়ার কালে যে-লেখক পাঠক-পাঠিকা মহলে সত্যিকারের চাহিদার স্বীকৃতি করেছিলেন—মাসের পর মাস করে যে-লেখককে স্মরণিত করে বাংলা সাহিত্যের পাঠকবৃন্দ অনেক অনেক চিঠি পঠের আদান-প্রদান করেছিলেন বনামগত সাহিত্যিক এবং সম্পাদক উপেক্ষণ্য গল্পোপাখ্যান সম্পর্কিত সেই স্মৃতি-স্মরণিত কাহিনী:

অমলকুমার ভট্টাচার্য

একজন আর কয়েকজন

শ্রীঅমল প্রকাশিত হচ্ছে।

আপনার লাইব্রেরীর জন্য আজই অর্ডার দিন।

৥ ডি. এম. লাইব্রেরী ৥

৪২নং বিধান সরনি, কলিকাতা-৬

॥ এই সংখ্যায় ॥

মেঘে-মজলিশ

বিকল্প খাজ বাবুজায় মেয়েরা—বেলা দে

হাসি মুখে খেতে হবে—শান্তি ভট্টাচার্য্য

এই প্রথম

প্রেমের ঠাকুর—জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক সমালোচনা—



উত্তরের ঠান্ডিয়া
রক্ত বাতাস
ঋতাবিক জাবে ধলে পড়ে

সুসমা

ট্রান্সপারেন্ট
মিসারিন সাবান

সি, শেট এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India



আমি 'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করে দেখেছি
লভ্যই ইহা বিত্ত ও স্বাস্থ্যের।

ওঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করে দেখেছি এটা ভাল
জিনিস।

ঐতুহারকান্তি ঘোষ

লক্ষ্যক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সুযোগ হইয়া-
ছিল। ব্যবহারে পরিষ্কার হইয়াছে। এই
কেন্দ্রের বাজারে এরূপ বাটি ও সুস্বাদু ঘৃত
সংগ্রহ সৌন্দর্যের ব্যাপার।

ঐশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি।
এই ঘি বাজার চমুটি উৎকৃষ্ট ঘূতের অল্পতম,
কনসাধারণ নজরে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

ঐবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্যক—বুদ্বাজ

'লক্ষী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার
এচলিত সাধারণ ঘূতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে
ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া
দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন
আশা করা যায়।

ঐআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া লভ্য হইয়াছি।
বহার আর ও পদ ভাল।

ঐসীতা দেবী

'লক্ষী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি,
ইহাতে প্রথম বাজারের ঘি ভাল ও
সুখোরেচক হয়।

ঐশান্তা দেবী

মূলেখা
ঐতিহ্য
সময়ে
ও
বিদেশে
সময় স্থির

মূলেখা

ফটোকপি পেন্সিল কলম

এই পেন্সিল প্যাকের :

হু. হালক • বহাল হু • হালক
১৫০ • ৩০০ • ৬০০ • ১২০০

মূলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
মূলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩১



Programme 1974-75



কোলে

▲ ডেতিম

▲ অ্যাসটেড
লাজন্ম ও টফি

এক = দু'পয়সা মূল্যে উৎকর্ষশীল
সুস্বাদু ও উপকারী কলে, কলে,
জাম্বল ও কফি পেস্টের টিফ।
উৎকর্ষ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অমূল্য।

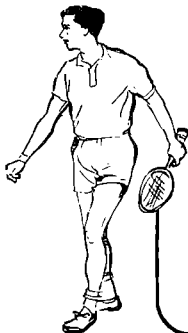


কোলে বিট কোম্পানী লিমিটেড
কলিকতা-১০

পাইওতীয়ার গেজী

সুন্দর ও সকল বয়সের
উপযোগী।

গেজী • কোল • রেবী • গার্ড • পাইওতীয়ার
কল • হাইট-বাই • লিফটার-বাই • "গার্ডিয়ান" •
লিফট • প্রকার বাসিটের • ইজানক •
উইন-টের • "পাইওতের" ও অনেক অর্ডার বিতঃ
বাছনর পাওয়া যায়।



দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেবিস সার্ট • চেব সার্ট •
ড্রয়ার ও ডীক প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে
থোত ও প্রস্তুত।

পাইওতীয়ার লিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওতীয়ার বিল্ডিং, কলিকতা-২

এবারের শারদ সাহিত্যের
সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

গল্প-ভারতী

অভিন্ন পরিকল্পনার সম্বিষ্ট। শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকার রচনায় সমৃদ্ধ। বহু নতুনতর
চমকপ্রদ বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ এবং বহু চিত্র-শোভিত।

ঊঁরা অর্থ সাচ্ছিন্নহীন তাঁদের ঘাণে আছেন :

ঐজীলীষ ছায়বীর্ণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়,
আলাপূর্ণা দেবী, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী রায়, মহাশেতা দেবী, মরেন্দ্র মিত্র, সুমধ ঘোষ,
পক্ষিগারজান বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রামপন মুখোপাধ্যায়, মন্থন রায়, প্রভাত
মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, স্থলেখা দাশগুপ্ত, শক্তিপদ রায়গুপ্ত,
চিত্তরঞ্জন মাইতি, কবিতা সিংহ, সুধাশ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল, বিহুতি গুপ্ত,
খোশাল জৌমিক, ডঃ উমা রায়, ডঃ সন্ধ্যা ভাট্টা, বেলা দে, আভা পাকড়াশী, সুবোধ বসু,
হাসি ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর দে, মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, অনিলকুমার ভট্টাচার্য,
অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

। চারটি উপন্যাস ।

। একটি নাটক ।

। বাইশটি গল্প ।

তাছাড়া এবারের অনঙ্গসাধারণ আকর্ষণ

তিমিটি সচিত্র সংস্কোজন

। যুগে যুগে রূপসাধনায় নারী ।

। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রতারকা ।

। রসমঞ্জের সেকাল একাল ।

এই বিরাট অতুলনীয় গ্রন্থের দাম মাত্র চার টাকা।

ডাক মাওস ৭৫ পয়সা

আজই অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে অর্ডার বুক করুন।

গল্প-ভারতী

২৭২বি, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৪৪-৩২২৪



প্রয়োবিশিষ্ট বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এখন চলছে ১৯৬৭ সাল। আগস্ট মাস পেরিয়ে গেল।

১৯৪৭-এর এই আগস্টেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। অনেকগুলো আগস্ট পেরিয়ে গেছে। অথচ এখনও আমরা স্বাধীনতার আশ্বাস অহুত্ব করতে পারিনি। স্বাধীনতা কেমন বস্তু, স্বাধীনতা আনন্দের না দুঃখের, তাও আমরা জানি না। অনেকদিনের অনেক ব্যাকুলতা, অনেক মনস্তাপ এবং অনেক সংগ্রামের পর যে শুভ দিনটিতে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সেই দিনটিকে আমরা মনেও রাখতে পারি না। অথচ '১৫ই আগস্ট' তারিখ জীবনে একটি চিরস্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে উচিত ছিল।

আজকে ১৫ই আগস্ট শুধু দেখা থাকে ক্যালেন্ডারের পাতায়। মনের পাঠ্য তার কোনও চিহ্নও বেধতে পাই না।

পথে পথে ছেলেনেব মিছিল বেবোয়, রাজভবন থেকে সিম্রণের চিঠি আসে, তারিখকে পৃথকনি হয়, স্বাধীন মাংস মাংস আনন্দের জাতীয় পতাকা টাঙাবার আয়োজন চলতে থাকে, তখন মনে পড়ে—আজ বৃষ্টি পড়েনোই আগস্ট।

কিন্তু কেন এমন হলো?

স্বাধীনতা পাবার পর সুদীর্ঘ ছুটি বঙ্গল—মিত্র কল ময়র ময়।

অথচ স্বাধীনতা পাবার এই ছুটি বঙ্গল পরেও আমরা দেখছি—জনসাধারণের দুর্গতির সীমা নেই।

মাহুদের জীবনে যে দুটি বস্তুর একান্ত প্রয়োজন, আজ যেখানি আমাদের দেশে সেই দুটি বস্তুর একান্ত অভাব। অন্ন এবং বস্ত্র। শিক্ষা এবং চিকিৎসার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পরে রুখে বসলে বৈতে থাকার সমস্যাটাই যে দেশের মাহুদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে ওঠে, বিক সে-দেশের স্বাধীনতার!

যখন আমরা পরাধীন ছিলাম তখন আমাদেরই দেশের এক কবি একটি গান রচনা করেছিলেন।

বনবাতে পুষ্পভরা আমাদের এই বঙ্গল।

.....এমন দেশটি কোথাক বুকে গায়ে থাকে কুসি

কথাটা তখন হস্ত সত্য ছিল কিন্তু আর সত্য নয়।

কেন এমন হলো? অহুত্বান করতে দিয়ে অনেক অনেক কথা বললে।

কেউ বললে, পাকিস্তান থেকে অনেক লোক এখানে এলো, তারা এলো তারা উৎপাদন করলে না কিছু, অথচ খেলে প্রচুর। কেউ বললে, বড় বড় কল-কারখানা তৈরি হলো, দেখানেক লেট একই সদস্য। আবার কেউ কেউ বললে, মাহুদ লম্বাচ্ছে বেশি, বয়সে কম।

এইরূপ মানস সমস্তই অধঃপতিত হইবে পশ্চিম বাংলা আৰু ভাঙ্গাশতাব্দী।

এ সমস্তই প্রতিকার কি ?

দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি—সর্বত্রই কেমন যেন একটা এলোমেলো ভাব।

পোটা দেশের এবং মাহুঘের ঋষির্গদ্যান সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে একমাত্র সাহিত্য। মাহুঘের পবিত্র পরিচয় তার চিত্রশিল্পকে থাকে না, হস্ত-শিল্পকে না। পুরোপুরি পরিচিত থাকে তার সাহিত্যে।

মাহুঘের যেমন চরিত্র আছে, সাহিত্যেরও তেমনি একটি চরিত্র আছে।

মাহুঘের যা প্রয়োজন, মাহুঘকে তা আহরণ করতে হয়। ঈশ্বর তার এই প্রয়োজনকে সহস্রমত্যা করেননি। পতকে গিরোহেন মাঠতরা ঘাস। মাহুঘকে কিছু অন্ন দেননি। অথচ অল্প মাহুঘকে বানের সাহা রোপণ করা থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধি আর শক্তি দিয়ে অনেক কিছু করতে হয়। অনেক জুগে গতে হয়। এই জুগেই মাহুঘের মূলধন।

এই জুগের মূলধনের বিনিময়ে তার নিজের এবং অশ্রুতের কল্যাণের অল্প গণ্ড-সীমাকে অতিক্রম করে নিজেকে অনেক উর্ধ্বে তুলে নিজে গিরে মাহুঘ তার সত্যতা এবং মাহুঘের দৌরব বুদ্ধি করেছে।

কিন্তু আজ কি দেখছি ?

মাহুঘের যে-শক্তি অতীতের ওপর অমী, যে-শক্তি তরুণদের ওপর অমী, এমনকি কৃত্রিম ওপরেও তার আধিপত্য, সেই অশ্রুতের শক্তিকে অপকৌশলে তপস্কৃত করে জুগকে এড়িয়ে মাহুঘ আজ শক্তিমানেয় দ্বারা পাত গতে তিক্তক লোকে বলে আছে।

যে-মাহুঘ তার বিষাদ নৈরাশ্র, তার ও ভাবনার উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মাহুঘের দৌরবে দৌরবাসিত হতে চেয়েছিল, সেই মাহুঘ এখন তার সকল মহিমাকে বিলম্বন দিয়ে নিজের তুচ্ছতম স্বার্থসিদ্ধিতেই চরমতম লাভ মনে করে নিশ্চিন্ত হলো, বাসনাভূমিই হলো তার পরম আনন্দের বস্তু, তখন তার সাহিত্যের চরিত্র হলো উপেকার বস্তু, সংস্কৃতি হলো অতঃসারমুখ।

যে সত্যতা ও সংস্কৃতি ছিল আমাদের পবিত্রতম সাধনা, আজ দুদিনে তাই যেন হয়েছে চটুলতম পরিহাসের বস্তু।

পত লক্ষ্য প্রণাম জানাই যদি বক্তব্যসমূহকে। তিনি মুচিরাম গুড়ের চরিত্র এঁকেছিলেন।

আজ দেখছি মুচিরাম গুড়-ভাতীয় মাহুঘের সংখ্যা অল্প। বাংলাদেশ তো মুচিরামে মুচিরামে ছেয়ে গেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে মুচিরাম, লম্বাক সত্যায়ক মুচিরাম, সাহিত্যিক মুচিরাম, অধ্যাপক মুচিরাম, বিচারক মুচিরাম ব্যবসায়ীর মুচিরাম।

সর্বত্র বিরাজ করছে মুচিরাম। মুচিরামের হস্তবৈশ বহুবার উপায় নেই।

দেশে বসন্তলি পুরকার, বসন্তলি মেডেল সবই মুচিরামের অল্প পরাক্রম। লম্বাক মুচিরামের, লম্বাক মুচিরামের, মুচিরামের অলম্বানে সারাবিশ্ব মূর্ণনিত।

মুচিরামের অলম্বানে প্রণাম। মুচিরামকে প্রণাম। অল্প মুচিরামের অল্প।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভাববার কথা

সদামল

আজ বিপ বহর আমরা বাবীনতা পেয়েছি। এই বাবীনতা এত কাব্য যে তার কণ্ঠে বুকের পর বুপ করে আকস্মিক আমরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছি। পিতা পুত্রকে হারিয়েছে, স্ত্রী-বাবীকে হারিয়েছে। মাতা অমহাঘ আত্মনাশে নিকণ পুত্রতাকে বরণ করে নিয়েছে। কত অলঙ্ঘন কত বেদনা! কত বিশিষ্ট বকনী কত ত্যাগ স্বীকৃতি রয়েছে এর পেছনে! একটা লম্বা আত্মবি জীবনব্যাপী দুতর তপস্তার কলস্রণ এলোছে এই বাবীনতা।

কিছু কোথায় সে প্রাণের বহোলাস? এতদীর্ঘ দিন ধরে বাবীনতা পেয়েও কেন লকে অস্তরে মহাবিকোলের আকারে আজ উঠেছে হাকার খিঙ্কাস? আজ তারতের আকাশ বেদনার বেধে তারাক্রান্ত?

একাত্ত বেদনায় আজ আমরা উপলভি করছি যে আদিক মুক্তিযে উপর যে রাজনৈতিক বাবীনতার ভিত্তি সেই সে বাবীনতা বাবীনতা নয় তা অলম্পূর্ণ-বহর, সে চলে। প্রতিপদে কিছু খুঁড়িয়ে চলে। আর হোচটু বায়।

বেশের এই হানসিক মহা-অনন্তোয় বৃ কবার প্রলোভন দেখিয়ে আজ নানা রাজনৈতিক হল নানা মতবাদ নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই পদম্পর বিছোবী রাজনৈতিক হলের মতবাদদের লংঘনের কলে জনসাধারণের চিত্ত আজ বিকৃত হয়ে উঠেছে।

নিজা মৃতদ হল, নিজা মৃতদ পাট। বিভিন্ন বকমের মতবাদ হলের নেতাদের মধ্যে। মত বিচ্ছেদ বিবোধ আর মতান্তর সেসেই আছে। এদের আগলই বা কি উদ্দেশ্যই বা কি সাধারণ হাছন তা বুঝতে পারিচ্ছে না তারা আজ বিভ্রান্ত। তাদের লামনে কোন মূল্যবিক্রমিত পবিকল্পনা বা কর্মগম্বা সেই—অবচ মুখে তাদের লেনলোবার ও জনলোবার বড় বড় বাণী?

অভ্যবিকে, অভাবো, হুংবে, কষ্টে বেশের সাধারণ মাহুয়ের দুর্গতি চরম সীমায় পৌছেছে। আজ অভাবের তাক্তমায় নিজের কপালে করাঘাত করছে।

যে বেশের মাহুয় বাবীনতা পাণ্ডুর পূর্বে ডবেলা পেট করে বেয়ে অভ্যবিক দেখা করেছে। যে বেশের মাহুয়ের বর্ষ ছিল পরোপাকার ততা, পরের হিতার্থে লব্ব বিলিয়ে দেওয়া। সেই বাংলা বেশের মাহুয়ের আজ কি বিতখনা, কি অভ্যবিক জীবন! হা অর! হা অর, করে আজ আকাশ বিদীর্ঘ করছে। সেই মাহুয় বায় বেশ ও বিবেশে একদিন অর বিতরণ করেছে।

অবচ বিভিন্ন রাজনৈতিক হলের লেদিকে ক্রক্ষেণ সেই তারা। মন প্রাণ দিয়ে বেশের লোভার মদস্তল। বেশ লোভার এমন কামলামান দুষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

দুর্গতি মশনকারী



আরে চারটা বে বেজে গেল তোরা এখনো ঘুমিয়ে ।
শিগগীর একজন যা রেশমের লাইনে
আর একজন যা সিনেমার লাইনে
পল্টু যা ছুধের লাইনে
আর মেজী ও পেটী তোরা হুজনে যা কটীর লাইনে
ওহ্ তাকাতাড়ি ওহ্



শিকারের সময় সার্বভৌমতা!



পরিকল্পনা কেমন জুট এগিয়ে চলেছে ।



এখনও তাইলে ভক্তি শ্রদ্ধা আছে !

বন্যা কন্যা

অষ্টকুমার (স্বনমুদ্র)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[পূর্বকথা : সরসিমা মনুষ্যসত্তার চেয়ে বনছায়া। বাণ বহুলোক লগ্না সত্তাও বনছায়া চাকরি করে, গর উপভোগ লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন বেধে। কখনও বা তাতে মানসিলিষ্ট হই বেবেতু আশ্চর্য সাহিত্যের চেয়ে মানসিলিষ্টমেই বেশি গ্রাম্যার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই বহরম-মহরম করে। সুখীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বহুলোকের মেয়ে পরিবর্তে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাসে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপভাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুখীর যদি লম্বুজের মত উদ্ভাস, সন্দীপ পাখাড়ের মতই দীর্ঘবির। সন্দীপও ছুঁই কিছু আশ্বিনিষ্ট। ব্যতিক্রম যেন তার আশ্বিনে স্থান করতে না পারে সে লম্বুজের সর্বদা লম্বা। সরসিমা যেহেতু স্বপ্নে বিয়াতে যোগ নামে এক কুতী এজিনিয়ার ট্রিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে 'রক' করতে কে এদিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুখীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত বিয়াতেকেই বরণ করবে? বিয়াত্তের বহু আর মুক্তি সেখাণ্ডোতি তৌমিক, যে অকসি বনছায়াই বন, তার মুক্তিও না কোন বনছায়াই বিকে। বনছায়া প্রেমের মত্তে কেবিরর মাটি করবে, না কেবিররই মত্তে প্রেম ?

অতঃপর সরসিমের বাড়িতে টি-পাটিতে নিমন্ত্রিত হল বিয়াতে। বনছায়াকে পাণ্ডী বিয়াবে মনোনীত করল। তার কার্ণে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুখীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল বিয়াতে, সুখীরকে চাবরি বিল। সুখীর ভাবতেই পারেনি এমন অবটন ঘটতে পারে। আর সুখীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের দৌটিপ বিল বনছায়া। এ ব্যাপারে বিয়াতে অচক্যে।

হিমাত্তের সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিড়িয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অতীত হবার সঙ্গে বিয়েটা নিবিয়ে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাত্তের কাছে থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিড়িয়ে নিল বনছায়া। সহস্রলক্ষবান্ধু জানলেন হিমাত্তের নিজের সুবিধের অগ্রেই তারিখটা লগা করছে। এখন বনছায়ার তর তার আগেই স্বধীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

স্বধীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নিবিয়েই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম বিলম্বকেই মনে হল যে যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল স্বধর্ম সহস্রলক্ষবান্ধু এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হইতে গেলেন। বনছায়া কৃষ্ণ পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা পাশ হবেন না।]

॥ প্রণামো ॥

তাকে যে অবশেষে পিতৃগৃহ ছাড়তে হবে এ বনছায়া জানত। কোন মেটেই বা তার বাপের বাড়িতে চিরকালের বাসিন্দা হয়ে থাকতে চায়। বঁদি অবশিষ্ট না বাবা তার সংসারের প্রয়োজনে বোঝাপের মেয়েকে আইনুড়া করে রাখে!

তার বাপের সংসারে তার প্রয়োজন বোঝাপারের অল্প নয়, তার বোঝাপার এ বাড়ির পার্শ্বের সুখের একটা বড় সূত্রীও হয়না—তার প্রয়োজন শুধু এ বাড়ির মধ্যম ব্যক্তাবার কষ্টে। অর্থাৎ সে একটি শাশিলা। বর বরবার ঝড়ি দিয়ে থাকবে আর এমন একজনকে গৌণে কুলবে তার নামে-নামে সমাজ সংসার আলোকিত।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে স্বধীর নিজাত চুনোপুটি। আর তার পক্ষে বত হুজিই দেখানো হোক না, তাকে দিয়ে এ বাড়ির বিজ্ঞাপনের অক্ষর সোনা করাবেনা।

হুজি আবার কী? হুজি ভালোবাসা। নিরাক্ষর আকর্ষণ, দুঃখপারের আত্মান। হুজি সাহিত্যে অগ্রহাগ, সাহিত্যে সমন্বিত। কষ্টে স্নেহে অতাবে গারিহো একেবারে তর না পাওয়ার মনোভাব। হুজি বস্তু, অগ্নির প্রতি লালসা। হুজি, এক কথার, পাগলামি। ভালোবাসার মধ্যে হুজি বোঝাই তো পাগলামি।

হ্যাঁ, বাড়ি তাকে ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু এমনি একটা নাটকীয়তার মধ্যে যেতে হবে, এ বনছায়া ভাবেনি।

স্বপ্ন নাটকের মূলে ঐ হিমাত্ত। হিমাত্তের অতীত। হিমাত্তে অমন বীর্ষ করে হাত না বাড়ালে এমনি-এমনি বিয়ে না করলেও হয়তো চলত।

আবার এরিক স্বধীরও অসুখ। সেও বলিলে সেই করে হবল পাকা না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চায় না। কীভাবে মাঠে বোলা হওয়ার সুবে বেড়ানোর মধ্যে স্মৃতি থাকতে পারে কিন্তু বাত-পানীর সেই আর বাত-পানীর না গেলে শুধু হাওয়া বেয়ে কাক বাহা করে না। হুতরাং স্বধীরের কাছে তার প্রেমকে প্রদর্শিত করার কষ্টেও বিয়েটার প্রয়োজন ছিল। সেও বড়লোকের মেয়ে হয়ে

পারিব কবিরে ভালবাসতে পারি কিনা। তাকে সর্বদা দেবার ক্ষেত্রে ছাড়তে পারি কিনা সর্বদা। এখন বলো তুমি আমাকে কী বলবে ?

শ্রেয়সের পরিণতি শ্রেয় এ বনছায়াও মানে না। শ্রেয়সের পরিণতি বিহে, এ তারও সিদ্ধান্ত। তার গুরু বক্তব্য ছিল বিয়েটা যদি কিছু বিলম্বিত করা যেত। যদি এর মধ্যে স্ত্রীরের চাকরির ভিতটো মজবুত করে নেওয়া যেত, চাইকি ভূঁইয়ে-বুঁইয়ে কিছু মাইনেও হরতো নেওয়া যেত বাড়িয়ে। 'ক' মাস পরে তার নিষেধও তো একটা লিফট পাবার কথা। যদি সব মিলিয়ে আরো একটু ভালো বাড়ির সংস্থান করা যেত। অন্তত শ্রেয়সের সুখেই ঐ পাখির পাখা-কাপটানো বাঁচাটোর দিয়ে উঠতে না হত। অন্তত দুখানা ঘরের বোলা-মেলা একটা ক্রাট পারত জুটতে নিতে। হাত্রে একটা ঘর আর একটা একচিলতে বারান্দা—এ যেন বড় বেশি অল্প, বড় বেশি পূর্ণ। উটুহুন আরগার গুরু বাবা চলে, থাকি চলে না।

গুরু ঘরের অন্তরেই মাহুবে বিয়ে স্থগিত রাখে। উপযুক্ত সোপানতার অন্ত্রে। কিছু কিম্বদন্তি এমন 'তাড়াতাড়ো' হুক করে দিল যে, যখনই এমন শু মেটুছু আছে তারই উপর সবচেয়ে কাঁপিয়ে পড়তে হল। উপাত্তস্বর হইল না।

এমনও একবার যেন করেছিল সব কথা খুলে বলে কিম্বদন্তির কাছ থেকে কাটান নিয়ে নেয়। কিন্তু বলতে সাহস পেল না। থাকে চাকরি দিয়েছে তাকে বহালনও ছেড়ে নিতে হবে এতটা। নিশ্চয়ই সন্তু করত না কিম্বদন্তি। পরগণা স্ত্রীরকে বরখাস্ত করে দিত। আর বরখাস্ত হবার পর অবিধাহিত স্ত্রীরের কী প্রতিক্রিয়া হত কে জানে। তাছাড়া কটকে সাহিত্য সভার গুরুহাতে লম্বা চাইবার পর বিয়ে থেকে ছাড়ান দিন বশী—এ আবেশন করার মত সুখ ছিল না। তার চেয়ে চোখ বুজে করণীয় কাজটা সম্পন্ন করে কেলসই লবচেরে সোঝা। হাতের তার ছুঁড়ে ফিলায়, সে এখন বেগানে পড়বার পড়ুক।

অনন্ত এমন যখন জানতে পারে কিম্বদন্তির একই রকম মনোভাব হবে। সেখানে যে ছলনা করে চাকরি নিয়েছে সেই সরাসরি বর হয়ে বসেছে। চোরকে বরজপে দেবে সে নিশ্চয়ই খুঁশি হবে না। চাকরিতা সাময়িক, এই গুরুহাতে স্ত্রীরকে তাড়িয়ে দেবে। তখন কী প্রতিক্রিয়া হবে স্ত্রীরের ? আর বাইহোক, বনছায়ায় উপর সে অঙ্গের হতে পারবে না। কেননা বনছায়া তার বউ হয়ে রয়েছে। তখন তার সমস্ত রাস দিয়ে পড়বে কিম্বদন্তির উপর, মমিহের উপর। তখন গ্রাম প্রকৃত-কৃত্যের গ্রাম, সেখানে বনছায়ায় কোনো প্রত্যক ভূমিকা নেই। যদি সেখানে কোনো ভূমিকা থাকত সে মিসপের তার বামীতই লবকাবিতী তলে, আগ্রাণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। পক্ষ তার চাকরি কেড়ে নিতে পেরেছে কিন্তু প্রেমকে কেড়ে নিতে পারেনি।

সুতরাং একটি দিনও অদূরতর্কে যেতে দেবার আগে দলিলটাকে সম্পাদন করে কেলস উচিত।

সেই পোড়ার অন্ত বলা যেত যখন কিম্বদন্তি চা যেতে এসেছিল। বলা যেত কিম্বদন্তির গাড়িতে করে যেতে-যেতে। কিংবা যখন আত্মীয়-বাড়িতে যাবে বলে সে গাড়িটা বাঁসিয়েছিল। অন্যায়সে বলা যেত। বলা যেত, যেহুন, যে আত্মীয়টির চাকরির কথা আগুনকে বলেছি সেই আমার মনের দাহন, আমার শ্রেয়সের ঠাহর—তাকেই আমি আমার জীবনের স্বাধা করব বলে প্রতিজ্ঞাত—অতএব—অতএব, কী হত ?

সুখীয়ের চাকরিটা আর চক না।

তার যে ভরসতন এটা চাকরির সবচেয়ে বেশি বড়কার। মাড়োয়ারির পসিতে বলে কবি খাতা শিখছে এ যেন সবেচ বাইরে। একটা ইভিনিয়িং কার্ণে কোঠামির কান করছে এ অনেক লম্বা। তার লাগামত তার মায়কে তার পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাধা করা বনছায়ায় তো সেই অহংকার। কবি হিসেবে তার ব্যক্তি বিপুল, তাকে স্বীকৃত হোক এ তো বনছায়া চিরদিন চোঁটা করে এসেছে। আর একটা লম্বা চাকরির কাজে সাংঘাত হলনা করবে এ আর বিভিন্ন কী। প্রেমের সিঁড়িলাস্তের কাজে হলনা তো বৈধ রীতি।

ভক্তরাং বিয়ে ছাড়া বিচবার উপায় নেই। না বা বিচবার উপায়।

হিমালয়ে ঠেকানো গেলো বাবাকে ঠেকানো যাবে না। আর ও দুজনকে নিরস্ত করা গেলো সুখীয়েকে বাধন করা যাবে না। সুখীয়েই অস্বাভাবিক। এক চিলে সকেলে তাই তিন পার্বত্যে মারতে হলে বিয়েটাই একমাত্র উপায়।

বাড়ির ভাঙে যেগণ বিচবার ক্ষেত্রে ডক্টরেটের লোক ঝুঁক-ঝুঁকি এনে মজুত করছে—পত্রিকার আঠারো তারিখটাই বোটা করে হাসি দিয়ে দিয়েছে হিমালয়ে। আর বাবা তো সব সময়েই স্বীকৃতের লক্ষ্যমণী।

কিন্তু আর আড়ালে থাকবার যাবে চক না।

বড় বৌদি মল্লকে ডাকল বনছায়া। বললে, 'বাবাকে এলব ধাঁধা'না করতে বাধন করে দাও।'

'কেন?'

'আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।'

'হয়ে গিয়েছে। হিমালয়ে বাবা কালকেও কোমার বড়মাকে ফোন করেছিলেন, এমন কথা তো বললেন না।' হিমালয়ে ছাড়া আর কাউকে যে বিয়ে করা যায় এ যেন মল্ল চিন্তার মধ্যেও আনতে পারে না: 'কি, ব্যাপার কী?'

'যায় কথা বলছ সে নয়।'

'সে নয়, তবে কে?' মল্লারই বুক কাঁপতে লাগল।

'এই যেবা।' বলে বনছায়া বলিল যেখানে।

'এ্যা। সুখীয়ে—সেই ভাঙে-পায়ে ছেলেরা? লজা পরিবার বড় তোহা? মল্লার বুক-ভাঙা ধীরেবাল কেলস: 'এ তুমি কী করলে ঠাকুরজি?'

'না করবার করেছি। তুমি বড়মাকে বলো।'

'আমি কিছু বলতে পারব না। তোমার মাঝের বিয়ে তুমিই চাক পিটিয়ে বলে। লম্বাকৈ।' মল্লার বলিলটা ছুঁড়ে কেসে দিয়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে: 'উঃ, কী বোকা, কী বোকা, কোনো বুজিমতী আত্মনিক মেয়ে এমন হতজ্ঞাড়া বিয়ে করে?'

বেথতে-বেথতে লম্বা বাড়িতে আঙন লেগে গেল। পাখতী এসে মল্লিলা ছুঁড়িয়ে নিল। সেও বেথল চোখ মুলিয়ে। সুখী চিনল ছেলেরা। ঐ যে একদিন লজার দিকে তাদের বাড়ির দেটে বনছায়ায় কাজে ঝাঁপিয়েছিল অনেককণ। বনছায়া বাড়িতে নেই অনেক চলে যায়নি, যুয়ে

আগতে বাঘনি, এক আয়নার দ্বিধা থেকে অপেক্ষা করেছিল। লসোয়ের কামকর্ষ করছে আর বাঘে বাঘেই বুঝে বুঝে আনন্দায় এসে বেগেছে পাখতী, ছেলেটা হানসটাই হয়নি। একবার চাকর পাঠিয়েছিল তাকে ভিতরে ডেকে এনে বসাবার জন্যে। ছেলেটা যাকি হয়নি। ভিতরে এসে বসলেই যেন ঘূর্ণলের মত বেগাবে, প্রাণের মত বেগাবে। বাইরে নিজের অবিকারে থাকিয়ে থাকটাই যেন লম্বীর ভবি, পক্ষিমানের ভবি।

সেই ছেলেটাই নিশ্চয়। মনে-মনে সাক্ষ্য বুধি হল পাখতী। যদি প্রেমের বিয়ে বলতে হয়, একেই বলতে হয়।

‘ঠাকুরকি, এ সেই তরলোক ?’ যেকোনম তরিতে বনছায়ার কাছ বেগে থাকাল পাখতী।

ছোট বৌয়ের লম্বা লম্বা প্রর ভনে চমকে উঠল বনছায়া। বুকের বিকে তাকিয়ে থেকে বললে, ‘তরলোক—তুমি তাকে চিনলে কী করে ?’

‘সেই একদিন লম্বের তোমার হাতে বাড়ির পেটে অনেকজন থাকিয়েছিল। তুমি বাড়ি নেই কেনেও চলে বাঘনি, লম্বা বাঘনি। অনেকজন—অনেকজন।’ যেন নিজের মনেই তম্বা হয়ে বলতে লাগল পাখতী : ‘এই একটা আয়নার দাঁড়িয়ে থাকলে তোমাকে কোনো-না-কোনো লম্বা টিক বরা বাঘে এই বিমানে তরলোক অটল ছিল। তারপর তুমি কোন লম্বের টিক এলে বলো তো ?’

‘তুমি উপর থেকে বেগছিলে বুধি ?’ আনন্দে লম্বা বুধ তরে তুলে লিঙ্গেল কহলে বনছায়া।

‘কানলায় বুধে বুধে এলেই বেগে থাকিলাম। কিন্তু টিক যে লম্বটাকে তুমি এসে লিললে সেই লম্বটাকেই আমি ছিলাম না। সেই দুহুট্টাই আমার কলকে সেল !’

‘আমি এসে লিললাম কখন ?’ বনছায়া হুস্টে বেগে উঠল : ‘ও তো থাকিয়ে থেকে থেকেই চলে সেল !’

‘মোটাই নয়।

সে নিয়ে বাঘার লোক। বলো না তারপর

ছুটিতে কোথায় সেল ?’

কোথায়, কোথায় সেল বলি ? বনছায়া ততকবে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে লম্বলিম্বের কানে এসে পৌঁছল। আর পৌঁছনো মাত্রই তিনি ক্রিষ্ট হয়ে উঠলেন : ‘কই লিললটা নিয়ে আর আমার কাছে। লম্বা ছোটুরি। বোকাবাধি। পুলিশে বধর দে।’

পাখতীর হাত থেকে পৌতম লিল, পৌতমের হাত থেকে কৌশিক। আর কৌশিকই পৌছে লিল বাঘের হাতে।

বললে, ‘এ লম্বা পরিবারকে অপমান। আমি এখন বিমাতাকে লম্ব দেবাব কী করে ?’

‘অপমানের চেয়েও এ লম্বা।’ পৌতম বাগ কহল : ‘এ লম্ব। কোর-টুয়েন্টি। লম্বলম্ব ক্রিমিডাল ফেল।’

আর লম্বলিম্ব যে কী বলছেন আর কী না বলছেন তার আদি-অন্ত সেই। কখনো বলছেন, ছোটলম্বটাকে ছায়েট করাও, কখনো বলছেন মেয়েটাকে বাড়ির বাইর করে দাও। কখনো বলছেন, বিমাতাকে বিয়ে বাসলা করাও, কখনো বলছেন, কৌশিককে বলো মেয়েটার চাকরি বতম করে দিক। কখনো হাটছেন কখনো বলছেন কখনো বা বাঘের লম্বা বন্ধ করে দিচ্ছেন। কখনো বা

মিলেই নয়না। খুলে দুখ বাড়িয়ে বড় বৌমাঝে ডাকছেন, কান্নাবন্যা পলায় বলছেন, 'বনিফে বলে মাঝে এ বাড়িতে আর শুধু আরণ্য হবে না, ও যেন ওর সাথের স্বামীর হয়ে চলে যায়।'

'তাই যাবে বাবা।' বলতে গিয়ে বলহার চোখেও জল ঝড়ান।

বলহার তেও রং নয়, বলহার শুধু রং। সে কিছুতেই যেন নিতে পারছেন না এ মুগের কোনো মেয়ে এমন একটা অসার, অনাহারী প্রেমে মত্ত হতে পারে। প্রেম করতে বলে এমনি বাস্তব বুদ্ধির জলাঞ্জলি দিতে হবে আধুনিক যুগে এ সত্যও যায় না। চলে নেই চুলো নেই, কলম দিয়ে কটা টাকাই বা মাইনে পাও, আর ঐ তো চোরাচাঁদ, লম্বা-খুল একটা বাট্টা গায়ে, ক্রাওল বলে বলে হালা চলে, তার প্রতি কেউ আকৃষ্ট হয়? শুধু অনাহারী কি, একেবারে অহির্ভীষার, বাণের বাড়ির লক্ষণে কোনো সন্দেহ নেই। ছি ছি ছি, এমন একটা অবাঞ্ছিত অস্ত্রে কেউ অস্ত্রের বাংলা ফেলে দিয়ে আসলে?

'তোমার-আমার হিসেবে এখানে চলেবে না গিবি।' শাখতী গাল বেঁকে বলে উঠল: 'যে প্রেমে পড়েছে সে আর হিসেবে নেই।'

'বাক্যে কণা। প্রেমে পড়ার আগে আধুনিক মেয়ে বিচার করে দেখবে না এ লোকটা আমার যোগ্য কিনা? এই সাধারণ কণ্ডজ্ঞানটুকুও সে খুঁয়ে বলবে?'

'গ্রেমটাই যে অকণ্ড।' বলে উঠল শাখতী। বললে, 'যে অযোগ্য তাকেও যোগ্য করে তোলে। বাট্টা গায়ে ক্রাওল পায়ে ছেলেটাকেই হাফথার বলে মূল্য দেয়।'

'ভূই আবার প্রেমে পড়লি কবে?' বলল শালিয়ে উঠল।

'পড়িনি। তবে বুঝতে পারি।'

এ বাড়ির ঘরকন্নাটাও বুঝতে পেরেছে বলহার। কটা দিন এখানে গা-তাকা দিয়ে বিজ্ঞান করতে পারা ঘরের কথা, কখনো কখনো এক-আধবেলাও আর বেড়িয়ে থাকার যাবে না। সময় মজিদক্কা হির করে দিয়ে তাকে অকূলে হাঁপিয়ে পড়তে হবে। তার বাবা-মা-বৌদিদিরা কেউ আর তার আশ্রয় নয়, হিঁদত্বী নয়। সে অস্ত্র আর অকল হয়ে পড়লেও ঐ এক রকম ছোট্ট ঘরটাই তার সর্বস্বত্বের আশ্রয়।

তবু এই নুঠে জীবনটাকে জীবন প্রকাণ্ড বলে অস্ত্রত্ব করল বলহার।—আর সময় জগৎটাকে স্পর্শ করল তার সাথের নিচে, তার হাতের মুঠোর মধ্যে।

তাকাতাড়ি করে একটা সুটকেস ভুড়িয়ে নিল; সত্যকি দিয়ে অড়িয়ে নিল বিছানাটা। কাল রাতে কী ঘনিষ্ঠীন শয্যার প্রথম ঘুমটার অপব্যয় করে দিয়ে এসেছে তাহতে অবজিহোষ করল। আজ সেখানে স্বহস্তে কেরন পরিপাটি করে বিছানা পাতি, কেমন সুন্দর করে ঘর লাগাই, সংসার-উপভোগের কৃত্রিমিক লিপি।

ছোট বৌদিকে ডাকল বলহার। বললে, 'তোমাদের চাকরকে বললে একটা ট্যাঙ্কি এনে দেবে।'

'ওমা, তা কেন হবেনা?' শাখতী নিচে বসে বসে বলে।

ট্যাঙ্কি এলেছে এখনও শাখতীই নিয়ে এল উপরে।

যদি থেকে বেতনার আগে আরম্ভের নিমিত্তে একবারে বেতন বনছাড়া। মনে হল কী যেন কম বুঝটা হত উজ্জল বেতনার কথা তত যেন দেখাচ্ছে না।

‘হোটেলেরি, তোমার সিঁড়ির কোঁটোটা মিলে আসবে?’

‘আমি—’ শাখরী সিঁড়ির কোঁটো এনে দিল। বললে, ‘কুমি নিজে পরবে? তোমার বর পারিয়ে দেবে না?’

বনছাড়া ছেলে বললে, ‘সে এসব প্রতীকে বিশ্বাস করে না। আমিও করি না।’

‘তবে এখন পরছে যে?’

‘তবু বিজ্ঞাপনের ভাঙে। তবু ক’মারার ভাঙে যে আমি অসী আমি সুখী।’ নিজের হাতে ঘন করে সীমন্ত তবে দীর্ঘ সিঁড়ির বেধা ঝাঁকল বনছাড়া।

হঠাৎ নিজের বস্ত্রের বন্ধ হঠাৎ আবার খুলে দিলেন পরদিক। বড়দোকানকে ডাকলেন। টেবিলে বসলেন, ‘বসি বাবার সময় আমার লকে যেন বেধা করতে না আসে। আমার বস্ত্রের দরজা বন্ধ দেখে যেন না হাতা দেয়। বলে দিও পত হাতা দিলেও আমি দরজা খুলে দেব না।’

বন্ধ দরজা ঠাঁক করে আবার খুলে বসলেন: ‘না, আমাকে প্রণাম করতে হবে না। বসি স্বর্ণদালী গর হাতের কথা মনে পড়ে তবে প্রণাম যেন সেইখানে পৌঁছে দেয়। না, হাঁড়িতে হবে না। চান। সিঁড়ি আছে, চলে যাক। ট্যাঙ্কি হর্ষ দিচ্ছে।’

হঠাৎ করে নেমে গেল বনছাড়া।

শাখরীর কথার চাকর বাস্তব বিজ্ঞান। পাড়িতে কুলে দিয়ে গেছে বাপের দাড়ির এই শেষ কপা দিয়ে বনছাড়া বেরিয়ে গেল।

তার অস্থানে, অস্থানে এলে পৌঁছল।

কপালে সিঁড়িতে সিঁড়ির, মাথার বোমটা, কে এক অপরিচিতা যেন ঘরে ঢুকল এমন হঠাৎ যেন হল সুখীবেদ।

লেই ‘এই’ বলে ঢোকা নয়, একেবারে ‘আমি’ বলে আনির্ভাব।

‘আবে, কুমি?’ সুখীর উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল: ‘কী অপরূপ দেখাচ্ছে তোমাকে। সিঁড়ি কে পরিচয় দিল?’

‘আমি নিজে পরছি। এখন আবার কুলে কেলব?’

‘কুলে কেলবে?’

‘হ্যাঁ, ওটা বাপে পরেছিল। কুলে দেবার পর কুমি আবার নতুন করে অহুহানে পরিচয় লাভ হবে হাসল বনছাড়া।

‘বাপে পরেছিল কেন?’

‘হাসল কেনে? বাবা সার্টফিকিটটা ছিঁড়ে কেল দিলেন, বলতে চাইলেন এ বিধে একটা বিয়েই হয়। হাওয়া তখন বেগালেন যেন আমি কী একটা দীন কাজ করেছি। লগোরে আমার মস্ত গুণা বলতে আর কেউ নেই। আমি তখন কী করি? কী করে বোকাই যে আমি অসী আমি ভুল আমি পরিপূর্ণ। জায়াস হোটেলেরি কাছে সিঁড়ি ছিল। তাই বামিকটা নিয়ে মাথার বাঁধানাম মোটা করে, দেখে না বেগাটা বাপে কেনন কুলে আছে—’

‘কিছু তুলবে কেন ?’

‘না, আকিলে যেতে হবে না ।’ সহাইকে পায়ে পড়ে জানাবার কী ব্যবহার ?’

‘জানাবার যথেষ্ট তো সমর্থ । দাড়াইয়া বসো, শির বসো, পান বসো, বিয়ে বসো, সমস্ত জানাবার ক্ষমতা ।’

‘বিয়েও জানাবার ক্ষমতা ?’

‘নিশ্চয়ই । প্রেমকে মুগ্ধিত করে প্রকাশিত করার নামই তো বিয়ে ।’

‘তুমি আশাও যে : আমি যদিও পারি শুধু তা’দি ।’

বাক্যের শেষে বনছায়া বধন স্থান করে ফিরল, সশব্দ দি’বি নির্ভল শাসা হয়ে গেছে ।

বেতবার আগে যেটুকু প্রসাধন করল, বেল, তার মধ্যে দি’ওর নেই ।

বনছায়া বৃক্ষল, গুহাভাটা বৃষ্টি আর স্ত্রীরের মনোপূত নয় । প্রকৃতির চিত্রটা মাঝার উপরে তুলে দিতে পারলেই বৃষ্টি তার মধ্যস্থিত মনোভাব পরিচয় পায় ।

তাই সাধনা দেবার মত করে বললে, ‘বলেছি, তা র’জে তুমি নিশ্চয় হাতে পরিবে দিও : শি’দুয়ের আরেক নাম যে পুণ্যবৃত্তবর্ণ তা জানে : বোধহয় ।’

‘না, কথ্য নয়’, স্ত্রীর হঠাৎ পতীর হয়ে গেল, ‘একদিন বহু-বাহুবল্যের জেতে এনে পাওয়া- যাওয়া করতে হয় । লোকে বলবে ক’’, বিয়ে করলাম, বউ দেখলাম না, মিলি সুখ করলাম না ।’

লোকে বলবে কী ! কাকে বিয়ে করলাম য’বিয়ে অভিনন্দন নিতে হবে । বাইরে বাইরে কতটা বলে প্রতিপন্ন হতে হবে । কোনো মধ্যস্থিত মনোভাব থেকেই স্ত্রীর মুক নয় । এই সুযোগে বৃষ্টি কিছু প্রেক্ষাপট আঁচনা করার ধ ইচ্ছা রয়েছে প্রকৃতি হয়ে ।

‘না, না, এসবের কোনো ব্যবহার নেই ।’ বৃষ্টি বল বনছায়া ।

‘অন্ততঃ আমার বলকে তো একদিন বলতেই হবে ।’

‘তা তোমার বল, তুমি বলো । তাকে তুমি ইচ্ছে মতো হোটেলের নিয়ে গিয়ে বাইরে দাও ।’

‘তোমাকে তো যেতে হয় ।’

‘না, না, আমি এরমতো নেই ।’ প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাল বনছায়া ।

‘তুমি এর মধ্যে আছে বলেই তো পাড়ানো । তা ছাড়া দ্বিবাংগে বাস তো তোমার চেনাখানা তোমার সুপারিশেই আমার চাকরি । তার কাছে তো আমাদের অনেক লায়াবিলিটি ।’

‘তাকে তাকলে আমার বলকেও তাকিতে হয় ।’ পরিহার করার ক্ষমতা বনছায়া আরেক পদ নিতে চাইল ।

কিছু স্ত্রীর কিছু হটলনা । বললে, ‘নিশ্চয় । তাকে না তাকলে সে আঁবার না সুর হয় ।’

‘যে গেল সুর হল ।’

‘না, না, বস পাঠা যায় লোকের আশ্রয়স্থল তুচ্ছোনা ভালো, বহু-বাহুবল্যের গুণেজ্ঞা । আশ্রয় দিচ্ছ পলায় বললে স্ত্রীর ।

দেইলব পড়া পুরোনো কথা—আশ্রয়স্থল, গুণেজ্ঞা, বরদান ।

‘তার মানে তোমার ইচ্ছে তুমি একটা লক্ষ্যভ্রমের হাট দাও । লকলে তোমাকে তারিক ককক তোমাকে বাহবা দিচ্ছ এটা তুমি উপভোগ করো ।’

কথার স্রুটী ব্যাথন লাগল সুবীরের। বিশেষত 'সংকীর্ণন' কথাটা। 'তাই উত্তর দেবার সময় তার সলাহও একটু ধীরে এলে গেল। সে বললে, 'তা হলে তোমার মতে এ ব্যাপারটা পাঠকদের কাছে সেবার মত কিছু নয়? এটা ঘোটেই কোনো প্রবাদের ক'জ নয়? এ নিয়ে তোমার পবিত্র হবার কিছু নেই?'

'আহা, আমি তাই বললাম?' আশ্চর্য হ্রস্ববলি বললেন বনছায়া: 'কিন্তু লম্বাইকে যে ডাকবে আমলা দেবে কোথায়?'

'আমার কবিত্বের ঠিক করবে।'

'বা, তা হলে তো কবাই নেই।' সুবে-চোখে উৎসাহের আভা ফোটাল বনছায়া: 'যে একটা সাহিত্য-সম্মিলন ডাকাও। চমৎকার হবে।'

'আমিও তো ভাই বলছি।'

'তুই ঐ দুটো বলকে বাদ দাও। কবি সম্মিলনে খুঁজা একেবারে নিশ্চিত।'

বনছায়াকে আবার নিজের বক্তব্যে ফিরে আসতে দেখে সুবীর তড়প হল। বললে, 'না, সম্মিলনে গিয়ে একজনকে সমাপতি আরেকজনকে প্রধান অভিধি করব।' তারপরে বৃষ্টি একটু থাক যেমাল: 'তবে যেহেতু সেমে ওরাই তো আমাদের সরকার, আমাদের মা-বাপ। ওদের বার দিলে চলে কী করে?'

যেদিন সম্মিলনের কথা, সেদিন বনছায়া অফিসে বসে। কথা আছে সুবীর বিকেলে বাড়ি এলে বনছায়াকে নিয়ে যাবে। সম্মিলনের আমলা শীঘ্র বজের বাড়ির ছা। তুই বনছায়াই রহস্যমণি বলে ডাকে একটু আগে যেতে হবে।

সেই উদ্দেশ্যেই সে কিছু লাগপোক করছিল। নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট জাঁকা হয়ে গেছে, এখন যেহেতু বলে পারে আমলা পরছে, হঠাৎ বরফার আঙুলের টোকা পড়ল।

'কে?' চমকে উঠল বনছায়া।

কড়া বেড়ে শব্দ করা নয়, আঙুলের দি'ট দিয়ে শব্দ করা। এ বিচ্ছিন্ন সুবীর নয়, আর কেউ। 'কে?'

তুই কথা নেই।

'হ্যাঁ করে জানলার কাছে এসে দাঁড়ান। মইলে, লোক না বেবে আমি বরফা খুলব না।'

কে একজন রাতের উপর জানলার পাশে লসে এসে দাঁড়ান।

বনছায়াও উঠে দাঁড়ান সেই মুহুর্তে।

যেমন, বেবে, পাখির মত গেল, আর কেউ নয়, বাইরে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে।

একটি গিরি স্রুটী মুহুর্তে বিধা করল বনছায়া। খোলে কি না খোলে। কিভাবে যে কি না দেহ।

কিন্তু কিছু স্রুটী করে বিধা করবার আগেই বরফা খুলে দিল বনছায়া। বললে, 'আজ্ঞে।'

(ক্রমশঃ)

এ এক অত্যা নদী

সমর বসু

দুঃ ক'রে শেতলের কলসীটা মেঘের ওপর বেবে হুতপা বলল,—তুমিছো! কি যে রাতদিন তুমি
হয়ে বলে থাকো ভাল লাগেনা।

শেখর হাসতে হাসতে ওর দিকে তাকাল।

হুতপা আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে আরও একটু এগিয়ে এসে বলল,—নদীতে জল
আনতে গিয়ে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। বিবিয়া লেভেন,—একই নদীতে জুবার চান তরা
বারনা। কথাটার কি একটা মানে আছে, কিছুতেই মনে আসছেনা। তুমি তো খুব লেখাপড়া
জানো, রাতদিন ব্যাসর ব্যাসর করে কত কি লিখেই চলেছ,—বলতো কথাটার মানে কি?

শেখর আবার হাসল; কিন্তু কিছু বলল না।

—জানি তোমার কণ্ঠ নয়।—বলেই হুতপা বেগিয়ে যাচ্ছিল, শেখর তাকে ডাকল।

—হাতে কোনও কাজ নেই তো,—তবে বল, কথাটার মানে তোমার বুঝিয়ে দিই।

চেয়ার ছেড়ে শেখর মেঘের ওপর এসে বলল। হুতপাকেও বলতে বলল পাশে। অত্যন্ত
মনোযোগী ছাত্রীর মত শেখরের দিকে দু'ব'লে তাকিয়ে বলে বইল হুতপা।

শেখর সজীর হ'বার চেষ্টা করল। পারলনা, হাসতে হাসতেই বলল—নদী দিয়ে সব সময়
জল পড়িয়ে যাচ্ছে। যে জলে একবার বান করা হত, ঠিক সেই জল আর পাওয়া যায় না, ততক্ষণ
অভাবল এসে পড়ে। তাই—

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এককণ্ঠে মনে পড়েছে। তোমার বুঝি আছে কিছ।—হুতপা বিল বিল
ক'রে হেসে উঠল। পরক্ষণেই দু'ব'তার ক'রে বলল,—এখানকার নদীতে তো ডেউ নেই। জল তো
এক কারাগার দ্বির হয়ে আছে।

—এটা কি নদী, যে ডেউ থাকবে! অন্যতর ডেউ কেউ ব'লে—এটা কামানদী;
এটা হ'ল একটা খাল। নাম ঐডেন ক্যানাল।

ঠাৎ জানালায় দিকে নজর পড়তেই তাকাতাড়ি উঠে পড়ল হুতপা। আর সঙ্গে সঙ্গে
বাইরের থেকে কে বেন ডাকল,—শেখরবাবু! আছেন—শে-খ-র-বা-বু।

শেখর হঠাৎপুলে বাইরে এলে দাঁড়াল। ভক্তকণে আলকাতরা বাথানো বাথারীর পেট, ঠেলে উৎপল বাগানের মধ্যে এলে পড়েছে।

—ও আপনি। সময়ভার, আপনার তো বিকালে আগার কথা ছিল।

প্রতি-সময়ও আনিয় উৎপল একটু সংকুচিত হ'য়ে বলল—হ্যাঁ। তাইলাম সকাল সকাল কারাগার। একটু ঘুরে ফিরে বেড়া যাবে। তাই চলে এলাম। বেশ, ভাল আছেন তো।—বলতে বলতে উৎপল ঘরে এসে ঢুকলো।

একটি হাত চেঁহা। শেখর তাই তাকাতাকি একটা হাতের পেতে বিল দেখে।—বলুন, বলুন,—অনেকখানি রাত। হেঁটে এসেছেন।

উৎপল হাসল,—তীর্থ-বর্ণন করতে গেলে একটু কষ্ট করতে হয় বৈকি।

তীর্থ-বর্ণন।—বিশ্ব প্রকাশ করে শেখর গভীর হ'য়ে বলে উঠল।

—এতে আর আশ্চর্য্য কি আছে। একেই তো তীর্থ বলে। উৎপল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এমিক-ওমিক ঘেঁষতে লাগল—

—মহীর সঙ্গে লাগোয়া সন্ধি পিতৃ মন্ত বড় শাকসব্জীর বাগান। পুর্বাধিক হুলসাহেব। তার মধ্যে দিয়ে লক রাত। বৈশেষ বেড়ার অভিরে আছে মাবীলতা। বহের থেকে লিমেণ্টের, কিছু মাধার খড়ের ছাউনি। অদূর শান্ত, হৃদয় পরিবেশ।

খুঁটি খুঁটি মনে উৎপল বলল—অবশ্য তীর্থ না বলে আর্থমও বলতে পারতাম। কিংবা তপোবন। আপনার সাধিরা বতখানি বাহনীর তারচেয়ে এই আর্থমে কিছুকাল কাটিয়ে বাওয়া বোঝার বৈশিষ্ট্য আনন্দে। কিছু মনে করবেন না, এখানে এলে আমার কিছু বায় বায় সেই কথাই মনে হচ্ছে।

পুত্র হেসে শেখর বলল,—আর্থম। আর্য্যকে শেখ কালে ভগবান করে ছাড়লেন। তা, মন বলেন নি। বলেই উদাল তাহে বাইরের দিকে চোখ ফেঁদাল।

রাতের লগাশে বড় বড় গুলো আমগাছ। অল্পস অল্প ঘরেছে তাকে। ছেলেরা চিল ছুঁতেছে। এখনই ছুটে আসবে গাছের মালিক। গালাগালি করবে। ছেলেকলো কিছু গালাগালি। এমিক-ওমিক লুটিয়ে পড়বে। তারপর বুড়ো লরে গেলই আবার চলবে ইট ছোঁড়া।

এই কাত ঘেঁষতে ঘেঁষতে স্তম্ভা লেহিন ব'লে উঠেছিল,—গুমি বহি তার না কর। আমি এছনি গুলো আম পেতে নিয়ে আলতে পারি। আমের খোল এই সময় বাওয়া খুব ভাল।

শেখর বলেছিল,—হাট থেকে আমি কিনে আনলেই তো হয়।

—হ্যাঁ। সে আমের আবার খাব আছে বাকি। গাছ থেকে টাটকা পেড়ে নিয়ে আন। আম,—তার ঘেরামি খাব, তেমনি পছন্দ।

শেখরের সে সময় মনে হয়েছিল—স্তম্ভার মধ্যে একটা সরল শিশু, সব সময় ভকে কেমন উজ্জ্বল ক'রে চেবেছে স্তম্ভা তাহেতেই পারবে না যে, সে এখানকার বউ। মেয়ে নয়। বাড়িতে অবশ্য দুই লক্ষ্যকর—ম্যাট্রিমা ছাড়া আর কেউ নেই। তীরেও অনেক বয়স হয়ে গেছে। পুণো-আজা, মামাবাওয়া নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকেন। স্তম্ভা ভীকেও বশ করেছে। ছেলেরাছবি ক'রে নয়, দেবার ক'রে।

শব্দ-শাক্তি কেউ নেই হুতপার। তার মতে মনে তার আক্শিপালের অশ্রু নেই। কতদিন শেষরক বলেছে,—একত্রে একটা পুণ্য কাক করা আহার চল না। আমার আঙ্গাটাই বাগান।

শব্দর আশ্রয় হয়ে জিজ্ঞেস করেছে—সে আহার কি!

হুতপা বুঝটাকে ধম ধম করে, বড় বড় টলটলে চোব গুটো মুড়তে মুড়তে বলেছে—যেহ তলে আমার জুপে বৃহতে পারতে। ছেলেদের যেমন বাপ-মা মেয়েদের তেমন শব্দ-শাক্তি। তাদের সেবা-বর করা যে কত তাগেয়র কথা তা জুনি কি বুঝে! ব'লে ব'লে ইনিরে বিনিরে সঙ্গ লিবলে আর মোটা মোটা বই পড়লেই মেয়েদের চেনা যায় না। বুঝলে।

—হ্যাঁ বুঝলাম।—মুচকে হেলে শব্দর বলেছিল,—লতিই আমার মত মেয়ে যে এখনও বেচে মনে বেচে আছে, আমরা তো তা ভাবতেই পারিনি।

—কি ব'ল শব্দরবাবু, এমন হুতপা ব'লে কি ভাবছেন?

—না কিছুই হয়নি, আপনি ঠিকই বলেছেন—এটা একটা আশ্রয়।

উৎপল ঠিক বুঝতে পারল না। শব্দরবাবু কি ক্ষুদ্র হয়েছেন! কবীটা বলা হুতপে ঠিক হয়নি।

একটু ইতস্তত করে উৎপল বলল—পরিবেশটা লতি তপোবনেব; তাই আশ্রয় বলেছিলেন। তাতে পারিনি আপনি এতে—

—না, না, মনে কিছু করিনি।—শব্দর এককণে আত্মবিক হন। —আপনি ঠিকই বলেছেন উৎপলবাবু। আপনার সেবার চোব আছে। আপনি তো শুধু প্রকাশক মন লেবকও। হুতপা আমরা সবগোত্রীয়। মনের দিক থেকে কোথাও আমাদের সিন্দাই একটা মিল আছে। তাই বড়র থেকে অনেক দূরে এসে এই শান্ত পরীতে আমি যে আনন্দের লক্ষ্য পেয়েছি, আপনিও তাতে মুগ্ধ হয়েছেন। বুদী হয়েছেন। অবশ এখন অনেক লোক আছেন বীরা আমাদের ব'লেছিলেন—এখানে গড়ে থাকলে কিছু হবে না। আজকাল কি আর সেদিন আছে যে, সম্প্রদায়-প্রকাশকতা এতদূর এসে তোমার লেখা নিয়ে যাবে। তাদের কাছাকাছি না থাকলে, দিনান্তে ভীষের সঙ্গে একটু আড্ডা না দিলে, পরস্পরের গিঠ না হুলকোলে কিছুই হবে না।

একটু তেবে উৎপল বলল—কবীটা পুরোপুরি অসভ্য নয় শব্দরবাবু। তা'হলেও আমি বলব,—আপনি এখানেই বাসুন। পরের দুঃখ-জেনাজ্ঞ কীবন নিয়ে আনন্টমিকাল পরীক্ষা করার লোকের অভাব নেই। অভাব—চিরকালের চরিত্র স্রষ্টার।

শব্দর মুগ্ধ বৃত্তিতে উৎপলের দিকে চেয়ে হইল। মনে মনে বুঝতে পারল,—কথাগুলো লেবক উৎপলের নয়,—প্রকাশক-উৎপলের। কিন্তু মুখের রেখার সে কথা প্রকাশ না করে শব্দর বলল—এই পরিবেশ শুধু প্রকৃতিরই দান নয় উৎপলবাবু, তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে মঞ্জিরের হাত। সে-হাত হুটোর দালিক অবশ্যই আমি নই। আমার গৃহিণী, অর্থাৎ আশ্রয়-কর্ত্তী।

—তা আমি আগেই অনুমান করে নিয়েছি শব্দরবাবু, এবং এখন বুঝতে পারছি, আপনার অদম্য অদম্য রচনার উৎস কোথায়।

শব্দরের একধানা উপভাস প্রকাশ করেই উৎপলের প্রকাশনা শুধু হুমান অর্জন করেছেনি,

সেই সঙ্গে প্রচুর অর্থও গিয়েছে। শব্দভী উপভাসধামা গাংগার আশাভেই উৎপন্ন এত কষ্ট ক'রে প্রচুর সময় এই ক'রে এই প্রচুর গল্পীগ্রামে এসেছে। শেখরকে পুষ্ট করবার জন্তেই ব'কো চামের জুটিয়েও বসেছে। অর্থও জীবনের প্রতি শেখরের তীব্র অনুরাগ দেখে গ্রামজীবনের স্তিমিত্য ক'রেছে। অতঃপরিত্যক্ত উৎসেপে হে-কথা ব্যক্ত ক'রেছে উৎপন্ন, সেটা কিছ্র আন্তরিক।

এখন উৎপন্ন বুঝতে গিয়েছে শেখর সত্যি সত্যিই বৃষ্টি হয়েছে। শেখর যেথা গড়তে লেবক-প্রকাশক এতটুকু ভুল করেন। সুতরাং তার পরিচয় আজ নিশ্চয়ই সার্থক হবে।

—আপনি একটু বৃহন্ন, আমি তেঁদের থেকে আসছি। শেখর উঠে গিয়েছিল।

—না, না, আমার জন্তে আর আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বেনা।

—তা' কি হয়! একটু চা করতে বলে আসি।

—আপনার লগে গল্প করতে গেলে, সত্যি কথা বলতে কি, কিংবা ভেঁদের কথা মনেই থাকেনা। বলেই উৎপন্ন নিজেকে সংযত করল।—মজা বেশি হয়ে যাচ্ছেনা তো।

শেখরকে যেতে হ'লনা। কলকাতার নিরে জুতপাই এল।

উৎপন্ন অস্বাভাবিক হয়ে দেখতে লাগল জুতপাকে। জুতপা কিছ্র একবারও শুধিক তাকানোনা।

শেখর যখন পরিচয় করিয়ে দিল, তখন শুধু মুহুর্তে হাত তুলে নমস্কার করল উৎপন্নকে।

উৎপন্ন ঠোট কামড়ে বাইরের দিকে চোব কিরিয়ে দিল।

হাতাবি লেহু পাছে অকস্ম কুল ধরেছে। তারই গড়ে-আতুল হয়ে উঠেছে শবের বাতাস। উৎপন্নের মন কিছ্র আতুল হ'য়ে উঠল অত ভারে।

সে-সব কথা জুলাই গেছল উৎপন্ন। হঠাৎ জুলাই থাকত। আজকের এই লক্ষ্যলটা বেন চলতে চলতে হঠাৎ থমকে গাড়ির উৎপন্নকে নিয়ে গিল্লু হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে আর একটা লক্ষ্যলের দিকে এগিয়ে চলল।

গোপালগড়ের শেখর সরকারের বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে গেল কোথায় সেই বাকীপুরের উৎপন্ন মিজিরের বাড়িতে। সেখানে ননী সেই নরীর তীরে এমন হাঠাবীথি নেই। সেখানেকার দেহিরের সেই লক্ষ্যলটা ছিল সেতারের আর একটা তার। সেতারে অল্প গুর।

উৎপন্ন আবার যেমন জুতপাকে। হ্যাঁ, সেই জুতপা। লক্ষ্যেণে কখনও জুতি, কখনও ভুল। রেহুগিসিয়ার ঘরে।

গা-লক্ষ্যকে জুতপার মাকে উৎপন্ন পিসিয়া বসত। কলকাতা থেকে যখনই সেখের বাড়িতে আসত উৎপন্ন, পিসিয়ার বাড়িতেই তার বেশকণ কাটত। মাস্ট্রিক লাল করার পর থেকেই উৎপন্ন কলকাতার ব্যস্ততে মুক্ত ক'রেছিল। সেখানে থেকে গড়াখোঁদা করত। পূব ভাল চাত্র ছিল উৎপন্ন। এম. এ. পাশ করার আগেই লেবক হিসেবে তার নামটাও চড়িয়ে গড়েছিল। তারপর ক্রমশঃ কেনন বেন সে ঘুরের সাহস হয়ে গেল। গোয়াফে-আপাফে, কথার-বার্তার চাল চলনে বীরে বীরে কেনন বেন বসলে গেল উৎপন্ন। তার কাছে জুতপার মূল্যও সেই লগে অনেক ক'রে গেল।

এক এক সময় উৎপন্ন ভেবে ঠিক করতে পারতনা,—কি করে জুতপাকে তার ভাল লাগত। কি ক'রে রেহুগিসির বাড়িতে গিয়ে সে বস্তার পর বসে। কাটিয়ে দিত। জুতপাকে একদিন দেখতে না গেলে কেন সে অমন অস্থির হয়ে উঠত। এখন সে না করা তা'লে উৎপন্নের হাসি পায়ে। জীবন হাসি পায়ে।

অনেকদিন পরে সেবার যখন সে বেগে এল, তেজপিলিমা তাকে আশ্রয় জানাতে লাগল করলনা। স্তম্ভাঙ্গ সংকুচিত ক'রে ঘুরে ঘুরেই রইল। মনের দিক থেকে ভেদন কোনও উৎসাহ বোধ করলনা বলে উৎসাহও এদের সঙ্গে হেঁবা করল না।

এই তাঁবে প্রায় এক সপ্তাহ কাটল। এই এক সপ্তাহের মধ্যে একটা দিনও স্তম্ভাঙ্গর সঙ্গে হেঁবা হ'লনা। কথা চলনা। অবচ তার ভক্তে উৎসাহের মনে এতটুকু অধিকতা ছিলনা। উৎসাহ ছিলনা, বেদনা ছিলনা। এদের বাড়ির শাপ দিয়ে কতবার হাওয়া আসা ক'রেছে উৎসাহ, অবচ একবারও ওদিকে তাকাইনি, তাগালে হয়তো বেগতে গেল, ঘুটি করণ চোখ, জানালার পাশের আড়াল থেকে, কী পতীর আকৃতি নিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। যদি একবার চোখ পড়ে। যদি একটি বাঁহ ফিরে তাকায়,—কি আকুল পিণাসা সে-চোখ দু'টোতে।

উৎসাহই স্তম্ভাঙ্গর কিশোরী মনকে একটু একটু করে পরিণত করেছে, ভালবাসতে শিখিয়েছে। অবচ সেই উৎসাহই অথ স্তম্ভাঙ্গর কাছে থেকে ঘুরে ঘুরে থাকতে চায়। কিন্তু কেন? স্তম্ভাঙ্গর তা কোনও দিনই জানতে চায়নি। চাইবেও না। মনবহর হয়ে, দিনরাত্রির কত হাজার হাজার ঘূর্তে উৎসাহের সঙ্গেই কাটিয়েছে স্তম্ভাঙ্গর। বেলাগুলোর সাল-পরে পড়ানোর উৎসাহই ছিল তার একমাত্র সখী। আক যদি সে এই কয়েই ঘুরে ঘুরে থাকতে চায়, বাসুক। তাতে তার যদি কোনও কতি না হয়, স্তম্ভাঙ্গরও হবেনা। স্তম্ভাঙ্গর নিজেকে দূর করতে পেরেছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দূর থাকতে পারেনি। যেদিন উৎসাহ অ'ব'র কলকাতায় ফিরে যাবে, সেদিন তার বেলায় স্তম্ভাঙ্গর উৎসাহের সঙ্গে হেঁবা করতে এসেছিল। ওকে প্রণাম করে বলেছিল এই বোধহয় আশ্রয়ের শেষ বেগা! খুব শীঘ্রইই আশ্রয় বোধহয় কাকার কাছে চলে যাবে। সেইখানেই থাকবে। মামার বাড়ি আর গড়ে থাকবে না।

—তাই নাকি? কবে যাবে?—উৎসাহ শুকনো পলার জিজ্ঞেস করল। ডিতা-উৎসাহ-মনোবেদনা, কিছুই তার কণ্ঠে প্রকাশ পেলনা।

যাণা নিচু ক'রে তারি পলার স্তম্ভাঙ্গর বলল—আমি সব জানছি। তুমি মনে করনা কেন, তাতে হুঁপ পেয়েছি।

—কি শুনেছ তুমি?—স্টাট্‌কেন গুতোতে গুতোতে উৎসাহ জিজ্ঞেস করল।

—জানছি, আমি তোমার গোপ্য নই। তুমি অনেক লেখা-পড়া শিখেছ। কত গল্প-পত্রিকার তোমার লেখা বেরোয়। আর আমি দ্রাণ সেভেনে উঠতে না পারা গেয়ে বেয়ে। আমি কি তোমা' গোপ্য হতে পারি!

গুহেলে উৎসাহ বলল, বাঁহ কতানা। কথাটা কিন্তু লজি।

স্তম্ভাঙ্গর শীর্ষবাল কলে কিছুকণ চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল—তোমার বাঁহ গুটিয়ে দেবে? এভাবে কাগজ-চোপড় বাঁধলে যে তাঁজ নষ্ট হয়ে যাবে।

উৎসাহ বলল,—তা থাকবে। এ-লব মরল। কাগজজানা, কলকাতা সিংহই কাচতে দেবে।

স্তম্ভাঙ্গর আঁহ থাকতে পারলনা। তাকে পলার বলল,—আমার কি মনে হচ্ছে আমি। মনবহর আগে, বাবা মারা যাওয়ার পর আশ্রয়। যখন এখানে প্রথম এলাম আমার তখন বোধহয় পাঁচ বছর বয়স, তোমার দশ কিংবা এগারো। মামার বাড়ির পিণাসা গাছে উঠে তুমি শিখা বাঁজিলে।

আমাদের দেখে তাকাতাকি ছুটে গালিয়ে গেলেন। সেদিন আমার কাছে কুমি যেমন আছে তা ছিলে আজও ঠিক তেমনি অচেনাই হয়ে গেলে—

ছাঁচলে চোব ঢেকে তাকাতাকি বর থেকে বেরিয়ে গেল স্তম্ভণা। আর উৎপল হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

দীর্ঘকাল পরে। সুদূর গোপালপুরে দেখা লরভারের বাড়িতে বলে সেদিনের সেই হাসির সব এই মুহুর্তে যেন স্তম্ভে গেল উৎপল সেই বিজ্ঞপের হাসি। তবে তখন স্তম্ভণার দিকে আমার লে তাকান।

স্তম্ভণা বলল,—হাত গুটিয়ে বলে উইলেন কেন। বেয়ে নিম। জানেন তো এখানে তেমন দোকান বাজার নেই। স্তম্ভণাং সবই হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ভাল লাগবেনা—স্তম্ভণা সুখটিপে হাসতে লাগল।

উৎপল লজ্জা প্রকাশ করে উৎপল বলল,—এত তাকাতাকি এই সব করলেন কি করে!

বাহা-বাহা নিজেই তো থাকি। ঘটেতো আর কোনক বিভেই নেই, তাই ঐ কাকটা বেশি রপ্ত হয়েছে।

উৎপল হাসতে গিয়ে গলীর হয়ে গেল।

—আমরা ঠিক পুণী দাছব নই, স্থলেন উৎপলবাবু, তাই আভিবেহতার হঠাৎ জটি হতে সে-জটি অব্যক্তই দার্জিনীয়। লপখে বেলে উঠল দেখব।

—বিলকব! বলেই উৎপল চোরাচোবে স্তম্ভণায় দিকে তাকাল। স্তম্ভণা চোব নামিরে নিরে ইৎৎ ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়াল। হাই পান নিয়ে আলি।

পরবর্তী উপজ্ঞানের চুক্তি লবন্ধীর সময় কথাবার্তা শেষ করে উৎপল বিতালের আপনই বেরিয়ে পড়ল। বাহার সময় স্তম্ভণা বাহ বাহ বলল—আবার আসবেন কিছ। বাবলার বাড়িরে নয়। এমনি খেড়াতো। আপনেন তো!

—নিশ্চয়ই। হঠাৎ এবার এইখানেই কুঁকে বঁধব।

উৎপলের পরীক্ষা! হেলতে হুসতে রাত্তার বাকি বসন একেবারে অতৃপ্ত হয়ে গেল; তখন স্তম্ভণা শেষরকে জিজ্ঞাস করল,—যে বইটা একে বেবে ঠিক করলে, তা কি তোমার লেখা হয়ে গেছে?

—না! কেন বলতে?

—তলেই হয়েছে গল্পটা আমিই তোমাকে বলব। কুমি লিখে দিক।

—কুমি!

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ! আমি! গল্প বলব। বেশ সুন্দর একটা।

পিছনের জানালায়

শ্রীকটকেশ্বর শর্মা

ট্রামে চলেছিলাম কালিবাট থেকে এসন্ন্যানেতে। অকিন্স-টাইম নয়, তবু কিছু ছিল।
ভিতরটারে মজ্জা:বর ঠালবুনি—বহুবার বাইরের উপরে পড়ে নি, এইটুকু বক্ষা!

ক্যানিষ্ট্রালের মোড় থেকে একটা হল উঠতেই টৈলাটেলি ভাঁতোওঁতি মুক হল লকে লে
দরম দরম বুদির জুদকি কাঁটেতে সাপল।

আঃ সপাই কি হচ্ছে! একেবারে সায়ের ওপর হুদকি বেয়ে পড়ছেন যে!

কি করব পেছন থেকে চালায় মারছে দেখছেন না।

ভাই বলে সায়ের উপর এলিয়ে পড়বেন। কোথাকার পাওলা—

আমি বুড়ো বাহুব, একটা কিছু হয়ে দাঁড়াবার সুবিধা পাচ্ছেন না বলে—

ভবে আর কি সাতবুন মাপ! ইন্ড্যানিডদের উচিত ট্রামে বাংলা না চাপা, ট্যাঙ্কি করে
সেলেই পারেন।

এ পক্ষেও সর্ব্বক জুটে গেল—তারপর যা আরক্ত হ'ল লেকালের তরকার লড়াই বলে কোথার
আছি।

ভিড় পাঁতলা হলে ভাল করে দেখলাম হলটিকে। বহল বিশ থেকে পঁচিশ। সায়ে হুঁচলো
দুব জুতো, পরনে চোংবোর পাভলুন, সায়ে সুছই ও কোমর-কাটা কম দামি টেরিলিন জামা, কজিতে
বকি বাবা আর মাথাভলো কাকপকীর বালা। সেই বালা মাক। দিতে দিতে ওরা গলা তুলছিল
লগ্নয়ে। একটা পুরনো লুকে নস্ত্রাৎ করে দেওয়ার ভাবি নিয়েই কবার জের টেনে যাচ্ছিল। লবলেনে
একটি কঠিন মস্তব্য কানে এলো—যাকো লব ওজ কলিল।

নিজের পানে চাইলাম। সিরাপন একটি আসনে বলে মস্তব্যটি উপভোগ অবধা উপেক্ষা করা
যায়। হেলেকালি একজুটি নয়, তির তির কারসা থেকে আসছে, কিন্তু পোষাকে ও হললে এক কোটেই
হুববদ। ওরা বিশেষ একটি কালের প্রতিকূল হবার বাঁধি নিয়ে আর একটি কালকে নস্ত্রাৎ করে দেবার
আসন্দে যেতেছে। এই বিভ্রানের লুগে মাহুব টানে পৌছলে পুখিবাটা এমনি জুজ হয়ে যাবে মাকি।

তাতেও ভাবতে প্রিকারার পৌছে গেলাম। তার পরেও নানান কালের চাপে ভাবনাটা তলিয়ে
বহরিসের পুরাতন এক পুখিবাঁকে সামনে দেখলাম।

আবার বহর আবার পাড়ার্না মিলে এই পৃথিবীর নদীয়া। পৌর-শাশনের আওতাধর বধাকালেহ
রাভাঙালে পুঃবাণুরি কর্ণন-নিষ্ঠর নর, ছোট ছোট ধান্য বোলল এবং নরম হুয়াকির লালেহে কাদালে
কলকৃত। কাঠের খুঁটির মাথার চৌকোনা মাড়-বেড়ে কাচ বেড়া কাছলের ভিতরে কেরোসিন জ্বলি
মলে অস্তির গুল টেনে টেনে—সে আলো গর নির্দেশক নয়—সে যেন ‘কণপ্রভা প্রভাবান’ কবিতার
ভাব্যাহুসরণে পরিচালিত। আরও হাইল বানেক মুখে যে ক’টি গ্রাম আছে হাঁদের অশ-পাড়ার্না হল।
যার—তারের তুলনায় এই শরী অতিশয় লম্বা—যেহেতু সেইল গ্রাম থেকে প্রতিদিন হলে হলে হাফস
আলে এখানে মান্য প্রয়োজনে। হাট বাজার বোকানপাট বেড়াহেনা সারতে, হাতবা চিকিৎসালয়ে
ম্যালেবিহার (পকাশ হাট বহর আসে গরীবাংলার ম্যালেবিহারই ছিল সংখ্যাত্তর ব্যাবি) চিকিৎসা
করতে, ভাল খাতীর লম্বানে এবং উচ্চ ইংরেজি বিভাগয়ে বিদ্যা শিক্ষার্থে, আবার গালে পার্বেও
আলে দুর্গা কালী জনকাত্মী প্রকৃতি পুজার উৎসবে প্রয়োজিত হতে এবং হাসিমেলার ঐকভবক বেবে
অধাক হতে। হুতরাং এ চেন গ্রাম আমাদের দৌরবেরই লামগ্রী।

প্রাথমিক বৃত্ত হলেও পরবর্ত্তনের শরীলমাঝের ছায়া-মন হতে বেবেছি হাতে হাতে। বিশেষ
বিশেষ সম্ভাব্যে কার্টি ট্যাকির আকোলন, হলমেলির হলমেল এবং ব্যাক্জিতর অহুয়া বিবেকের হাপট
গ্রামের ব্যাক্জিত প্রায়ই কলুহিত করত। এইলব লবেও পরিবেশটা খুব অস্বাভাবিক বোধ হত না।
এর কারণ ছিল একাধিক। তখনকার দিনে পৃথিবীটা ছিল খুব বড়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাফসের
লব হাফসকে আনন্দ হান করত, প্রভাপ্রতি ভালবাসার বধার্থে দুলাবেহ ছিল কাগ্রত, খ্রীমদক
বিবেকানন্দের বাণী তখনও তত পুরনো হয়নি বহ অল্পকয়ে ল্পর্শ করত এবং উচ্চ আশর্পের আলোর
অনেক জীবন ছিল উজ্জল। ভাল-মন্দ সংজ্ঞার দেশানো সেই লম্বা, গ্রাম এবং হাফসগুলিকে এখন
স্ট্রি দেখতে পাচ্ছি।

প্রথমেই দেখছি হুপের বৃত্ত আনিয়াটি। তাবধেন না আমকাল হাট বিকোত শিক্ষক
দেহাও, প্রগপত ছুরি ও শরীকার উত্তীর্ণ হওয়ার অসাবু পহার বৃত্তাক কাগলে পড়ে ও চোখে বেখে
ওই ছবিটাই প্রথমে লামনে এসেছে। আমাদের প্রথম জীবনে যে লম্বত কর্ত ও চরিত্রের প্রভাব গ্রহণ
ভাবে অহুত হয়, উত্তর জীবনে সেইগুলিই বৃত্তি তাওতে সর্বাংগ লকয় সেই নিরম বশে প্রতিটি
হাফসের মনেই ইচ্ছা জীবন বৃত্তির গুতাওতার। কালে অত বৃত্তি অস্ট্রি হরে আসে—এই বৃত্তির
কর নাই।

আমাদের নদীয়া বহাকালের নামাঙ্কিত উচ্চ ইংরেজি বিভাগয়ে সেই লম্ব শিক্ষক ছিলেন
জন লব-বারো তার মধ্যে কয়েকজনকে মনে পড়ে। বিশেষ করে মনে পড়ছে প্রথম শিক্ষক
দীতানাব কবানীকে। বাহুত্ব তিনি ছিলেন অতিশয় বড়। প্রকৃতির হাপজতা হাফস। তার
চোখের উপর চোখ বেখে প্রায় তো হুয়ের কথা, পাঠা বিয়ের উত্তর দেবার লাবা ছিল না অধিকালে
হায়ে। অথচ আদর্শ তিনি আদৌ বৈত ব্যবহার করতেন না। সেকালে প্রত্যেক মাস্টারের হাতে
বৈত থাকতো। বৈত হাতে করেই তাঁরা ক্লাসে আসতেন এবং অধায়ে তা ব্যবহার করতেন। পঠন-
পাঠনের লকে বৈত-শালন ছিল বিভাগানের অপরিহার্য অঙ্গ। কবানী লম্বার বৈত ব্যবহার করতেন
না তাহ পরিধর্তে বাক্য বা ব্যবহার করতেন সে বৈতাব্যতের চেয়েও অধিক। চেহারার ভলপর্গন
বিশিষ্ট মন,—একধারা ভলু কঠিন পৌরকাঙ্কিতে শালনের বহিমাফে অনায়াসে প্রকীর্ণ করে রাখতেন।

তিনি যেখানে দিয়ে চলে যেতেন, হুচ পড়লে পথ খোলা যেত। ক্রাস ভিত্তিবে তাঁর দলার আওয়াজ বাইরে যেত না, তবু ছাত্রলৈল লগত নিভত। কোন অভিযোগ নিয়ে হল বেঁধে এসেও ঘরের চৌকাট ভিত্তিতে লাহল করত না। ইকুলের বাইরেও তাঁর অগত প্রতাপের তাপটুকু অগত্বত হত। হরতো আমরা অনকয়েক সলী মিলে গরু করতে করতে লব চলছি বুঝে দেখা সেল তবানী মপার অসছেন— লকে লকে বাঠ মন গলিটলি বে বেরিকে লারত লয়ে পড়তো। এটা মিছক তীহ প্রকৃতির কথা নয়, তর দেখানো প্রকার খাপার। কি আনি লামনে পড়লে উনি কি প্রর করবেন। কোবার চলছিল। মট্রিয়ার কাতে খেলার কথা মলা কি লহক।

তবানী মপার পাঠা বিঘর ছাড়া অত্র প্রসল তুলতেনই না। পুনের বাইরে আর একটা লগল আছে—সে খেন ঠর আনার কথা মর।

আমরা তখন প্রথম শ্রেণীর (বর্তমানে ক্রাস টেন) ছাত্র। উনি একদিন ক্রাসে এসে আমাদের বললেন এই একটা বছর খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে। ছুটির দিনেও মনে রাখবে—শেখ পরীক্ষা সামনে। তোমাদের অভিভাবকরা কত আশা নিয়ে লেখাপড়ার বরত খুসি হয়ে থাকেন—কত চিন্তা তাঁদের। দেখো খেন তাঁদের ক্রুখের কারণ মরো না, তা ছাড়া পরীক্ষার কলাফলের উপরে তোমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

ঐদের বড়ের আগে বললেন, ঐদের লখা ছুটিটা কেমন করে কাটাতে ভেবেছ কি? হুপুর-বেলাটা একলা একলা খুব বেশি লগল পড়া যায় না, ক্রান্তি আসে, খুম লার। এগুলো কি করে খুয় করা যায়—ভবেছ কি?

একটু খেমে বললেন, আমি কিন্তু একটা ভাল উপায় ঠিক করেছি। সকাল সকাল বাওয়া মাওয়া লয়ে খেমন ইকুলে আসতে তেমনি চলে আসিবে আনার বাড়ীতে। ইংরেজি আর অক্টটা ভাল করে লিখে নেবে। পাঠকনে একললে বললে মন বলবে—আমারও ভাল লাপবে। ও দুটো ভিনিল ভাল করে লিখে নিলে উক্ত লিকা বল, চাকরি বল কিছুতেই আটকাবে না। জীবনে লকল হবে।

অন্ততঃ তেরো চোমকন ছেলেকে নিয়ে ঐদের হুপুরে ইকুল বসাতেন বাড়ীতে। চার খট্টার ইকুল বারোটো বেখে চারটে। লেই ইকুলে বা লিকা হতো—এখন মোটা মাইনে দিয়ে গুখ-লিকক য়েবে তা লার করা লভব নয়। সে তো প্রথা মাকিক লিকা লান নয় লিকাকে প্রকৃত জানের লখে লুকু করার প্রক্টো। ইংরেজিতে তাঁর লবল ছিল লাকা আবার লাহিত্য অংগের চেরে গ্রামার ট্রান্সলেশনের লিকে লোঁক ছিল বেশি। বলতেন—এই দুটো ভাল করে লিখতে পারলে বক বক লগুরে মন লান্তির বাড়বে। গ্রামার হল তবরা লাক্যের লি-লরক। এটি লাপু ভাল করে পড়া করা চাই।

এমনি অক্লাত পরিল্লম করতেন—লিনিময়ে পারিল্লমিক কিছুই নিতেন না। লেকালে বেশির ক্রাস লোকের লায়ণা ছিল—বিভা বিজয়ের বস্ত নয়। বে লিকক জীবিকা নিবাহের অত্র অনভোণার হয়ে এটি লুখণ করেন—তিনি অগত লিন্দনীর নয় কিন্তু লিনি ছাত্রকে লিনাওড়ে বিভাধান করতে পায়েরন—লমলখে তিনি লম্বানীর, তবানী মপার কিন্তু লম্বান লান্তের লগতও তেমন উল্লজীব ছিলেন না। ছেলেরা কৃতবিত হয়ে তাঁর ইকুলের লৌরব বৃত্তি করবে—ওর লিকাদান লার্থক হবে—এতেই ছিল তাঁর আনন্দ। লেকালেও সীতামাখ তবানী খুব বেশি ছিলেন না। লিক লংসারের লখে লিকালয়কে একই অল্লরাপের লোরে লীবতে পায়েরন—এমন লাহব একালে তো লুহল্ট।

এই প্রদেব আর একজন শিকড়ের কথা মনে পড়ছে। নীচের তিন চারটি জালে তিনি পড়াতেন—অতএব কাপড় ভালটা প্রদেবেই এসে পড়তো তাঁর হাতে। ছাচে কেলাস উপযোগী করে কাপড়টা তৈরী করে দিতেন উনি। অদূর ছিল তাঁর শিকাদান প্রণালী। কথা বলতেন রসিয়ে রসিয়ে, বেতের ব্যবহার ছিল অপরিসীম এবং প্রতিটি ছেলের কাছ থেকে প্রতিদিনের গুণ আদায় করে নিতেন। জাপে খোলমাল হলে ভালমন্দ নির্বিশেষে প্রতিটি ছেলেকে হাত পাতিয়ে হাতের তালুতে কড়া পোছের বেতের আঘাত দিতেন। হোমটাঙ্গ দ্য দিতেন তা শ্রব করতে বেলায় সময় আগমিই সংকীর্ণ হয়ে যেত এবং টাঙ্গ না হলে পুরো সময়টা দাঁড় করিয়ে রাখতেন বেকির উপরে। সে এক অপরমান ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। হিটলরী অভিতাবকের মত ছিল তাঁর ব্যবহার। সে নিয়ে কেউ কোনদিন অভিযোগ তোলে নি—অভিতাবকরাও ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসেন নি ইন্থলে। আশ্চর্যের কথা এ ছেন পাতিতাতাকে গবেষণে কেউ ছুটে পালাত না। ইন্থলের বাইরে উনি ছেলেদের সঙ্গে অদূর ভাবে মিশতে পারতেন। ছেলেদের চু-কপাটি খেলা বা খুড়ি গুড়ানো দেখতেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভাল খেলুড়েকে তারিক করতেন। খেলের দিন লক্সাবেলার খেলের হাঙকাগুলিকে এক এক জায়গায় লড়ে করিয়ে ডালি বরা উৎসব করতেন। প্রত্যেক হাঙকার সামনে এলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাজ-সজ্জা দেখতেন—প্রশংসা করতেন এবং ডালি বরা শেষ হলে সব ছেলেকে মিষ্টি খুব করিয়া যত্নের সহায়ত করতেন উৎসবের। অথচ মাস্টার মশার ছিলেন খুবই গরীব। দিন আন। দিন বাওয়া মাস্তব। উনি ছিলেন আমাদের ঠাকুরদার বয়সী, কিন্তু আমদা মনে করতাম—আমাদের বয়সের সঙ্গে তার মনেদ মিল রয়েছে।

ষাট বছর আগেকার সেই বৃদ্ধ মাস্টার মশারকে এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই, এখনও তার কথাগুলো স্পষ্ট কানে আসে।

ব্যবহার গুটুমি করবি নে—সোলমাল করবি নে—মন দিয়ে লেখাপড়া করবি। তোদের বাপ দাদারা এই বাক্য মাস্টারের হাতের বেত বেয়ে মাজব হয়েছে, টাকো উপার্জন করেছে, খুশি ?

তারপর চাপকা সোঁকের শেবাণে আবৃত্তি করতেন : 'যবেশে পুখাতে রাজা—বিভান সর্ব পুখাতে।

স্বপ্ন ভঙ্গ

সুদীপ চক্রবর্তী

ডুগোলের শিকড় হ্রদপন্থার একদিন ক্রাসে ঢুকেই বরফা-ভাঙ্গা লব বড় করে দিয়ে একটা ঘোমবাড়ি আর একটা গ্লোবের সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছেলেন—দুর্ভাগ্য পৃথিবীর বনন যেখানে বৃষ্টির আলো পড়ে তখন লেদিকটা দিন আর অপর দিকটা রাত্রি হয়। ছেলেবেলায় পড়া ও পেশা এই তথ্যটার কথা আজ লজ্জালখেলা চঠাৎ মনে পড়ে গেল বীজেনবাবু।

সকালবেলা সূর্য থেকে উঠে রোজক বাসি বুধে এক রাস জল খাওয়া বীজেনবাবুর বয়সের বয়স। এই জল রাস গাঁর পিররে ঢেকে রাখার হাথির—আগে ছিল স্রী সুনন্দা দেবীর ইমালীং চাকর মদু। কিন্তু মাদুয় যাত্রেরই জল হয়। গত রাতে মদুও জল হয়ে গিয়েছিল। সাদা চোখে এইটুকু ফ্রটি করা যোগ্য লম্বের নেই। কিন্তু বীজেনবাবু কাছে এটা একটা বিশেষ ঘটনা বলে মনে হল। তবে এই নিয়ে তিনি কাতিকে কিছু বললেন না। এমন কি চাকর মদুকেও না। নিজেকে ইজো থেকে গতিরে এক রাস জল গেলেন এবং দ্ব্যাবীতি হাত বুধ বুধে এসে আবার বিহানার উপর বললেন। এমন সময় রিটা জলবাধার নিয়ে আগতেই তিনি চাই করে ববয়ের কাপড়টা চোখের উপর তুলে পড়তে লাগলেন বা প্রকারত্বের চোখ বুধ ঢাকলেন। মনের অবস্থাটা পাছে চোখে বুধে প্রতিফলিত হয় আর তা ছির চোখে বরা পড়ে যায় এই তরই বোঝক। কারণ তিনি তার মনের তাহটা কাতিকে বুধতে হিতে চাননা এমন কি রিককেও না। এ যেন সখা মাথতে কামান লাগার মত। কিন্তু তা বলে হবে কি এই বুদ্ধ কারণেই তো অনেক সময় মনের, মেহের, সংস্কেত, লম্বকের এমন কি স্নাত্তের বিরাট বিপদর ভেদে আনে। বীজেনবাবু মনেও বিরাট বিপদর দেখাছিল।

রি টেবিলের উপর ঢা জলবাধার রেখে চলে যেতেই ববয়ের কাপড়টা গালে রেখে বীজেন বাবু তাকিয়ে উইলেন দুয়ারিত ঢা কাপড়ার রিকে। বতকণ চা-টা পরম থাকবে ততকণ বোঁরা উইবে, ততকণ এর কবর থাকবে। জুড়িয়ে গেলেই ওটা বাতিল বলে গড় হবে এটাই নিয়ম, এটাই বাস্তবিক। বীজেনবাবু সেবেলেন কাপড়ার বোঁরা লম্বতে লম্বতে কমে গেল। বোঁরা করে সেলেক চা-টা এখনও কিছু সময় আছে। তেজ কমে গেলে সময় ততকণ থাকে! তবু লজ বিপদ-প্রাণ-দেহটা যেমন বানিককণ পরম থাকে তেমনি এই তেজবীন চা-টাও কিছুকণ সময় থাকবে। তার পর—?

বীজেনবাবু একবার আয়না দিয়ে গাঁর বুধখান। তখা সাদা দেহটাকে সেবেলেন আর একবার কাপের ভিতরের চা-টুকুর রিকে তাকালেন। সেবেলেন—গাঁর এই জৌর-ঘটটা আর কাপের ভিতরের

চাটুঙ্গ একই বকস তেজস্বীম একই বকস অনাধারের বস। তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার ববরের কাগজে মন দিলেন।

ছোট্ট একখানা ছোট্ট ভাঙি বীজেনবানু। পেট ঘিরে ঢুকুই ছোট্ট বস একটু লম্বা। লম্বুটু গেরিরে প্রথমেই একটু খোলা বানান। বানান্যার মাঝখান দিয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ি উঠে গেছে। বানান্যার ঠ'পাশে ছ'খানা বস। তখন দিকের বসবান্যতে বীজেনবানু থাকেন। সেই বস লাগেয়া তিতর দিকে একখানা বস আছে। সেই বসে চাকর মনু থাকে। এই ছুই বসের মধ্যে কাতেরবেলা বসনা খোলা থাকে। যাতে বীজেনবানু উপর মনু লক্ষ্য রাখতে পারেন তাই এই ব্যবস্থা।

বীজেনবানু ববরের কাগজ পড়ছেন বলে বলে অবধা বলা বার চেরে আছেন। ওপর থেকে—টুক টুক করে সিঁড়ি বয়ে'নোমে আসার শব্দ হ'লো। বীজেনবানু ব্যক্তি দিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারলেন—বেলা বসটা থাকে। বস ছেলে দিলর অকসি বেলল। এ-ও বুঝতে পারলেন—ছেলের মা-ও ছেলের পিছন-পিছন দলর পর্বর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন—আর বস ছেলের বউ সিঁড়ির নীচে বাগ পর্বর এসেছে।

বানিক বলে আবার অল্পক্ষণ শব্দ হ'ল। সাঁকে বসটা থাকে। ছোট্ট ছেলে দলর অকসি বেলল। ছেলের মা এবার সিঁড়ির নীচের বাগ অবধি এলোছেন আর ছোট্ট ছেলের বউ নুতন বলেই বসতো নীচে না এসে ঘোড়লার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার আর একটি অল্পটামের কত্রে প্রস্তর হলেন বীজেনবানু। হুন্না দেবী ববের চৌকাঠ বরে একটু কুকে খিজেল করলেন দেবী ভাল আছে তো?

যোঝই এই সময় হুন্না দেবী বানীর বান্য লম্বতে বোঁক নেন। ছেলেরা অকসি বেললে পর একটুকণের কত্রে তিনি একবার আসেন এবং ঐ কথা খিজেল করেন আর বীজেনবানু একই উত্তর দেন—ভাল আছি। কিন্তু আক তিনি কিছু বললেন না। প্রীর দিকে তাকালেনওনা। ববরের কাগজের দিকে চোখ ছুঁটোকে খোর করে আটকে রাখলেন। কিন্তু তিনি অবধ দিতে দেবী করতে পারেন—তাই বলে হুন্না দেবীর তো দেবী করার সময় নেই। তুঁতিনি একটু অপেক্ষা করলেন তারপর চলে'তে গিয়ে টেবিলের উপর স্তুটি পড়তেই বন্ধুকে দাঁড়ালেন। বললেন—ওকি! ওা লল-খাবার বাওনি কেন?

বীজেনবানু কবার অবধ না দিয়ে ববরের কাগজের পাতা ওপ্টালেন। হুন্না দেবী ববের যথো ঢুকে একটু টেবিলের লকে বললেন অল্প বিলুপ করিনি তো? বলে বীজেনবানুর কপালে হাত দিয়ে বললেন নাঃ—সেরফর তো কিছু—তা কী হয়েছে বলবে তো? পেটটা ভাল আছে তো? না তোমার সেই মাথা বরাটা—বলতে বলতেই বিছানাটার উপর স্তুটি পড়তেই একটু ওকা ললাই ডাক দিলেন মনু—মনু—।

—বাই এজে—বলে—মনু আসতেই হুন্না দেবী বললেন কর্তব্যাহু বিছানাটা একটু তেড়ে দিতে পারিসনি?

মনু অপরাধীর মত আমতা আমতা করে বললে কর্তব্যাহু ওঠার আগেই তো আমি—

হুন্না দেবী ললের ঝুঁকোর দিকে চেয়ে বেন আঁতকে উঠলেন। বললেন—লেকি! ঝুঁকোটার চাকনা নেই কেন?

যু বসলে—কেন ঢাকনা তো ছেল মা ।

—ছেল তো গেল কোথায় ? লক্ষ্যলবেলা জল জুলেছিলি ?

—কখন জল ? কাক না ডাকতেই তো—ঐ যে বললুম বড় বৌঠান আমার বাগের বাড়ি বাণীপল্ল পাঠালেন । সেখান থেকে তো এই কিয়ছি । আমি এতুনি জল জুলছি ।

—ও—বড় বৌমা পাঠিয়েছিলেন ? তা এমন কোথেকে জল জুলবি ? কলে কি এমন জল আছে ? গলার স্বচটা যেন আন্টব্ব রকম নয়ম পোনালা জুনঝা দেবীর । যেন তারার লা থেকে উল্লারার লাতে নেমে গেল । অতঃ বীজেশবাবু কাকে তাই মনে হ'ল ।

যু বসলে—কেন তারার 'টিউকল' থেকে । বলে ঠিকোটা নিয়ে যু জল আসতে চলে গেল । জুনঝা দেবী বীজেশবাবুর বিছানাটা একটু বেড়ে ঠিকঠাক করতে গেলেন । বসলেন একটু ওঠা—
আমি—

—ঠাহুর মা—আমাকে জুলে দিয়ে আসবে না ? মা মিজেস করছেন । ক'ল গলার মিটি ডাক । ডাকের লগে কিছুটা অতিযোগও ।

—এই যে বাই বাহু তাই । বলে খাবীর পরিচয়ী মুলজুবী যোগে একরকম হুটে চলে গেলেন জুনঝা দেবী । শব্দ দুহুটে কচিকর্কের দৃষ্ট অজ্ঞাপণে কানে এলো বীজেশবাবুর—আজ তোমার মস্তে আমাকে পেছনের থেকে বলতে হবে—জুনি এত দেবী করলে কেন ? না খুব রাগ করছিলেন আজ নিজের মাস্টার মশাইও বকবেন আমাকে ।

অপরাধীর মত বসলেন জুনঝা দেবী—না না বকবেন না । আমি মাস্টার মশাইকে বলে দিয়ে আসববন ।

—খী বলে আসবে ?

—বলব বোকনের কোনো ঘোষ নেই আমার মস্তেই—

আর পোনা গেলনা । তাহা প্রবণ সীমার বাইরে চলে গেলেন । বীজেশবাবু অসাব্যক্ত ভাবে কাগজের খুঁটি নিয়ে চন্দ্রমার কীট জুটো পরিষ্কার করে ববরের কাগজটা চোবের লামনে জুলে ধরে পুস্তকের নিকে চেয়ে রইলেন ।

যু এলে তেল সমিছা দিতে গেল । বীজেশবাবু চান করতে গেলেন । চান করে আসতেই ঠাহুর ভাত নিয়ে এল । বীজেশবাবু আজকাল এই বরে বলেই খান । আজ প্রবণে তেবেছিলেন খাবেন না । তারপর কি ভেবে খেতে বসলেন । খেলেন কিছু লব যেন কখন বিখান ঠেকল । আগে জুনঝা দেবী নিকে রাহা করতেন নিকে ভাত থেকে লাবেন বলে বীজেশবাবুকে খাওয়াতেন । তখন জুনঝা দেবী ছিলেন নেহাতই একজন কেহাগীর বউ । বোল লেনের একখানা ভাড়া করা ঘরে—জীবের সমস্ত মশায়টা ঠাণ্ডা ছিল । কেহাগীর মশায়ের বা হর অতাবে দারিহা সবই ছিল । আর ছিল মনে রত্নীম বস্তু । খানী জী জুনঝাই ভাবতেন ছেলেনের মাহুর করতে হবে এক ঘের, তাকে ভাল ধরে বিরে সিতে হবে আরও কত কী । সেই লগে আর একটি রত্নীম বস্তুও তার। বেবেছিলেন একখানা ছোট বাড়ির । তারপর কখনো ছেলেনেরদের উল্ল তবিত্ব কন্দার কখনো মনের মত একখানা বাড়ি করার অঙ্গার তাহের বোল লেনের সেই একখানা ঘরের দাম্পত্য দীর্ঘনের দিনগুলো কাটতে লাগল । এরকম অনেক রাত কেটে গেছে জীবের ঘ্রানের পর ঘ্রান করে

পরিচয়নার পর পরিচয়না করে। যে হাতে বাড়ির কথা উঠল তে—চল সেই সিঁহে সরাসর্য্য আশোচনা সুনন্দা দেবী একতরফ বললেন তে বীজেশবাবু বললেন আর এক তরফ। আর এই করে হাতটা এখন প্রায় কাবার হয়ে আসল তখন বেগে গিয়ে বীজেশবাবু বললেন যে—বত সব! কীকার সাধ যায় চিৎ হয়ে গুতে। কুমিত, বদন—[আমিও বাড়ি করছি আর কুমিত তাকে সাঝাচ্ছ। হ'—[হাফখান থেকে পুইটা নই!

আবার যেদিন ছেলে মেয়েদের কথা উঠল সেদিনও ঠিক এই তরফ কাটল।

দুপে উড়িতে সিলেঙ মনের অপ্রস্টিকই ছিল। তাই বীজেশবাবু সিলেঙ চাকরী টিউননী নানা-ভাবে হাড়চাড়া গাটনি খেটে ছেলে মেয়েদের সাজব করতে লাগলেন। কিন্তু বাড়ি করার সবটাই ব্রতই থেকে যেতে লাগল।

অবশেষে অল্প আর্থিক সফল হ'ল। বড় ছেলেকে সত্যিই হাছব করতে গেয়েছেন মেয়েকেও ভাল করে বিয়ে দিতে গেয়েছেন। একতর বীজেশবাবু বহিঃ অবগ্রত হয়ে গড়েছিলেন—২২ তিন আর সুনন্দা দেবী মনে কিছু সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু বড় ছেলের পেছনে যে তুলনার ব্যয় করতে গেয়েছেন—সেই তুলনার ছোট ছেলের পেছনে ব্যয় করতে পারেননি। অর্থাৎ বই গ্রন্থান কায়েদ। তবে বাধার দুজনেই অগোচর ছিলেন বড় ছেলে একবার ঠাকুরাণে পারলে তাঁদের কোনো চিন্তাই থাকবে না। তখন ছোট ছেলের পড়াশুনাও হবে আর সলোবে খললতাক আসবে। এদিকে বীজেশবাবুর চাকরীর মেয়াদ শেষ হল। অবসর নিলেন তিনি। অবসর নেবার সময় এককালীন যে টাকা পেলেন তাই দিয়ে প্রৌড় বরলে যৌবনের রতীন ব্যয় সার্থক করলেন। কলকাতার প্রান্তে এই ছোট্ট বাড়িখানা করলেন। গ্রন্থান করলেন একতলা। ছোট বড় মিসিয়ে তিনবারা বব। কিন্তু তাকে তো অল্প সার্থক হবে না। কারণ বীজেশবাবু আর সুনন্দা দেবীর দুজনেই সাধ ছিল বাড়ির সাহসে লন থাকবে। তাতে থাকবে—নানা তরফের জ্বলের পাছ। সুনন্দা দেবী অন্য সেই সাধ কিছু লাউ কুমড়া বেগুন সাহের কথাও বলেছিলেন। তাতে বীজেশবাবু আপত্তি করে বলেছিলেন—না-না কতে বাড়ির সৌন্দর্য বদন নই হবে তেমনি জ্বল সাহেরও ইচ্ছা থাকবে না। কসম ক্যামেলিয়া জ্বল সাহের সতে লাউ কুমড়ার সজ অবস্থানটাকে বীজেশবাবু কিছুতেই বরখাস্ত করতে পারেননি।

হাইকোড—বাড়ি করার পর একটু ছোট্ট লন্ডন গিয়ে বা হ'ল কিন্তু বদনের এই হাফখান সখীরবে—দোতলার জ্বল বাগানকার স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঠাকুরে সেই জ্বলের সৌন্দর্য উপভোগ করা হবে না। অতএব দোতলা করতে হয়। কিন্তু তা করতে গেলে টাকার বরখাস্ত। অত টাকা তাঁর নেই। যা আছে তা দিয়ে বড়োয়ার দোতলার ছ'খানা বয় করা যায়। আর তা করতে গেলেও—বীজেশবাবুর একবারে হাফখান হয়ে যাবে। সুনন্দা দেবী কিং বরলেন—বললেন এখন আর আদায়ের চিন্তা কী। নিলর আদায়ের বাড়িয়ে গেছে। তোমার হাফখান বলও নিলর আদায়ের হাফ খরচ করে যাবে। কুমি দোতলারও ছ'খানা পর করে। আর সাহসে একটু জ্বল বারকা।

এই সময় বড় ছেলে নিলর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করে কেমব্রিজ লরকারের অধীনে চাকরী গেল। সেই একটা দিন বীজেশবাবুর। বদন তিনি জনলেন নিলর আটপ টাকা মাইনেতে চাকরী গেয়েছে তখন তিনি অতি আদখে হতবাক হয়ে গেলেন। আটপ টাকা। বীজেশবাবু সাধা চাকরী জীবনে আটপ টাকা একই দেখতে গেয়েছেন কিনা সন্দেহ। আর তাঁর ছেলের কিনা মাল গেলেই

আটপ টাকা হাতে আনবে। হাই হোবু ছেলে চাকরী পেয়ে দিল্লী চলে গেল। আর বীজেনবাবু মনের আনন্দে বাড়ীটার দোতলা ভগ্ন বিহীন লেগে গেলেন। এমন আর তার চিন্তা কী! তার ছেলের সাইনে আটপ টাকা। আরও তো বাড়বে। তাবতেও যেন কেমন লাগে। পাটী যেন শিঙ্গ-শিঙ্গ করে ওঠে।

এদিকে ছেলের চাকরী প্রাপ্তির বরদী কেমন করে যে বাঙ্গালদেশের বিবাহযোগ্য মেয়ের বাপদের কানে গিয়ে শৌধুল কে জানে। তাঁরা হল বেঁধে মহাবীর সুরতে আসতে লাগলেন। জুনঝা দেবী বললেন—ছেলের উপযুক্ত মেয়ে চাই। বা-তা হ'লে চলবে না। আমার ছেলে তো বা-তা নয়। অবশেষে অনেক বাছাবাছি করে ইংরেজ আমলের ভূতপুং যার বাতায়র কে, নে, লাঙ্গুলীর নাতনীও সঙ্গে নীকজনক সহকারে বড় ছেলে নিলয়ের বিয়ে হ'ল। বিয়েতে খৌতুকানি এত পেতেছিল নিলয় যে তাতেই তারের এই ছোট্ট বাড়িখানা প্রায় ভয়তি হয়ে গেল। বড় লোকের বাড়িরে মেয়ে আসতএব দু'হাত ত'রে তাঁরা মেয়ের বিয়েতে খরচ কবেছেন। বিয়ের পর নিলয় বউকে নিয়ে চাকরীস্থল দিল্লী চলে গেল।

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে নিলয় বউকে নিয়ে দিল্লী চলে বাবে—এ বীজেনবাবু বা জুনঝা দেবী কেউ তাবতে পারেন নি। জুনঝা দেবী আগে বলতেন কিনা ছেলের বউয়া এলে একটু হাত পা ছোঁকে কিরোতে পারব। বউয়া কামকর্ম করবে আর আমি তারের চোলাব। এতো সব মায়েরাই ভেবে থাকেন। এতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু তিনি তাবতে পারেন নি সে সুন্দর মায়েদের—এ সুন্দর ছেলে বউর উপর এতটা আশা করা উচিত নয়। এই ভাবেই দিন চলতে লাগল।

এদিকে বীজেনবাবু এতদিন যেটা আশা করেছিলেন—সেটা বড় ছেলের কাছে আনাগেল। বড় ছেলে—হ'বাস গবে তার উত্তরে লিখল বাসা খরচ করে খুব বেশী কিছু আর বাচে না। তার উপর আমি ঠিক করেছি করেইয়ে দাব। তাই এখন বেকে টাকা। বা অমালে কী করে তা সম্বল হবে? অতএব আরও কিছুদিন কষ্ট করে চালান। মলয় স্থল কাইনাল পাশ কয়েছে কোনে স্থনী হলান। তাকে বলবেন লে যেন টাইপটা শেবে। একটু চেষ্টা করলে টাইপিস্টের চাকরী পেতে পারবে। আর বা হলও টাইপ করে এমনতেই দু'পয়সা যোগদান করতে পারবে। আমি বা হয় একটা টাইপ রাইটার মেশিন কিনে দেবার ব্যবস্থা করব, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর মায়ের কাছে একবারা ছোট্ট চিঠিতে লিখল—মা তোমার বৌমাং শরীর খারাপ। এই সময় তোমার ব্যাং দরকার। আমি টি, এম, ও, করে টাকা পাঠাচ্ছি। টাকা পেলেই—মলয়কে নিয়ে ভূমি চলে আসবে। লক্ষ্যে যে পুনত দিয়ে লিখেছে—যখিন বা মলয় একটা চাকরী পাচ্ছে তখিন বা হয় আমি প্রতিমাসে এসপ টাকা করে পাঠাব। বাবাকে চিন্তা করতে বাধন কোর।

বীজেনবাবু ও জুনঝা দেবী দুজনেই দুজনের চিঠি পড়লেন এবং দু'জনই দুজনের বিকে নীরবে ডাকিয়ে বসিলেন।

চিঠির মধ্যে এমন দু'টা লেখাব ছিল যাতে প্রত্যেক বাপ মা-ই আমল অমৃতব না করে পারেন না। ছেলে উচ্চ শিক্ষার কাজে কয়েক বাবে আর ঈগনিরই তাঁর নাতির খুব দেখতে পারবেন। আনন্দেরই কথা। কিন্তু নিলয়ের বাবা-মা দুজনের কেউই যেন ভেতন আনন্দ পেলেন না।

বীজেনবাবু তাকালেন অসমাপ্ত দোতলার বর দু'খানার দিকে। হাঃ চালানই হয়েছে।

এমন সরল ভাষা আর শ্রাস্তির কথা বাকী। এবিকে পকেটেও তাঁর আর বেশী কিছু বাকী নেই। অথচ বড় চাকুরে ছেলে তাঁদের আরও কিছুদিন কষ্ট করে চলার উপদেশ অথবা নির্দেশ দিয়ে গাটরেছে—। অতএব—

সুনন্দা: বেশীও সব বুঝলেন। কিন্তু ছেলের বউয়ের পরীর ব্যাপার অতএব—

ভিটর মর্ম মলমল জ্বলল। কেনে সে বাবা-মাকে কিছুটা অভিযোগের সূত্রে বললেন—[সনে কিছুটা অভিমান বিধিবে) আমার কণ্ঠে তো আর কিছু করলে না তোমরা। আরি এমন নিষেধ ব্যবস্থা নিষেধ করব। মাদাকে লিখে লাও—তাকে আর কষ্ট করে টাইপ হাইটার কিনে দিতে হবে না। হাইকোর্স সুনন্দা দেবী বিদ্রোহী বলে গেলেন। মলম তাকে পৌছে দিয়েই চলে এল।

সুনন্দা: দেবী সেই যে গেলেন আর নাতি বড় হলেন পর মিলম বন বন্দী হয়ে কলকাতা এল সেই সনে এসেন। এতদিন আগতে পাবেন নি—ছেলে হবার পরে বড় বৌমার পরীরটা বেঘম ভেঙে গড়েছিল তেহনি তার পকে ছেলের বর নেওয়াও সম্ভব ছিল না।

মিলম সুপরিবারে কলকাতায় এলে ওপরের অঙ্গবাণ বর দুখানা লম্বা করল। এবং সস্ত্রীক ওপরের একখানা বরে থাকতে লাগল।

মলম একটা অফিসে চাকরী পেয়েছে এবং চাকরী করতে করতেই প্রি-ইউনিটি পরীক্ষা পাশ করল। কিছুদিন বাধে তারও বিয়ে হ'ল। তার বউ অল্পত কোনো বড় লোকের মেয়ে নয়। 'নতারাষ্ট্র বীজেন্দ্রবাবু সন্ত একজন সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে। মলম বোতলার বাকী ব্যবস্থা দেখল করল।

মিলমের করনে আর অধি বাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এখানে আসার পর সলোয়ারের পর তার কাঁধেই গড়েছে। চাকর-বি ঠাকুর মিলিয়ে সলোয়ার বেশাই খরচ। তার উপর বড় বৌমা বড় লোকের মেয়ে। তার চাল চলনই আসিয়া। অতএব ছোট ছেলে মলম সলোয়ার বা বের তা নিয়ে ভাল পরমণ্ড হয় না। অতএব সলোয়ার বন বড় ছেলের টাকার চলছে তখন বড় বৌমার কথা মতই সকলকে চলতে হবে এতো জানা কথা।

বীজেন্দ্রবাবু হাত বাঁধি। অতএব তিনি সব বুঝেও চুপ করে থাকেন। তিনি আজ্ঞার নিয়মের বাধ্যতার পাশে নীচের ঘরে। সুনন্দা দেবী ছেলে ছেলের বউ নাতির বেগমত করে বীজেন্দ্রবাবুর বড় একটা তত্ত্ব নিতে পারেন না। তার উপর দুই বছরের ব্যবধানে বড় বৌমার আরও দু'টি মেয়ে হ'ল। অতএব আগে বাওয়া একটু আট্টে সময় পেতেন বীজেন্দ্রবাবুর বর নেবার—এবন আর তাও সম্ভব হয় না। এমন কি রাতের বেশারও না। বোতলার টোরে রুমটাকেই বেতরনে পরিণত করে বড় নাটিকে নিয়ে ততে হয়। বীজেন্দ্রবাবুর উপর দৃষ্টি দেবার ভজ চাকর মনুই রইল শুধু।

বড় ছেলের যে বাবার দিকে দৃষ্টি নেই তা নয়। এই তো এবার শ্রীতকালে তাঁকে একখানা দামী শাল কিনে দিয়েছে। পরসের মিনে গিরে ঘরে ওয়ার কুলার লাগিয়ে দিয়েছে। ছোট ছেলে মলম অল্প কিছু বিতে পারে না। কী করে হবে? তার বউ বড়ও সাধারণ ঘরের মেয়ে কিন্তু বলে কী হবে? বড় জায়ের চামচলম মেয়ে সেও ভাল আমিও বা কম হাই কিলে। অতএব বড় জায়ের খাঞ্চি গমনার সঙ্গে পালা দিতে গেল। কলে মলম বোটারীর গ্রাণ অল্প।

দুপুরবেলা বাওয়ায় পর বীজেন্দ্রবাবু একটু খুঁসিয়ে নেন। আশ্চর্য তলেন। কিন্তু দুই এলনা চোখে। বিকলবেলা চা পেরে বেড়াতে বেরোবেন এমন সময় সুনন্দা দেবী হালতে হালতে এসে ঘরে

চুকলেন। তাঁর পলটা দেখিয়ে আনন্দের সঙ্গে বললেন, যেথেকে? বড় বৌমা ছিল। আমার যে বিচ্ছেদ লারটা ছিল ঠিক সেই বকম হয়েছে—তবে আমারটা এর চেয়েও বেশ আর একটু চক্কড়া ছিল তাই না?

বীজেশবাবু কিছু বসার আগেই আবার বললেন, দেখিন কবার কথায় বড় বৌমাকে বলেছিলাম কিনা নিলয়ের পত্নীকার কী দিতে গিচে আমার বিচ্ছেদ লারটা যেচতে করেছিল—তাই শুনেই—

সখটা না? তুমিই এবং ভালমত কিছু না বলেই বীজেশবাবু সখীমতাবে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মনে ক'ল ছেলের বউ যেন তার স্বামীর গুণ শোব করল।

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরতেই—‘কই কে বীজেশ!’ বলে হাঁক মেরে বয়েনবাবু এসে হাজির। বীজেশবাবু হুঁপাত বাড়িয়ে সোৎসাহে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে—আরে বয়েন যে! এলো এলো—। বয়েনবাবু আর বীজেশবাবু দু'জনই অস্তুর বন্ধু। এক লাফ চাকরীতে চুকছেন একই লক্ষে রিটায়ার করেছেন। তবে বয়েনবাবুর অবস্থা বীজেশবাবুর মত নয়। বয়েনবাবু তাঁর ঠাকুরবাড়ি আরল থেকেই কলকাতার বাড়িওয়ালা। বয়েনবাবুর তিন ছেলে দুই মেয়ে। মেয়ে দুটিও বিয়ে করে গেছে। ছেলেদেওও বিয়ে হয়েছে। ছেলেরা সবাই চাকরী করছে। বয়েনবাবু কিছুদিন আগে সস্ত্রীক জীর্ণগ্রন্থে বেরিয়েছিলেন। কিছু এত শিশুর ফেরার কথা ছিল না। তাই বীজেশবাবু বললেন—সে কি হবে কিভাবে?

বয়েনবাবু বললেন—পরত। কেন তোমার বড় ছেলে নিলয়ের সঙ্গে তো আমার দেখা হয়েছিল! তা, বা বলো তাই—তুমি একদিক থেকে আমার চেয়েও ভালবাস। ছেলেটি গাকে বলে বর বিশেষ। বেশ বড় চাকরী করছে। আমার শিশুরই নাকি তার প্রবেশন হচ্ছে। আমাকে প্রণাম করে আসিবার চাইল।

চমকে উঠলেন বীজেশবাবু। বললেন—প্রবেশন হচ্ছে।

—হ্যাঁ, কেন তোমাকে বলেনি?

সামনে নিয়ে বীজেশবাবু বললেন—ও: হ্যাঁ-হ্যাঁ আমাকেও দেখিন প্রণাম করে এই কবাই বলেছিল বউ। আমার মনে ছিল না। আর আজকাল এমন হয়েছে যে কোনো কবাই আর মনে থাকে না। বয়সের লোথ আর কি। বলে একটু হাসলেন কি কীলেন ঠিক বোঝা গেল না। তারপর প্রলম্ব বহল করে বললেন—তা এত শিশুর কিরে এসে যে?

বয়েনবাবু বললেন—আর বলো কেন বুঝাবন অবধি নিয়েছিলাম সেখান থেকে এক লম্বা বাড়ির ছ'টা টেলিগ্রাম গেছে কিরে আসতে ক'ল।

—সে কি বাড়িতে কারও অস্থব—

—না না সেসব কিছু নয়। বাড়ি এসে জিজ্ঞেস করতেই ছেলে বউরা এসে—আমরা বাড়ি যা থাকলে বাড়িটা নাকি তাগের কাছে অছড়ায় মনে হয়। আর পাছে একজনে টেলিগ্রাম করলে অপরের আন্তরিকতার লম্বা প্রকাশ করি এইজন্তে তিন ছেলে আর তিন বউ প্রত্যেকে একটা করে টেলিগ্রাম করেছে। বলে হো হো করে হাসতে লাগলেন।

হাসি থামিয়ে বয়েনবাবু বললেন—আর বলো কেন আমি কতগুলো পাগল নিয়ে সংসার করছি। আমার বলে কি জানো—আমরা আপনাদের চারবারে আছি এই বাড়িই তো জীর্ণবাস।

এখন ছেড়ে কোথায় যাবেন ? এই দেখানো আমি রিটারের করার সময় যে টাকা পেয়েছিলাম তা ওদের দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ছেলেরা বললে ও টাকা তোমার কাছেই থাক দাও ।

বীজেশবাবু যেন হঠাৎ জেপে উঠে বললেন—ওঃ, তোমার টাকা বুঝি তোমার কাছেই আছে ?

—হ্যাঁ, তা তো আছেই । তা ছাড়া ছেলেরা যা মাইনে পার সবই এনে আমার কাছে তাকে দেয় । তারপর হাত পরচের অস্ত্র তার হাঙ্গরকার হয় আমার কাছে থেকে নিয়ে নেয় । জুনি বললে বিশাল করবে না বৌমাদের লাড়ি গর্ভজ হয় আমাকে নরভোজ আমার স্ত্রীকে কিনে দিতে হয় । বৌমারা বলে আপনারা পছন্দ করে যা দেবেন তাই আমাদের ভাল । বলে আমার হাসলেন বয়েনবাবু ।

বয়েনবাবু পার্শ্বস্থ ভাবনের দ্বন্দ্ব দেখে বদ্ধ হিসেবে বীজেশবাবুরও স্ত্রী হবার কথা । তা হলেনও অজ্ঞাতঃ বয়েনবাবুর পার্শ্বক হাসির সঙ্গে নিজেই হাসি মশালেন । মনে মনে ভাবলেন তাঁর ছেলের বউরাজ তাঁর কাছে আসলে বছরে একবার বিজয়ার প্রদান করতেন ।

বয়েনবাবু সন্ধ্যাবেলাটা করে বললেন—বুকে তাই আসলে ব্যাপারটা কি জানো ? ঐ ছেলেরই বোলা ছেলের বউই বোলা মোটা লম্বারটাই হ'ল টাকার বদল । টাকা হ'ল স্ত্রীর মত । ওর চন্দ্রি বেশিকৈ পড়ে শেখিকটাই আলোকিত হয় । তাই লম্বারটাকে পুণিবার মত সেই রমির আকর্ষণে টাকার চারদিকে ঘুর ঘুর করে ঘুরছে । রিটারের করার সময় যে টাকা পেয়েছিলাম তাওটা আছেই তা-ছাড়াও আমি কিছু জমিরেছিলাম । সবটা আমার হাতেই বেবেছি ।

বীজেশবাবু চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল । বললেন—তবে যে জুনি বললে—ছেলেদের টাকাটা জুনি দিতে চেয়েছিলে ?

বয়েনবাবু একটু চোখ টিপে হেসে বললেন—মাকে মাকে ওরকম বলতে হয় । না বলে ছেলেরা ভাবতে পারে—বাধা বুঝি তাদের বিবাস করলেন না । আরো বাপু বিবাসও কম ভালও বাসি কিছু তাই বলে হাতবাঁধি করছি না । খেয় বরলে যে তোমাদের সম্মার উপর ঝাটতে হবে তা আমি লইতে পারব না । তাই আমি আগে থেকেই স্ত্রীর নামে বেশ কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা বেবেছি । বাকীটা আমার অধিকারনে ছেলেরা এমনিতেই পাবে । তা জুনি কিছু হাতে টাতে বেবেছে তো ? না একেবারে হাত-পা ধুয়ে বলে আছে ? কী হে—কথা বলছে না যে ?

—এঁ—হ্যাঁ—তা—

—বুঝেছি—। জুনি যেন কী ভাবছে । আজ্ঞা আজ উঠি একবার বেহা আদায় এখানে ।

—আজ্ঞা ।

বয়েনবাবু চলে গেলেন । বীজেশবাবুও চলে গেলেন চিত্তার দ্বন্দ্বতে ।

এরপর বীজেশবাবু দিন কয়েক কোথায় কোথায় জুপুরবেলা যেন ঘুরলেন । তারপর—একদিন লকালবেলা খুব বেতে উঠেই বন্ধকে ঘিরে গ্রন্থনা দেখীকে ডেকে পাঠালেন । বললেন, এছনি যেন আসলেন ।

হঠাৎ বড় তলব পেয়ে হস্তমত হ'য়ে ছুটে এলেন গ্রন্থনা দেখী । বললেন—কী ব্যাপার ?

বীজেশবাবু গভীরভাবে বললেন—কোলো—কথা আছে ।

—যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে । এখন কি বলবার সময় আছে । ছেলেরের ললবাবার করতে হবে—পাণিয়ার জর হয়েছে তার অস্ত্র পণ্য করতে হবে একা ঠাকুর কি এদর পাবে ?

—কেন তোমার খৌমার? কোথায়?

—তাঁরা মানে কোনোরকম এসব করেনি তো—তাই

—করতে দাও অতোস হোক, তুমিই যা করিনি করবে?

—যদি চোখ খোঁসা আছে।

এমন সময় রোগী কঠোর কণ্ঠে ডাক তুলে এলো পাণিরায়, ঠাকুরমা—ঈশ্বরির এসো।

চকল হয়ে উঠলেন সুনন্দা বেবী। সাতা দিগে বললেন—বাঁট ম'হু তাই।

বীজেশ্বরীর গুঢ়ভাবে বললেন—না বলো।

বীজেশ্বরীর চোখের দিকে চেয়ে তার গেরে গেলেন সুনন্দা বেবী। পাশে বলে বললেন—কী ব্যাপার হলো।

বীজেশ্বরীর বললেন, পাণিরায় যা আছে বাবা আছে। বোমার টাকা আছে—তাকে দেববার লোকের অভাব হবে না, কিন্তু আশ্রয়—কথাটা অলম্ব্য রেখে আসেনের মত বললেন—সে'ম'তে একুশি আমার লগে বেতে হবে।

—কোথায়? অবাক হলেন সুনন্দা বেবী।

—আমার বাসায়।

—বলো কী!

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারপরের চিন্তাটাই আমি বিটরেছি সুনন্দা। এই দাসীরা যথা বেচে তোমাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা আমি করেছি। শোনো আমার বন্ধ বিজয় বোসকে মনে আছে তো? তার ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। বিজয় রিটার্নার করার সময় যে টাকা পেয়েছে তাই দিয়ে বাপ খাটো দিলে একটা ছোট কারখানা দিয়েছে। সেই কারখানার আমি অ্যাকাউন্ট্যান্টের চাকরী পেয়েছি।

—ওঃ।

—শোনো আরও আছে। আমি চাকরীতে তিনদিন হ'ল অরেন করেছি, বাবু পে চলে।

—কিছু

—কিছুই তো কিছু নেই সুনন্দা। সারা জীবন কষ্ট করে ছেলেদের বাস্তব করেছি। রিটার্নার করার পর যে টাকা পেয়েছি তা বিয়ে ছেলেদের বাড়িও করে দিয়েছি আর তো আমার কোনো দাবিও নেই সুনন্দা।

—কিন্তু সোকে বলবে কী?

—লোকের কথা থাক—তুমি কী বলছ তাই হলো।

—আমি আর কী বলব?

—তাহ'লে চলে। তারপর একটু থেমে আত্মলজাবে বললেন বীজেশ্বরী—সুনন্দা। নতুন বাসায় গিয়ে আমার আমরা নতুন করে লগার পাতক—আমার নতুন করে কবিত্বের বগ্ন দেব। বগ্ন দেবার মধ্যেই সত্যিকারের আনন্দ—বগ্ন ভেঙে গেলে সেই আনন্দ আর থাকে না সুনন্দা। বলতে বলতে বীজেশ্বরীর গর গর করে কঁপে ফেললেন।

দুই বাঘের লড়াই

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংলণ্ডের সংসদীয় রাজনীতির অবিস্মরণীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রাধিপতির আমলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সরকার এবং বিপক্ষী পক্ষের মধ্যে যে বাকবুদ্ধি হত, তার বাস্তবতা, প্রাচুর্য্যতা এবং তীব্রতা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল উজ্জল হয়ে দেখা আছে। শাসনীয়তা সম্পূর্ণ বহুতর তত্ত্বগত পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ধারা এবং অব্যর্থ লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল কঠিনতম ক্রিয়াকলাপ।

লন্ডনের প্রথম লড়াই হয়েছিল দুই বাঘা নেতার মধ্যে। ডিসরেল্লী এবং গ্রাভটোন। বাঘী হিসেবে দুজনেই তুলনার যোগ্য।

আগে ডিসরেল্লী পরে গ্রাভটোন।

ইংলণ্ডের দুই সেরা রাজনীতিবিদ এবং প্রবাসমন্ত্রী। দুজনেই ছিলেন সমসাময়িক। কেউ কারও চেয়ে কম নয়। তাই সংঘর্ষ ঘটেছে বারো বারের। আর সেই সব সংঘর্ষে আন্তরিক হৃদয় উঠেছে সংসদকক্ষকে ঘাঁটিয়ে বিয়ে।

১৮৫২ সাল। মধ্যরাত্রি। পার্লামেন্টকক্ষের বিতর্ক চলছে। বিপক্ষীপক্ষের নেতা হিসেবে ডিসরেল্লী ক্রমাগত আবার চাপিয়েছেন গ্রাভটোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে। তীব্র খানিত বুদ্ধি, জালালী জালা, আর তেমনি বলাব ভঙ্গী। সংসদকক্ষে যেন আগুন ছুটেছে। ডিসরেল্লী যখন তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন তখন যেন হলো এর আর জবাব নেই,—সরকার পক্ষের পক্ষের অনিবার্য।

উত্তর দিকে সরকার পক্ষ থেকে উঠে দাঁড়ালেন গ্রাভটোন। ঘরের মধ্যে পুড়িয়েছে তীব্রতা। বীরে বীরে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। ক্রমে ক্রমে কঠোর উচ্চ পরমায় উঠতে লাগল। তাঁর মাঝার মাহুদ-খুদ-করবার হস্ত ভঙ্গী নিয়ে গ্রাভটোন বিপক্ষী নেতার হৃদয়লব্ধি কেটে টুকরো টুকরো করতে লাগলেন। শেষরাত্রে যখন তাঁর জবাব শেষ হলো তখন দেখা গেল ডিসরেল্লীর বক্তৃতা আর কারও হাতে নেই।

এর কিছুকাল আগের আর এক ঘটনা।

সরকারের অর্থমন্ত্রীকণে ডিসরেল্লী তাঁর হাতে পার্লামেন্টে গেল করেছেন। সেই হাতে

কনগ্রিয়সহ। তার বিচ্ছেদে প্রথম বিচ্ছেদ। সেই বিচ্ছেদের উত্তরে ডিসয়েলী এক প্রচণ্ড বক্তৃতায় সরকারকে সমর্থন করবার অল্প সময়ের মধ্যে আবেগন ঘনালেন। তাহার ফলে, আন্তরিকতার দাবনে সে আবেগনকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা বোধকরি কানাই ছিলনা।

ডিসয়েলীর বক্তৃতায় পর বিরোধীগণের তরফে উঠে দাঁড়ালেন গ্যাডটোন। তিনি তখনও তেমন ব্যাভিমান্য করেননি। মাত্র একজন উঠতি হাননৈতিক কর্মীরূপে উঠা নাই।

গ্যাডটোনের কণ্ঠে ডিসয়েলীর মত জ্বালা-ধরা ভাষা নেই। তিক্ততা নেই। বিবেচনা নেই। কিন্তু রূপ? ইয়া তা আছে বৈকি। তাইই পরবর্ত্তে তিনি বিলুপ্ত করলেন ডিসয়েলীকে। বললেন, “অর্থনৈতিক একজন উদ্বোধনের বিদ্বদ্ভাষক। তিনি বিরোধীগণের যেসব সুখ ব্যক্তিরের বিচ্ছেদে তাঁর অজ্ঞান চালালেন তাঁরাও কনগ্রিয়ের মতই নন। আমি একথা বলতে বাধ্য যে আমাদেবের প্রধানমন্ত্রী জীবনে অনেককিছু শিখেছেন, অনেক জ্ঞান তাঁর, অনেক বুদ্ধি। কিন্তু হৃৎকের বিধ, তাঁর রাজ্যজ্ঞান নেই। বুদ্ধিবিবেচনা সহনশীলতা প্রকৃতি যেসব গুণগুলি মানুষকে অগ্রভাষন করে সেগুলির অভাব প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় লক্ষ্য করে আমরা সর্বাধিক।”

এইভাবে রোষাশ্বক বক্তৃতায় তিনি দেবার পূজন ঘটালেন ডিসয়েলী মন্ত্রী সমূহ।

প্রথম জীবনে ডিসয়েলী ছিলেন সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। তাঁর ‘ভিক্টোরিয়া রো’, ‘ইনকারনাল ম্যাবেক’, ‘পোপালিনা’ প্রকৃতি বইগুলি সে সময়ে যুগে জনপ্রিয় হয়েছিল। কয়েকবার পরাজয়ের পর তিনি স্বল্পকালীন বলের সমুদায় গার্গ্যমেন্টে নিবাসিত হন এবং ৬৪ বছর বয়সে (যখন মানুষ অবসর নেবার কথা ভাবে) তখন প্রথম প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করেন। ডিসয়েলী ছিলেন যোরকর সাম্রাজ্যবাদী। “ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষণে”—এই ছিল তাঁর মোগান।

প্রথম প্রধান মন্ত্রীর গ্রহণ করবার এক বছরের মধ্যেই তিনি বিরোধী গণের নেতা গ্যাডটোন কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। তাই গ্যাডটোনের প্রতি তাঁর বিরূপতার অস্ত ছিলনা আর সে বিরূপতা প্রকাশ পেত জাঁজালো রোষাশ্বক উক্তি দ্বাৰায়।

একবার গার্গ্যমেন্টের একজন সভ্য তাঁকে প্রশ্ন করেন, দুর্ভাগ্য (misfortune) এবং দুর্বিপাক (calamity)—এ দুই-এর মধ্যে তফাত কি?

সঙ্গে সঙ্গে ডিসয়েলী উত্তর দিলেন, “যখন, গ্যাডটোন যদি পুলের উপর থেকে লা পিছলে টেমস নদীতে পড়ে যায় তবে সেটা হবে দুর্ভাগ্য। যদি কেউ তাকে জল থেকে উদ্ধার করে তাড়ায় তোলে তা হলে সেটা হবে দুর্বিপাক।”

১৮৭৬ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে লর্ড ইগারি প্রধান করেন। রাষ্ট্রের অতি গ্রন্থপাত্র ছিলেন তিনি। রাণীকে তিনি শোনায়েতর ভাষায় বলতেন—‘গবীরাণী’। বলতেন—‘রাণীর দেবা করবার অযোগ্য পণ্ডে আমি বড়। জীবনে যা কিছু পেয়েছি তা তো রাণীর কাছে থেকেই।’

সেই বছরেই তিনি ভিক্টোরিয়াকে তারতের সম্রাজ্ঞীরূপে ঘোষণা করলেন।

ডিসয়েলীর মৃত্যু ২১ ডিসেম্বর ১৯০৪ সাল, বুধ ১০শে এপ্রিল ১৯০১।

গ্যাডটোনের মধ্যে ছিলনা ডিসয়েলীর উচ্ছাস বা ভাষার তীব্রতা। তাঁর মধ্যে ছিল

একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনাক্রমে, যখন আচরণ আর বক্তৃতার মধ্যে ছিল ঐক্যমৈত্রিক অথচ একজনকে বৃদ্ধি কর্তার অপরাধের দৃষ্টান্ত।

কোন অবস্থাতেই তাঁকে কখনো অগ্রসৃত করা হইত না। হেন বিবরণ সেই বার লক্ষ্যে তিনি বক্তার পর বক্তা বলতে না পারতেন।

একবার তাঁর দুইবন্ধু তাঁকে অগ্রসৃত করার জন্য এক বক্তৃতা করেন। তাঁরা বিবরণে প্রায়শ্চেষ্টার পানেন এমন এক বিষয়ের অবতারণা করতে হবে যার লক্ষ্যে প্রায়শ্চেষ্টা কিছু সম্ভব প্রকাশ করতে পারবেন না। কিন্তু কি হবে, সেই বিষয়বস্তু বা প্রায়শ্চেষ্টার বিষয়? সুখে গতে তাঁরা একটা পুরাতন সাময়িক পত্রিকা, লেখা বাবা-বেলা লক্ষ্যে একটা প্রবন্ধ আবিষ্কার করলেন। বিবরণ করলেন এই বিষয়ে প্রবন্ধ উত্থাপন করে প্রায়শ্চেষ্টাকে আচরণে প্রবৃত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চেষ্টা তো কোনদিন বাবা-বেলায়নি। তাই নিশ্চয়ই তাঁকে চুপ করে থাকতে হবে।

পরদিন বলাসহরে প্রায়শ্চেষ্টার উপস্থিতিতে, সেই দুই বন্ধু বাবা-বেলা লক্ষ্যে পরামর্শের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছিলেন এ' এক সময়ে হঠাৎ একজন প্রায়শ্চেষ্টাকে প্রবৃত্ত করলেন, 'বাবা-বেলায় ঐতিহ্য এবং ইতিহাস লক্ষ্যে এই বা-আমরা আলোচনা করছি এ লক্ষ্যে আপনি কোন মতামত দিতে পারেন কি?'

বীর বীর প্রায়শ্চেষ্টা বললেন, 'প্রবৃত্ত বন্ধু, আপনাদের আলোচনা শুনে মনে হচ্ছে কোন লক্ষ্যে অসুখ পত্রিকা অনেক মাপে লেখা আমারই একটি প্রবন্ধ আপনাদের এ বিষয়ে প্রেরণা দিয়েছে। নিশ্চয়ই আপনারা আমার সেই প্রবন্ধটি পড়েছেন। অথচ সেই প্রবন্ধের লেখক হিসাবে আমার নাম ছিল না।'

তাঁর কপাতনে বক্তৃতাভারী হৃদয়ের সুখ চূন। তারপর একজন চিত্রকাণ্ড করে উঠলেন, 'বিশ্বকোষ, লাকটা একটা আত্ম বিশ্বকোষ।'

উদারমৈত্রিক বলের নেতা ছিলেন প্রায়শ্চেষ্টা। তার দক্ষতার চারবার প্রবাস মজার পরলোভ করেছিলেন। যেমন আশীর্বাদ তেমনি বার্ষিক ছিলেন। ১৮৭৪ সালে যখন দেবদ্বারের মত প্রধান মন্ত্রীর পর থেকে ইত্বা ছিলেন তখন তাঁর অস্ত্রে মোটা পেন্সন বাঁধ করা হলো। কিন্তু পেন্সন নিতে অস্বীকার করলেন তিনি। বললেন, তাঁর বা-আমর লক্ষ্যে, তাই তাঁর মনোবৃত্তি। স্বাক্ষরকারের অর্থতার ক্ষয় ব্যর্থ হোক এ তিনি চান না। স্বাধীনবনে একবার প্রবাসমন্ত্রী থাকার সময় তাঁর যেমন বুদ্ধির প্রত্যয়ক তিনি নিজেই বিরোধিতা করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিরোধী বলের নেতা লর্ড স্যারিসবারী তাঁর লক্ষ্যে উক্তি করেছিলেন—
The greatest member of the greatest deliberative assembly that the world has ever seen.

লক্ষ্য, ২২ ডিসেম্বর ১৮৭২। মৃত্যু ১২ মে ১৮৯৮।



রহস্যময়ী

গৌরাণকের দে

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর এক নারী গুপ্তচরকে কেন্দ্র করে কত ঘটনা-কল্পনা, কত গল্প না শোনা গিয়েছিলো। যেন হতেছিলো সে বুদ্ধি অলৌকিক কল্পনার অধিকারিনী। ফ্রান্স ডট্টর নামে পরিচিত এক নারী গুপ্তচর সত্যি এক আন্তরিক স্ত্রী করেছিলো বন্ধু-শত্রুরে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনীও তৎকালীন সর্বোচ্চ সর্বপ্রথম পাঠ ১৯১৫ সালে। ফল্যাণ্ডে থেকে ব্রিটেনে এক জার্মান গুপ্তচর আসা মাত্র ধরা পড়ে। তার কাছ থেকেই গোয়েন্দা সন্থা ব্যবহৃত হয়। লোকটি যে বহা পড়ে তার কারণ গুপ্তচরবৃত্তি তার মোটেই ভালো লাগছিলো না। ভয়ে-ভয়ে সে কান্না করছিলো। শেষ-পর্যন্ত নিজেই বহা দেয় ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে। ইংল্যান্ডে এসে সে গুপ্তচরের কাম করেনি। কেবল ওই ঘেঁষে বেআইনী গ্রন্থের করেছিলো। ওই অপরাধে তার মাত্র পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়।

লোকটা বোঝ হব বাচাল। বিজ্ঞানবাদ শুরু করা মাত্র সে নিজেই বলে পেলো অনেক কথা। বললো কেমন করে সে গুপ্তচরবৃত্তিতে তালিম নিয়েছে। তালিম নিয়েছে অ্যানটোপ-এর একটা ঘুরে। তার পরিচালক একটি ঘেঁষে। ঘেঁষেটির ভয়ে সে নাকি তটস্থ থাকতো। অগেল করে জানা পেলো ঘেঁষেটি ফ্রান্স ডট্টর এলিজাবেথ নামে পরিচিত। সে নাকি তরুণী। তার চোখ অদিকল ব্যবহার মতো। গুপ্ত ব্যবহার আদান-প্রদানের যে সাংকেতিক ভাষার কথা লোকটি জানালো দেখা মেল তা সত্যি অস্বাভাবিক। তার উপরে ফল্যাণ্ডের অল্প একজন গুপ্তচরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ রয়েছে। দ্বিতীয় গুপ্তচরটির বাইরের পরিচয় ডাক-টিকিট সংগ্রাহক রূপে। ইংল্যান্ডে আসার সময়ে প্রথম গুপ্তচরটিকে বলা হয়েছে চিঠির উপরে বিভিন্ন বরনের টিকিট লাগিয়ে সেই চিঠি পাঠিয়ে দিতে। সেই টিকিট থেকে দ্বিতীয় গুপ্তচর খেনে নেবে ব্রিটেনের বিভিন্ন নৌ-বাঁটির যুদ্ধ-আহাৎয়ের বরণ ও বহর। যার তারিখ পর্বত পাওয়া বাবে চিঠির উপরকার ছাপ থেকে। তা থেকে জানা বাবে ব্রিটিশ আকাশের চলোকেয়ার বহর। বহর পাঠাবার ওই অভিনব উপায় নাকি ফ্রান্স ডট্টরই আবিষ্কার।

দু'দিন ভাল পরে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সন্থা আয়ো তথ্য সংগ্রহ করলে ওই গুপ্তচরী সম্পর্কে জার্মানী অধিকৃত ফ্রান্সে ওই ঘেঁষেটির বাঁটা পরিচালিত গুপ্তচরবৃত্তি দেখাবার একটা নতুন পর্বত ইংরেজ গোয়েন্দাবাহা আবিষ্কার করলো।

ফল্যাণ্ডের এক তথাক কোম্পানীর ব্যবসায়িক প্রতিিনিধি হিসেবে দু'জন লোক এসেছিলো ইংল্যান্ডে। অংশে তারা জার্মান ঘেঁষেটির প্রেরিত গুপ্তচর। তার ইংল্যান্ডে পৌঁছে লিজেট

বিক্রি করার ছিল যুগে বেড়াতে লগলো: আবারের এক ঘাটি থেকে আরেক ঘাটিতে। অ্যাডমিরালডামে তারাবাড়ী পাঠালো: "এছুরি ৩,০০০ কবোলাস এবং ৮,০০০ হাজারা লিসাচেট রঙনা হয়ে থাকে। তারাবাড়ীর আলম মানে ভিন বানি ব্রিটিশ হুচ-আবাক এবং আটবানি জুঝার বন্দরে প্রেরিত হয়েছে। এই লোকেরা তাহার উদ্ধারকও ভই একই অজ্ঞাত তরঙ্গী।

সামান্য জুনের অস্ত শুগচর জুমন বরা পড়ে। লগনের ঐতিহাসিক কোয়ার নিয়ে গিয়ে তা'দের গুলি করে মারা হয়।

হুচ চলবার সময় ইংরেজরা বহু চেষ্টা করেও কিছু ক্রলিন ডক্টরের প্রেরিত পরিচয় উদ্ধার করতে পারে নি। ১৯১৮ সালের পর তাকে ঘিরে বহু সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী গড়ে ওঠে। এরকম পোনা যায়, ১৯১৪ সালে কলম্বোশে তাকে যুক্তরাজ্যে গণিত করা হয়েছে। পোনা যায় উনিশ শ পনেরো ডি মেলো সালে সে নাকি ছিলো ক্রালো আর্মির গুপ্তচরদের মধ্যে সর্বপ্রধান।

কেউ বলছে তার চুলের ২৫ সোনাগি। সে অসাধারণ রূপসী। আবার কারো মতে একেবারেই সাধাশিবে বহুভেদ। পোনা মেলো সে নাকি যুরোপের কোনো এক দেশের সুবাসকের প্রেবিকা। হেনের নাম আবার একে কখন একে রক্তম বলছে। কেউ জানাচ্ছে 'লাল বাঘ' এই নাম নিয়ে সে গড়ে তুলেছে এক সম্ভবপর-সম্প্রদায় এবং তার শাখা যুরোপের সর্বত্র। বেলগ গুপ্তচর অপলার্ক, কানুকা বা অবস্থিত বলে প্রমাণিত তা'দের নাকি সে এমন ভাবে বিভিন্ন দেশে পাঠায় যাতে তারা বহা পড়ে এবং পরে বন্দুকে প্রাণ হারায়। হাতাবারির পরিচালিকাকে নাকি সে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ক্রলিন ডক্টর সম্পর্কে প্রচুর তথ্য জানা

কালনিক কাহিনীর মধ্যে অতথ্যনি নাটকীয় বা আকর্ষণীয় নয়।

ক্রলিন ডক্টর এলিআবেথের সময় ১৮৮৮ সালে। রক্ত অকলের শেষ প্রান্তে ওয়েস্টকেলিয়ার এক সপ্তগ্রামে। তার বাবা ছিলেন আর্মির বায়ক সমিতির প্রধান কর্মচারীদের একজন। এলিআবেথ বায়কাকাল থেকেই চালাক-চতুর। একটু বাড়ো হয়ে সে বিভিন্ন ভাষা আর অর্থনীতির পাঠ নিতে শুরু করে। দক্ষিণ-পশ্চিম আর্মিনীয় প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় জেগুর্গ থেকে অর্থনৈতিক পি. এইচ. ডি. উপাধি। তার গবেষণার বিষয় ছিলো প্রাচীর আর্মিনীয় বায়কাক সন্য।

এলিআবেথ খাটি টিউটনিক হয়ে। হিটলার যে নারী সেতারের কথা ভেবেছিলেন ঠিক তেমনি একজন। আবার একরাশ সোনাগি চুল। সেপক্ষে তার রক্তের প্রতি বিশ্বাস্তে।

১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এলিআবেথ যেছাই বোগ গিলো কাকে। কিছু যুদ্ধের সময় সাধারণ বেরেরা যে সব কাজ করে বেনন নার্সের কাজ ওয়ার্ডনের কাজ তেমন কালে তার মোটেই উৎসাহ ছিলো না। সে চাচ্ছিলো এমন কাজ যাতে উত্তেজনা, শিথরণ আছে। তার মেয়ে-ময়ে উজ্জাল উদ্দাম মৌরন। যে-কোনো পুরুষকে সে তার মানাবার ক্রমতা রাখে। আর্মির অকিলাররা পর্গত বোক: বনে যায়। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই বন সে অল্পমতি চাইলো আর্মির-অবিকৃত বৈশিষ্ট্যের বাবার, খুশি হয়ে তারা ওকে অল্পমতি গিলে। গাড়িতে আলাপ হলো আর্মিনীয় গুপ্তচর বাহিনীর মেজবের সঙ্গে। ওর বিভা-বুদ্ধি এবং ওর ভাষাজ্ঞান—তাকে আকৃষ্ট করলো। ইংরেজী আর ফরাসী ভাষায় এলিআব অদ্বুত হল।

ব্রাহ্মসে নাগরিকদের চিঠিপত্র পূলে দেপবার একটা কেস ছিলো। মেম্বরের সাংঘাত্যে এলিআবেথ চাকরী পেলো। এই কেসে। নাগরিকদের চিঠি থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার ক'রে সে পাঠাতে লাগলো। আর্ম্যান গুপ্তচর বিভাগে। উৎকল কর্তৃপক্ষের নজর পড়লো এই পরিচরী, সুস্থিতি, অসাধারণ মেয়েটির দিকে।

গুপ্তচর বিভাগের বড় কর্তা তথ্যলেন “এই ক্ষয়ভোগ লোকটি কে হ'ল” তার বহু মেম্বর জানালেন শ্বিনসিই। এই লোকটিকে কর্তার কাছে সম্পর্কীয় হাজির করবেন। নিদিষ্ট দিনে নিদিষ্ট সময়ে কোনো পুরুষ না এসে বছর সূত্রি বয়সের একটা ছন্দরী মেয়ে যখন হাজির হলো তিনি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে সেলেন। এই বয়সের কোনো মেয়ে এর আগে তিনি যেমন নি।

শেষ-পর্বত আর্মানে লন্ডাটের গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান কর্বেল নিকোলাইয়ের নজর পড়ল তার উপরে পড়লো। তখনকার দিনে যা অকল্পনীয়, অসম্ভব, নিকোলাই তাই করলেন। এলিআবেথকে উন্নীত করলেন লেকটেনেন্ট পদে। মেয়েদের মধ্যে একমাত্র এলিআবেথই হলো আর্ম্যান সেনাবাহিনীর অফিসার। নিজের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংয়ে নিয়ে সে নিশে গুপ্তচরবিজ্ঞান তালিম।

কিন্তু নিজে গুপ্তচর হবে এ ইচ্ছা। এলিআবেথের ছিলো না। সে হলো গুপ্তচরদের শিক্ষিকা। তার ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে অগ্নিহুই করতো। কারণ তাদের লেবে এমন ব্যবহার করতো যেন তারা খেরানী পিত। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকই তাই ছিলো। সে লেবে ছেলে-মেয়ে কিংবো-অপরাধের লজ অভিযুক্ত হয়েছে তাদের অনেককে আর্ম্যান কর্তৃপক্ষ পার্সিয়ে দিতে। আনটোপ-এ এলিআবেথের ফুলে। অ-সামান্যিক ছেলেমেয়েরা আর কিছু পাকক বা না পাকক অন্তত আর্ম্যানের হয়ে গুপ্তচরত্ব জি করক এই কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা।

গল্প-ভঙ্গব থেকে যা মনে হয় এলিআবেথ বাস্তবে কিন্তু সে-রকম সফলতা অর্জন করতে পারে নি। কারণ সে প্রায় সব-সময়ই কড়া নজরে ছিলো। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তার প্রকৃত পরিচয় বা জানলেও তার আচনার ববর রাখতো, তার টিকানা জানতো। বেলজিয়ামে ব্রিটেনের বিভিন্ন বরণের গুপ্তচর ছিলো। রাষ্ট্রা সেরাশক্তকারী নজর, ডাকপিরন, বাস্তি-আলা, ফুলের ছাত্র সফলই নজর রাখতো অ্যানটোপের গুপ্তচর-ফুলের দিকে। এমন কি এই ফুলের অনেক ছাত্রের ছবি পর্বত তারা নিয়েছিলো। কলে তারা গুপ্তচরত্ব জি চালাতে যখন ইংল্যান্ডে যায় সবজেরই এবং প্রায় লকে-লকেই বসে পড়ে।

আর্ম্যান গোয়েন্দা-সংস্থা কিন্তু এলিআবেথের কাকের খুবই মূল্য দিয়েছিলো। এই সংস্থা তাকে বহু সমানে সুস্থিত করে এবং ১৯১৮ সালের পরে তার পেনসনের ব্যবস্থা করে।

ফুডের পরে এলিআবেথ বস্তুপ আর্ম্যানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গলিটিকালে ইকনমিক লেকচারার হিসেবে কাল করে। মেয়েদের বিভিন্ন ক্লাবে ফুডের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে বহু বক্তৃতা দেয়। কয়েক বছর পরে সে ক্ষয়যোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তাররা তার পিঠের পিঠাড়া অস্ত্রোপচার ক'রে তাকে বাঁচায়; কিন্তু সে বাকি জীবনের মতো পলু হয়ে পড়ে। তার সুস্থর মেয়ে হঠাৎ নেমে আসে বার্ষিক্যের অভিশাপ।

বিত্যায় মহাফুডের গোড়োতে ক্রলিন ডক্টরের মধ্যস্থতিক অবস্থা। শারীরিক খেদনা লাগবের মত তাকে সেশার আশ্রয় নিতে হয় প্রত্যাহ। ১৯২০ সালে মিত্তনিক পন্থরে তার মৃত্যু হয়। এলিআবেথের বয়স তখন বাঁচান।

বিজ্ঞাপন বিচিত্রা

দ্ব্যুজ্জয় তরবার

শ্রৌণ্ড বিজ্ঞাপনে নানা অদ্ভুত চাহিদা :

উদ্ভট খেয়ালী মনের পরিচয় :

বিচিত্র রসমৃষ্টি ।

দৈনিক পত্রিকাও বড় বড় বিজ্ঞাপনগুলি সবচেয়েই আগনার চোখে পড়ে ।

কিন্তু পত্রিকাতত্ত্বের দ্বিতীয় তৃতীয় পৃষ্ঠায় যে শ্রৌণ্ড বিজ্ঞাপনের ভীড়, তার মধ্যে আপনি সচেতন নব্বয় কেনেন না । অথচ সেই সব বিজ্ঞাপনে কত মজার কটকটার কথা যে বোনা যায়, কত কাহিনী যে প্রকল্প থাকে, কত বিচিত্র মানসতত্ত্বের পরিচয় যে ফুটে ওঠে, তার ইয়ত্তা নেই ।

কর্মবালি, কর্মপ্রার্থী, বাড়ী ভাড়া, শিক্ষক চাই, পাত্রপাত্রী, ব্যক্তিগত, হারানো প্রাপ্তি প্রভৃতি সব ছোট ছোট চার পাঁচ লাইনের বিজ্ঞাপন । কিন্তু সেগুলির মধ্যে থাকে বড় বড় ঘটনার পটভূমিকা, জীবনের নানা সংঘাতের চিত্র ।

যেণ বিদেশের সব বড় বড় বৈরিকেই এই যরণের বিজ্ঞাপনের ছড়ানুড়ি । তাদের মধ্যে কত রক্তের অলংকারও কথা, কত রক্তের অদ্ভুত দাবী আর বাধানা !

যেমন ফরম ওয়াশিংটন পোস্টের একটি বিজ্ঞাপন :

“বাসবাস চাই । আমার বাঃ বলিতেছেন, ভালবাসিয়া বিবাহ করিতে । কিন্তু এই পহর বলিতেছে আজকের শুভই বিবাহ সরকার । এমন কি কেহ রাই বিনি আমার মায়ের নির্ণে অহুসারে আমার উদ্ধার করিতে পাবেন ?”

কলকাতার একটি দৈনিক পত্র থেকে দুটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করছি :

“পাত্রী চাই । যে কোন বয়সের, যে কোন বর্ণের, যে কোন বর্ণের । মূল না থাকিলেও চলিবে । এমন কি, পাত্রীর কোন আত্মপ্রত্যয়ের যদি কোন পুঁত থাকে তাহাও বিবেচ্য নয় । পাত্রীকে কেবল পুঙ্খকর্মনিপুণ ও লেখাপড়াইয়া হইতে হইবে । পাত্র বিজ্ঞানী, অমায়িক, তর, মায়িক ও অন্ধ ।”

“পুঙ্খকর্ম চাই । ক্রাস টেন-এর ছেলেকে প্রত্যহ লঙ্কার দু’বকী পড়াইতে হইবে । ঐ সময় ছাত্রের উকিল-পিতার মতলপও আসেন । তাই ঐ সময় ছাত্রকে আটকাইয়া রাখা সরকার । শিক্ষক মহাশয় পড়াইতে পারেন না হইলেও চলিবে । কিন্তু তিনি বিশেষ বলপাশী হওয়া একান্ত প্রয়োজন । সূত্রগির বা বকুলার হইলে ভাল হয় ।”

আমেরিকার লস এঞ্জেলেস-এর এক পত্রিকার বিজ্ঞাপন :

"এক ঘরওলা একটি বাসস্থান চাই। এমন ঘর চাই য'হার অংশতন স্ত্রীর পক্ষে অনুবিধাজনক হইবে না অর্থাৎ তাঁহাকে তাঁহার মাতার কাছে বাইবার প্রেরণজনক হইবে না, আবার ঘরটি এমন বড়ও না হয় যাহাতে স্ত্রীর মাতা সেই ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতে পারেন।"

পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনেও ও-দেশের পত্রিকাতেও কম সংখ্যক লেখা বেহাওয়ার না। যথা :

"পাত্রী চাই। পাত্রীর অল্প তারিখ ২১শে নভেম্বর হইতে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে হওয়া চাই। পাত্রী জ্যোতিষচর্চা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সময়ের মধ্যে যে সকল নারী অল্পতন তাঁহারা সুসুস্থিত, সত্য স্ত্রী এবং যোগ্যস্বরূপা মাতা হইবার গুণের অধিকারিণী।"

পাত্রটির কপালে এই জিহ্বাটিক লজ্জা হয়েছিল কি না কে জানে।

'ব্যক্তিগত' কলমের একটি বিজ্ঞাপন :

"বিবাহ করিতে উত্তম একটি পুরুষ অতিজ্ঞ ও বয়োষষ্ঠ ব্যক্তিরের অতিমত আশ্রিতে চাহ— যাহারা তাহাকে ঐ কাজে নিযুক্ত করিবেন।"

লক্ষ-দুহু কলমের ওদেশের একটি বিজ্ঞাপন। যম্ম সন্তানের অল্প ঘোষণা :

"বিঃ বিঃ এবং এবং মিসেল মিসেল একরা একরা তোলান ডোলান মিউইয়র্ক মিউইয়র্ক : যম্ম যম্ম সন্তানের সন্তানের অল্প অল্প ঘোষণা ঘোষণা করিতেছেন করিতেছেন।"

যম্ম সন্তান কি না, তাই ঘোষণার প্রতিটি লম্বই ভল ভল।

মিউইয়র্ক লক্ষসন্তানীর একটি হৈনিকের 'পাত্রী চাই' কলমের একটি বিজ্ঞাপন :

"চাহী। যম্ম ৫৮। ৫০ বছর বয়সের পাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত। পাত্রীর অবস্থাই একটি ট্রাষ্টের থাক। আবশ্যক। উত্তরের সহিত যম্ম করিয়া ট্রাষ্টেরের ছবি পাঠাইবেন।"

ওদেশের দ্বারানো প্রাপ্তি কলমের একটি বিজ্ঞাপন :

"দত্ত লক্ষ্মিন হইল দ্বারাইয়াছে একটি কাপানী সুস্থ ও তাহার মনিব, অর্থাৎ পূর্বস্বামী। পূর্বস্বামীকে কেবল না পাইলেও কতি নাই। কিন্তু সুস্থটি কেবল পাইলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব।"

বিলাতের একটি হৈনিকের জৌবদ বিজ্ঞাপনের পুষ্টার অল্প-দুহু সম্প্রদীত বিজ্ঞপ্তি লক্ষ্য করুন :

"বাসোভাব যেহু অনেকগুলি অল্প-দুহু এক সন্তান পিছাইয়া দেওয়া হইল।"

আর একটি "ব্যক্তিগত" বিজ্ঞাপনও লক্ষ্য করবার মত :

"বাঙালী আসিতেছেন। তাঁহার অল্প একটি সেকেন্ড হাও কৌত আবশ্যক। আবাসনায়ত না হইলেও চলিবে।"

লগনের এক হৈনিকে "কর্ম-প্রার্থী"র কলমে একটি বিজ্ঞাপনের আবহার দেখুন :—

"লব্ধগণ-লক্ষ্য ট্রেনো, বুদ্ধিমান মনিব চান। মনিবের ব্যবসা সম্পর্কে কিছু জান থাক।

আবশ্যক তাছাড়া তাঁহার ডিক্টেশন পরিষ্কার ও নিখুঁত এবং ব্যবহার সাক্ষিত ও আনন্দদায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।”

এদেশের ‘ব্যক্তিগত’ কলমে একটি বিচিত্র বিভাগন :

“সুন্দর বিকাল শব্দক ছোট মেয়ের সন্নিবিহিনে হিসাবে থাকিতে চায়।

দে কিছু কাছক ঘেবাইতে পারিবে।”

এদেশের “পাত্র চাই” কলমেও একটি বিভাগন :

“পাত্র চাই। উপযুক্ত অর্থ দিয়া সুপাত্র ক্রয় করিতে চাই। পাত্রের বোমাতা হিসাবে দান দান হইবে। জাতি বিচার নাই। তবে ত্রাশন বংশীরের আবেশন সর্বাঙ্গগণ্য।”

এদেশেরই “পাত্রী চাই” বিভাগের একটি বিভাগনে দাবীর বহু তুলন :

“পাত্রী চাই। লক্ষ্মীনাথ, সুশীলা, বাবাবতী, শ্রদ্ধাসুন্দরী, উত্তমিকান্তা, সুবর্ণকর্ণিনীপুণ্ডা, রত্নন-পট্টরঙ্গী, দানদায়কী, দানী, ২০২২ বছরের কনিষ্ঠ পাত্রী চাই। কয় লক্ষ মুদ্রা পণ দিতে লক্ষ্য তাহা আশাইয়া পাত্রী কটো লম্বিত লিখুন।”

তবায় ঐক্যনিষ্ঠের সব চাইতে সুবোধ্য এবং কঠিন কবিতা ‘লভেলে’। এমন কি লগুন গোয়েটি লোমাইটিও এর একটি আংশের অর্থ উদ্ধার করতে অপারগ হয়। শেব-গর্ভের তবায় লগুনগর কর বহু কবিতা। ত্রাউনিং কবিতাটি বার দুই পড়তে পর মাথা নেকে বলে শুঠেনঃ “কবিতাটি যখন লিখি তখন এর মানে আনন্দ একমাত্র আনি আর আনন্দের ঈশ্বর, কিন্তু এখন এর মানে আনন্দ একমাত্র ঈশ্বর।”

নাট্যমঞ্চ

উদ্ভাসকর

রঙ্গালয়

লোকশিক্ষার আসন।

প্রত্যক্ষভাবে দেশবাসী রঙ্গালয়

হইতে যে শিক্ষা লাভ করে

তাহা চিরদিনের মত তাগাদের মনে

গাঁথা হইয়া যায়।

জাতির পক্ষে রঙ্গালয়

তাই শিক্ষাবিস্তারের একটি বিশেষ ক্ষেত্র।

পাঁচেকড়ি বন্দোপাধ্যায়

যুগ-চিন্তা

নাট্যে সংগীত।

[কলকাতার বেডিস্টার আই প্রবর্তকদের মধ্যে
ধীর নাম চিরকাল প্রচার লব্ধ অসীম অর্থ ধীর নাম আই
আমরা। বেকার বিদ্যুত, সেই সখীত-সাবক বুপেজনাথ
মজুমদারের ধানীর সুর ধীর। তবেছেন তাঁরা। তাঁকে কোনদিন
এই সংখ্যার ওপর একটি অবলুপ্ত বচনা উদ্ধার করে দেওয়া হল]

সমস্ত প্রকৃতি সুরে ধরা। বিশ্বব্রাহ্ম কোন সময়েই বিশ্বপ্রকৃতির সুরধাকাতের বিচ্যাম নেই।
তোমার আলো ছুটে ওঠার পূর্ব হতেই পানীর কাকলিতে আকাশ ভরে ওঠে। সাতাধিন সে সুরের
প্রাতি নেই, লকল সময়েই সেই সুর বৈচিত্র্যের মালা গেঁথে চলছে। জাতির অন্ধকারের বুকে বিজয়ী
অজ্ঞাত মুগ্ধ গুহ্মসেই বা শেষ কোথায়?

হাজির তার মনোভাব প্রকাশ করে পথে। আর প্রকৃতি তার হামের কথা জানায় সুরে।
হাজির বা কিছু উপাধান সংগ্রহ করে নিজেই পড়ে তোলে, তা প্রকৃতি থেকেই সে গেতে অভ্যস্ত।
সেই অজ্ঞ প্রকৃতির বুকে সে একটা সজ্ঞারের বশে ছুটে যেতে চায়, যাবেন পাথরের চক্ষুমেদানো বাতীর

যথোক্ত সে দুটো কুলের সহি কিনে বেধে দেয়। এর কাবণ অজ্ঞানতার ফলেই বোঝা যায় যে প্রকৃতিকে সে কোনমতে ভেঙে যেতে চায়না। সেই অল্প প্রকৃতির মধ্যে যে সুবাসা অবিচ্ছিন্নভাবে রয়ে চলেছে সে স্তরে অবগাহন করে সে ভূপ্রিয়াদের আশা করে। বাইরে কতক সে সমস্যা তা প্রকাশ করায় আবশ্যিকতা উপলব্ধি করেন। কিন্তু অবচেতনতার মধ্যে একটা অতাব থেকে যায়। স্বপ্নের কলহনি, সাগরের গর্জন, বৃক্ষগণের বর্ষাধ্বনি সব কিছুই মধ্যে স্তরের যে একটা আবেদন আছে সেই আবেদনে বাস্তবের মন লাড়ানো দিয়ে পাতের না। মনের সেই চাহিয়া স্তরের দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

প্রকৃতির স্তরের সঙ্গে যদি বাস্তবের কর্তব্য সুর ঠিক মিলতে পারে, যদি পারিপাশ্বিকতার দ্বারাকে অন্ধুর রেখে কেউ মনুর স্তরে গান গায়, তা হলে সে জিম্বি বাস্তবের আন্তর্মিহিততাকে পর্যায় আন্দোলিত করে তুলবে। আমরা যখন মিলে কথা বলি তখন বাস্তবের খুব ভাললগনে কিন্তু কথা যতই মিলে কত না কেন তার একটা শেষ বা ছেদ আছে, কিন্তু গানের স্তরের কোথাও বামবার অবকাশ নেই, সুর শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার রেখাটা যেন কিছুতেই মিলিয়ে যায় না। মানব অস্তরের অতি দৃষ্টি অজ্ঞাতিকে তা স্পর্শ করে বলেই স্তরের মূল্য কথায় চেয়ে বেশী।

কিন্তু এই স্তরের দৃষ্টি কেটে যায় তখনই যখন তার মধ্যে কেউ বসেছে। তাবের আশ্রয়ানী করে। কর্তব্য দ্বারা কিবা কার্যের দ্বারা এই কোক পারিপাশ্বিকতার বিকৃতি বা অসামঞ্জস্য স্তরকে ব্যাহত করে। স্বপ্নে যে ভাবের গান বা সুর বাস্তবের মনকে স্পর্শ করে, বাসরঘরে সেই গানই কৌতুকের স্রষ্টা করে। পারিপাশ্বিকতা ও সুর যেন নবম্পত্তির পাঁচছাত্তার বড় অক্ষর মিলন-প্রদ্বিত আঁহা। আশ্রয়ের প্রাচীরে সুরময়ীরা এই কথাটা খুব ভাল করে বুঝতে বলেই তাঁরা প্রত্যেক স্তরের প্রকাশ কেন কেন লম্বা বহুতা উচিত তা নিহিত করে দিয়ে গেছেন, তার কাবণ তাঁরা বুঝতে যে কোন সময় বাস্তবের মন কি সুর চায়। নাটকের মধ্যেও এই স্তরের যেকোনো প্রয়োজনীয়তা আছে এইবার সেই নিয়ে আলোচনা করবো।

নাটকীয় রসকে বসীভূত করতে নাট্যরসগীত যে কতবারি সহায়তা করে তা ধীরে পাঠ্যতা নাটক বেধার প্রয়োগ হয়েছে, কিবা শিশিরস্রাবের আত্মকী প্রবেশিত “সীতা” দ্বারা বেধেছেন তাঁরা বুঝতে পারছেন। যখন শিশিরস্রাব “সীতা” আরম্ভ করলে তখন তাঁর অভিনয় ও শিকারান নিখুঁত রসেও একটা জিনিসের অতাব তখন যাব কহিলুম। মনে হজিল সব জিনিসটাই স্তরে বাঁধা হয়েছে বটে কিন্তু কোথায় যেন একটা তার ঠিকমত বাঁধা হয়নি—কি যেন একটা পুস্ততা কোথায় ভরে গিয়েছে। তখনই যেন হোল বহু-লক্ষ্যের সাহায্যে সেই অপরিপূর্ণতার অতাব হঠাৎ দূর হতে পারে—হলও তাই। অভিনয়ের বিজ্ঞি অশেষলি যেন বাঁধি স্তরে বাঁধা পড়লো। নাট্যকলায়নিক ধান্ধেই তার প্রণয়না করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সবচে অভিনয়টি দ্বারা বহুসকীতে একটা পরিপূর্ণতা লাভ করল। বহু স্তরে তখন বহুসকীতে বাবদ্য করা হোল। শিশিরস্রাবের নিধের অভিনয়ও যেন আরও সজীব হয়ে উঠল। একটি স্তরের কথা স্তরিত বহুপ উল্লেখ করা যেতে পারে। সীতার বিরহে রামের স্তব যখন একটা বিরাট পুস্ততার ভরে উঠেছে, সেইসময় চতুর্থ বর্ষ পরে বালক লবের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। সজ্জার স্তব আলোকে অধোদ্যায় প্রাণার তখন স্তবস্রব হয়ে উঠেছে, পূরে বাঁধি অস্টট কল্প সূর্যনার যেন তার বিরহ-বাধা স্তরে পড়ছে—এমনিই এক বিশ্বাসের

সময়ে যিনি সোথে নিরাশ্রিত। যাতার বিচার প্রার্থনা করতে ছুটে এল তিখারী বাবুপুর লম্বা তার পিতার কাছে। পিতাকে বেবেই তার অভিমানে চ'ল, কোন কথা না শুনে পিতার সত্যতার আহ্বান উপেক্ষা করে সে যখন ছুটে চলে গেল তখন অভ্যর্থনা লাভের হঠাৎ হঠাৎ। সে সময় সকলের মুখ অতিব্যক্তি বহুসঙ্কীর্ণের দাবায়ে। যেন মুঠ হয়ে উঠল। অথোথার প্রাঙ্গণে সোপানে মুদ্রিত নিশ্চয়-বাহের সঙ্কল্প মনোবেদনা তখন বীণী হুয়ের হুয়ের বিয়ে হুই সেই প্রাঙ্গণের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কেঁবে ভেঁনি প্রত্যেক দর্শকের অধরদ্বারে দুটিয়ে পড়ে তাঁর প্রাণের কীভাবে ফুলছিল। যে বেদনা কথার মধ্যে দিগে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে না সেই বেদনা হুয়ের বয়্য বিয়ে আশ্রয়কাল করল। এই বানে বহুসঙ্কীর্ণের প্রয়োজনীয়তা যে কতবারি তা নাট্যসিঁকেরা বিবেচনা করে বেবেদনা। বহু-সঙ্কীর্ণ অভিনয়কে আচ্ছন্ন করেনা, সে অভিনয়ের বিকাশের পথে সাহায্য করে।

অভিনয়ের সময় মাঝে মাঝে অতি বৃহৎ-সঙ্কীর্ণ নাটকের প্রাণকে শীলায়িত তাহে প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু যিনি নাটকের মাঝে হুয়ের দাবায়ে দুটিয়ে তোলাবার চেষ্টা করবেন তিনি আপসে সেই নাটকের তাৎপরি, কি সে প্রকাশ করতে চায় তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করবেন। আর একটি সকলের বড় দরকারী—হুয়ের মধ্যে-বহু-হুওয়া, যে হুয়ে বহু-নেই সে হুই নিশ্চয় বার্ষ্য-প্রোতবা।

অনেকে বাংলা নাটকে বা লম্বা ভিত্তি মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য হুই লংঘনেনা করে কতিপয় প্রার্থনা করতে যান কিন্তু তা অনেকেরই ভাল লাগেনা। এটা পুঁই আত্মবিক। কারণ ওদেরই সঙ্কীর্ণের লগে ওদেরই সঙ্কীর্ণের হুয়েই পার্থক্য আছে। কোনটী ভাল বা কাগাপ তার তুলনা অবশ্য করতে চাইনা। তবে এটা ঠিক, বাহুয়ের প্রবেশিত্রয়ের একটা পংক্তির আছে—সেই লংঘন-বিহোদী কোন হুইকে সে প্রাণের লগে গ্রহণ করতে পারে না।

তারপর মনে করুন যেখানকার যে জিনিষ সেখানে সেই জিনিষের অলঙ্কারে ঘটলে তার বহু-বিচ্ছাতি দ্বারা লঙ্ঘননা পড়ে পড়ে। চৈতন্যলীলা অভিনয়ে কীওনের হুয়ের পরিবর্তে যদি বিশ্লিষ্ট ব্যাও দাবনা যেন তাহলে সেটি শুধু বসন্তের কহবে না বসন্তীতিকে নিত্যন্ত অকলংঘের মত বিচ্ছিন্ন করে ফুলবে। গুয়ের পথে বীণী হুওয়া প্রাণলম্বী হবে গিরানোর টুনটুন-এ তার লঙ্ঘনের একাংশও হবে না। পারিপার্শ্বিকভাবে বা যে সময়ের যে তাহে হুওয়া উচিত তা বিশ্লেষণ করে বিভাও করে যিনি হুই নিরাশ্রিত করবেন তিনিই প্রকৃত বসন্তা হিলাবে নাট্যকলাদোদী মাজেই আশীর্বাদভাজন হবেন।

কৃষ্ণপ্রদীপ মল্লিক

ভাবে বসমত কুটাইতে হইবে তাহা শিক্ষার অস্ত শিক্ষকের কাছে অত বাধা নুঁড়িবার প্রয়োজন কি ?
 ঠোঁট করিলে বসন বাস্তব অসম্মত প্রতিমিহ চক্ষের সমক্ষে আসল এবং বাস্তবিক চিত্রসমূহ দেখিতে পাওয়া
 যাইতে পারে তখন নকল দেখিয়া শিক্ষা করিবার আবশ্যক কি ? মনে করুন একজনকে “ইংরেজি”
 কৃমিকার অভিনয় করিতে হইবে। তিনি শিক্ষা নিতেছেন তিনি বাঙালী। কিছুতেই তিনি লাহোরের নিখুঁত
 চিত্র দেখাইতে পারিতেছেন না—তাহার উপর তাঁহার (অর্থাৎ শিক্ষক মহোদয়ের) নিকট অভিনেতা
 যাহা দেখিলেন সেটুকু সম্বলই নিখুঁত ভাবে অভ্যসরণ করিতে পারিলেন না—অনেকটা বাধ পড়িল।
 সুতরাং ‘আসল’ হইতে তাহা হইল—হোমিওপ্যাথি মতে mother tincture হইতে হইবত অথবা
 পঞ্চমত dilution হইয়া গিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা যদি পথে, চাটে, ঘাটে, কিম্বা অকস্মে অথবা
 কলম্বে ইংরেজের কথাবার্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গী, গতিবিধি মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করা যায়,
 কতকটা তাহা হইলে শিক্ষা লাভ হওয়া সম্ভব—মনে মনে বুঝিয়া দেখুন। সাহস ক্রোধোদ্ভূত হইলে
 কিম্বা অতিশয় আনন্দলাভ করিলে কিম্বা বোকাচ্ছন্ন হলে অথবা হোপাত্তির হইলে, অন্যভাবে
 থাকিলে, কথার্তী হইলে, সাধাত পাইলে কিম্বা সুবচন করে—বুদ্ধিমান অভিনেতা অথবা বুদ্ধিমতী
 অভিনেত্রী সে সমস্ত নিজ নিজ পুর্বে অথবা পরে সংলাপে বসিয়া আলোচনাই শিক্ষা করিতে পারেন।

একস্থানে নটগুরু সিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন—“গতিভেদা বলেম—বাক্যভঙ্গ্য মনোভঙ্গ্যের প্রতিরূপ-
 দায় ০০০ মনোভঙ্গ্যে বাহা নাই বাক্যভঙ্গ্যেও তাহা নাই। এই মনোভঙ্গ্য-রচনালয়ের অভিনয়
 একজন দর্পক মনোভঙ্গ্যে বসিয়া নিত্য দেখেন কিন্তু অভিনেতা আপনায় অভিনয়েই বিভোর, দর্পকের
 প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়েনা। এই বাক্যভঙ্গ্য-রচনালয়ে মনো-নাট্য ক্ষেত্রের জোয়ারভাটা পড়ে এবং দেখিতে
 পাওয়া যায় যে, বার্ষিক বাস্তবপ্রতিভাতে অভিনেতারা অভিনয় কার্যে নিমগ্ন আছেন।”

তিনিহাছি অগণিত্যত নট সার হেনরি আর্ডিং তাহাজের সীমান-বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন।
 উদ্বেত, ভুলির আঘাতে বোঝা বশব্দেই কি ভাবে বরাপাই হইয়া প্রোণতাপ করে, মুহূর্ত্ত হ্রস্বা কিতাবে
 সে ভোগ করে—মুহূর্ত্ত ছাড়া পড়িলে কি প্রকার সুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ষ হয়, মুহূর্ত্ত অধ্যবসিত পূর্বে মুহূর্ত্ত
 বোঝা কি প্রকারে বহন বিকৃত করে—এই সমস্ত বাস্তবিক চিত্র নিখুঁতভাবে জগতে অঙ্কিত করা।

প্যারিসের কোন একজন দ্বন্দ্ব অভিনেতা একদিন কোন একটি হোটেল প্রবেশ করিয়া
 দেখিলেন—তাঁহার একজন প্রিয় বন্ধু তথায় বসিয়া প্রহুস্রমণে অস্তিত্ব দোলের সহিত কথাবার্তা
 করিতেছেন। তিনি হোটেল প্রবেশ করিয়াই তাঁহার সেই বন্ধুটিকে সন্ধান করিয়া বলিলেন—
 “ওহে! ইংলণ্ড থেকে তোমার মক সংবাদ এলোহে।” তিনিবাহার বন্ধুটি অস্তিত্ব ভীত হইয়া শব্দভাঙে
 জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি—কি—কি—কি সংবাদ?” অভিনেতা বলিলেন—“তোমার একমাত্র পুত্র কলে
 হঠাৎ প্রেমে মারা গেছে!” অকস্মাৎ এই ভয়ঙ্কর খেলাঘোড়ে একমাত্র উপস্থিত পুত্রের বিয়োগ বার্তা
 অরণে হস্ততাপ্য শিতার বেগন সুখতাপ ও লক্ষণাবি প্রকাশিত হয়—সে ভয়লোকে নিভরই
 সেই সমস্তগুলি দেখিতে পাওয়া গেল। অভিনেতা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া,
 জ্বরজন্য করিয়া—কিছুকণ পরে বন্ধুকে সাধনা দিয়া বলিলেন,—“মার্কিনা কর, তোমাকে অনর্থক একজন
 মনোকষ্ট বিলাস। তোমার পুত্রের সংবাদ মকল এই খেব তাহার টেলিগ্রাম। আসাকে ঠিক এইরূপে
 একটি নৃতন কৃমিকার অভিনয় করিতে হইবে। আমি মহলায় কিছুতেই অকস্মাৎ পুত্রশোকে সুস্থান
 শিতার ভাব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এইবার দেখিয়া লইয়া শিক্ষা করিতে পারিহাছি।”

ভূশেন্সমাখ বন্দ্যোপাধ্যায়

নব-নব রূপে

মাইকে পাগল। এই নামে লক্ষ্যটি একটি নাট্যগোষ্ঠী
বেশদূর বিস্তারিতরূপে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পবন' পত্রের নাট্যরূপ
পরিবেশন করেছেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন রামধন
চট্টোপাধ্যায়। বিজয় মজুমদার ও দেবরঞ্জন বসু মল্লিক ছিলেন নাট্য নির্দেশদাতা। শিল্পীমণ্ডলের প্রচেষ্টার
অভিনয় প্রণয়ন করে আছে। প্রথম চরিত্র দুঃখভোগের ভূমিকায় দেবরঞ্জন বসু মল্লিক নাট্য প্রতিষ্ঠার
স্বাক্ষর রাখেন। অত্যন্ত চরিত্রে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন শিল্পী ভট্টাচার্য, বিজয় মজুমদার, কলী
মাল্যকার, রামচন্দ্র ঘোষক। আলোক সম্পাদিত বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছেন অরুণ রায়। অঙ্কিত
চট্টোপাধ্যায় ও চিত্র বসু মল্লিকের দ্বারা বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

আগামী। প্রথম প্রযোজনা হল আগামী শিল্পীমণ্ডল পৈলেন শুধু নিয়োগের অনগ্রসর
নাটক 'ভবী' মঞ্চ করে। তখন মজুমদারের নির্দেশনার নাট্যভিনয় বর্ণনায় পরিচয় করে।
অগ্রসর করেন দেবরঞ্জন বসুচট্টোপাধ্যায়, পৈলেন আচা, অনাবিকা। তার অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়,
নিপা পাত্র, বিজয় বসু, সুমার বসু। বিকাশ সেন, চিত্র মল্লিক, গোটা বসুচট্টোপাধ্যায়, সুবীণা,
উম্মেদ আচা, প্রদীপ চৌধুরী, কল্যাণ কর্ণকর, দেবপ্রসাদ মুখার্জী ও মল্লিক মজুমদার। আলোক সম্পাদিত
ও লক্ষিত পরিচালনার গোপাল পাত্র, তখন যে ও শিবনাথ ধ্যানাঙ্গী কৃতিত্বের নকল রাখেন।

সংগীতী শিল্পীগোষ্ঠী। বর্তমান নাট্যভিনয়ের অগ্রসর ওপর আলোক-সম্পাদিত কল্যাণ
দায়ে যে বাংলা নাটক আজ বিশ্ববাসীর কাছে নতুনতর পরিচয় দিচ্ছে, কেবলমাত্র বাস্তব সমস্যার
কথাই বোঝা করে না। শিল্পীগোষ্ঠীর লক্ষ্য হল বসুচট্টোপাধ্যায়ের 'বিশেষী' নাটকটির অভিনয় করে সেই
কথাই প্রদান করলেন। বিশেষী এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নাটক। তখন রায়ের নির্দেশনার অভিনয়
আগাম্যের দৃষ্টান্ত হয়েছিল। সুমার হরের প্রভুত্ব এবং পি, কে, রায়ের সুমারী নাট্যের বসুচট্টোপাধ্যায়
রচনা। অত্যন্ত চরিত্রে অভিনয় করেন অরুণী ভট্টাচার্য, রেখা দাশ, শিল্পী দাস, ও অশ্বিনী
চট্টোপাধ্যায়।

জ্যোতির্বিদ্য ইমজিটিউট। অনিল বসু বসু রচিত 'বীজতি' নামে নাটকটি এঁরা বিশেষ সাফল্যের
সঙ্গে মঞ্চ করেন। প্রত্যন্ত লাবিড়র নাট্য নির্দেশনা বিশেষ প্রণয়নের দাবী রাখে। চরিত্র চিত্রণে
যেই সুযোগ্যতা, সুকান্তা গঙ্গোপাধ্যায়, দীনা বসু, প্রত্যন্ত লাবিড়র, নভোজিৎ ঘোষ, গোবিন্দ
বসুচট্টোপাধ্যায়, নন্দী দাস ও সুমার গুপ্ত বর্ণনায় আনন্দদান করতে সক্ষম হন।

রূপ ও ভাষা। পৈলেন সুযোগ্যতার 'অন্ধ পুঁথি' নামে নাটকটি অভিনয় করে এই
লক্ষ্যের শিল্পীরা বর্ণনায় বিশেষভাবে অগ্রসর করতে সক্ষম হন। বিভিন্ন ভূমিকায় রবীন্দ্র মজুমদার,
শ্রীতি দে, দীনা দাস, ভারতী চৌধুরী ও তিরিচ শুভ উজ্জ্বলের নাট্য-লক্ষ্য প্রণয়ন করেন।
পরিচালনা ছিলেন শশী বসু।

সেখলীপদ গুপ্তপ্রদর্শন দ্রাব। এই লক্ষ্যে লক্ষ্যটি যে একাধিক। অভিনয়ের প্রতিযোগিতা
প্রদর্শন করেছিলেন তার কলাকল একাধিক হয়েছে। কোচবিহার, হলবিহারী, আদিপুত্র দ্রাব
প্রকৃতি স্থানের বসু নাট্যলক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার অগ্রসর করেছিল। প্রেত অভিনেতা নির্বাচিত
হয়েছেন দেবপ্রসাদ গুপ্তচট্টোপাধ্যায় (ভাষার দাবী রাখা)। দ্বিতীয় প্রেত অভিনেতা দ্বিধা দাশ (সুখ)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—কল্যাণী মিত্র (বৃন্দ) ও পূর্ববী নন্দী (ভাণ্ডার মাথি বন্ধন) ।

কল্যাণী মিত্র (বৃন্দ) ।

অনুকাশ । হৃদয় কলকাতার এই নতুন নাট্যসংঘ। সম্প্রতি প্রকাশ্যে চৌধুরী 'প্রত্যাবর্তন' নাটকটি অভিনয় করেছেন। পরিচালনার ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সামগ্রিক ভাবে নাট্য-পরিবেশন বিশেষ উত্তম বরেন্দ্রের মা হলেও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে কল্যাণী মিত্র, সুবোধিনী, চিত্তরঞ্জন দাস এবং মণিকা বোম্বের নাম করা যেতে পারে ।

শ্রীমতীম্বা । উক্ত কলকাতার এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সপ্তমবার্ষিক অর্ন্তমানে উপলক্ষে বীরেন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' নাট্যনাট্যটি বিশেষ সাক্ষ্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। সন্দেহ পরিচালক বরেন্দ্র ও নৃত্য নির্দেশক পঙ্কজ ভট্টাচার্যের সন্তান সৃষ্টিতত্ত্বের ফলে নাটকটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। পঙ্কজ ভট্টাচার্যের অভিনয়ে বলগেন (কণ্ঠে বরেন্দ্র ও) এখানে মৃত্যু। 'ভাণ্ডার', 'কোঠাল', উত্তর ও প্রধান সঙ্গীত সৃষ্টিকার বাক্যেও পঙ্কজ, সুবোধী, পমিত চ্যাটার্জী, তেজা ও নীলির নৃত্য বিশেষ প্রশংসার্পণ। অত্র সৃষ্টিকার পঙ্কজ, বোধ, ব্রজা, লাহা, মণিকা, দ্বন্দ্ব ও কল্যাণী দ্বারা প্রদর্শিত নৃত্য বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। সন্দেহে অল্প পঙ্কজ, অশোক দাস, ভোলাদেব দাস, শিখা ও, বীণা দাসদ্বারা, অনিভা সুবোধিনী প্রভৃতির মনোবন্ধন করেন। অর্ন্তমানে স্ত্রীকানিনাথের মুকুতিময় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোগমত্রে প্রশংসা লাভ করে ।

মর্ম ক্যালকাটা ড্রাম্যাটিক ক্লাব । সত্তর বছরিত 'দামাই' নাটকটি লাফলোর সঙ্গে অভিনীত হয়েছে এই নাট্য সংঘের সুন্দরী শিল্পীদের দ্বারা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন কল্যাণী ভট্টাচার্য, বিমল দেব, ও ভগ্নন সুবোধিনী, ও বিজয় দাস। বিশেষ গুণের সুরঙ্গী প্রদর্শনীর ।

বিজিতা । দ্বারদ্বার দাম্পত্যের 'বহুলতলা পি. এল. ক্যান্স' দাম্পত্যদ্বারের সীমার বেরনার নাট্যলগ্ন্য। সম্প্রতি বিজিতা নাট্য সম্প্রদায় মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ নাটকটির পুনরুজ্জীবন করেন। অভিনয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মল্লিকা ভট্টাচার্যের অনবদ্য চরিত্র উপস্থাপন। অত্র চরিত্রে প্রাথমিক করেন বিবল দেব, খগেন চক্রবর্তী, কল্যাণী মিত্র, ভগ্নন মিত্র, সুবোধী বসু ও সন্দেহ মিত্র ।

কলকাতার (রাণাঘাট) । রাণাঘাটের বীরেন্দ্র তখন মঞ্চ এই সংঘের শিল্পীরা 'শেষ দৃশ্য' নাটকের অভিনয়ে দৃষ্টকণের আনন্দ দান করেন। রাণাঘাটের পরিচালনা উত্তমানে পরিচালক। প্রায় ত্রয়োদশ চরিত্রচিত্রিত ও মল্লিকা । অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যনাথ বসু, বিনোদ, শিখা, শিখার ইন্দ্রবর্তী বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে ।

শ্রী. প্রমুখ অভিনয় ক্লাব । হৃদয় পূর্ব হেলগের অত্র সৃষ্ট নাট্যলগ্ন্যের সত্তর। দীর্ঘ সুবোধিনীদ্বারা 'বহুল' নাটকের অভিনয় করে ব্যাপ্তিলাভ করেছেন। পরিচালনার দ্বারদ্বার ভট্টাচার্য বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। হলগত অভিনয়ের সত্তর সামগ্রিক নাটকটি বেরদান ও আকর্ষণীয় রূপ নিয়েছিল। অভিনয়ে অল্প প্রদর্শন করেছিলেন, ইরা মিত্র, কল্যাণী মিত্র, সুবোধী, পঙ্কজ চক্রবর্তী, কল্যাণী, কল্যাণী, দ্বন্দ্ব, সুবোধী সুবোধিনী, ভোলা চৌধুরী, অনিল দাম্পত্য, নীলিন দাম্পত্য, দ্বন্দ্ব চক্রবর্তী বিনোদ ও শিখার ও ।

চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নতুন সারী চোরে

রাতের বকরে কান পেছে সাধার ঘর লাগল চুল এবং তার আল্পাংকের ভিতর থেকে একটা ছোট কুহুর উকি মারছে সেই যেহেটি সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য পুলিশ হাফিং-পন্ডির ইন্সপেক্টর হোকারীলের নির্দেশ দিয়েছে। যেহেটি চোব বাঁধায়েনো জগে বকলে হোকারীলের যেটা অর্থ নষ্টা দিতে হবে।

পুলিশ বলছে সংশ্লিষ্ট ছাউ পড়া যেহেটি আসলে একটি ডাকাত। যখন দোকানদাররা তার কুমার সুবের দিকে একপুটে তাকিয়ে থাকে এবং তার খুঁসে কুহুরটাকে দেখতে থাকে সেই হুবোলে যেহেটির লঙ্কারী হোকারীনের জিনিসপত্র সহিয়ে কেনে। চুরির এই নতুন পদ্ধতি ইন্সপেক্টর হোকারীলের বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছে।

আল্ফার্ড অল্ডসহা!

মেডিকো। পরবের পাবলিক হাসপাতালের ডাক্তার জানছেন তাঁর হাসপাতালে একটি গুরুত্বপূর্ণ মেয়ে ভর্তি হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই তার সম্ভাবন হবে। যেহেটির বয়স মাত্র মণ। নাম তার হরটেনসিয়া গোমেজ জুয়ান। তার সাধারণ আত্ম বেশ ভালো। যেহেটি অবিরাহিতা।

অনুভূত আত্মহত্যা

লিকাসো। পরবের হোলে রহাট ডিক্সন ডাক্তারীবেলা ঘরে ব'লে টেলিভিশন দেখছিলেন। দেখছিলেন পলার বড়ি দিয়ে একটি লোকের আত্মহত্যার দৃশ্য। পরদিন তোরে দেখা গেলো সে-ও একই উপায়ে আত্মহত্যা করেছে।

আমেরিকারই আরেক শহরে একমল বাড়ির আগের গ্রোথ করণো অনুভূত বেশে। মশকন হারেনের প্রত্যেকেরই মাথা ভাঙা। দৃশ্যটা যে খুবই উপভোগ্য হয়েছিলো লেখক সেই।

সাহ্যারার দ্বিভে মন্ত হ্রদ

আলবিহালের একটা বকরের কাগজ থেকে কান পেলে বিশ্বের বৃহত্তম সঙ্কল্প সাধারণ হুবোনে তুমার বুক কেটে গেলো এক কোটা ভল পাবার আশা সেই তার নিচেই রয়েছে তাছা। কলের মত এক হ্রদ। পানীর কলের এই হ্রদটির আয়তন ২২১,০০০ বর্গ মাইল। হ্রদটির অবস্থান বঙ্গপুট থেকে ৩,৫৫৫ থেকে ২,৭৫০ ফুট নিচে। হ্রদটি চ'লে গেছে আলবেনিয়া, টিউনিসিয়া এবং লিবিয়ার ভলা দিয়ে।

আগেরগিরি বিশেষজ্ঞ

পৃথিবীর য. য.প. য.যানেই আগেরগিরি অস্থায়ীভাবে বটে সেই ভয়াবহ অকালের হাতের ভেতল পঠায় এই অকালেই। সেই বিশেষজ্ঞের নাম হার্লম তেজিয়ের। বাকি তার বেশকিছনে। চমৎকার ব্যক্তি। মাথায় একরাশ লাল চুল। যখনই কোনো ভারসার অস্থি-গিরির বিফোরম বটে, সনে-সনে তারহাতি আলোড়িত করে। ‘আসছি’ আনিয় সেন তেজিয়ের। ঘটনাবলি পৌছেই ঢুকে পড়েন আশাভূষণের মধ্যে। কেন বিফোরম ঘটলো তা জানতে চেষ্টা। এ যেন কোনও নতুন নতুন ঢুক পরতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া। নিচে তাপ ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কম নয়। মিনিটে মিনিটে বেরিয়ে আসছে হাস্যরোচকারী খুঁজ বিস্ময় গ্যাস। সুস্থি পাতাল আনিবীর বিধ-নিধান। এটি মধ্যে মধ্যে পড়েন তেজিয়ের। এখনো যে তিনি বেঁচে আছেন এই যোবনের আশ্বস্তের বিষয়।

অস্ব-নিয়ন্ত্রক ব্যক্তি

আধুনিক অস্ব-নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি, বিশেষ করে ‘বডি’র ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন যোগে আগের গার অনেকখানি করিয়ে দিয়েছে। এই কারণেই প্রায় সব দেশের সরকারই এই সব পদ্ধতিতে সন্ধান ও সাহায্য করেন। একই কারণে বহু-তর পাওয়া যাচ্ছে অস্ব-নিয়ন্ত্রক নানা ঔষধ ও মিনিসপার।

মিউইজর্ক মহরের একটি অফিস পৌরসমিতির হাসপাতাল পুলিশার পর থেকে সেখানে এক বছরের মধ্যেই অস্বের হা’র পতন হা’র তাল তাল পেয়েছে। তাছাড়া অস্ব-নিয়ন্ত্রক হা’রও প্রচলিত তাল করার পর থেকে অপর্যায়ন পতনগতির সংখ্যা প্রায় পতন হা’র পতন তাল করে গেছে। ‘শিকার’, ‘লল এজেন্সি ইত্যাদি এলাকাতেও তাল পাওয়া গেছে অস্ব-নিয়ন্ত্রক হা’র।

অভিনেতার আকর

যেতারলি হিলের পনোয়া-বাণী বহরের একটি মেয়ে স্থানীয় জনস্বতন্ত্র একটি সমিতির পক্ষ থেকে দিয়েছিলো টাংগা তুলতে। এক বিখ্যাত অভিনেতার ব্যক্তিতে দিয়ে সে বহুবার কলি বেশ টিপলো। অভিনেতা যখন এলে যখন সরকার তুলে হিলের ও টাংগা হিতে রাণী হিলের তখন জানবে যেহেটির তো অভিনেতার বহর অবস্থা। প্রায় হাওয়া তালতে-তালতে সে ছুটে এলো স্থানীয় সমিতির পরিচালকের কাছে। হাওয়াতে-হাওয়াতে বললো: “জানেন তিনি আমাকে কী দিয়েছেন? পাঁচ ল ডলারের একখানা চেক।”

“তাই না কি। এতো খুঁজি জানিয়ে কখন। কিছু এক মিনিট। চেকটাতে তো বাক্য নেই।” মেয়েটি বললো: “বাক্যে কী করে? ওটা যে আমি কেটে আমার অটোগ্রাফ বইতে লাগিয়েছি।”

সিগারেটের লেবেলে

জানেন কি ১৯৬৫ সালে আমেরিকার একটি লক্ষ্য আইন পাশ হয়েছে? এর ফলে সিগারেটের প্রত্যেকটি কাউন্সি ও গ্যাকেটের লেবেলে অবশ্যই লেখা থাকে চাই যে সিগ্রেট খেলে ক্যান্সার কত হতে পারে। এতে কিছু খুশান না করে বহর বাড়বে। কারণ, মিথিষ্টি জিনিসের প্রতি মাত্রের আকর্ষণ চিরকালের। তবে আশ্চর্যের বিষয় আইনটা পাশ হয়েছে বিভিন্ন সিগারেট কোম্পানীর সমিতি অজুহাতে ও ব্যাধি।

ক্যাথলিক শহরে জঙ্গলনিরূপণ বীজত

গোড়া ক্যাথলিক শহর কর্পাস জিন্ডি। কিন্তু রোমান ক্যাথলিকদের তাঁর বিবেচিতা লেবেও জঙ্গলনিরূপণের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের আর কিছুদিনের মধ্যেই চারটি জিন্ডিকে জঙ্গলনিরূপণ বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসেন মাল মিলিয়া। ক্যাথলিক চার্চ অফিস এখনো এ বিষয়ে লম্বাকারের বিচোষিতা করছে এবং মনে করে যে জঙ্গলনিরূপণ বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা আর লম্বাকারী আর্থের অপব্যয় করা একই ব্যাপার।

ভাক্সার স্পক

ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ জুনিয়রটি জিন্ডিকে ভাক্সার বেঞ্জামিন স্পক-এর মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো এক তরুণী মায়ের। যা অস্বাভাবিক চোখে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন: “আমি এতদিন তোমার এলেনি স্পক বৃত্তি কোনো বইয়ের নাম।”

ভাক্সার স্পক বই নয়; কিন্তু তিনি মায়েরের পক্ষে বইয়ের চাইতেও বেশি। তাঁর লেখা ‘কমন্সেল বুক অব দ্যেবী এ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার’ বইখানা ১৯৪৬ প্রকাশিত হবার পর কেবল পেপারব্যাক লেভেলই ১৭০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। এই বিষয়ে তাঁর বই পাঠা নিয়েছে বাইবেল, শেভেন্সিয়ার আর ইয়ান ক্রেনিয়ের লেলে। দুকুয়াট্রে এখনো তাঁর বই ছুঁছ’রে কাটছে।

ভাক্সার স্পক-এর গল্প লম্বাক, অনাক্ষর। তাঁর গ্রন্থ অস্বদিত হয়েছে পুঁথির নানা ভাষায়। ইয়ানের লাহের বোন আর পারসিক ভাষায় এইখানির তর্জমা করেছে। হিন্দী, বাই এবং মারাঠী ভাষাতেও বইখানি অলম্বাক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাক্সার স্পকের হলেল বাটের উপরে হলেও তাঁর বাবা অটুট।

জল্লের জুলো রাত্তা

১৮০০ মাইল দৈর্ঘ্যের যে রাত্তাটি ভারত গজ ছয় বছর ধরে লীমাক বরাবর তৈরী ক’রে চলেছে তা তবু পাবার আর পিচ দিয়ে তৈরী হয়নি।

প্রতি মাইল রাত্তা তৈরী করতে অন্ততঃ একজন ভারতীয়কে নিতে হয়েছে তাঁর রক্ত। এ বছরের জুলাই মাস পর্বত ঐ রাত্তা তৈরী করতে গিয়ে নিহত ভারতীয়দের লগ্যা হাঙ্কিয়েছে ১০৬০। তবু রাত্তা তৈরীর কাজ চলেছে অব্যাহত ভাবে। তবু তাই নয়, চতুর্থ পঞ্চাবিকী পরিচরনা অলম্বাকী ৪,০০০ মাইল দৈর্ঘ্যের একটি লম্বাক লীমাক বরাবর তৈরী করা হবে বলে বিশ্ব হয়েছে। তাঁর অস্ত্র আধার কত রক্ত দিতে হবে কে জানে।

ভারতীয় বিজ্ঞানী পুরস্কৃত

রাষ্ট্রসংঘের বাস্তব ও কৃষি লগ্যা কটকের লেট্টাল মাইল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী এ. কে. বন্যোপাধ্যায়, এন. পট্টনায়ক এবং আর. লাহকে বিশ্বের চাউল উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের অস্ত্র লক্ষ্যনিমগ্ন অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। এঁরা যে লম্বাক উপায়ের কথা বলেছেন বিচারকপণের মতে তা কার্যকরী করা সম্ভব।

মণক নিয়ন্ত্রণে মন্তব্য

জৈবিক মার্কিন বৈজ্ঞানিক মণিক আবেদিকার এক আত্মীয় ছোট মাদ্ বাণেশক্তাবে উৎপাদন করছেন। তিনি মনে করেন এই জৈবীর মাদ্ আত্মাবিক ভাবে মণক নিয়ন্ত্রণ করবে। এই মাদ্দের নাম পার্ল কিন।

মণক উৎপাদনের উপযোগী স্থানগুলিতে, যেমন, জলদ্রাবিত স্থান ক্ষেত্রে এবং অজ্ঞাত জলা কারাগার ওই মাদ্ ছেড়ে দেওয়া হবে। মণকের মার্তা এই জৈবীর মাদ্দের বাস্তব। পরীক্ষার সেবা পেছে একটি পরিণত পার্ল কিন বৈজ্ঞিক অস্ত্রতঃ ৫০টি মণক মার্তা উৎপন্ন করে।

সমুদ্র থেকে পানীয় জল

পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। তবু ওই তিনভাগ জলের কতটুকু পানীয়? পৃথিবীর জলের অবিকাশে সমুদ্রের জল এবং তা পান বা কৃষিকারের পক্ষে অগ্রগম্য। অবশ্য অনেক কারাগাতে জলের তহানক অস্ত্রাব। তাই, বিজ্ঞানীরা চেষ্টা ক'রে আসছেন সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করতে। যাতে ক'রে সমুদ্র-জলের অস্ত্রতঃ কিছু অংশকেও পানীয় জলে পরিণত করা যায়। এই সম্ভবপর্য অগ্রগতি কৃষিকা নিম্নেছে ত্রিটোনে। এই উদ্দেশ্যে সেখানে কয়েকটি বস্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। সমুদ্র থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের চেষ্টাও করা হয়েছে। ত্রিটোনে একটি আত্মজের মকলা রচনা করা হয়েছে যা পানীয় জলহীন বীপগুলিতে বসেই পরিমাণে পরিষ্কৃত জল সরবরাহ ক'রে সেখানকার কৃষিক জলপয়গুলি পূর্ণ ক'রে নিয়ে আসবে। এর দ্বারা বিশেষ ক'রে উপকৃত হবে কুম্ভা লগরেই গ্রীক বীপগুলি। সেখানে পানীয় জলের একান্ত অভাব। কাহাজটি প্রতিদিন ১,০০০ টন পানীয় জল উৎপাদন করবে, যা ১০,০০০ লোকের সৈনিক গ্রোহাশন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট। বিভিন্ন বিকিণ বীপগুলির দ্বারা ঘুরে ঘুরে এই কাহাজ লাফা বছর ১২টি সমুদ্রারের ৫,০০ লোকের জল যোগাতে পারবে। বীপগুলির মধ্যেকার ব্যবধানে ১০০ মাইলের দূরত্ব। একজন লোকের গ্রোহাশনীয় আত্মাই স্যালন জলের দ্বারা পূর্ণই কম পড়বে।

চালকবিহীন ট্রাকটর

ব্রিটেনের এডিনিয়াবরা একটা মনু বরনের ট্রাকটর উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছেন। এই ট্রাকটরের মত কোনো চালকের গ্রোহাশন হবে না। চালকের বদলে রেডিয়ো সংকেত নির্দেশ দেবে ট্রাকটরটিকে কোন দিকে ঘুরতে হবে।

মাঠ থেকে হুবে কন্ট্রোল কমে বলে চমক রেডিয়ো। দায়কত জানতে পারবেন ওঁর ট্রাকটরটি এমন কী করছে। কন্ট্রোল কমে বলেই রেডিয়ো সংকেত পাঠিয়ে তিনি এক লম্বা কয়েকটি ট্রাকটর পরিচালনা করতে পারবেন।

চাঁচাচাঁচী

চিত্র শিল্প

চলচ্চিত্রের অঙ্গ রাজ দেখিল। সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদির তুলনায় নিতাই এই পিত। প্রেক্ষাগৃহের তুলনায় নাট্যশালা ডের প্রাচীন; একজনকে যদি বালিকা বলা যায় তো আবেশজন বুড়ো। রজন্যের হতো তার পেছনে সেই সীমালেনের ঐতিহ্য। কিন্তু প্রত্যয়ের দিক থেকে? সব-কিন্তু হতেও আজ তার অস্বাভাবিক চকুহিকে। আধুনিক জীবনের সঙ্গে সিনেমা জড়িয়ে গেছে গভীরভাবে। শিল্প সাহিত্যের আবেশন হুইমের মাস্কের মতো লীলাবৎ। কিন্তু সিনেমার আবেশন প্রায় পার্বত্যবীর। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বনী-বহিষ্ট, নারী-পুরুষ, শিশু-যুগ সকল স্রেষ্ঠ মস্তকের কাছে এর আবেশন। বস্তুত সিনেমাকে অবস্থা কোনোরকমেই আর উপেক্ষা করতে পারি না। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এমন ভাবে সে তার নিজের আসন ক'রে নিয়েছে যে তার উল্লেখ আজ তুচ্ছ-সাধ্য নয়, অসম্ভব। বনিয়ার এর আকর্ষণী শক্তি, ব্যাপক এর প্রভাব।

তপালি পর্মা থেকে শিশু সংগ্রহ করে তার নবীন মনের বাগ; তার করনার, ভাবনার, তার বোলাবয়ের মোতনীর নানা উপাধান। পেয়ে নতুন-নতুন খেলা। মনের সেগুন মেঘমালা রক্তিন হয়ে ওঠে নানা রঙে। জুলাহলিক হয়ে ওঠে মন। বিভিন্ন জুগ্মম পথে যাত্রা করে সে মনে-মনে; কখনো পাঙ্কি অমায় উভাল লম্বুয়ে; কখনো আরোহণ করে কুমারাবৃত্ত পিঠি। শিশু-মন পুষ্ট হয়ে ওঠে বিভিন্ন করনার রসে।

শিশু বাস্তবিকভাবেই অগ্রকরণগ্রহণ। কিন্তু বড়োবাক কি সিনেমার নট-নটীদের কম অগ্রকরণ করে? বিশেষ ক'রে রজন্য-তরুণীর বল? তপালি পর্মা থেকে নানা উপকরণ আহরণ ক'রে

ভাষাও কী নাথাকে চাষনা নিজেদের ? তাই আদ্যমুখি দিনেবার প্রভাবে বিভা-মুখি অভিনয় বেশত্বা, অলংকার, বেশবিভাগ-কীতি। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দেখে দৃশ্য-দৃশ্যভীরাও অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে অহুকরণ করে তা'দের কথা বলার, বসবার, চলারকার্য তথি। এমনকি তা'দের মুদ্রাধোষ পর্যন্ত। চলচ্চিত্রের দ্বারা সবটাইতে বেশি প্রভাবিত হয় নর-নারীর সন্দর্ভ রূপালি পর্দায় দেখা প্রণয়-বৃত্ত সজীবিত করে তরুণ-রক্তের প্রেম-শব্দ। কী ক'রে প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলতে হবে, তা'কে প্রেম নিবেদন করতে হবে ইত্যাদি প্রেমকলার পাঠ তারা মের প্রেক্ষাগৃহ থেকে। সেই দিক থেকে বিচার করলে আধুনিক তরুণ-তরুণীর কাছে প্রেক্ষাগৃহ শুধু প্রয়োজনীয় নয়, গুরুগুরু বটে। অনসাধারণের তুলনায় অংশেব কাছে সেই সব নট-নটীই সবটাইতে অনগ্রহ, দ্বারা প্রেমিক-প্রেমিকার কুসিকার অভিনয় বেশি করেন। বাংলা চব্বিতে তরুণজন নট-নটীর অনুগ্রহতার মূল কারণই তাই। এঁরা অভিনেতা হিসেবে কতখানি বড়ো কি ছোট তা বর্তমান আলোচনার অপ্রাসঙ্গিক, তবে তাঁদের বিপুল সাফল্যের কারণ তরুণ-তরুণীর মনের মূগু-পিপাসা তাঁরা নিশ্চয় ক'রে থাকেন। সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি আদ্যমুখি মনের দিবা-শ্রুতি ও কল্পনা-প্রবণতাকে উজ্জ্বল করে তোলে। কিছু দিনেরা যেমনভাবে আদ্যমুখি গুরু ও মূগু আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনাকে আকোশিত ও আঘাত করে এমন আর কিছুই নয়। তরুণ-তরুণীরা মূগু-বেশা হাককড়া বা হাকপুজকে নিয়ে অঙ্গল পায়ন তৈরী করে লাভ বহলা বাঙি। দিনেমা জীবন গুহের সম্বন্ধে নিমিত্ত ব'লেই আদ্যমুখি মনে তা অনিবার্যভাবে সঙ্গীত করে নানা রস : কল্যাণ, ভয়, দুঃখ, জোষ এবং প্রণয়। শুধু ব্যক্তির জীবন নয়, একটি দেশ বা জাতির চরিত্র পর্যন্ত সেই দেশে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের প্রভাবে গঠিত হয়। হয় ব'লেই, সমাজ তথা দেশের কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দারাই অগ্রহী ভাবাই দিনেবার গুরু-অগুরু প্রভাব নিয়ে আঙ্গ বিশেষভাবে চিত্রিত।

বিকৃত-কর্তি ও অর্থলোভী প্রযোজক ও পরিচালকদের হাতে প'ড়ে চলচ্চিত্রশিল্প সমগ্র জাতি, দেশ, এমনকি পৃথিবীর পক্ষেও বিপজ্জনক ও সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠতে পারে। হতে যে পারে তার নমুনা তো আদ্যমুখি নিজেদের বেশেই অস্বহ বোধতে পাচ্ছি। মূল ও বিকৃত কর্তি, যৌনতা-সর্বস্ব ছাড়া-ছবির প্রভাবে আদ্যমুখি দেশের নৈতিক জীবন কী পরিমাণে কলুষিত হয়েছে তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। আদ্যমুখি দেশে মূল, লবন ও যৌন-অশরাদ্ধের সংযোগে এত বেড়ে গেছে, তার কারণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাবে এর মূল নির্যাসের মূল ছাড়াছবি বহলাংশে দারী। অপরিত লুপ্তার মনের সৌন্দর্য কীটবট ফুলের মতোই বিগতপ্রায়। দিনেমা প্রকৃতিই প্রায় বিচ্ছেদ ব্যাতিচার, দুর্নীতি এবং কুচরিত্র। কিছুদিন আগে কলকাতার ও তা'রতের অজ্ঞাত শহরে বেশব 'রাড্রি-সিরিফ'-এর ছাড়া-ছবি প্রদর্শিত হয়েছে ও এখন বেশব 'ভগুচর' ছাড়াছবি প্রদর্শিত হচ্ছে তার বাইরের বিভাগন, টিকিটের মূল কিশোরদের লগা কিউ-ই এর প্রদান। এই সব ছবি দেখার পরে যদি জেমস বন্ডের বঙ্গ পাড়ার মূল-কলেজের বেয়েবেয় পিছন নেই, অসীম মজবা করে কিংবা তার চাইতেও বেশি কিছু করতে সাহসী হয় তাতে অস্বহ বোধের কিছু আছে কি ? শুধু তাই নয়, এই সব ছাড়া ছবি প্রায়ই দেখার কলে ও জীবনযাত্রার তার অঙ্গ অহুকরণ করার মূল জীবনের মূল সব দিক, দুই দিকগুলির প্রতি এরা হয়ে থাকে সম্পূর্ণ অচেতন, উদাসীন। তাই এদের কাছে বেশপ্রদেব আঙ্গ হস্তকর, বেশ ও জাতি অর্থহীন, সবত রক্ত ময়ৎ আশ্রয় অবাতন, মূত্রের পরাধেব। আদ্যমুখি ও জোপদিলাদের ভাষারজনক জীবনের করনা করা ছাড়া এদের আর কোনো উদ্দেশ্যই বেন নেই। এই তরুণের অস্বহ, মজব্বের এই

বিষয়টি পড়নের কথা কেনেও আদর্শের সমাজ ও সহকারী বেন নিজের। এর চাইতে উৎসাহের বিষয় আর কী হতে পারে?

অবশ্য সিনেমা এমন একটি শিল্প-মাধ্যম লক্ষ্য তুলে ধরে যাতে শক্তি এবং সম্ভাবনা অসীম। সিনেমা এমন একটি শক্তিশালী অস্ত্র যাতে সমাজব্যবহার সমগ্র পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনে বিশেষ আনন্দে পারে। বিশেষ বিষয়কে জন-আগেবনের প্রচার কার্বে সিনেমাকে কাজে লাগিয়ে কার্যকরী যে বিশাল সাফল্য অর্জন করেছিলো তা আমাদের অজানা নেই। সিনেমা কী না করতে পারে? শিক্ষামূলক ছবি শিক্ষা বিস্তারে, দেশের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণে সাহায্য করতে পারে। ছবির মাধ্যমে জনসাধারণ প্রভাব করতে পারে বহু দূর দেশের নয়-নারীর জীবন যাত্রা, যে দূর আগন্তকের কাছ থেকে বহু দূর দাঁরে গেছে সেই বিশ্বতকালের ছবি। কল্যাণি পর্দার আশ্রয় অব্যাহত করতে পারি পৃথিবীর বহুদূর মাতৃবহুর স্বপ্নীয় কাহিনী, অল্পপ্রাপিত হতে পারি হৃৎ আবেশে। প্রকৃত আনন্দের মধ্য দিয়ে আমরা এই যে থাকার পাঠ নিতে পারি প্রেক্ষাগৃহ থেকে; পারি আমাদের হাজারো মনোহর করে গেতে, সত্যিকারের স্বাধীনতা ও সাম্য অর্জন করতে। জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রপুত্র যা পারে নি সিনেমা তা-ই পারে, পারে পৃথিবী থেকে চিত্রকালের মতো মুক্তের বিজয়িতা দূর করতে। সমগ্র পৃথিবীর মাত্র এক ধর্ম—এই বিশ্ব আদর্শ—ধর্ম আলোহি বহুকাল আগে থেকে। সেই আত্মজ্ঞাতিকতার স্বপ্ন লক্ষ্য হতে পারে সিনেমার মাধ্যমে।

আজ আমাদের দেশ নানা তরুণ সমগ্রায় লক্ষ্যবীন। আজ বিকেল-বিকেল নিরন্তর হাটখার; যন্ত্রণার বিস্তৃতি; প্রাথমিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাণ। ভাষা-সমগ্রায় নিয়ে ভাই ভাইয়ের মুখে বিবিয়ে দিয়ে ছুরি। সমগ্র জুল যোদ্ধা, সমগ্র সংকীর্ণতা ও অস্বাভাবিক হতে পারে যদি আমাদের চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকেরা সেই উদ্বেগ নিয়ে হাজারবি নির্দান করেন। আমাদের দেশে মরৎ গল্প ও উপজ্ঞানের অভাব নেই। সেই সব গল্প-উপজ্ঞান অবলম্বনে নিমিত্ত হোক ভাষা-ভাষা ছবি। তার সঙ্গে এগিয়ে আসুন নতুন দিনের নবীন সাহিত্যিকতা ও নতুন, বলিষ্ঠ চিত্র-কাহিনী নিয়ে। নতুন ভাবভাব, নতুন পৃথিবী যদি পড়ে তুলতে হয়, তবে সিনেমার মাধ্যমে তা অনায়াস হবে। কল্যাণি পর্দার প্রতিফলিত হোক আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

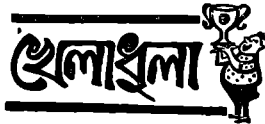
ভাষার প্রথম চলচ্চিত্র

ভাষাতে চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ১৮৯৬ সালের ১ই জুলাই। হাজারবি প্রথম প্রদর্শিত হয় বোম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে। চলচ্চিত্রের হাজারবি প্রথম প্রদর্শন করেন মিস্টার স্টিকেনস। ঠাণ্ড রক্তকে। ১৮৯৮ সালে হীরালাল সেন সিনেমা দেখাতে শুরু করেন। এ-সময়ের চলচ্চিত্রনির্মেত ইতিহাসে হীরালাল সেনের নাম অতীত হয়ে থাকবে। প্রথম ভারতীয় হাজারবি 'রায়া বরিন্দ্র'। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাইয়ের 'কন্ট্রোলমেন্ট সিনেমাতে ছবিটি মুক্তি পায়। প্রথম দর্শক চিত্র 'আলস আরা' নিমিত্ত হয় ১৯০০ সালে, ৩ই বোম্বাই শহরে।

পল্লীলোক পল্লী জুনি

প্রখ্যাত অভিনেতা পল্লী জুনির মৃত্যু-সংবাদ ত্রিভুবর্ণকম্বের পক্ষে একটি বড়োবকম্বের সূচনাযোগ্য। বিখ্যাত অভিনেতার মৃত্যু যে সাধারণ প্রয়োজন সেট সন্দেহের ভিত্তি সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত করেছিলেন। বিশেষ করে মনোবিদগত জটিলতার অসাধারণ অভিনয়ের ক্ষমতা তাঁর অসংখ্য ছাড়া নয়। 'দি গুড আর্থ' 'দি লাইফ অ্যান্ড এমিলি অংলো', 'দি স্টোরি অব লুই পাস্তর' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে তিনি অসাধারণ কীর্তি অর্জন করেছেন। 'দি স্টোরি অব লুই পাস্তর' ছবিতে ম'ম কুমিতার অভিনয়ের ক্ষমতা ১৯৩০ সালে অ্যাকাডেমী পুরস্কারে সূচিত হয়। কয়েক বছর আগে পল্লী জুনি ত্রিভু-অপেক্ষে থেকে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার অবলম্বন করেন বাপন করছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭১। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিভু-অপেক্ষে যে কতি হলো তা পূরণ করার নয়।

বিশ্বের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী হোজ চেরি করতেন কিশোর গুণা দিয়ে নাকের ডগ ছুঁতে। একদিন জ্যাক ইয়র্ক শহরের রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিতে করে একা যাচ্ছিলেন। ট্যাক্সিতে বসেই কিশোর ব্যাক্সি শুরু করলেন। তিনি একবারও থেড়াল করেন নি যে ট্যাক্সি জাইতার হাতের কাছেই ছোট্ট আয়নাটাতে সব কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করছে। জাইতার হঠাৎ পাড়ি বামিয়ে পাড়ির বরফা খুলে বললো : "আপনি আমার পাড়ি থেকে এলুনি দেখে যান। তাড়া। বা-ই দিন না কেন, আমার পাড়িতে চড়ে আনাকেই আমার লিভ দেখা যেন এ আনি ধরায় করবো না।"



ক্রীড়োত্তিরস

বঙ্গালীদের ফুটবল খেলার আদিপর্ব : বিজয় মার্চেন্টের সাধনা : ব্রাহ্মিলের প্রস্তুতি পর্ব ।

HOW EVANS OF THE BUFFS TOUGHT THE BENGALLEES TO PLAY FOOTBALL

১৯০৪ সালের কথা। সে সময়ে কলকাতায় একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ পড়ত। তার নাম Empire। সেই পত্রিকার এক সংখ্যার একটি হেডলাইন উপরে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার नीচে আছে বিবরণ। সেই প্রামাণ্য বিবরণ থেকে বাঙালী ফুটবলের আদিভবা জানা যায়।

খোতাখাওয়ার রাজাদের পুটলোৎসবের প্রতিষ্ঠা খোতাখাওয়ার চাব উত্তর কলকাতার দাউ ছেড়ে সড়ের দাউ দিয়ে মহাসেপ্টের তলার ওঁয়ু পেড়েছে। খোতাখাওয়ার সাবের কর্মকর্তারা লকলেই ছিলেন ইংরাজীভাষি ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে দু'একজন ছিলেন বাংদের তুল্য ইংরাজী বলনেওখালা বা লিখনেওখালা। বাঙালীদের মধ্যে বেশি দেখা যেতো না। কলে, সাহেব মহলে ওঁয়ের খুব ব্যক্তি ছিল। তু লাহেব মহলেই নয়। মিলিটারিদের মহলেও। ওঁরা দু সিনজনই বোবকরি তখনকার দিনের দু সিনজন রাজ বাঙালী বাংদের কোর্ট উইলিয়মে প্রবেশ করবার অধাে ছাড়পত্র ছিল। ওঁদের নামগুলি অ্যাক বিশেষ তাে অস্বপী। নগেত্র প্রদাণ সর্বাধিকাধী, কালিনাথ মিত্র, মঙ্গলনাথ বাজুদী ও অক্ষয়কুমার সুবাগাখায়া। সে সময়ে আই. এক. এ-তে সাহেবদেরই একচেটিয়া প্রামাণ্য। সেই সমিতিতে প্রথম ভারতীয় প্রতিনিবি ছিলেন কালিনাথ মিত্র।

একটা কথা এখানে বল। প্রাণলিক হবে বলে মনে করি। তা হচ্ছে এই :

বাঙালী ফুটবলের উচ্চ প্রবর্তকরা ইংরেজি বাংলা বা ইংরাজ ভক্ত হলেও, নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য কখনো বিলম্বন যেন নি। সেই সময়েই ইংরেজ ও মোরাদের লকে ওঁরা লড়েছেন, খেলায় দাউে জাদ্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধা পাবার দাবী জানিয়ে। চারিদিকে শাধা চামড়া ও বিলাতী পোষাক। তাদের মধ্যে ওঁরা বিতরণ করতেন অধেশী পোষাকে, ললাবড় কোট, কৌটানো নুতি মোকার উপরে দাবী সাইডজি হু। কেউ কেউ বা দাবার মোল টুপি পরতেন। পুরো বধেশীজানা বকায় যেনেই ওঁরা যেনে ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরাজী খেলাধুলার আধিকৃত্য অহুতব করেছিলেন।

বাক্সালী হেলেরা কী না পারে? কেনই বা তারা পারে না। ছুটবল খেলার ওদেরই যত বড়তা অর্জন করতে? আচ্ছ না গতিক না কাল পারবে।

কেজার মাঠে গোয়ালের বেলা দেখে বেবে বাক্সালী হেলেরা বেলা দেখে। কিন্তু বেবে দেখা আর ভুটটু কান্দে লাগে। নিজেদের মধ্যে খেলায় খোজা যায় না। কিন্তু লামেবদের লুকে খেলতে গেলেই হার হয় প্রচণ্ড। খোজাবাক্সার জায়ের সময় উঠু! জাপক'ল, হেজার শো'টিং, লা মার্টিমিয়ার এলব সেমন ভারী হল মঃ। কেজার গোয়াল লের লুকে খেলতে হবে। তখন কেজার রয়েছে বাক্সার হেলিয়েট। আই. এক. এ শীত পড়ন, হাতে প্রথম ট'বছর তারা সেই শীত কেতে। তাদের হারিয়ে গেয়ে তারতে তখন তেমন কোন গোয়াললই ছিল না। সেই বাক্সার হেলিয়েটকে খোজাবাক্সার চ্যালেঞ্জ জানালো। এইভাবে তখন কেজারি মাটি খেলা হয়। একমল অপর মলকে চ্যালেঞ্জ বা আমন্ত্রণ জানিয়ে আসতো।

বাক্সার মলের কাগেন আর অস্ত্র কর্তারা খোজাবাক্সারের কর্তব্যের ভিত্তিতে। অনেকদিনই সময় তারা খোজাবাক্সারের গুণ্ডিতে এলে পানাহার করে গেছে। তাই তারা সাহসে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। নির্ধারিত দিনে বেলা হল। খেলার প্রাৰ্থে কেজার থেকেই গোয়ার হল এলে বাজনা বাজালো। দুর্ধই হল বাক্সার হেলিয়েট। তারের পানিং স্ত্রিখলি সে সময় উত্থন পর্ব্বারের। সেই উৎকর্ষের বিকছে খোজাবাক্সারের হেলেরা মাড়াত্তেই পারলো না। গায়ের ছুটোছুটিই সার হল। প্রতিপক্ষের নাগাল তারা গেল না। মাঠে যেন সত্যাক্ষণ নাগেতে লাগল। তাদের বিকছে গোল হল এগারোটা। আরও গোল হোতে পারতো। কিন্তু বাক্সার মলের কাগের এতানল খেলায় চিলে বিলে। বাইহোজ কোনক্রমে বেলা শেষ হল।

গোয়াল খোজাবাক্সারের হেলেরের লাঘন। দিলে, তোমরা তোমরাও একদিন খেলতে পারবে। আমায়ের মত।

কিন্তু খোজাবাক্সারের কর্তব্যের আর খেলোয়াড়দের মন বড় মনে গেল। এতদিন তো তারা ছুটোছুটিই করেছে, বলে কিছু মেরে দৌড়েছে সেই বল ধরতে, যে মত বেশি কিছু করেছে সেই ভত ভাল খেলোয়াড়। কিন্তু আললে তা তো নয়। এ খেলার পদ্ধতি তো আর। সেই পদ্ধতি কী করে আয়ত্ত করা যায়?

সেই সময়ের শেষ হবার পর, খোজাবাক্সারের কর্তারা গেলেন কেজার। বাক্সার মলের কর্তব্য লুকে দেখা করে গায়ের মনোস্ত্র অতিপ্রাণ জানালেন। তখন তিনি বললেন, এর আর কথা কী! আমি এখন ডাকছি এতানলকে!

এতানল এলো। গায়ের কর্তা বললেন, বেশ এতানল, এঁরা বলছেন, এঁদের হেলেরের খেলাটা দেখাতে হবে। আর তোমাকেই নিতে হবে সেই ভার।

এতানল সানন্দে সম্মত হল। পুজোর পর শীত এলো! তখন ছুটবল বড়। কিন্তু খোজাবাক্সার মাঠে ছুটবল পড়েছে। খোজাবাক্সারের হেলেরা অস্থায়ীলন করছে। একজন গোয়াল তাদের দেখাচ্ছে। দিনের পর দিন এই অস্থায়ীলন চলতে লাগল। এতালের লুকে তার লকী সাধারণত আসতো। প্রগতি বৃদ্ধির মধ্যে দুই কাজের হেলেরা মিলেমিলে খেলতো। আর খেলার পর সদা অক্লান্তি করে

মাঠে তরুণ বাকসো। তারপর শোভাবাহারের আশ্রিত্য পূর্ণ যাত্রায় উন্নত করে তাত বটো বনটায় গান গাইতে গাইতে তারা কোয়ারি করতো।

এমনি করে অল্পশ্রমের পর আবার হুটবল মরশুম খুঁজে এলো। অনেকগুলো ছোট বড় খেলার পর এলো শোভাবাহারের বর্ণাধ পুষ্টি পটীকার দিন। বাকসো রুমিরেণ্টের সঙ্গে খেলা।

শোভাবাহার মাঠে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সামিয়ানা পড়েছে। একটাের পর একটা। প্রথম সামিয়ানার কোয়ারি বড় বড় অফিসার আর কলকাতার শ্রেষ্ঠ লোকের মালিকের মল। তাঁদের মধ্যমণি কে? না, মহাশয়! অল্পোচবিহার। বিশেষ অমিরেণে এ খেলা দেখবার ভেত্রে তিনি এসেছেন। দ্বিতীয় সামিয়ানার কলকাতার বনকুংবের মল। তাঁদের মধ্যমণি মহাশয়! বিনোদ্যুৎ দেব। তৃতীয় সামিয়ানার কলকাতার বন হুটবল জাহের কতৃপক্ষ আর খেলোয়াড়। ইত্যাদি। হাজার হাজার ছোট বড় পতাকা উডছে তরুণ চারপাশে। হুটবলটে গোটা বাজানলার মল বিকাল চারটা থেকে বাকসো বাজছে। তাঁর একবারে খেলা আরম্ভ হয় লম্বা টেবিলে বসে লাখানো হয়েছে। উইলসন হোটেলের উনিশটা বানানামার খুঁজে। বন চাও তত পাবে, পলসা চাবে না।

বহা লম্বা খেলোয়াড়রা মাঠে নামল। কিন্তু একই! বাকসল মলে তো এতানুল নেই? না। তিনি নেই। জানা খেল, তিনি আক খেলবেন না। বেলেত তিনি বাঙালী ছেলের হাতে বরে এক মাল শিখিয়েছেন, সেই হেতু তিনি আক তাদের বিরুদ্ধে খেলবেন না, বরক লাইনের পাশ থেকে তিনি তাদের উৎসাহ দেবেন, নির্দেশ দেবেন। লাহেবদের মল হাসলো। সাইবা হইল এডানুল। তা হলেও বাঙালীর বন কি দাঁড়াতে পারবে? খেলা পুঙ্ক খোল। বাকসল মল স্বীকৃতিসহ চাপ দিয়ে মোড়া গল্পন করবার চেষ্টা করল। তাদের ওপর সেই বকসই নির্দেশ আছে। বন কোরে পার খেলা, বন পার খোল খেবে। কিন্তু শোভাবাহারের ছেলেরা এক দক্ষ খেলছে! ঠিকঠাক পাল, ঠিকমতো কৌতু—বল আদান গ্রহণ। বাকসলের দুর্ভেদ্য বর্ণণাও যে বিস্তর হয়ে গড়লো। মাঝে মাঝে এতালের মলা খোনা থাকে, ‘পাল অন টু হাইট, কান আপ দাঙ্গুলী।’ কখনো খোনা থাকে, ‘দুট।’ কখনো বা, ‘কল বাক।’ ওর নির্দেশমতো মজুন অল্পেরেণার উদ্বীণিত হয়ে শোভাবাহারের ওর খেলা খেলোয়াড়রা সেদিন অল্প খেলা খেললো। খোল তরা করতে পারলে না বটে, কিন্তু প্রতিপক্ষকে খোল করতেও দিলে না। খোলপুঙ্ক খেলা হলো লম্বা লম্বা। কোবার গত বছরের ১১ খোলে-হারার খেলা আর কোবার এয়ারকার খেলা।

লাহেব খুবো আরসোতার বনকুংবের কর্তে জাযতো। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ডেকে তারা অভিনন্দন জানালো। পরদিন ইতোদী কালকগুলোতে এই খেলার দীর্ঘ রিপোর্টের মধ্যে তাক্ষরিতক ভবিষ্যৎ পটী খোনা খেল ‘খোলার মাঠে বাঙালীদের মকাদরণ খেবে এলাব আমরা।’ লাফা গজিকা এলুগায়ার গ্রাণ খুঁলে বাঙালীদের প্রাণটি গাটলো। যদিও হেতু লাইন ছিল ‘কেনন করে বাকসলের এডানল বাঙালীদের হুটবল খেলা খেলো’—তাহলেও বাঙালী খেলোয়াড়দের ওরপনা স্বীকার করতে তারা স্তুতি হয়নি। তাদের সেই রিপোর্টটি বাঙালী হুটবল খেলার ইতিহাসের একটি অমূল্য মূল্য।

বে কোন কালে লাফনা অর্জন করতে মলে একনিষ্ঠ সাধনা অব্যতই চাই, তার বতায় বটলে অব্যত অব্যতস্বাধী। আমাদের জীবনে সাধনার প্রাণটিটাই হুঁত হয়ে গেছে। খেলার মাঠে খেলার

নানা বিভাগে সেই অবনতি প্রত্যক্ষ করছি। ক্রিকেট বলুন, ফুটবল বলুন, হকি বলুন, লব বিব্রহেই আমরা পিছিয়ে পড়ছি। তার উপর আবার বিশেষে গিয়ে শেভনীর পরামর্শ বরণ করে সেখের লক্ষ্য আরও বাড়ানি। সত্য সমাপ্ত ক্রিকেট সফরের কথা স্বভাবতই মনে আসছে। শাট্টই যেবাংল, এবেশের বেলায় মাঠে এসেবের সর্গক তা অক্ষেই যেবেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে উদ্ভূ উদ্ভূ তার এবং মিটার ও সাধারণ অত্যাব। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় ও অভিনায়ক সর্বজনমাত্র বিজয় মাঠেই সন্মতি যে কথাগুলি বলেছেন তা বিশেষভাবে গ্রহণীয় খোলা। তাঁর মতে, ক্রিকেট হোক বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই হোক, জীবনে সকল ক্ষেত্রে কলে চাই চরিত্রের চূড়তা, লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং ব্যক্তি কল লাভের ক্ষেত্রে যে কোন হ্যাগ স্বীকারের মানসিক প্রস্তুতি। মাঠেই বলুন ক্রিকেটের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক কিছু হ্যাগ করতে হয়েছে। খেলায় তিনি কঠিন নিয়ম কাঠন পালন করেছেন, জীবনে মন স্পর্শ করেন নি, সিগারেট খাননি এবং বহুর একবার দুব্বারের বেশী লিনেমা যেবেন নি। তারপর তিনি বলেছেন, ব্যক্তির চেয়ে মন বড়, অভিনায়ক হিসাবে তিনি বরাবরই মনগত সংহতির উপরেই লক্ষ্য রেখেছেন সবচেয়ে বেশী। মাঠেই আরও বলেম, আন্তর্বিখালেই খেলোয়াড়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মূলধন। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৩৩ সালে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল বাইশ। তাঁকে একটি ট্রাফলে ম্যাচে অস্তিত্ব করা হয়। বিপক্ষের গুরুত্ব হুঁসি কটি খেলোয়াড়ের হ্যাগটে তাঁর মনের চাহজন ব্যাটসম্যান আট রানে আউট হওয়ার পর মাঠেই ব্যাট করার পলা আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি বল তাঁর চিহ্নকে আঘাত করে এবং সেখানে তিনিই সেলাই দেখায় হয়। চিকিৎসকের অস্থিতিতে তিনি আবার মাঠে গিয়ে এলে ১২ রান করে আউট হন।

ঐ ইনিংস প্রসঙ্গে মাঠেই বলেম যে, এটি তাঁর জীবনের সেবা ইনিংস। কারণ এই ইনিংসেই তাঁর আন্তর্বিখালের বনিয়াদ চূড় হয়েছে।

ক্রিকেটই বলুন আর ফুটবলই বলুন, তার প্রতি পর্বটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। সেই পর্বে যে বল বা সেখের কর্তৃপক্ষ হয় সেই সাধনা, চিন্তাশীলতা এবং উদ্ভবের ব্যাকর রাখতে পেরেছেন সেই বল বা সেই বেশ খেলার মাঠে তত বেশী জয়ের পার্থক্য লাভ করেছে। বিশ্ব ফুটবল প্রসঙ্গে ব্রাজিলের কথা বরা থাক। সত্য বহুরের আগে এই বেশ ছিল বিশ্বজুড়ে ফুটবল খেলার বেশ। সত্য বহুর ইংলেণ্ডে গিয়ে তারা হেরে গেল। এট হার তোলাপাক করলে তারা বেশকে। লগে লগে লাড়ো গড়ে গেল পাড়া বেশে। নতুন করে নতুন ভাবে পরবর্তী বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে বল পঠন করতে হবে। তার এখনো অনেক ঘেরী। সে খেলা অগ্রগতি হবে ১৯৭০ সালে। কিন্তু এখন থেকেই বল তৈরী হুক হয়েছে লক্ষ্য্য খেলোয়াড়দের নিয়ে। তিনি বহুর ধরে চলবে অগ্রসর। কর্তৃপক্ষদের ভীত-ভীত থাকবে সেইসব লক্ষ্য্য খেলোয়াড়দের প্রতি। লুপ্ত সৌর পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ব্রাজিল যেন হুস্তর সাধনার যত হয়েছে। প্রতিটি পর্বের ব্যাপকতা ও গভীরতা বেশে সত্যিই বিশ্ব মানতে হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের খেলের স্ফুটিলতা সুবিধাবাহী ও স্বাধ-স্বয় ক্রীড়াকর্মীদের ব্যবস্থাপনা ও আচরণবিধি লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায়, কি আকাশ পাতাল ভাঙায়।

একটি আদিম জাতির উপকথা

নির্মল দত্ত

একটি আদিম জাতির উপকথা লিখছি :
ওই যেরেটিকে নিরেই এই উপকথা শুক।

বেশ উজ্জ্বল মেয়েটি।

যৌবনে তল-হৃৎ-কম্বুছে যেন! ওদের মাঝে ও যেমানামক।

নার ওর ওন্দুহী।

লবাই বলে, বজ্র যেমাক্ ওর। আর হবেই না বা কেন? ওদের লম্বাও ওর মত রূপসী আর কে-ই বা আছে! অজিমা, ষীতমা, কিকোমা—ওরাও কম সুন্দরী নয়! যৌবনও ওদের কনিষ্ঠ কানায়। কিন্তু ওন্দুহীর মত কেউ নয়। ওর কাছে লবাই যেসে জান! ওন্দুহীর মত রূপের ছটা আর কার? ওর রূপ যেন জিলিক্ মারে! হাতে-লাত্রে ও যেসে তুলিয়ে বেহ মরমের মনকে।

পাহাড়ে স্বরূপার বারে ব'লে আছি। ওন্দুহী আর অজিমা কবি থেকে জুটো কেড়ে গিঠের স্তুতিতে বোকাই ক'রে নিয়ে কিছুছিল যবে। হঠাৎ স্তুতি নামিয়ে হু'কনেই জল খেতে এল স্বরূপার। জল খেয়ে অমায় দিকে তাল ক'রে আর একবার তাকিয়ে নিয়ে হু'কনে হেল লুটিয়ে পড়ল এ ওর গায়ে। তারপর পাহাড়ের দ্বারে হেলান দিয়ে ওন্দুহী অমায় হেল জিজ্ঞেস করল—আর কতদিন থাকবি এখানে?

বেশ হাসিটি ওর।

বললাম—থাকব না। কাল বিকেলেই চলে যাবে।

—চ'লে যাবি? জুবা?

—কলকাতায়।

—কলকাতা! সে জুবা? এর কবে অজিমা।

—অনেক দূর।

—অনেক দূর। ছোট ছোট চোখে হু'কনেরই বিশ্ব জাগে।

—মতবুদ পথর।

—ম-ত-ব-ক্।

—হ্যাঁ। তোরা যাবি?

হু'জনেই পুণ্ডিতে লাগ দেয়। তারপর একটু বেয়ে নিয়ে বলে—কে নিয়া

সত্যিই তো! কে নিয়ে যাবে! কথার উত্তর দিতে পারিবে ওদের। ঠাণ্ডে গুম্ফী ব'লে বলে—তুই নিয়া যাবি?

—আমি? তোদের?

—হু'।

—কি ক'রে?

—ভ্যান্সে, বিয়া ক'রে। গুম্ফী উত্তর দেয়। বিয়া করতে পারিবে আমার?

কেমন যেন চম্কে উঠি ওর কথায়।

ও আবার বলে—কি পারিবে নে? তবে মরক হইছিল কানে?

কথা আর এগুতে দেখিয়া উচিত নয়। তাই অল্প কথ পাড়ি—চল, তোদের পাড়ায় যুয়ে

—চল।

বড় সরল কথা। পুণ্ডিতে ভরপুর হু'য়ে কুটীর ভুড়ি হু'টো পিঠে তুলে নিয়ে ওরা প্রস্তুত হয়। তুলে যায় সঙ্গে সঙ্গে আগের কথা।

টোটেপাড়ায় এসেছি আগের দিন। এর মধ্যে ওদের সঙ্গে আলাপও হু'য়ে গিয়েছে বেশ। ওরা আলাপীও যুব। নতুন বাহুব আমি ওদের পাড়ায়। কিন্তু আলাপ করতে লজ্জা নেই।

আমি শেখনে। ওরা আগে আগে পান পাইতে পাইতে চলেছে। তার হু' এক লাইন কানে ভেলে আসছে—কোপো পেতে চেতানো—। যানে নুঁকি না গামের। তনুতাল লাসে। ভাল লাসে ওদের সরলতা আর প্রাণতর। চকলতাকে।

চলতে চলতে গবে দেবা লবার লাবে। তার সঙ্গে শিরং সুক্সা। টোটেদের পুরোহিত। লবা লোকটি বেশ। তাই ওর লাবে বহুব পাতিয়েছিল। আসল মাম ওর চম্পা-সে-টোটে। বেচারী লবার বউ যারা গিয়েছে কিছুদিন আগে। সে আবার তার বিবধা বড় ভালিকাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু নিজেয় হেলপুলে নিয়ে লবাকে বিয়ে করতে বাকী হচ্ছে না ওর ভালিকা। তাই লবা আমার বয়েছে, তার ভালিকার কাছে বিয়ের অতে তার হয়ে একটি সুপারিশ ক'রে দিতে। আমি বিশেষী বাহুব। আবার কথা ও তুলেও ওন্তে গাবে—তাই।

লবার মুখেই গুম্ফিলাস: গুম্ফী-অজিয়া-গীতমাবের কথা। ওদের লম্বাকে ওরা কেমন বাপ-ছাড়া। অল্প লবার মত পান আর হাড়িয়া যায় না ওরা। তাই লম্বাকের অল্প বাহুবরা ওদের ভাল চোখে দেখেন। ওরা যেন একটু বিসর্গী ওদের লম্বাকে। দেখলাম, পাড়ায় আর লবা মেয়েদের মত ওরা বালি লাবে থাকে না। রত্নি স্টাউলও চাপিয়েছে গারে একটা ক'রে। গারে আর কোন কাপড় নেই। পরনে হুঁটু পর্বর এক চুঁরো কাপড় জড়ানোমাত্র। লম্বা ঢাক্কাব ব্যবধা, যেটুকু নইলে নয়, তনু সেইটুকু।

লবার মুখে আরও গুম্ফিলাস: গুম্ফী এ পর্বর তিনটি মরমকে ভাইতোল' কয়েছে এই বাইশ ভেইশ বছর বয়সের মধ্যেই। ভাল লাপেনি ওর একটাকেও। তিনটিও পর আর একটিকেও বিয়ে

কল্পে রাজী আছে সে। কিন্তু তার মনের মত তেমন বয়স আর কই ওদের সমাজে। তাই ও নিজের সমাজ ছাড়িয়ে অল্প কোন সভ্য সভ্যকে বিয়ে করতে ব্যাকুল। কিন্তু তা কি আর হবে? তার গায়ের রং ক'ল, বেষ্মভেদ ইন্দ্রী—কিন্তু তবু তো সে সেই আদিম জাতির বংশধর। টোটে। সভ্য সভ্যের সমাজ থেকে অনেক দূরে।

অশ্রিমাংগ বিয়ে হয়েছিল। তার মনে হ'লে গিরেছে। অল্প বয়সেই। উনিশ বছর না পেরোতেই। তার বাবার আবার আর একজন মতে ঠিক করেছিল। কিন্তু সে বুড়ো। তাকে বিয়ে করতে রাজী নহে অশ্রিমা। বুড়োর সাথে বিয়ের ভয়ে পানিয়ে ছিল সে তিসদিন অজলে। তারপর মর্দো ওকে আশ্রয় দিয়েছিল। মর্দোর কাছেই এখনও আছে। মর্দো তার চেয়ে বয়সে ছোট হ'লে কি হবে। তবু বুড়োর চেয়ে তো ভাল! মর্দোর সাথে বিয়েটা এখনও সে পাকাপাকি করেনি। মর্দোকে ঠিক পর মন চায় না। কিন্তু আর মরই বা কোথায়? এই টোটেপাড়ায়? গীতমা আর জিকোহা। ওদের তো মরই পড়ল বহনি। অবন্ত বয়স ওদের অল্প। বিয়ের কথা মনে এলেও কাজে তা হয় নি।

ওদের বিয়ের কথা কিছু বলা বাক্য। বিয়ের প্রস্তুতি বড় অল্প। ছেলেমেয়ের বিয়ের আগে ছেলের পিলে, মেলা বা মাঝে এমনি কেউ বার মেয়ের অস্তিত্বকে সন্দেহ করে না। ছেলের বাবা বা মার কিন্তু বাস্তবতার নিয়ম নেই। বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হ'লে সেল মেয়েকে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসতে পারে ছেলে-পল। তারপর যে ছেলের সাথে বিয়ে হবে, সেই ছেলের সাথে একসঙ্গে বাস করতে হয় মেয়েকে। অবন্ত মেয়ে যদি ছোট থাকে বা উত্তরপল রাজী না হয়, তা হলে মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকে। পরে তাকে সমরমত ছেলের বাড়ীতে আনা হয়। ইচ্ছে কল্পে মেয়ে দিনের বেলায় বাপের বাড়ী থেকে রাজে তবু ছেলের বাড়ী গিয়ে থাকতে পারে। তারপর মেয়ে গর্ভবতী হ'লে তখনই হয় আচ্ছাদনিক বিয়ে। “কারবারী” (বটক) আসে তখন। আসে পুরোহিত। বিয়ের উত্তোল আরোহণ চলে। তৈরী হয় “হাড়িয়া” (হেঁই মদ)। ছেলের আদিক সাহেবা থাকলে পলক কাটা হয় এক আঁটা—না হ'লে নিয়মপক্ষে একটা বৃষ্টিও। অনেক সময় পূর্ববতী হওয়ার পরও এই আচ্ছাদনিক বিয়ে হয়। বর আর কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে পুরোহিত দুর্গা দিয়ে পলক বা পাখীর রক্ত একটু ছিটিয়ে বের বর-কনের মাথায়। কোন বর নেই। বাচ্চা-বালিও নেই। ব্যাস! বিয়ে শেষ। তারপর হাড়িয়া আর মাংস বার নিমন্ত্রিতেরা লবায়। বারা অহুতানে উপস্থিত হতে না পারে, তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হয় তোলের জিনিষ। আচ্ছাদনিক বিয়ের আগে ছেলে ও মেয়ে এক সাথে বাস ক'রেও যদি শেষ গর্ভ দিয়েছে মত না হয়, তা হ'লে সে বিয়ে ভেঙে দেওয়া বেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিয়ের কথাবার্তার সময় যদি কোন জিনিষ বেওয়া হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তা কেন্দ্র বিতে হয় পরস্পরকে। আবার বিয়ের পর যদি কেউ ডাইভোল কল্পে চায় তা হ'লে পরিণাম বড় হাড়িয়া জরিমানা দিলেই ডাইভোল হ'তে বার। এদের মধ্যে আবার একাধিক বিয়েরও প্রচলন আছে। এক স্ত্রী অল্প বাধী বা এক বাধী অপর স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। দুবে কোন ছেলে ছোট তাইয়ের বটকে, মালা-পিলী বা কাচা-ঝোঠার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে নহে। অবন্ত বড় তাইয়ের বটকে বিয়ে করতে আগন্তি নেই।

অল্প-ব্রহ্মার সামাজিক রীতিটা এদের লবল। শিশু অঙ্গারের পর নিজেরাই বাড়ী কাটে। আশায়া ঐচ্ছান-বর কিছু নেই। নিবেদের পোষার ঘরেরই একপাশে পর্বা টাঙিয়ে বর প্রসব। ওর

পেয়ে আসে এদের সম্রাটের পকারেৎ বা মোড়ল অথবা পুৰোহিত । তাহদেরই কেউ নানকরণ করে নবমাতক বা জাতি করে । তারপর শিক্তর সেই মার প্রচার করে দেওয়া হয় পাকার লবার কাছে ।

ময়ল এদের মৃতদেহ পোড়াতে নেই । অল্প থেকে গাছ কেটে এনে তৈরী করে কড়ির । সেই কড়িরপর মৃতদেহ কবরস্থ করে । পোক পালনেরও নিয়ম আছে । কিছু সেটা বড় অল্প । মৃতের মাণ অল্পবাকী একটা লাঠি কেটে তাই এক বছরব্যাপী হ'য়ে বেড়াতে হয় । ওই-ই হ'ল পোক-চিহ্ন । বাকী মারা গেলে জীকে আর জী মারা গেলে বাকীকে পালন করতে হয় এই পোক । কিছু বাপ-মা মারা গেলে ছেলেকে পোক পালন করতে হয় না ।

এরা সেই টোটেটা । জাতিতে হিন্দু । অথচ পক্ষর মাংস খায় । ময়লে লম্বাঝিও দেয় । টোটেটো একফালে ছিল বাঘাবর । কিছু এখন আর নয় । বাকীভাবেরই এখন তারা বলতি কপন করেছে অলপাইত্তি মেলায় এই টোটেটোপাকার । জুটান সীমান্তে । বাগোনা দুট উত্তরে পাণ্ডেদের পায়ে এইখানে । মধ্যভক্তি-পরাহকটা-লম্বাপাক । হ'য়ে মুড়িপাক । দ্বিজে টোটেটোপাকার আসার পথ । মুড়িপাক । পেরিয়ে বানিকটা এনেই 'হাউরি' আর 'টিটি' নহী । টিটি অমলের প'প দ্বিজে প্রায় হ'মাইল তাতাটা হ'ল পূর্ণ । হাউরি আর টিটি নহীতে প্রায়ই অল থাকে না । থাকলেও তিরতিয়ে একটু অল । পাবর । শুধু পাবর শুধু । কিছুদিন আগে এই পূর্ণ পাবর পাবর দ্বিজে আর অল কেটে তৈরী হয়েছে কোনও রকমে বাতাহাতের একটি পথ । তবে তাত পূর্ণ । হাতী বা হেঁটে বাহ দ্বিজে অলি ছাড়া চলে না । তার গুণর বিশদও আছে । পুয় লক্ষ্য রেখে অলি চালাতে হয় । সামনে বা প'প থেকে অমলের হাতী বেরিয়ে এসে বিশপ না খটায় ।

টোটেটা : মেমোলিহন জাতি থেকে উদ্ভূত বল : যেতে পারে । জিপশীনের মতই এরা একটা জাতি । জুটান অতি কাছে । জুটিরাহের বক যে এদের দেহে আছে—একবা অমীকার করার উপায় নেই । এদের আর একটি বল নাকি মেগালে আছে, 'রাবা' নামে এমন আর একটি জাতি এ অকলে ছিল । কিছু এখন আর তাহের দেখা যায় না ।

টোটেটোর পকারেত আছে । রয়েছে মোড়ল । মোড়লের কাজ, বাজনা আচার করা । তারপর তা লম্বের সবকারী তবিলে অমা দেওয়া । বলতে গেলে মোড়লই এদের লবেলবা । মোড়লের অল্পবতি না নিয়ে এখানকার একটি সাহজ কারো কাটাংগ নিয়ম নেই । পকারেতের কাজ, ইটনিয়ল খোড়ের ট্যাঙ্ক বা কব আদায় করা । এই ট্যাঙ্ক আদায়ের মতে পকারেত পার একটা কমিশন । পকারেতও এদের অল্পতব নেতা ।

উপলব্ধি কল্যাণের মতে কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লম্বকার থেকে একটি কৃষিকারী তৈরী হয়েছে । এদের উন্নত বরপের চাষবাণ পেশানো হয় এমন থেকে । উন্নত বরপের সুখী বাক, জিম, আর বিভিন্ন কলপের বীজ, বিভিন্ন গাছের চারা প্রকৃতি বিনামূল্যে দেওয়া হয় এদের, লম্বকার থেকে । এদের ঝাঁপ-সুখী পালনে সাহায্য করা, এদের সাহায্যক প্রকৃতি দ্বিজেও লম্বকার থেকে সাহায্য করা হয় ।

লম্বার সাথে এদের বর-ছায়ার দেখতে বাই । মাটিতে কাঠের খুঁটি খুঁতে খুঁতে প্রায় হ'ল্ট উত্তরে হয় । বরের সামনে বাঁপের হাত পেতে বানিকটা বাহাঝা মত । একটা বাঁক কাটাফটা মোটা কাঠ বেয়ে আর তবিলে পোতা একটা বাঁপ হ'য়ে উঠি সেই বাহাঝা । বাহাঝা থেকে যায় ।

বেড়ান বহুদূর পড়িতে চুকতে হয় ঘরে। ঘরে বিশেষ কিছুই নেই। ঘরটি বেশ বড়। সেখানেই ভাড়া পোয়। বিছানার মধ্যে বহুকোণ ও মাল্য ঢাকার বা কবল। বালিশ ব'লে যে একটি বস আছে বিছানার অন্ততম অস্বস্তিকর তা চোখে পড়ল না কোথাও।

এই ঘরের পাশে বেড়া বিহীন বরংঘর ভাড়া তহা এককালি একটি ঘর। সেখানে চোদ্দবার অধিকার নেই বাইরের কাঠো। ওটা পুকুর ঘর। কোন দেহতা নেই। মহাকালের পুজারী ওতা। এখানে ওদের থাকে অধিক কল। কুটো, হুপুড়ি আর কাঠিনি। কতই আর। সামান্য লম্বাই বস্তু পড়িব। এর একপাশে হাজার ব্যবস্থা। মহাকালের ব্যবহৃত কালিমাথা একটা কি কুটো ক'রে লোহার কড়াই। নইলে গেলের ডেকুটি। বাস। বাসন বলতে ওই-ই। কলের ভেত্রে ব্যবহার করে বাসের একহাত লম্বা চোড়া। তবে তা বেশ যোটা-দোটা। শুভে ক'য়েই ক'রে আসে ওরা পানীর মল। হালের অবস্থা ভাল তাদের ঘরে এক আঁট্টা গেলের বড়াও দেখা যায়। হুপুড়ি পাহারার বস বেশী তার অবস্থা নাকি স্তম্ভ ভাল।

বাহারকার ব'লে আছে জোড়া। জিজ্ঞেস করি—আজ কি বেয়েছি হুপুড়ি ?

—চা আর কুটো। উত্তর দেয় ও। অতি সহজ ও সাংবাদী উত্তর। চারের মধ্যে দুই-টি নিশেই। বড়োবর একটু হুপুড়ি।

—বাজে কি খাবি ? আবার প্রশ্ন করি।

—আজ ভাত।

অর্থাৎ ভাত রোধ কোটে না। যেদিন পরস। থাকে, চাল কিনতে পারবে, সেদিনই খেবল ভাত বয়। লতা চালের সময়েও তাই করত। এখন ঘর বেশী ব'লে ভাত প্রায় বার না বললেই চলে।

—হোট একটি হাকারও চোখে পড়ল পাড়ার। হু'একটি দোকানও। সেখানে বেলে—চাল ভাল—হু—হাল—তেল।

এরা খুব সরীষ। কিন্তু মিথ্যা কথা বলে না। চুরি-ভাড়াতি করার অপরাধ এদের মধ্যে নেই। এ ওর কতিব চোটা করে না। আহাতির লম্বায়ে এরা হয়ত সত্য ব'লে কথা নয়। কিন্তু অলসতা অলসতা এদের মাঝে নেই। এরা থাকে বনে-জমলে। কিন্তু বস্ত্র নয়। অতিবেহতারও অভাব নেই। অমলী পান আর হুপুড়ি বার এরা বড় বেশী। যে ঘরেই গিয়েছি বা গবে দার সাধে দেখা হয়েছে বা আশাপ হয়েছে, এই বিশেষীক এক টুকরো হুপুড়ি এগিয়ে দিয়ে অতিথি সেবার চোটা করেছো প্রত্যেকেই। লক্ষ্যীয় এইটুকুই।

মহাকালের পুজারগণ বেহতে হবে। পা হাড়াই সেথিকে। হোট হোট সরবা ভিত্তি, উফু-নীহু পাহাড়ী পথ পেরিয়ে এগতে থাকি। সবার কাছে শুধিলাম ওদের আরও অনেক কথা : ছেলের বিয়ে দিয়ে বাপ ছেলেকে ক'বে, মের আলাকা বরদাফী। ছেলে বাপের সম্পত্তির অধিকারী হয় বিয়ের পরই। বাপ-মায়ের ভরণপোষণের ভার নেয় ছেলেই। অনেক বাপ ছেলের ওপর তরল না ক'বে বা ছেলে বেতে না খিলে বিকেই পেটে-খুটে বার।

পথে দেখা মর্যোর সাথে। হাসিতে হাসিতে পালাচ্ছিল। ওরা লম্বাই খুব হালে। লম্বা শুকে ডাকল কাছে। পরিচয় করিয়ে দিল আমার সাথে। জিজ্ঞেস কয়লা—অলিগাকে বিয়ে করবি তো ?

খুশিতে উত্তর দ'রে উত্তর দিল—হঁ, করব তো। কিন্তু—

—কিছু কি ?

—উঃ আমার বিয়া কয়ে না।

—কেন রে ?

—বুলে কি—

লম্বা গাছিল বলতে যবে। লম্বা তার কণাটা টেনে নিয়ে বলল—যেঁর যত মরকে উর
পছন্দ নয়।

—ওঃ! এই কথা! অজিমা কে তার কখন লাগে ?

—আমার ভাল লাগলে কি হবে! উর তো লাগে না! হাতাখার ভেত্রে পড়ে যেন যাবে।

আবার এগেই। যোগে সজ নেয়।

পাড়ার একপ্রান্তে মহাকালের পুজোঘর। পুজোর ঘর বলতে প্রকৃত্তি কেবলমাত্র একটালি
ঘর। তারপাশ তার উল্লু। মাটি থেকে কিছুটা উঠতে বাঁশের বাঁতা দ্বিজে মাটা তৈরী সব ঘরটা
জুড়ে। দেবতার মূর্তি নেই কোন। কেবল 'চোল' থেকে কুঞ্জে 'বাতাকী' আর 'মহা'। মহাকালের
পুজোর থাকে শুটো। ভুমাভু—ভুভাভু। সব মাহুর—মহানারী-পিত্ত নিবিশেষে এসে ভড়ে
হয় এখানে। পাড়া পুত্র ক'রে আসে। মাতে পুজোর। চোল ছুটি বাতাকী আর মাহা থাকে।
প্রাণের লাড়া আগিরে থাকে। পুজোর সময় ছাড়া থাকেনো হয় না এ ছুটিকে। বাজনার লাগে
মচি-পানও হয় এলতর।

আট পুজো হয় জুলাই আসনে। এই পুজোর লাগে পাঁচটা ঘোরস আর সাতা দুইটি একটা,
দুইটির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যের জন্তে। একে বলে 'ঘেদং'। নক্সের জন্তে লাগে দুটি সান। ঘোরস আর
পক্ষি পাড়াড়ের জন্তে কাউরে বয়েব ঘোরস একটা। এ হ'ল 'লংডং'। মহাকালের জন্তেও লাগে
অর্ঘ্য। সাধা-লাল রংয়ে ঘেদানো একটা ঘোরস। এ হ'ল 'প্র্যাতং'। ঘোরসগুলোকে বলি দেওয়া
হয়। আঠাতো বছরের ছেলে হ'লেই সেই বাড়ী থেকে পাঁচটা ঘোরস-দুইটি উৎসর্গ করা হয় পুজোর।
দেপ্তেমের হয় 'মু' পুজো। এই পুজোর দুইটি জন্তে অর্ঘ্য দিতে হয় একটা সাধা দুইটি দিয়ে।
মহাকালের জন্তেও লাগে ঘোরস, সজ আর পুরোর। পুজো হয় চাঁদা কুলে। পুজোর কোপাড় করে
দ্বারা, তাদের আবার অনেক নিরমও পালন করতে হয়। তার আর লবণ থাকরা তাদের নিয়ে।
ভুটলতে পারে হাতিয়া বাওরা।

তারপর সজ পুজো। সে হয় মার্চ মাসে। সজ পুজো অর্ঘ্য দিল পুজো। এ পুজোর
প্রাণটাও অল্পত বয়বের। পাড়ার বাইরে হয় এ পুজো। হাতার বাঁরে কোন এক জায়গায়। এখানেই
বলি দেওয়া হয় হাঁস-দুইটি, পুরোর, ছাপল—সবই। পাশরও উড়িয়ে দেওয়া হয়। এ পুজোর
টোটাটোদের বোগমান নিয়ে।

লম্বা ভাড়াভাড়া কচ্ছিল কোয়ার জন্তে। তার খুব ইচ্ছে, কোয়ার গণে তার শালীর বাড়ী
হ'য়ে আসি। সুশাসিত তার জন্তে একটু ক'রে দিতেই হবে। লম্বা তার শালীর লাগেই থাকে।
ভু দিয়ে হচ্ছে না। নিয়ে বেবি, বাড়ীতে ছেলে-পুলে ছাড়া আর কেউ নেই। বানিক পরেই অবত
লম্বার শালী কিয়ল এক বোকা কঠি হুড়িয়ে নিয়ে। কণাটা পাকলায়। বিয়েতে তার শালীর অমত
কিছু নেই। তার তো বাড়ী বর, দুইটি পাহ, দুইটি সবই রয়েছে। এলব ছেড়ে লম্বার বাড়ী নিয়ে

বাংলা কি ক'রে দে! এই হ'ল বিয়ের সময়ের কাহণ। সখার চেয়ে তার বয়সও অনেক বেশী। সেই সবে সখার ভাত তার ভালবাসাও অনেক। কিন্তু তাই হ'লে ছেলে-পুলের কাজে দারিদ্র্য ও কর্তব্যও রয়েছে তার। সখাও তার বাড়ী ঘর ভেঙে যেতে নাহক। শেষপর্যন্ত একটা আপোষ করা গেল। মাসের অর্ধেক দিন সখা তার পাল্লীর বাড়ী থাকবে। আর অর্ধেক দিন তার পাল্লী ছেলে-পুল নিয়ে এসে সখার বাড়ী থাকবে। উন্নয়ন দিকই যক্য হবে।

সখা খুব খুশী।

কেনার গণে শুধুই আর অভিন্নার সাথে দেখা। শুধুই একটা হুগুরি পাছে বেমানান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দু'জনেই হালছিল বি-বি ক'রে।

বললাম—বাড়ী একটা ছবি তুলুন।

পালাতে চায় শুধুই। অনেক চেষ্টার বায়লাম্! খুব বিকিয়ে বলল—উঃ কি হবে! বিরা কখনই না তো শুধু উ দিয়া কি হবে! হেসে গুড়িয়ে গেলেন যেন ও।

এই ভাবে ছবি তোলায় চেষ্টা করি। বন্ধুকে বাড়ীর শুধুই। কিন্তু কয়েক দুই মাত্র। বন্ধু চকল ও। কায়েদার পাটার টিপতে টিপতেই সেসে স'রে যায় আবার লামনের বেলা।

টোটােরা দেখাওনা জানে না। তাহার কোন বন্ধুও নেই ওদের। টোটােরা বাহার ভাতি। টো-টো ক'রে খুঁবে বেড়াত ব'লেই বরত ওদের টোটাে নামে পরিচয় ঘটেছে। আসে জুটানের সঙ্গেই ছিল ওদের সম্পর্ক। কারণ জুটানের 'ডোরা' ভাতি আর টোটাে গ্রাম একই ঘরপের ভাতি। সামাজিক ইতিহাসিকও গ্রাম এক। কেবল ভাষা আলাদা। উত্তর দ্বীপকল (বা পশ্চিম জুয়ার্) থেকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েরলার। জুটিয়ারের বিভাজিত করার পর জুটান আর তারতের সীমানা নির্ধারিত হয়। সেই সময় এই দুই ভাতি পৃথক হ'য়ে যায়। ডোরাটা জুটানে, আর টোটাটা তারতে। ক্রমে ক্রমে বাংলাও গেছে ওরা। বর্তমানে পারে বেশ। বর্তমানে পারে।

কিছুদিন আগের হিসেব অনুযায়ী দেখা গেছে টোটােরা পরিবারের সংখ্যা গ্রাম খোট নকুই এবং এই নকুইটি পরিবারে লোকসংখ্যা গ্রাম চারপো।

টোটােরা পার্দেই রয়েছে নেপালীপাড়। টোটােরাই এনেছিল ওদের তাদের ভাল চাবাস দেখাবার জন্যে। কিন্তু একে একে বেড়ে যায় নেপালীদের সংখ্যা। তারপর বন্ধ হয় এই সব সব বাহ্যবের ঠিকরে থাকার পাল। সম্প্র বাক্তে নেপালীদের। টোটােরা কল্যাণের কথা চিন্তা করলে পশ্চিমবঙ্গ ভাষা সরকার। ওয়েলফেয়ার অফিসার নিযুক্ত হলেন একজনে। বর্তমানের বর্তমান বাস্তবতার পর ছিল না। হাতীতে সেসেই আসতে হ'ত অসম ভাবে। ওয়েলফেয়ার অফিসার নেপালীদের বন্ধার কলম থেকে টোটােরা বন্ধ। করার চেষ্টা কর্তৃতে লাগলেন। হলেন তিনি নিবৃত্ত। লোকে বলে, নেপালীরাই তাদের আর্থের জন্যে ভীতে নাকি খুন ক'রে তাদের ঘিরেছে যোক্তাখিনী ভোগ্য নবীর জন্যে। একদিন তিনি ওদের লাখেই সেলেন শিকারে। কিন্তু আর কিছুলেন না। সে অনেকদিনের কথা। টোটােরা সেই বাঙালী ভ্রমলোকের দ্বারা মনের পরিচয় পেয়েছিল। তাই টোটােরা আশঙ্ক ওঁর নামে জ্ঞান রাখা মত করে।

তারপর। অনেকদিনই কেটেছে। টোটােরা বীয়ে বীয়ে বাইরের লোকের সংস্পর্শে আসছে। বতই এরা বাইরের লোকের সংস্পর্শে আসছে, ততই নিজেদের ভালবাসা সবচেয়ে লক্ষ্য রাখছে।

আগে এরা বাইরের লগনের কোন বরষাই বাধত না। কিছুদিন আগেও এদের বাধণা ছিল যে, এখনও ভারতে মহারাষ্ট্র ত্রিভোজিয়ার রাজত্ব চলছে। কুলভোরও কম ছিল না এদের। এদের বাধণা ছিল, টোচোপাড়ার বাইরে গিয়ে কেউ বাজিবাগ কত্নে তার দৃষ্ট্য অনিবার্য। এ কুল এখন এদের তেড়েছে।

এদের সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা বেশী। মেয়েরা কাজও করে বেশী। পুত্রবরা আলস। শুদ্রী-অজিমা-শ্রীতমা-জিকোমা-তাই বলগাছাড়া। অবার পতিবিধি সমাজে। বড় হরিণের মত। ওরা পেতে চায় ওদের সমাজ ছাড়িয়ে কোন দত্ত্য সমাজের লড়াই। শ্রীতমা আর জিকোমা। বিয়ে করতে ওরাও মারাম ওদের সমাজের কোন দরেকের। ওরা সবাই যেন দুটে বেড়িয়ে আসতে চায়—মুক্তি পেতে চায় আদিমপুণ্ডি সমাজ থেকে। যন্ত্রণ ও ভতত বেবে শুদ্রী-অজিমা-শ্রীতমা-জিকোমা নিজেদের কোন দত্ত্য হাতের বরনীক্সে। লোকাল পেতে চায় যেন একটু সেই দত্ত্য মাজবেব।

বেবুক ওরা সেই যন্ত্র। বৃত বাবুক সেই আশায়।

টোচোপাড়ার উপকথা শেষ।

জিপে উঠেছি। কেরার নাম। জিপের পেছনে বেড়িয়ে-এ হেলান দিয়ে বলেছি। জিপ ছাড়বে। টোচোপাড়ার অনেকই ঝাড়িয়ে আমাদের বিদায় বিচ্ছেদ।

জিপ স্টার্ট দিয়েছে। লগা বলল—আমার বিদায় সময় আমার আসুবি বটে লগা।

আসুতে পারব কি না জানি না। তবে তাকে বুদী করার মতোই মাথা নেকে বলি—আসু।

জিপ এগিয়ে চলে। টোচোপাড়ার এলাকা শেষ হয়। হঠাৎ নম্বর পড়ে সাহুটার দিকে।

শুদ্রী না? পাছের আঁকালে ঝাড়িয়ে ও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। শুদ্রীর বুকে সে হাসিটি যেন আর নেই। হাত কুলে আনালাম আসি রে! শুদ্রী কোন প্রতি-ইমিত কত্ন না। হঠত গাঙ্গল না।

জু'মিকের লম্বলকে পেছনে বেবে জিপ দুটে চলে।

শুদ্রী-অজিমা-লগা-শিরাজুমা-শ্রীতমা-জিকোমা—ওরা সবাই যেন আমার মনের ওপর ভিক ক'রে এলে ঝাড়ায়।

বিখ্যাত লুহকার ও শিরানোবাহক শিরোপোন্ড দোতোয়দী প্রাইই অজিমা যোগে কুলভোর। ভেমনি আবার ওঁর ছেলে যু'মের ব্যাপারে ছিলো কলির কুলকর্ণ। দোতোয়দী বহুকণ পাচাশি করার পরেও চোখে যু'ম আনতে না পেরে ছেলের খবে হুকে না তে'কে তাকে যু'ম থেকে জাগিয়ে কুলে বলতেন : "কী ব্যাপার, বোকা? কু'মিও আমার মতো মুতে পারছো না?"

ব্যাপার যা চলছে

চক্রপাশি

(মতামতের ক্ষেত্রে পত্র-ভাষ্যে লিপ্যবতী রাখি ন৷)

বাৎসব, বাৎসব চড়ে। কল, আসার সময় চড়ে। বাৎসব সময় মড়ক! অমৃত পাখীর মতে।

সমুদ্রের পারে বলে একটা সংকল্প নিসূদ। কী সংকল্প জানো? বাঁকি জীবনটা বিবিকল নৈকর্ষের মধ্যে ফাটাঝো! হ্যাঁ, তাই। নামারকম কর্ম-প্রচেষ্টা তো হইলু একদিন। কিন্তু কেউ তার কানাকড়ি কী বাম দিলে? বরক, সমালোচনা শুনেতে তুমতেই জীবনটা গেল। এ শুধু তোমার আহার তথা নয়। সব মাত্রঃখই তথা। মাহুকের জীবনে দুঃখ আর বিপদের শেষ নেই। হোসো না। শোন, বুঝিয়ে বলি। মাহুকের এখন এই বচাবায়ে আসে তখন তার লক্ষ্যই নেওয়া হয় না। বরন যায় তখন খুব খেজার যায় না। পৃথিবীর সংকল্পই তার বিপকে। কোন দিকে সিন্ধার নেই। সে যদি পরীক হয়, তাহলে তাকে ঘোর দেওয়া হবে, সে মিকর্মা, সে অপরাধ। সে যদি বড়লোক হয়, তাহলে তার বিজ্ঞে অভিযোগ শোনা বাবে, সে অলং উপায়ে টাকা রোজপায় করেছে, সে চোর, সে পরীকের বক্তাবোধক! সে যদি স্বাক্ষরীতির মধ্যে থাকে তাহলে তাকে বলা হবে, সে সুবিধাবাহী, সে খুবঃখার। সে যদি স্বাক্ষরীতি একিই চলে তাহলে তাকে বলা হবে, সে দেশপ্রেমিক নয়, দেশের লব্ধে সে চিত্তা করে না। সে যদি দান দান করে তাহলে লোকে তাকে ঠাঁট করে বলবে, সে লোক-বেখানো জড়ৎ দেখাচ্ছে। সে যদি কোন দান দান না করে তাহলে বলা হবে, সে বখ, সে কপন, তার খুব বেবলে হাঁড়ি কাটে। সে যদি বর্ষকর্ম করে তাহলে লোকে বলবে সে জড়ৎ, যদি না করে তাহলে সে অবদিক পানী। সে যদি খুব পরিজ্ঞানী মাহুকের হয়। তাহলে লোকে বলবে, সে বোকা, সে গাঙ্গল। যদি পরিজ্ঞান কম করে, তাহলে সে অলস, চুড়ে, কর্মচোরা। সুতরাং কাল কি কোন কালে।

অনেকদিন জ্ঞানেকার বাৎসবেরের এক বহিষ্কৃত গ্রামের একটি কাহিনী মনে পড়ছে। গ্রামের মাঝা তার মহাপ্রেরের ঘরের বিহে। খুব বট। মাঝা গ্রামের নেখজর। বর আসবে পাশের গ্রাম বেছে। সে গ্রামের বত লোক লবাই বরজ্ঞানী আসবে। বিচারি ব্যাপার। বাৎসবেরিতলঃখ মাঠে লাহিহান পড়েছে। কলকতা থেকে ডেকরেটর সিরে প্যাণ্ডেল বেবেছে। সেইখানে লোক বাৎসবের আয়োজন হয়েছে। এক এক পড়িতে পাঁচলজর করে বলবে। তার মহাপ্রেরের বাড়ির সামনের একাড চুড়ে বরজ্ঞানীঘের বলবার বাবদ। বাহ্যিক রকম পদের হাটা মনেছে। সে সব বরন রাটে

পূরী থেকে আমার সেই বেহাও বহু
এ পত্র লিখেছেন—বহু, বাৎসবীয়া
আসার। প্রতিবারের মতো বা আসছেন।
খুব খুব বয়েই তো আসছেন। কিন্তু
আমাদের কোন সুখা। করতে পারলেন
না। এবার আসছেন বোড়ার চেপে।

যেহে হুই গাঁওতে। কলে হুঁগাঁয়ের লোকই সেদিন সকাল বেকে শরীর ভরতরে করে রেখেছে—
 যাতে রায়ে গ্রাণ করে শাঁটা যায় সেজন্তে অনেকই লকাল বেকে হুইমটর করে দিন কাটিয়েছে। এত
 লোক বাবে, অতএব পরিবেশনকারীর সংখ্যাও বড়। চাই সেই মত। রায় শরীর হির করলেন
 একশো পরিবেশনকারী চাই। এসব কালে ভারী হুত খোয়ালহের মনোপোশাল। একাই একশো।
 তার ডাক গড়ল। মনোপোশাল হাখী। সব রিকটাক মানেক করে বেবে। কিন্তু একটা লুট আছে।
 কী লুট? বোলাই পাড়ায় কাউকে ভাঙা চলবে না। সে কী? তাবাক তো সব কবিরেকরী ছেলে
 আছে না, মনোপোশালের হলের তারায়। কী হুইল। বিহের আদের দিন লছায় ততী হওলে
 মাচল্লরহের লতা বসল। নানা হুইর নানা মত। ওপাড়ার বিলু পিহির নাখিরা এর মধ্যে না
 থাকাই ভাল। বিলু পিহির এক মেয়ে নাফি কলকাতার বিহে ওহ নাম কি... আর হরি খুড়োর
 ভারী বোলাক। তাহাড়া লেবায় কোর করে ছুলেহের চাটে বসলেন। হুতরাং ওর বাড়ীর কোন
 ছেলে পরিবেশনকারীরে মধ্যে বাবা চলবে না। রায় শরীর প্রমাদ পললেন। কিন্তু তিনিও
 অপরদেহ হাছব! নিজের হুইতর মনোপোশালকে পরিবেশনের তার দিলেন। বসলেন, তিনি বলাহলির
 মধ্যে সেই। সকলের সাহায্য তাঁর চাই। মনোপোশাল কোন কথার না বলে চলে গেল। পরদিন
 যখন সময় হয় এলো। এসো পালে পালে বহুবাখী আর নিরহিতের হল। লকলেই প্রচণ্ড বিদে
 নিয়ে এসেছে। জাক পড়লে হয়। এদিকে লছা-লগে বিহে। সময় মত বিহে হয়ে গেল। বর গেল
 বাসরে। বিহে থাকি বেকে হালি তাঁটা আননের হুই তেলে আসতে লাগল। কিন্তু বাবার ডাক সে
 আর পড়ে না। ব্যাপার কি? বোলা মিহে জানা গেল, পরিবেশনকারীরে মধ্যে ইতিমধ্যে
 হলাহলি ঘটেছে, কলে তারা বর্ষট করেছ, অর্থাৎ তারা সবাই চলে গেছে। তাহলে উপায়
 পনেরো কুড়িকন রাহুদী নিহুত হয়েছিল। তাদের বলা হল, পরিবেশন করতে। তারা লাক অর্থাৎ
 বিলে, তাহলে মার আত মাথা নিয়ে বণে কিততে হবে না। জুইলই আদের বাবে অপেক্ষা করছে।
 তারপর? তারপর গ্রাণ লকলেই অজুত অর্থাৎই বণে কিতবেছিল। কিছু নাছোড়বান্দা মাজব
 তাঁরাব বেকে আর রাহুদীরে এলাকা বেকে লুতি সুরকারী মেটাই লুট করে বেয়েছিল। কিন্তু তারা
 বর্ডব্যের মধ্যে নয়। মোট কথা সেদিন কাকর বাওয়া মোটে নি। এমন কি অরং বরকর্তা, তিনিও না
 বেয়েই কিতবেছিলেন।

এই গ্রাম্য মাটকেরই একটি আধুনিক পহর সংস্করণের অভিনয় হয়ে গেল সেদিন শরীর
 কলকাতার দেয়া থানাঘর গ্রাণ হোটলে। কোন অলুত বদনীতির চাপে ব্রাহ্মসুহুতে হোটেলের
 বানলাহায়া এক কোট হোরে বর্ষট করে বসল। কলে আকার লগবরাহ হল না। এবং নিরহিতের
 না বেয়েই কিতবেলেন। সেই আয়োজনের প্রধান অভিযিন ছিলেন হাওয়ার ম্যামরী অরং। তাঁকেও
 সেদিন অজুত অর্থাৎ চলে আসতে হয়েছিল। তবে গ্রাণ হোটেলের ব্যাপারে আরো "শোকারহ"
 ঘটনা হচ্ছে এই যে, ঐদিনের নিরহিতেরা লকলেই বানার বাহ অগ্রিম বিহে টিকিট কিনেছিলেন।
 শুধু লজ্জার বাতির টিকিট কিতবে বিহে হাড জেরং নিতে পারেন নি তাঁরা। একেই বলে বর্ষা
 'বাটগজা' অর্থাৎ 'নায়ে কডি বিহে হুবে পায়া'

হাতের বহুবার কট গাছিলার বলে সেদিন বর্ষলার ডাকার কেশব দেব ডিলপেনসারিতে

দিয়ে একটি ছোট্ট নাকি দেখে এলাম। দাঁতের চিকিৎসার পর ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময়খানে হাত দিয়ে আঁচুটি কাতরোক্তি করতে করতে এক ব্যক্তি বের হুটল। বুঝলাম কী হয়েছে।

লোকটি বললে, আর পারছি না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বললে, আমি তো দেখিনেই বলেছিলাম, দাঁতটা তুলিয়ে ফেলুন।

উঃ ত হ হ! কিন্তু দাঁত তোলাতে আমার বড় ভয় করছে ডাক্তার বাবু। আমার এক বন্ধু দাঁত তোলাতে দিয়ে গটল তুলেছিলেন। সেই থেকে আমার বন্ধ ভয়।

ডাক্তার বললে, আচ্ছা আপনাকে ভয় ব'লে চলে যায় তার ব্যবস্থা করছি।

এই বলে ডাক্তার আলমারি থেকে ত্রাণির বোতল আর সেলস বার করে লোকটিকে এক মাত্রা খেতে দিয়ে বললে, এইটুকুটা করে খেয়ে ফেলুন, তাহলেই মনের জোর ফিরে পাবেন।

লোকটি এক নিঃশ্বাসে ত্রাণিটা খেয়ে ফেললে। একটু পরে ডাক্তার বললে, এইবার আর ভয় করছে না তো?

উঃ! খুব ভয় করছে ডাক্তারবাবু।

আচ্ছা আর একমাত্রা খেয়ে নিন।

কিন্তু তাতেও লোকটির ভয় খুলে না। ডাক্তারও নাহোড়ানো। কয়েক মনের সাহস এনে তার দাঁত লে তুলবেই। হুতরাং মাত্রার পর মাত্রা ত্রাণি খাইয়ে কপীর ভয় খুব কমবার অন্তে বহুসংখ্যক হল ডাক্তার।

এমনি করে বেশ কয়েক মাত্রা ক্রিয়ণ পান করে লোকটি দেখতে দেখতে হীতিমত ঢাকা হয়ে উঠল।

ডাক্তার বললে, এইবার কী রকম বোধ করছেন? আর ভয় করছে না তো?

ভয়! লোকটির দুই চোখ দিয়ে তখন সাহসের স্ফুলিক বেরছে। হু'হাত পাকিয়ে বললে, ভয়! ঘোমটু ভয়! কার সাধ্য এমন আমার দাঁতে হাত বের। কান্দু অনু।

বাটিকের শেষটা আর দেখা হল না। কবীর বলে, মাতাল, দাঁতাল, আর শিঙেল। অতএব একলাকে রাখার মেনে হীটা দিলাম।

What Bengal thinks to day...মার্কে মার্কে এই পোড়া দেশ থেকে এমন এক একটা দাবার চাল বেহোর বা হীতিমত তাক লাগিয়ে দেয়। পরকারী বিজ্ঞানী, পরকারী কতোরা, পরকারী ছুটি, পরকারী বিবিসিয়েব—এসব আমরা ভুনেছি। কিন্তু পরকারী হরতাল? না, এখানে কোনো রাজ্যেই রাজ্যপরকার হরতাল সংগঠন করেন নি। সেদিক থেকে ২৪শে আগষ্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ। কিছু অসংগত কার্যও হয়নি। হরতাল হরতালই হয়েছে প্রজন্মের কাছে অধঃতননের বিকোত বা দাবী জানাতে। একেজেন্ডে তাই। বড় ভয়ঙ্কর কাছে ছোট ভয়ঙ্কর দাবী ও বিকোত নীচেরে জানানো হল। আর একটা কথা লক্ষ্য করা গেল, একটু চাপ দিতেই বড় ভয়ঙ্কর ভীষণের হরকা খুলে কিছু হাল বার করে দিতে গব গেলেন না। দাইহোক বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাপন করলে বটে। যদি দেখা যায় অত্র রাজ্যেও এটি চালু হয়েছে তাহলে আশ্চর্য হব না।

ভীত করছে গরুর জানাতে জানাতে। লোক নিভশিত করছে। পথ ছাড়া যায় না। আর চকুদিকে তেমনি কোলাহল, তেমনি ভাষা, তেমনি অশাশ্বত আচরণ। বলবার কো নেই। ‘বালা জানা মিছে রে। ছুটো চৌসা দিহে রে। বাসা’ অতএব মিথের মান মিথের কাছে। কেবল যেনে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। এখানে সেখানে বল পাঁকানো। বাবা, ক্যাসাব। ওইটুকু গরুর মতোই পাঁচ ছটা মল। অতীত কালে বা তাবাই যেতো না—একটা গরুর মতো আবার মল কি? সব গরুটাই তো একটা মল। তারপর শুভজন? এমন তাঁরাই সন্নিহিত করে পথ ছাটেন। অল্পকেন হুয়ের ছেলেরা নতুন সিগারেট বেতে শিখেছে। মোড়ে ঠাকুরে সিগারেট টানছে। সুতরাং ওদিক দিয়ে না যাওয়াই ভাল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বাড়ন-ই টানার ব্যাপার। কী ব্যাপক প্রচলনই যে এই বক্তৃতা হচ্ছে দিনের পর দিন তা বলবার নয়। আর হয়েছে আরো, সিগারেটে কোম্পানিগুলির বিজ্ঞাপনের জগলে আর আড়ম্বরে। আড়ম্বল ভাগ্য খুঁলেই যেনেবন সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন সিগারেটের। শুধু তাই নয়—কত বক্তৃতা কলী কীর, প্রাইভেটের বটা। সুতরাং হেলেরা যে প্রস্তুত হবে তা আর বিচিৎ কী! এবং বাপ-মা শুভজনের সামনে যেমন তা যাওয়া পান যাওয়া চলবে, তেমনি সিগারেট যাওয়া চলছে। অনেকগুলি বাড়ীতেই এই বক্তৃতা চলন হবে এলছি। মতপাশটাই খুব জড়াজড়ি প্রচারিত হচ্ছে। আড়ম্বল করার করার কবুটেন। কবুটেন ছাড়া পাঁচি হয় না। একজন বিন-বাইশ বছরের ছেলে সেদিন আমার বললে, You have to Mr! Dont be goody goody! come on! যেখানায়, সেই পাঁচিতে ২০ থেকে ২৫ এমনি বয়সের ছেলেমেয়ের লেখা অস্ত্র: ১০০। এবং লকসেই বিকির লকসকার সামনেই যব বাজে। এটা যেন একটা ক্যাসাব। এই ক্যাসাবে না মানে মানে ব্যাকডেটেড হয়ে থাক। যেরকমের অভ্যাস নেই, অনেকেরই হস্ত প্রথম বাজে। বেতে গিয়ে গলা জালা করছে। যুব বিকৃত করছে, আর সেই বিকৃত যুগেই হাসছে। সে এক অদ্ভুত মূর্ত! Come on Uncle Goody, lets have a go, on to the spree, mind a few trots with Hena Chakkor—she obliges all, young and old—have a try। এই বক্তৃতা ভাষা হেলেনের যুগে। আর আশ্চর্য, বাপ মারের সামনেই। হ্যাঁ, আরোহ বটে, বাপ-মা হেলেনের ছোট বড় সবাই একই সূত্রে বাবুজী। বাবু ও কবা। আগের প্রসঙ্গে কীর আলি—সিগারেট প্রসঙ্গ। আমেরিকাতে সিগারেটের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে—ইওরোপের সামান্যনও তার তেঁপ পোনা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে সিগারেট কতিকর। বিশেষ করে লতা হাসের তেঁকাল দেখা সিগারেট। মরাস্তক। আর আমাদের হেঁপে অব্যবে প্রিক সেইবকর তেঁকাল দেখা মহাঅপকারক সিগারেটেরই প্রচলন হু হু করে বেতে বাজে! সরকার বিদিকার। দেশের লোকও তাই।

গল্প-ভারতী সম্পাদক মহাশয় সচীপেয়

এই নিরাকরণ খাত সংকটের দিনে এবং দেশের এই চরম গুরুবজায় বাংলার মেয়েদের আহ্বান করে অপনারা বিকল্পখাত সহজে যে আলোচনা শুরু করেছেন এবং গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপের অল্পরূপ খাত সংকটের যে চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা পড়ে আমার মত অনেকেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন।

এই পত্রখানির মত অনেক গজই প্রত্যাহ আমার পাঞ্জি। অনেকে কোনেও আমারে বক্তব্য জানা করেন। এতে আমার বেশ আশাবিত হয়েছি। এই প্রশংসা বা বক্তব্য লতাই ভাবেই প্রাণ্য যে সব মহিলা সাংগ্রেহ এই পরিকল্পনাকে অগ্রহুত করার মত এদিয়ে এসেছেন।

সম্পাদক,
গল্প-ভারতী

আমার মনে হয় যদি এই আলোচনা ব্যাপকভাবে বেশ কিছুদিনধরে চালান হয় এবং বাংলাদেশের মেয়েরা (যাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান আছে) তাঁরা সাংগ্রেহেও সক্রিয়ভাবে এতে অংশ গ্রহণ করেন তবে শুধু আজকের এই সংকটের দিনের ক্ষত মচ, চিরকালের ক্ষত বাংলার খাত সমস্যার একটা মুরহা হবে। আমি সর্বাস্তঃকরণে আপনাদের এই পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করি।

নিবেদন
ইতি—
তারা বহু

কলিকাতা

১০/১০/৬৭

FOOD FACTS

MISS LIGHTFOOT works in a factory all day. She makes no song or dance about it, but she is doing her bit. And the thing you couldn't help noticing is that even in wartime conditions she is seldom tired, never ill, never nervy.

What is it Miss Lightfoot does that perhaps you don't? She eats potatoes and carrots. So do you. But *she* eats them every day—and every day in a different way. They protect her from illness and fatigue and keep her full of vitality. They'll do just the same for you.



Carrot Sandwiches for a change

1. Add two parts of ground beef, cauliflower, carrot, finely shredded white heart of cabbage, and blend with chutney or sweet pickle. Pepper and salt to taste.
2. Equal amounts of sliced raw carrot, cabbage heart and crisp celery. So and wash thoroughly in sweet pickle. Pepper and salt to taste.
3. Blend sugar ground raw carrot with mustard sauce, flavoured with a dash of vinegar.
4. Cook dried carrot in every sauce until tender enough to spread easily with a knife.

All these fillings taste their best with wholemeal bread.



Our doctors don't mind eating their gross or un-
least your food, but if you
want to show language is
something like this:

Carrot-Cap Salad

Every woman who values her good complexion should have this salad regularly.

Cook two or three good sized potatoes in their skins. When tender, strain without drying off, to avoid making them soggy. Slice and dice neatly, then dress in salad dressing (one part of salad oil to one of vinegar, pepper and salt to taste) while they are still hot. Pile in a salad bowl lined with a few shredded lettuce leaves or watercress. Sprinkle with a little chopped chives or rings of spring onion, and put high with ground carrot.

To make a more substantial dish, add one or two boiled apples or slices of mashed herring.

Potato Flossies

These are real tasty greens.

Scrub a potatoes and green with a coarse grater over a bowl. Then add sufficient flour to form a batter. Season with salt and pepper. Shake a little dripping and make very hot in a frying pan. Drop the mixture into it. When brown on one side, turn and brown on the other. Serve with a little sauce if you want it as a sweet dish. If you want it as a savoury, add a pinch of mixed herbs and a dash of cayenne pepper.

When you are hungry, keep your food as normally happy as possible—grain, fruit, carrots and milk.

"Fadge" for Breakfast

"Fadge" is both nourishing and filling. It is excellent for breakfast.

Blend some well-scrubbed potatoes, then peel and wash them while hot. When the potatoes are well enough to handle, add milk and cook in enough flour to make a pliable dough. Knead lightly on a well-floured board for about 5 minutes, then roll into a large circle about 1 in. thick. Can also wedge shaped pieces and cook on hot griddle, in electric toaster or on the upper shelf of a grill. Cook until brown on both sides, basting with milk.

Remember to turn on your wireless at 8.15 every morning for useful food tips from the radio Kitchen Front.

31

THE MINISTRY OF FOOD, LONDON, E.W.1



Courtesy
Premier Publicity
Society.

মেয়ে 'মডেলিং'

বিকল্প খাছু ব্যবস্থায় মেয়েরা

বেলা দে

বর্তমান খাছু সংকেটের দিনে আমাদের প্রত্যেক গৃহিণীকেই সক্রিয় সহযোগিতা করতে হবে; কারণ আমরা আশা রাখিন যে শৈশবের মেয়ে, আমাদের চোখে করতে হবে সেই শৈশবের প্রতিটি ধরে যেন 'নেই নেই' এমন ভাব না করে। যা আছে তাই বিচ্ছেদ খাছু ব্যবস্থা করতে হবে। তাহা বাওয়া সবই নির্ভর করে অভ্যাসের উপর। শতাব্দী গোলাও নেই, পুস্তকও নেই, মাহও নেই, কাকেই বা আছে তার মধ্যে থেকেই বস্তুত্ব সত্ত্ব ভিটামিন বস্তুত্ব বেখে বাজার তালিকা তৈরী করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি কথা বলছি। আমরা সত্য যদি ঢেকে ঢেকে রাখা করা যায় তাহলে খাছুগ্রাণ বিশেষ নষ্ট হয় না। খাছু বাওয়া আত্মকাল আমাদের বেশে সকলকেই অভ্যাস করতে হয়েছে; কারণ চালের পরিমাণ কম। কিন্তু অনেক পরিবারে বেবেছি, তাই নরম করবার জন্য গরম জলে আটা ভিজিয়ে নেন, এতে গরম খাছুগ্রাণ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। জাতও বস্তুটা সত্ত্ব মাড় বা ক্যান বেখে বাজা করা ভাল, তাতে ভিটামিনের অপচয় হয় না। চালের পরিমাণও কম লাগে। তাহাখুজির ক্ষেত্রেও যদি অল্প তেলে রাখে চান তাহলে একটু ছান মাখিয়ে অল্প তেলে তাহা ছেঁকে দিয়ে উছনের আঁচ কমিয়ে বা বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে আবার তাহাতে থাকুন। তেলের ব্যয় কম হবে। মোট কথা: যে তাহেই হোক খাছু আমাদের আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। সংকেটকালীন অবস্থায় খাছুগ্রাণের অনুপাতের কথা মনে করে বা-হস্তাণ করলে চলবে না—এ বিষয়ে প্রত্যেক গৃহিণীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে।

এখানে বিকল্প খাচুর কয়েকটি তালিকা দিছি। আপনারা এই বিকল্প লক্ষ্য বেখে যদি খাছু প্রস্তুত করেন তাহলে আমাদের অভ্যাস প্রতিযোগের কথা কিছুটা জুলতে পারবে।

প্রথমে আটার কয়েক স্বকম রাখা—

আটার পুরী। পরিমাণ মত আটা নিয়ে জল দিয়ে ঠেলে নেন। ঘি বেবেন না। মাখা হয়ে গেলে চাটতে অল্প ঘি দিয়ে তাতে এ আটার গুটি বা পুরীর মত বেলে ছেঁকে দিন। ইচ্ছে করলে আটা মাখার সময় একটু ছান ও কালোজিরে দিতে পারেন। এটা জলবাধার হিসাবে বেশ বাওয়া চলে।

আটার কটোড়ী—আমাদের বিউলি ডাল, একলের আটা, একপোড়া ঘি, একটু ছান ও বিং, অল্প মাখাবোটা। জিলাবো বিউলি ডালের সঙ্গে এইসব মশলা ও আটা মিশিয়ে ভাল করে মেখে নিয়ে ছোট ছোট লেটি করে বেলে নিয়ে অল্প ঘি দিয়ে তেঁকে নেন। টক তরকারি বা আচারের সঙ্গে খেতে ভাল লাগে।

আটা-টালা—তকনো খোলায় ভাল করে আটা বাধামী বৎ করে তেঁকে দিন। ঘন দুধ, চিনি ও গাখী কলার টুকরো দিয়ে মেখে রাখুন। বেজুর-গুড় দিয়ে আবার ভাল হয়। এটিও জলবাধার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

আটা দিয়ে ছাড়ুর নিষ্ঠি—সামান্য পরিমাণ আটা ও গোটকা ছোলায় ছাড়ু দিন। আটাকে

কটির মত করে মাথাবেন। চাঁদুর সঙ্গে পরস্পর ওলট, ঢল, ঝাঁপটান্ডা হুটো, জোড়ান ভাঁজার শুঁড়ো, বিয়ে মেখে নেবেন। অবশ্য আর অল বিয়ে পুতুপুতুর করে নেবেন। এবারে আটাই খুব বড় বড় লেটি কেটে তার মধ্যে ছাঁড়ুর পুঁহ, মুখটা হুঁড়ে বসেব মত করে নেবেন। কয়েকখানা খুঁটে বা টিকেত আগুন একটি টিন্ বা চাঁটুর উপর আলিয়ে তাপুন তার ভিতরে ঐ সিটুগুলো চুকিয়ে দিন। খুঁটে বা টিকে বেশ বাস্কর মত লাগিয়ে নিতে হবে কিছ। যখন খুঁটে বেশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তখন ঐগুলো বার করে নেবেন। গায়ে ছাইগুলো মুছে পরিষ্কার করে ঐগুলির গায়ে ছাঁড়া করে বেশ বাস্করটা ভাল বি চলে দিন। ঠাণ্ডা চলে ভেজে বান। বেশ সুন্দর বেতে হবে।

ছাঁড়ুর কটি—ছাঁড়ু হিরে কটিও বেশ বানানো যায়। আটা যেহে ঐ লেটির ভেতর আর পরিমাণ ছাঁড়ু করে বেলে দিন, তারপর পরটার মত সেকে নেবেন, ইচ্ছে করলে ঐ সঙ্গে আর পেঁয়াজ হুটোও দেওয়া যায়।

আলুর পরটা—আজকাল অনেকই করছেন। আটা হিরে আলু হিরে সুন্দর পরটা হয়। আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে আলুটা অল্প তেলে ছান, হিং লজাবাটা হিরে ঠাণ্ডা তৈরী করে দিন। নারিয়ে একটু ভিড়ে ভাতার শুঁড়ো দেবেন। আটা যেহে তাতে আলুর পুর হিরে ভালপুটীর মত বেলে সেকে নেবেন অল্প হিরে। ভারী সুবাস্ক হয়।

গমের মুগমী—আবাদের গম, একগোছা কিম্বা, এক মালা নারকেল, আদা, পেঁয়াজ, শুকনো লজাবা শুঁড়ো, ছান, চিনি, অল্প বি কিম্বা কে সেদ্ধ করে রাখবেন। সমগুলো হুঁরে সেদ্ধ করুন। বেশ সেদ্ধ হলে নারিয়ে কলটা ভরিয়ে দিন। উহনে কড়া চাপিয়ে হিরে সব মশলা ভালভেৎ বাতুন তাতে গম ও কিম্বা ছেঁড়ে দিন। এবারে অল্প গরম অল হিরে দেবেন। বেশ বন্ধবন্ধ হয়ে এসে নারিয়ে লজা ও গরম মশলার শুঁড়ো, পরে নারকেল হুটো হিরে পরিবেশন করবেন।

এছাড়া আমাদের দেশে প্রচুর শাকসব্জি পাওয়া যায়। ইচ্ছে করলে নানা জাতীয় সবজারীর বা সব্জি কটি পরটা ইত্যাদি করা যায় এতে আটা মরনার পরিমাণ কম লাগে। এছাড়া ভুট্টা, রাশিও লম্বাধিন, এগুলোও বিকল্প বাস্ত হিসাবে চালু করা যেতে পারে। গমের বিকল্প হিসাবে বাঁধাআলু ইত্যাদির মতলা ব্যবহার করা যেতে পারে। লম্বাধিন ও আলুর কিছুকি হতে পারে। কচুর মত জাতের মত ব্যবহার করা যায়।

আমাদের স্থল খাদ্যের বিশেষ প্রচলন হলো দরকার। প্রতিদিনই যদি রাঙে, ভাল বা বে কোনো সব্জির রূপ একটি করে গম হিসাবে বাস্ত তালিকার রাখা যায় তাহলে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে বেশ উপকার পাবেন। ভুট্টার সঙ্গে পোনা মাছের রাঙা খুব ভাল বেতে হয়। আদ্যরা প্রায় প্রতিদিনই একটা বা একটা ভাল রাঙা করে থাকি। ঐ ভালের সঙ্গে যদি সব্জি হিরে রাঙা করা যায় তাহলে কিছ ভাল ও অল্প ভাত বা কটি হলেই বেশ খাওয়া যায়।

মাছ অত্যন্তের দাগ : কাজেই যদি চিত্রাচরিত ভাত কটির পরিবর্তে নতুন খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করে পরিবেশন করা যায় তাহলে আমায় মনে হয় একটু একটু করে আমায় লক্ষ্যেই এইসব নতুন নতুন খাদ্য গ্রহণে অত্যাৎ হয়ে উঠবে। তখন আর 'হা' অয়েং' বিলাপ এতখানি প্রবল হয়ে দেখা দেবে না।

হাসি মুখে খেতে হবে

শান্তি ভট্টাচার্য

আমি সারা বেশ ছুড়ে তুই এক কথা কি বার! কি বাইরে ছেলেপুলে বাডিয়ে তাগবে।
আমরা বাঙ্গালী, আমাদের প্রাণ বাত তাত; কিন্তু চালের অভাবে বহুদিন থেকেই বিশেষ
করে পচ বিষমহাণ্ডের সময় থেকে পম ব্যবহারেরও আমরা বেশ অভাব হয়ে পড়েছি। কিন্তু বেশে
আজ চাল ও পম এই দুটো জিনিসেরই অভাব। যা হোকনা পাওনা যাচ্ছে তাতে কারোই কুলোচ্ছে
না, বাইরে চাল বাজারে কোথাও কোথাও পাওয়া গেলেও তার যা অগ্রিমূল্য তা কিনে সংসার
চালাবার সামর্থ্য ক'কেনেই বা আছে?

এই পর্বায়ে আলোচনার অঙ্গ 'পম-ভাত'টা খুঁই সম্মোহনযোগী অজ্ঞান মানিয়েছেন বাংলার
মেয়েদের। এখন আমাদেরও সেই অজ্ঞানে লাড়ু বিয়ে এগিয়ে আনা উচিত। এই ব্যস্ত সমস্তা আজ
জাতীয় সমস্তার ঝাঁকিয়েছে। এ আর আজ আমার আপনাত নহ, সকলেরই সমস্তা, তাই আমার যা
দু'চাষটি রাষ্ট্রার কথা আসা আছে বা বিয়ে বেশ কিছু চাল বা পম জাতীয় জিনিস কম খরচ করে
সংসারের খাতের সমস্তার মোকাবিলা করা যায় তাই বলছি:

প্রথমেই ধরুন ভাতের কথা। মনে করুন, আপনাত সংসারে প্রতিবেশীর এককল্যাণ করে
চাল গ্রহণে হয়। এখন যেকোনু আপনি যখন আপনার তুলনায় অর্ধেক পাচ্ছেন আপনি কোনও মতেই
৫০০ গ্রামের বেশী চাল ঝাঁকিতে চাপাবেন না। এর হতে পারে ষাটটিটা পূরণ হবে কি করে? ভাতের
সঙ্গে নানাধর্ম লিঙ্গ দিয়ে দিন। যমন, কচি ভিড়ে, চাঁচুপ, লাউ বা কুমড়োর কচি ডগা, ডাটা (মটো)
জাতীয় শাকের মোড়া, কাঁচা পেঁপে, ডল, মানকচু, কাঁচা কলা, রাগা আলু, মাঝে মাঝে উজ্জ্বী ইত্যাদি।
আলু বা ডালক মাঝে মাঝে দিতে পারেন কিন্তু ঐ দুটো জিনিসেরই দাম খুব বেশী হয়ে গেছে, কালেই
ওগুলোও কম করে খরচ করা দরকার। বাই তাত দিন না কেন সেগুলো আগে থাকতে ভাতের মধ্যে
থেকে বার করবেন না। ওগুলো ভাতের মধ্যেই থাক—তাত পরিবেশন করার ঠিক আগে বার করে
ভাত থেকে আলাদা করে দিন। এখন প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে একটু লবণ, সরসের তেল, সরসে
বাটা বা কালুন্দী মাখিয়ে পরিবেশন করুন; এতে কিছুটা পেট ভরবে বেশেও তৃপ্তিবোধ হবে। অন্যতর ভাত

ভাত (ভাতের মধ্যে সিদ্ধ) দেবার কথা জানা আছে সকলেরই কিন্তু তবু একটু আগুতাতে বা অল্প কিছু ভাতে দিলে হবে না, এগুলি সবই এখন দিতে হবে একটু বেশী পরিমাণে যেন বাপতে হবে যে এই সব খেয়ে পেটটা যেন কিছুটা ভরে যায় আর তার সঙ্গে অল্প ভাত খেলেই পুরো খাওয়া হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ও নাকি তকার কাজ হবে। কারণ এই সব খাত সবজীতে খাদ্যাংশ সব চাইতে বেশী থাকে।

ভাতের ক্যান যাতে না ফেলতে হয় ভাত চাপাবার আগেই সেটা বিবেচনা করতে হবে। ভাতের হাড়িতে অল্প এমনভাবে দিতে হবে যাতে ভাত ঠিকই সিদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু ক্যান না ফেললেও ভাত বেশ ঘরঘরাই হবে। ভাতে চাল অল্প হলেও চলবে এবং ভিটামিনও (খাদ্যাংশ) অনেক পাওয়া যাবে।

এছাড়া চালের প্রকৃত বিকল্প খাদ্য গম আতীর কথা। ভাতের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে আনতে হয়েছে কিছুটা গম আতীর খাতের প্রয়োজন হবে। কিন্তু ভাত বা যখনই যখন আছে তা নিস্তারই পর্যাপ্ত নয়। হাইহোক এখন আগুন দিবি দেখানো খুঁজে যদি কিছু ঠাণ্ডা করে পারা যায়।

এখানেই বন্ধন কটির কথা। আজকাল অবিকার্য বাড়ীতেই রাতে চাতে গন্ধা রুটি খাওয়া হয়। তার ভেত্রে যে পরিমাণ আটা রোগ মাঝে হয়—যদি তার অর্ধেক পরিমাণ পরচ করা হয়; যোল না হলেও লম্বা চাটে দিনও রাতে তাই চালের বিকল্প হিসাবে দুপুরে পাওয়া চলে যেক পাবে।

এখন কিতাবে অর্ধেক আটা দিবে সমপরিমাণ রুটি তৈরী করা যায়—আলোচনা করা যাক।

বন্ধন আপনাদের প্রতিদিন এককিলো আটা লাগে। আপনি আরেকিলো পরিমাণ হাঙা আলু (ঠিক আলুও বলে) দুপুরে রান্নার পরই সিদ্ধ চাপিয়ে রাখুন। মরহুদে চাপান যাক। সন্ধ্যা রাখুন যেন আলুগুলি বেশী সিদ্ধ হয়ে বলে ভাল না যায়। বন্ধকর হলে সিদ্ধ করে না দিয়ে রাখুন পরম জলের মধ্যেই থাকে না। পরে বিকালের দিকে যখন বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন খোলাগুলি ভাল করে তুলে ফেলুন। এখন একটা গামলা বা লম্বা পাতের মধ্যে ঐ সিদ্ধ আলুগুলি বেশ করে মেখে ফেলুন। খুব ভাল করে মাখবেন যেন হালি হালি না থাকে। মাখার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করে তুকনা আটা দিতে থাকুন আর মাঝে মাঝে। বন্ধকন নাটিক বেলার মত গুরু হয় আটা দিয়ারে যায়। মোটামুটি হিসাবে প্রায় সমান পরিমাণ আটাই লাগবে। তার মনে আরেকিলো হাঙা আলু সিদ্ধর সঙ্গে আরেকিলো আটাই লাগবে। এইবার লেট কেটে যেমন ভাবে রুটি করা হয় করে নি। দেখবেন প্রতিটি রুটি তুললে এবং বাবার সময় পরমই হোক আর ঠাণ্ডাই হোক বেতে খুবই জ্বাছ ও চমৎকার লাগবে। আরেকিলো হাঙা আলুর দাম আরেকিলো আটার চেয়ে অনেক কম তাছাড়া আটা যখন পাওয়াই মুকিল তখন দামের কোনও প্রস্নই ওঠে না। রান্না আলুতে ভিটামিন অনেক, কানেই পুষ্টিকর ও সুবোজক।

যেহাউ যে হাঙা আলুই সিদ্ধ করবেন তা নয়; পোশ আলু, শুক্কিহু সিদ্ধ করলেও ঐ একই ভাবে রুটি করা চলে। পাকা তালের এসের সঙ্গে আটা মিশিয়েও রুটি হয় তবে সেটা গুরুপাক কানেই এক আধদিন খাওয়া চলতে পারে। প্রতিদিন নয়, কারণ হজম করা যাবে না, ফলে অস্থির করবে। এক আধদিন বেশ আহার্যে খেতে পারেন। খুব বললানও হবে আনন্দও পাবেন।

যদি বন্ধন ভালেই হয় খুব বেড়ে গেছে কানেই সেদিকেও আমাদের নজর দিতে হবে যাতে ভালের পরিমাণও কিছুটা কমান যায়। ভাল শুধু না রাখা করে তার মধ্যে এক একদিন এক একটা

শাকশজি দিয়ে দিন। তাতে খেতে ভালই লাগবে আর স্বাস্থ্যও শক্তি অটুট থাকবে। টাটকা শাক-পাঞ্জিতে বাস্তপ্রায় যথেষ্ট তাতো লম্বাই জানেন। আমাদের দেশের গরীব লোকেরা এষ্ট পেয়ে কেমন সুন্দর শরীর গড়ে তোলে ও তত কাম কৰ্ম করে। এই ভাবে শক্তি ভাতীয় জিনিস দিচ্ছি দিয়ে খেলে জাঃ বা কটির পরিমাণ অনেক কমিয়ে ফেলতে পারবেন। জালের মধ্যে অনেক কিছুই দেওয়া যায় যেমন বকুন ঝেঁড়ের দিমে মুলো, ফুলকপি, বাগকপি, দিম, নরুন আলু ইত্যাদি। বাস্তপ্রায়ট বকুন বা অন্যান্য এ পাওয়া যায় তার করেকটি বলছি—লাউ বা সুমকোর কচি বা শাক ভাটা, উচ্ছে, আলু, জুনো করে কাটা খোক জুই ইত্যাদি।

অল পাওয়ার পার্ফেক্ট বিভিন্ন গ্রন্থের ও দেশের লোকের বাস্ত আলোচনা। কাকেই বাওয়ার ব্যাপারে পুষ্টিগরী সমস্ত লোকই কিছু একই বাস্ত গ্রহণ করতে পারবে না নিশ্চয়ই। তবুও আমাদের যে পরিমাণ ফল, মিষ্টি, তেতো বা টক লাগবে ঐ একই জিনিসকে অর্থাৎ শক্তি ভাতীয় জিনিসকে সেইভাবে ঠিকঠাক করে নিতে হবে। আর এ ব্যাপারে আমাদেরই তো এদিয়ে আসিতে হবে। একদিন অবশ্য ছিল (খুব বেস্টমিন আগের কথা নয়) পুরুষেরা বাস্তর থেকে নানারকম জিনিস নিয়ে আসতেন আর মেয়েরা সাব্বাখিন বলে তা দিয়ে তত রকমেরই না রান্না করে পরিবেশন করতেন। কিন্তু আল—আল আর নানারকম জিনিস কিনে আনা সম্ভব হচ্ছে না। সবই তো অগ্রিমূল্য, কাক্সেই বা পাওয়া যাচ্ছে ও কিনতে পাওয়া যাচ্ছে তাই আমাদের হালিমুখে খেতে হবে।

—

এমিল জোন্সার কাছে একদিন এক তরুণী এসে প্রশ্ন করলেন,—আজ্ঞা আপনিই হলুন সত্যিকারের গ্রেম কি?

জোন্সা বললেন,—যে গ্রেম মিথ্যে নয়, সেটাই সত্যিকারের গ্রেম।

—অর্থাৎ? বিশদিত ভাবে প্রশ্ন করলেন তরুণী।

—যে গ্রেম কীংয়ের কোন কাজে লাগে সেটাই কথাই বলছি।

—কি কাজে লাগে? তরুণী বললেন।

—অর্থাৎ যে গ্রেম হাওয়ার উড়ে বোকার না, চারিদিক বজায় রেখে সঙ্গারের তিন পত্তন করে।

—সেটা আসবে কোথা থেকে তরুণী বললে।

—বিবাহের মধ্য দিয়ে,—গরীর ভায়ে উত্তর দিলেন জোন্সা।



এই প্রথম

প্রেমের ঠাকুর

অমলী চট্টোপাধ্যায়

যুগে যুগে সাধনার পূর্ণাঙ্গীত ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমিতে আগমন ঘটেছে যুগাবতীর মহাপুরুষের।

৷ যং তগবান শ্রীশ্রীভাসবদ্ গীতার ভার আধিষ্ঠান লব্ধে বলেছেন—

“পরিভাষায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ চক্ৰতাম্

ধর্ম-লংকাপনার্থায় লজ্জবানি যুগে যুগে।”

। জুটের দমন, শিটের পালন ও বর্ষের পরিভ্রমণের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।)

যুগে-যুগে ভারতবর্ষ মহাপুরুষের সাধনার বিজয়-সাধা ছড়িয়ে দিয়েছে তিকে দিকে, দেশে দেশে। আজ সমস্ত পৃথিবী প্রভাবমত চিত্তে এইসব যুগাবতীর মহাপুরুষের পরিপথে আমার ভক্তির অর্থ। যুগে-যুগে তগবান মর্ত্যের মাক্ষের মধ্যে নেমে এসে লীলা করেছেন। তিনি বিলিয়েছেন শ্রম, যুদ্ধ টেনে নিয়েছেন পানী দুই আর্জুনকে। তাঁদের লীলা-কাহিনী কিতাবে আশ্চর্যকান করেছে তা। আমাদের মতো সাধারণ সাংসারিক মানুষের উপলব্ধি কটা দুজর। বহুৎ যেটুকু আমরা বুঝছি তাকে তগবান করে এইটুকুই বলতে পারি—

“হে ঐশ্বর—

তুমিই পিতা, তুমিই মাতা,

তুমিই বহু ? তুমিই সবার।”

আজকে ধীরে কথ্য লিখতে বসেছি সেই মহাপুরুষের কথ্য লিখতে যাওয়া যেনই অসম্ভবের উদ্দেশ্যে যাওয়া কথা। আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর পক্ষে সেই মহাত্মনের মর্ত্য লীলাকে নিপুণভাবে ছুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য, তবুও ভরসা এই যে পাঠকবর্গ আমার মোহকটিকুলো মার্জনা করে দেবেন।

(১)

“গন্ধদীপ পাতায় পাতায় তোমারই নাম লেখা

আবার কবে আসবে ঠাকুর আবার হবে দেখা।”

ମହାବୀର ଶ୍ରୀତି ମାତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରାଣାୟାସ ଲେଖା ଆଜେ, କଲ୍ୟାଣିନୀ ମହା ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନବର ସ୍ୱାର୍ଥ, ପ୍ରାଣାୟାସ ବଳିବେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ମହତତ୍ତ୍ୱେ ମିଶ୍ରିତ, ତିନିଟି ଆହାରର ପ୍ରାଣାୟାସ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର—ଆଜି ଠାକୁର ମହତ୍ତ୍ୱେ ମାତ୍ର କଟି କରା ଲିଙ୍ଗେ ନିକଟେ ସ୍ଥଳ କରତେ ଚାହିଁ—ତାଟି ଆହାର ଥିଏ କଞ୍ଚିତର ମଧ୍ୟ ସାଧା ।

শেষ :-

আমাদের চাকুরের সীলনাক্ষত্র ছিল বাংলাদে ক্রোমও এক কুহ নাম লগ্নিতে । তিনি হুগলী জেলার কাহারপুকুর গ্রামে নৈপদে সীলা কতে গেছেন ।

“হ্যাঁ! জুনিয়র খাতির মীড়
ছেটো ছোট গ্রামগুলি।”

এমনি একটি ছাত্র জাহাঙ্গীরনগর ।

এই গায়েবই তিষ্ঠান গ্রন্থ কুশিয়ার চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকোপে বেঙ্গল বঙ্গ সিরিজিলেন সেই আলীম অনন্ত মহাপুত্র। কামায়পুত্র গ্রামটি ছিল বেঙ্গল বঙ্গ। পট্টাবলীও ছিল সব এবং সন। তাঁরা শান্তিতে ইশ্বর আরাধনার মাধ্যমে জীবনের পবিত্র সময় কাটিয়ে দিত। তাঁই না হয়: ভগবান নিকে এলেছিলেন সেবানকার কুটিয়ে। ঠাহর প্রিয়স্বাক্ষরকণে পৈশবে পশাবর নামেই পরিচিত ছিলেন। শিতার নাম ছিল কুশিয়ার চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ছিল চন্দ্রমণি দেবী। পবন সাতিক গ্রাম ছিলেন কুশিয়ার। বঙ্গের প্রতিষ্ঠিত বহুব্রীহী ছিলেন তাঁর পুত্র চন্দ্রের সাদী। বামীর বর্ষা অল্পদামিনী ছিলেন চন্দ্রমণি দেবী। পশাবর পুত্র তাঁর হাকুমার ও বামেরব নামে দুই ছেলে এবং কাত্যাবনী ও লক্ষ্মণলা নামে দুই মেয়ে ছিল।

[illegible]

বীর-বীর কড়-জ্ঞে আভিত হোস। একে একে হাস গুহে এলো কান্ডন। শীতের হুহুনি ফেটে গিরে আকাশের পারে হুস্তির আনন্দ। প্রকৃতির প্রাণে উৎসবের লাড়া ভেসেছে। কক্ষপক পতঙ্গার, টানের শব্দ কল্যাণকর অন্তরঙ্গি যেন কোমল নৃতনের ইশারা বহন করে আসছে। নিশিবেয় বিনায়ে বিনময়ী উষা বরণভাঙ্গা সাজিয়ে প্রকৃত হাজে কোমল মহামানবকে মর্ত্যের পুলায় বরণ করে নেবার ভক্ত। ঠিক এদিন দিনে বার্ষিক পবিত্র আত্মার আভাসিত ক'রে, বর্ণের দেবতা মঙ্গল মিলনে কুসিদ্ধারের পূর্ণহুস্তি। ১২২২ সালের ৬ই কাশ্বন (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৯ খ্রি:) বুবার শুভা বিতীরা জিভির ব্রাহ্মমুহুর্তে ব্রাহ্মপতিবার বর্ষোৎসবের পূর্বকণে প্রীতিপদ্যের (পবনভীকালে প্রীতিবাহকবের) মর্ত্যে নেমে এলেন সীতা খেলার ভক্ত।

বীরে-বীরে শিশু বড়ো হাল। নাম রাখা হোল পদাধর। ছোট থেকেই শিশুর উপরের দিকে মনোযোগ। নিম্নের দিকে নানা দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে তুলে পূজা করে। বালকের হাতের চুম্বন মূর্তি যেন চিরন্তন হয়ে ওঠে। শিশুর যখন পাচ বছর বয়স, তখন তাকে লাক্ষ্মীবাসুদেব পাঠশালায় লেগে দেওয়া হোল। কিন্তু তিনি লব্ধ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা তাকে কি করনও সামর্থ্য পূর্ণি দিয়ে আটকে রাখা যায়? তাই পড়াশোনার চেয়ে বরং পদাধরকে মাটির পুতুল গড়তে বা বাজাপান শোনাতো দেওড়া হোক, এমন সুবিপুল দক্ষতা নিয়ে কাজ করবে যে সবার একেবারে ডাক লেগে যাবে। পদাধর এতো হৃদয় পান গাইতো যে সবার চোখে জল দেখা যেতো পান শুনে। একবারের ঘটনা বলি :—

গ্রামের লাক্ষ্মীবাসুদেব বাড়ীর মেয়েরা ছিল খুবই পদাধরীন। কখনও পুতলের অন্য়বস্থার তেতরে ঢোকার চক্কর ছিল না। একদিন লাক্ষ্মীবাসুদেব একটি গরীবণু মাথার ঘোমটা টেনে লাক্ষ্মীবাসুদেব সরল মন্ডলে এসে দাঁড়ালো। লাক্ষ্মীবাসু তাকে গ্রহণ করে জানালেন যে বহুটি ছাটে এসেছিলো কিন্তু সজ্জা হয়ে বাঁচবার সে সব কুলে লাক্ষ্মীবাসুদেব বাড়ীতে এসেছে, এই কথা শুনে লাক্ষ্মীবাসু বাড়ীর মেয়েদের ডেকে বহুটিতে অন্য়ত নিয়ে বসে বসলেন। মেয়েরা বহুটিকে নিয়ে গেলো। কথায় কথায় সবাই জানলো যে বহুটি পূব ভালো মান করে। তখন সবাইয়ের অন্তরে বহুটি সুললিত কর্তে মান বসল। তার পূব শুনে বাড়ীর সবাই পানের আকর্ষণে ছুটে এলো। এমিক পদাধরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চক্কর ঘুরে ঘুরে আসল হয়েছেন। অবশেষে পদাধরের বড়ো বাবা রামকুমার “পদাই পদাই” করে ডাকতে ডাকতে খুঁজতে বার হলেন। ডাক শুনে লাক্ষ্মীবাসুদেব অন্য়বস্থার গরীবণুটি হঠাৎ “বাই গো বাবা” বলে লাফ দিয়ে চোখের পলকে বাইরে চলে গেলো। নিম্নেবের মধ্যে যে কি ঘটে গেলো তা কেউই বুঝতে পারল না, এমনিই রসিক ছিলেন আমাদের গ্রামের ঠাঁহুর।

বালক পদাধরের যখন সাত বৎসর বয়স সেই সময়ে বিজয়া হনুমতী পূজা তিথিতে নিকটবর্তী গ্রামে পূজার ক্ষত্র নিয়ে তার বাবা সেখানেই গ্রাণত্যাগ করেন। এমিকে পিতার মৃত্যুর পর রামকুমার হামেশ্বরের হাতে গ্রামের ভাই নিয়ে পদাধরকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। এমিকে পদাধরের পড়ার মন নেই। দাদা রামকুমার চিন্তিত। দাদা রামকুমার পদাধরকে বড়ো বোঝান যে অস্ত্রতঃ লেখাপড়াটা শিখে নিলে বকমানিটাও তো হবে, কিন্তু পদাধরের সেই এক কথা—“অসব আমার ছাড়া হবেনি দাদা।” দাদা বুঝলেন যে তার আত্মজালা তাইটিকে বোঝান বাবে না।

সামান্য :—

জানুয়ারি বয়ে চলেছে কুণ-কুণ লম্বা। পথিকেকেই হকিণেশ্বর। বাতো শিবের মন্দির, বাবা গোবিন্দের মন্দির, মাতা মন্দির, আর সবাই মাঝে বিরাগিত বরাহরমায়িনী মাতা তনুভায়িনীর মন্দির। পদাধর মায়ের কুবনমায়িনী রূপ দেখে আত্মহারা, পদাধর মায়ের অনবরত কীর্তন “মা দেখা দে মা,” সবাই ভাবে “আহা ছেলেরটা বুঝিবা না মারা গেছে গো।” কেউ বা ভাবে পাগল মূর্তি। কিন্তু মায় উন্মত্ত পদাধরের আত্ম আত্মিক তিনি কোথায়? তার দেখা তো পাওয়া যাচ্ছে না? ছুটে বান পদাধর মন্দিরে, চেয়ে থাকেন কুবনী মূর্তির দিকে, তবে কি দেখানো একটু গ্রন্থের হালির আভাষ? আবেগে আত্মল হয়ে পদাধর ডাকে, চোখের জলে দৃক জেসে যায়। দিসবাস্ত বুঝে ‘মা’ ডাক ছাড়া

সদায়র যেন আর কিছু জানেন না। পাওয়া নেই, খুঁজ নেই, এক মস্তম্ভর যুগে ছাড়া। মা কেম দেখা যেন না, তবে কি পাখাণী মা আর আসবেন না? পদাধঃ মনস্ব কত লন এ জীবন আর স্থাপনের না। সামনেই আছে উজ্জত খল, তাতেই জীবনের অবসান ঘটবে। স্বাভিবেলা সদায়র উজ্জত খল নিয়ে প্রস্তুত হলেন তিনি নিজেকে বলি হোবার জন্য। 'ক' যখন তিন? তাঁর সামনেই আবির্ভূতা বিবলজননী। সামনের সমস্ত কিছু লুপ্ত হয়ে গেল। চারদিকে অ্যান্টিস সমুদ্র। সামনে মন্দিরের সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে বিবলজননী, যুগে প্রলম্ব কালি, কানে বরাতর মুখ; মুহুর্তে অব্যক্ত কোল মাস্তুলি। লজ্জাকালীন সদায়র দাঁড়িতে পড়ে পেলেন। ঘন ভবে বইল প্রজ্বর আনলে, বিবলজননীর প্রলম্ব পেয়েছেন তিনি, আর কি চাই?

বিবাহ :—

এদিকে গ্রামে গ্রামে যখন বটে গেছে পদাধঃ কলকাতায় রাণী হাসমণির মন্দিরে পূজা করতে করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছেন। মাতা চন্দ্রমণি দেবী তাঁকে আতুল করে ওঠেন। তাঁর সাংসারিচৈঃ মণিক সদায়র কিনা পাগল হয়ে গেছে। ছেলেকে বেগবার অস্ত্র মাথের মন ব্যাভুল হয়ে ওঠে। বাৎসর্যকে তিনি রাক্ষসের পাঠান সদায়রকে নিজে আসবার জন্য। জীবনিন পরে হাংক বেবে সদায়র শিশুর মতো 'মা, মা', ডাক ডেকে অধির মাতা তার ছেলেকে পেতে খুঁজ, কিন্তু মাথের মন, তাই ছেলেকে লসোরাই বেবেতে চান। তিনি ছেলের বিয়ের তোড়কোর শুরু করলেন, মনোমত পাড়ী আর পাওয়া যায় না। তাহলে উপায়? কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ চিত্তাধরন তার বিয়ের ব্যবস্থা কি আটকে থাকতে পারে? সদায়র নিজেই বললেন, "তোমরা মিছি মিছি ঘেরে খুঁজছে, সেখ গিটে সরাসর্যটির ভাস মুখুড়োত ঘেরে আমার অস্ত্র সুটোই বা আছে।" অধিন লব ছুটল ঘেরের খোঁজে। লতিই তো বেগবার মতো ঘেরে, যেমন ঘেরের রূপ, তেমনই ঘেরের গুণ। ঘেরে পছন্দ হয়ে গেল। মাতা চন্দ্রমণি দেবী উদ্বেগান্বী হলেন বিয়ের অস্ত্র। ১২৬০ সালের বৈশাখ মাসে বিয়ের দিন স্থির হোল। নির্ধারিত দিনে, পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়-বন্ধন সকলের আনন্দ-অছট্টানের মাধ্যমে আমায়ের ঠাকুর ও ঠাকুরাণির (ঐশ্বিন্দাবর ও শ্রীমা সারসাময়ী) ঐশ্বিক মিলন বিবাহের মধ্যস্থিত সুলক্ষণ হোল। বিয়ের পর শ্রীমা আত্মীয় লগে বস্ত্রবাহাণী চললেন। চন্দ্রমণিদেবী পুত্রবধূর টান যুগ বেবে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। পাড়া-পড়শী সবাই বহুকে বেবে লগই হোল। কিছুদিন কাখাৎপুসুরে কাটিয়ে সদায়র কলকাতায় চলে এলেন। এই সময়ে তৈরবী মাসে একজন ব্রাহ্মণীরা কাছ থেকে সাধনার বিষয়ে কিছু লম্বাফতা লাভ করেন। এই ব্রাহ্মণী ছিলেন সর্বাঙ্গজ্ঞা। এই সময়ে সদায়র ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে কিছু কিছু পাত্র শিকা করেন। সদায়রের ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে শিকা নেওয়াও কিছুদিন লগে তোতাপুত্রী মায়ে একজন মাসা সন্ন্যাসীর কাছ থেকে শিকা। নেন, এই সন্ন্যাসী-সদায়রকে, অধৈর্যজনন অস্ত্রপ ব্রহ্ম, নিবিকল সমাধি এইসব সাধনার উল্লসুখের অর্গল মোচন করে সদায়রকে সাধনার উদ্যোগের পর দেখিয়েছিলেন। এই তোতাপুত্রীর প্রেরণাই সদায়রকে নিবিকল সমাধি লাভ করতে লম্বাফতা করে এবং পরবর্তীকালে সদায়র ঐশ্বিন্দাবর নামে অভিহিত হন।

এদিকে শ্রীমা কাখাৎপুসুরে বা ভরাসামাটিতে। কিন্তু ঘন তাঁর ঠাকুরের পারশদেই পড়ে আছে। কীভাবে ঠাকুরের একটু দেখা পাবেন সেই চিন্তায় তিনি বিকোরে। এমন সুযোগ এলে গেলো।

১৯৩৮ সালের হোল পুনিমার উৎসবে একমল সন্ধ্যায়ী পদ্মসাগর উপলক্ষ্যে কলকাতা যাবে বীর করে, যা সাধারণতই ইচ্ছা হয় বাবার, কিন্তু কী করে বাবাকে বলেন? এই কথাটা তিনি তার আত্মীয়তার কাছে এক সময়ে কথায় কথায় ব্যক্ত করেন। সেই আত্মীয়টি শ্রীমায়ের পিতার কাছে বলেন। তিনি সন্দেহে শ্রীমাকে সন্দেহ করে হকিগেথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু অন্তিমালের কালে একটু হঠাৎই শ্রীমায়ের জ্বর আসে। শেখবরত বাবা হয়ে একটা চটিতে বিছানো নেন। এই সময়ে তিনি একজন কলকাতাবাসিনী নারীর দেখা পান। তাঁর কোমল কণ্ঠের স্পর্শে শ্রীমায়ের সব বেদনা দূর হয়ে যায়। চার দিন পরে অনেক বাবা-পুত্রি আতঙ্কিত করে শ্রীমা তার বাহিরে তাঁরই হকিগেথের আসেন।

এই সময়ে হকিগেথের অক্ষয়দা ছিল। শ্রীশ্রীকান্ত, শ্রীমা, তাপনে দ্বন্দ্ব, এছাড়া সন্দের প্রমুখ শিল্প ও ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হকিগেথের বহুজনের আগম বসেছিল। নাট্যকার শ্রীশ্রীশ্রী বাবুও ঠাকুরের প্রদর্শন-কণিকা লাভ করে বসে বসে। ঠাকুর প্রায়ই এইসময়ে তক্ত ও শিল্পবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে উপবেশন করতেন। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(১) একদিন ঠাকুর ঈশ্বরকে কী করে লাভ করা যায় সেই প্রশ্নে বলেছেন—

“সমুদ্রে বসে আছে কিছু তারি জল হয় চাট, তেমনি সলোয়ারে ঈশ্বর আছে। তার জল সাধনা চাই।”

(২) আরেক দিনে ঠাকুর গুণী তক্তবের ঈশ্বর আরাধনার প্রসঙ্গে বলেছেন—

“গুণী তক্তবা যদি পিতা মাতা পরিবার পুত্রের প্রতি সমস্ত কর্তব্য করেও মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে পারে, তাহলে প্রতি ভগবানের কৃপা অধিক প্রকাশ পেরে থাকে।”

(৩) আরেক দিনে ঠাকুর বিশ্বাসের উপমা প্রসঙ্গে বলেছেন—

“বাস্তব বিশ্বাস আছে তার সব আছে, আর বিশ্বাস নেই তার কিছুই নেই। কামচন্দ্রকে দেখে বীর সমুদ্রে পার হতে চেষ্টাছিলো, কিন্তু বহমান বিশ্বাসের কোণে ‘জয়বাহ’ বলে অন্তিমালে সমুদ্রে পার হয়েছিলো।”

এইভাবে ঠাকুর উপদেশাদিত শিল্প ও ভক্তদের মাতৃদানে বিলিয়ে গেছেন। শুধু কি উপদেশ? কতো গীতন, গান, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। হকিগেথের যেন তাবের হাট বসেছিলো। চির আনন্দময় ঠাকুর উপদেশাদিত ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মাধ্যমে শিল্পের ঈশ্বরগামী করে তুলেছিলেন। একদিকে পিতার মতো দেহপরিচয় ঠাকুর, আরেক দিকে শ্রীমায়ের মতো ঘেঁষমণী মা, তাই বিভিন্নতা আনন্দে ঈশ্বর সাধনার রূপে ব্যক্ত। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমা তাঁর শিল্পকর্মের কাছে উজ্জ্বল নিয়ে বলেছেন “তখন যদি ভাসনা আসলে মা, হকিগেথের সেই আনন্দের চিত্র শুধু পথের বাহুর নিচে কী করে বোঝাবো? সে সব বলে শেষ করা যায় না। সময় নেই, অলস নেই, বিনোদ নয় দিন এই আনন্দোৎসব চলত।” শ্রীমায়ের সুবিস্মৃত এই কয়েকটি কথার মাধ্যমেই বোঝা যায় যে হকিগেথের তখন যেমন আনন্দবাহী বইছিলো।

ঠাকুরের অগ্রদূত:—

পুণিবীতে কামও কিছুই বোঝে হয় চিরস্থায়ী নয়। তাই ভাষা আর গুণের চিরস্থায়ী থাকা চলেছে। হকিগেথের তাবের হাটে একদিন কালো মেঘ দেখা গেল। ঠাকুরের আনন্দ-হাটও একদিন ডেবে গেলো। কলকাতাবাসিনী পদ্মার উজ্জ্বল উজ্জ্বল হয়ে গেলো। আগের আগের সবাই

আভিষ্কৃত হয়ে উঠল। ঠাকুরের পলায় বাধা, ঠাকুর কিছুই খান না। মহেন্দ্র ভাকার এসে পরীক্ষা করে দেখেন—ঠাকুরের পূর্ণ বিশ্রাম নির্ণেয় বিধে দেখেন। মাতা ঠাকুরাণীও চিন্তিত। এদিকে ঠাকুরের পলায় বাধা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে, ঠাকুর কিছুই খান না। ভাকার চিকিৎসা করছে। শিশুস্বন্দ চিহ্নিত। ঠাকুরের যোগ দশন ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে তখন সকলের সিদ্ধান্ত অত্যাচারী ঠাকুরকে ভ্রামপুত্রে রাখা পরিবর্তনের অন্ত পাঠানো হোল। সকলে জাবল হরত বা ঠাকুরের তম যাহোর উন্নতি হবে। কিন্তু ভ্রামপুত্রে ঠাকুরের যাবোর উন্নতি হোল না। এই সময়ে ভ্রামপুত্রে থেকে ঠাকুরকে কান্দিপুরের বাগান বাড়ীতে আনা হোল। মাতা ঠাকুরাণী ঠাকুরের সঙ্গে এলেন। ঠাকুর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। ঠাকুরকে বাইরে হিতে হয়। এই সময়ে মাতা ঠাকুরাণী তারতৎপরে গিয়ে হেতা মিলেন। তিনদিন পর হাজিরেলা তিনি অল্পত্ব করলেন যেন অনেকগুলো হাঁড়ি সপথে কেটে গেলো। শ্রীবা ব্রহ্মেন কিছুই হবার নয়; ঠাকুরের হবার সময় আপত্তগ্রস্ত। তিনি তারাক্ষে যম নিয়ে কিয়ে চলে এলেন।

এদিকে ঠাকুরের অবস্থা ক্রমশই পরোপ আকার ধারণ করতে লাগল। ঠাকুরের দেহতাপের আগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে লাগল। ঠাকুর যার তার হাতে বেতে লাগলেন। তারপর একদিন তিনি হাতের ইষ্ট কবচ খুলে শ্রীবার হাতে মিলেন। সকলেই নিঃশব্দে বৃত্তে পায়ল ঠাকুরের জিহো-বানের সিন আগন্তগ্রায়। ঠাকুর খুব কম কথাই বলেন। একদিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন “নরেন্দ্র আমার যা কিছু আশ্রয় সব তোকেই দিলাম।” নরেন্দ্রনাথ নীরবে চোখের জলে বুক ভালাতে লাগলেন। ঠাকুর ছাড়া কী করে চলবে একথা ভেবে নরেন্দ্রনাথ পিতৃর মতো কীয়েতে লাগলেন।

১৮৮৮ খ্রি: ১২ই আগষ্ট। রবিবার। প্রাণব মাল। হাজির মহানিলা গলে গলে শেখ বাঘের দিকে এসিয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতি শোকতড়া, কালো নিঃশীল আকাশ, ধরতী যেন কোনও কিছু কত্থির সজ্জাবনার সূচ হয়ে গেছে। শিশু পরিবেষ্টিত ঠাকুর বীরে বীরে মহালম্বাধিতে মগ্ন হলেন। দেহ পিতৃর ছেড়ে মর্ত্যের লীলাধি সমাপ্তি সাধন করে আবারের পরম আরাধ্য ঠাকুর শিশু ও তত্ত্ব লক্ষ্যবায়কে দিত্তবীন করে চলে গেলেন।

স্বামী অতঃকালম্বের লেখা পাঠ করে জানতে পারা যায়—

ঠাকুরের বিদ্যা হেহ শীতবস্ত্রে সজ্জিত করে, চন্দন চর্চিত করে, পলায় হুলের মালা দিয়ে পুষ্পাবার বিশিষ্ট বাটে সর্বদর্শ সম্বরণের প্রাতীক—নিধান, বোল, কবচাল, ঠাকুর, জিন্দ, ব্রহ্ম, ক্রম, অর্চন, ইত্যাদি নিয়ে শোভাযাত্রা বার হয়। এই মহাপুত্রে বিদ্যাবের কান্দিপুর শ্রবণ বাটে দাহ করা হয়। তাই কান্দিপুর আশ্রয় বিখ্যাত হয়ে আছে।

ঠাকুর ও শ্রীবা আশ্রয়বের মতো নেই। কিন্তু আশ্রয়বের বহির্ভূক্তির আড়ালে থাকলেও অন্তর দৃষ্টিতে তাঁদের লেখা যায়। ভাকার মতো ভাকতে পারলে কি তাঁরা হয়ে থাকতে পারেন? কিন্তু আশ্রয়বের অকরতা যে আশ্রয় তাঁদের ভাকার মতো ভাকতে পারি না। তাই প্রাণব জানিয়ে বলি—

“কননীং লায়বাং দেবীং রামক্ক অঙ্গং শুক্কু

পায়পয়ে তরো দিবা প্রাণমসি সুহৃৎ”।

(সরিবা-রামক্ক)

পুস্তক সমালোচনা

চালি চ্যাপলিনের জীবন-রহস্য

সাধা পৃথিবীর মাজেবের কাছে একটি নাম যে প্রভা-প্রীতি আকর্ষণ করেছে তার জুসরা বেল। তার। চালি চ্যাপলিন। নামটির মধ্যে যেন বাহু আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, নামটির সঙ্গে সারা পৃথিবীর মাজেবের যেন নিবিড় আত্মীয়তা। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ছবিহার ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন বর্ণের, ভিন্ন আদর্শের, ভিন্ন জাতের মানুষকেই এই নামটি ধীরে ধীরে আমাদের আপনজন, তিনি আমাদেরই লোক।

যেই নাম এই বলে ব্যাংক টোক

আমি তোমাদেরই লোক।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ বার্ষিক তাৎপর্ষের সঙ্গে ঐ কথা বলতে পেরেছেন।

চার্লস্‌লিবিং মারক, বেলোয়াড়, শিল্পী, এই স্ট্রীট কুতী মানুষেরা লর্ডারনের কাছে অনুপ্রিয়তা অর্জন করেন। ভিন্ন দেশের লোকের মুখে মুখে তাঁদের নাম শোনা যায়। কিন্তু চালি চ্যাপলিনের নাম উচ্চারিত হয় ভিন্নতর আবেগের সঙ্গে। সেই আবেগে মিশে থাকে জ্বরের গভীর অল্পকৃতি। এই বিশেষ অল্পকৃতি দিয়ে ছবিহার মানুষ চালি চ্যাপলিনকে ভালোবেসেছে, প্রভা করেছে।

কিন্তু ধিয়ে চালি চ্যাপলিন এই অনুপ্রিয়তালভ করেন নি। নিজের জীবন দিয়ে গ্রন্থাণ করেছে মানুষের কাছে, ‘আমি তোমাদেরই লোক।’ আঘাতে আঘাতে জীর্ণ হয়েছেন, জ্বায়ে যেমনার হারিয়েছেন। দলিত বসিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর আদর্শকে কখনও তোলেন নি। নিজে অবর্ণনীয় অধ্যায় মধ্যে থেকেও তিনি মানুষকে হালিয়েছেন, কী দিয়েছেন, আবার হালিয়েছেন—‘এমনতে বায়। তুমি মিলে, পেলেনা কিছুই’—অপরাজেয় কণাশিল্পীর মত তিনিও তাঁদের পক্ষে লড়াই করেছেন তাঁর বহুরের চিত্রের মাধ্যমে।

বিচিত্র জীবন এই মানুষটির। আঘাতে, সর্বোত্তম, পতনে, উত্থানে চালি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য মত উপভাসের চেয়েও বোঝাকর। তুমি বিচিত্র বা বোঝাকর নয়, মানুষের কাছে এক অমূল্য গ্রেসবার উৎস। জীবন সারাহে সত্তর বছর পর্যন্ত হবার নয় তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন। বিচার্ট সেই গ্রন্থের মধ্যে আর্কট উল্ফটন, অকপট স্বীকারোক্তি আর জীবনবর্ণন সম্বন্ধে চমকগ্রন্থ অতিবর্ত এবং সর্বোপরি উপভাসের মত ঘটনার আলোচনা—সমগ্র বইখানি এক অনুভূতর রচনা রূপে পৃথিবীর কাছে স্বীকৃতি আদায় করেছে। সেই গ্রন্থের মুখ্যকাহিনীগুলি নিয়ে নিম্নলিখিত ভাষায়, স্টাইলে এবং রচনাবীতির মাধ্যমে অমরগ্রেসবার মুখোপাখ্যার রচনা করেছেন—চালি চ্যাপলিন। বইটির বৈদ্য ভাগসই বহন পর-ভারতীতে প্রকাশিত হয় তখন তা বহু পাঠকের উৎসাহ আকর্ষণ করেছে। এই বইটি লিখে অমরগ্রেসবার মুখোপাখ্যার দ্বাদশটি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন সম্বন্ধে সেই। বইটি অন্যান্য মুখোপাখ্যে হয়েছে। ঘটনাক্রমে উপস্থাপিত করা সম্পর্কে লেখকের বিভ্রান্ত বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বইটি নিঃসন্দেহে সমগ্র লোক করবে।

• চালি-চ্যাপলিন। লেখক—অমরগ্রেসবার মুখোপাখ্যার। প্রকাশক—লেনাবেল

ব্রিটানিয়াম প্রাণ্ড পাংলিয়ারস। রাস—৩-০-০০

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল, অক্ষুধা

কোন টী থেকে ভুগছেন ?

আমাদের

ভাস্কর লবণ

খেলে নিশ্চয়ই সেয়ে যাবেন।

ধারাই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন,
অর্ডার দিলে ভিপিডে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২২৫



গল্প-ভারতী

- অষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক গণনা যায়।
- দাখিল টাকার হার সডাক ১৫ টাকা।
- দাখিল গ্রাহকগণ কোন অন্তরিত দলা না দিয়াও পূজা ও অষ্টমী বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

এতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং-এ বই পাঠান হয়। বলাসময়ে পরিকা
বদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের অন্ত ভারতের সর্বত্র সময়ে ও গ্রামে একেই অবশ্যক।

লেখকগণ অমুগ্রহপূর্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন—অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া
হয় না।

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২২৫



বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস

৮৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৮৭-১২৫৮

সোতান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা

ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার

সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত খোলা

থাকে। ছবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সন্মতিকার :-

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বপ্ন সত্য
হলো



এখন তিনি জননী। ঔষধে অমৃত তুল।
‘সাধনা অশোকারিষ্ট’ তার অটুট স্বাস্থ্য
কিভাবে এমন তাকে আজ জননীর পোষকে
প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সাধনা অশোকারিষ্ট



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, লাক্ষা নদর কলিকাতা-৬৮

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. এ. বায়োস্কোপী, এম. সি. এস.
(গভন) এম. সি. এস. (আমেজিকা)
কলকাতা অস্ট্রেলিয়া কলকাতা
কলকাতা কলকাতা

কলিকাতা কলকাতা
কলিকাতা কলকাতা
কলিকাতা কলকাতা
কলিকাতা কলকাতা

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের
আধার

3 JAN 1988

লক্ষ্মী ঘি



বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত খাদ্য

গল্প-ভারতী



ষাণ্মাসিক ৩ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৫৩/৫৪

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

ডক্টর কালিদাস নাগের প্রতিবেদন

প্রত্যেক যুগোপাখ্যায়ের চিত্রিত সংখ্যাতপূর্ণ

উপস্থাপন : বন্দী বিখ্যাত

অভিনয়কৃত্যের সেনগুপ্তের দানবজ উপস্থাপন : বঙ্গাকল্পা ॥

শ্রীতকালের জপচর্চা (সচিত্র সংযোজন)

বিখ্যাত ব্যাচ্যান (চিত্রে বিশেষ নানাব্যবহ) ॥

৯টি সুখপাঠ্য গল্প



শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য

লিলি ব্রাণ্ড **বার্লি**

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত



সুস্থ, অসুস্থ
সব অবস্থাতেই
সমান
উপকারী

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

সাধনা বিউটি ক্রীম শুধু আপনার ত্বকের যত্ন নেয় না, তাকে লাভালাভ করে

সৌন্দর্য বিকশিত হয় ত্বকের
পরিচর্যায় সাধনা বিউটি
ক্রীম মেয়েদের এক সৌন্দর্যের
গোপন রহস্য।

হৃদয়-কমল, পাণ্ডি-পেলন,
যৌবন-মূল্য - এ লাভালাভ করে

প্রত্যেক ত্বকে ত্বকে
বক্ষা করে এ সজীব বাধে।



সাধনা শুধুধানয়

চাক।

কলিকাতা-৪৮



৪৯৫৬৭



**to keep people and loads
on the move
there is a Dunlop tyre
for every vehicle**

Today, India moves faster. New factories, farms and agro-industries, schools, colleges and hospitals are springing up all over the country. New roads are being built and more and more people and things are on the move. More bicycles, motorcycles, scooters, cars, trucks and buses are being manufactured.

To meet the growing demands of road transport, Dunlop is making tyres for all types of vehicles. To suit the special operating and road conditions of the country, every kind of tyre is marketed by Dunlop after rigorous tests on machines and on the road.



DUNLOP INDIA

—keeping pace with India's Road Transport



গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

নবমাস ১৩৭৪, NOVEMBER, 1967

হরোবিশ্বভিত্তি: বঙ্গ—৬১ সংখ্যা



প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

সম্পাদক

সহ: সম্পাদক



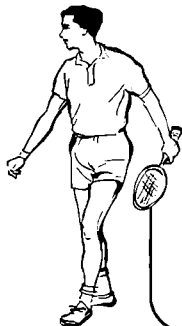
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণ রায়

পাইওতীয়ার গেজি

সুন্দর ও সকল বয়সের
উপযোগী।

গেজি • বোকা • কেলো • লাতিন • পাইওতীয়ার
কল • হাইট হাই • 'মিলটার কল' • 'হাইটস' •
সিগনাল • ফোর মাসিউজ • ইকালার •
ইন-টেক • 'পাইওতীয়' ও অন্য অল্প কিছু বিভিন্ন
আই-ও পাইওতীয়।



* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেলিস সার্ট • চেব সার্ট •
ড্রয়ার ও ডীক প্রভৃতিও পাবেন।

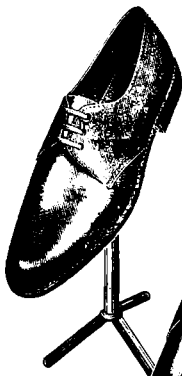
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে
ধোত ও প্রস্তুত।

পাইওতীয়ার লিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওতীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

যত বেশি পরবেন
তত বেশি
জান্নাম পাবেন

যতটুকু এই জুতোতে জামানি পাবেন
নিশ্চিত জান্নাম, আর দুইশতকট নকশা।
এখন জান্নাম পাও উল্লেখ
খিনজুর জামানার পাও সত্যিই জান্নাম,
নিষিক্ত জামানায় জামানত জান্নাম।
শোভন ওপার-জামানায়—এখন জান্নাম হলে
জামান হারাই নকশাক, উল্লেখ
জামান উল্লেখ জান্নাম, জামান
জামান নইতেও নই। জামান তামি জামান
জামান—নই, জামান জামান জামান।
জামান জামান জামান জামান জামান
জামান এই জুতো—
জামান জামান জামান



মোডেল 60.28



Bata

একদম জান্নাম ২৪.০০

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য,

অম্ল, অশ্লুধা

কোন টী থেকে ভুগছেন ?

আমাদের

ভাস্কর লবণ

খেলে নিশ্চরই সেরে যাবেন।

ধীরেই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুষ্ঠ প্রশংসা করেছেন,

অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪



পঙ্ক-ভারতী

- মাঝে মাঝে হইতে-বর্ষ আয়ত্ত।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক : ৫০০ টাকা।
- বার্ষিক চাঁদার হার সভ্য ১৫০ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত দ্রব্য বা দিবাও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংযোগ দি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক প্রেরিত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্ভিসকেট অব পোষ্টিং-এ বই পাঠান হয়। বৎসরময় পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে এক্সেন্ট আবদ্ধক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন—অমনোনিত রচনা কেবল ফেরত দেওয়া হয় না।

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

দীপ্তি

আপনার
নিত্য
প্রয়োজন

দীপ্তি লক্কম—এই পরিচয় নিশ্চয়ই জানেন,
এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে
আছে দক্ষদূতী সঠিক, অমর আলো আর
কম কেরোসিন খরচ।

খাস জন্মতা কেরোসিন কুকার—নিজ
গ্রন্থাগারের একটি আত্মপ্রকাশ
এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন
কামোদ নেই। গঠনে দক্ষদূত, বেহতে
অমর, খরচে সাশ্রয়। আর সময়ে যে
কোন দায় করা যায়।

'দীপ্তি' বার্ক এন্ডামেলের খামস—
আর দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর
গুণের দায়। সমাপ্ত হচ্ছে।

বি ওরিয়েন্টাল মেটাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড

৬৭ বিশিষ্ট বিহারী সান্দ্রী স্ট্রিট,
কলিকাতা-১১



দীপ্তি লক্কম



খাস জন্মতা



এন্ডামেলের খামস

আমার কী সিগারেট চাই আমি জানি



**সম্রা জাহাঙ্গীর
খান আল
সত্যিকারের
আমেজ**

“যেমনই হুঁসি লিখাংয়ের মত সিগারেট।
খাঁটি আমেরিকান মার্কা, সবচেয়ে জাহাঙ্গীরের মত—
উইলস্‌স্‌ (Wills) সত্যিকারের মার্কা। যেমনই
হুঁসি—যেমনই মার্কা মত মার্কা। এটিই
ইনি আমেরিকান, লেখাং মত মার্কা। মার্কা।”

৮০ প্যাকেট ১০টি

উইলস্‌স্‌ স্লেট

—সম্রা সিগারেটের সম্রা



এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় -

কালিদাস স্মরণে

সবীজস্বর্ণ

অন্তরীক্ষে (কাট্টন)

বজ্রা বজ্রা (উপক্ৰাস)

শিখনের জানাশাখ (ঐবন্ধ)

মাল্লিককে মাল্লিক বীচায় (গল্প)

ড: কালিদাস নাথ

— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অটকেশ্বর লখা

- আনন্দ অধিকারী

আনন্দ ডিস্ট্রিবিউটর
ক. হোডের
প্রসারিত সামগ্রী

দ. বোড় ২৩ কলং • কলিকতা - ১০

• **শেখা** **কাটা** **গোবাব** **কাছ**

ॐ नमः शिवाय

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**



অ্যাক্রিফেন্ট

ନିରାପଦ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ
 ଚରିତ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀମତୀମଣିକା ମଲ୍ଲ
 ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତିରୋଧକ
 ସହର ଆନ୍ଦୋଳନ

ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ



এই সংখ্যায়

চেতনা (গল্প)	—নোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়	২৪২
মুসাকির (গল্প)	—মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৫
রামপ্রসাদের সাধনা (প্রবন্ধ)	—সারদারঞ্জন পণ্ডিত	২৪১
মোট স্বাক্ষর	—স্বাক্ষর	২৫৩
ছাত্রাংশু	—চিত্রমিত্র	২৬১
ব্যাপার বা চলছে	—চক্রপানি	২৬৫
চলতি মুনিয়া		২৬৮

বৈশ্বাচার্য্য তুৎকেশ্বৰ নিত্য পৰিচিহ্নাং

হিমালী প্রিসারিত সাবান

নিৰ্ভূত ও মহৎ স্বক সৌন্দৰ্য্যেৰ
মাল্যকাণ্ঠি । স্বক্ৰমের প্রতিটি দিনেই
এর পরিচর্যা করা উচিত । উপযুক্ত
উপন্যাসে প্রস্তুত হিমালী
প্রিসারিত সাবান যেকের সাবান
ও মন্থনতা বাড়াই ।



হিমালী
টয়লেট লিঃ
কলিকাতা-২



অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakshmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Bhaudas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘি ব্যবহার করি। অল্প বিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিতর্ক সে বিষয়ে সম্বন্ধ নাই।

সত্যেন মজুমদার
দুগুপ্ত লক্ষ্যক—আনন্দবাজার পত্রিকা



লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিবিরকুমার ভাট্টা
[নাট্যাচার]

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করে দেখেছি সত্যি ইটা বিতর্ক ও বাত্যাগ্রহ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করে দেখেছি এটা ভাল জিনিস।

ঐক্যবাক্তি বোম

লক্ষ্যক—অনুভবাকার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিষ্কার হইয়াছে। এই ভেজালের দায়ে একটা বাটি ও দুইখান ঘি পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

ঐক্যবাক্তি বোম

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি দ্বারা চর্মে উৎকৃষ্ট ফলের অভ্যস্ত, অনলাভাধীন স্বাস্থ্যে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

ঐক্যবাক্তি বোম

লক্ষ্যক—দৈনিক ব্রহ্মসভা

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। দ্বারা প্রচলিত সাধারণ ঘূতের তুলনায় ইহা অনেক শুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

ঐক্যবাক্তি বোম

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া সত্যি হইয়াছে। ইহার দ্বারা ও সত্য ভাল।

ঐক্যবাক্তি বোম

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রচুর বাত্যাগ্রহ দ্বারা ভাল ও সুবোধ্যত হয়।

ঐক্যবাক্তি বোম

এই সংখ্যায়

কবী দ্বিত্য (উপগাস)

বাংলা সাংবাদিকতা : একটি দামা দলিল

বিখ্যাসাহিত্য

হুখের দিনে সে ছিল না

নজরানা (গল্প)

যেখানে বাঙালী সেখানে বা ল

বিম্ব

--প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

-অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দূপ : অর্ধ কেট, অধুবাদ—নিভাট সাহা রায়

—মানবেন্দ্র পাল

বিজ্ঞাননাথ সাক্তাল



একটি নির্ভরযোগ্য কেমি ক্যাল
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যাথারাইডিন হেয়ার অয়েল

একমাত্র সম্পূর্ণ ক্যাথারাইডিন কেমি ক্যাল হেয়ার অয়েল
আপনার বেশের-কায়ল খন-এ লে কেমি ক্যাল হেয়ার অয়েল
মদ্যতা অমৃত বাধে ও কেমি ক্যাল হেয়ার অয়েল
কম্বল



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কমিক্যাল • কোমাই

কামপুর • নিলী

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED
AUTOMOBILE TYRE COMPANY

THE HOUSE OF
NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS
OF INDUSTRIAL RUBBER
PRODUCTS IN INDIA

**Inohok Tyres
Limited**

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

অসমৰ দিল্লীত লাইট গ্যাম্প সন্মান ও মিত আশাৰ প্ৰভাৱ
আপনাৰ পুৰণি অতিথি আওদায়িক হয় কোলে। অসমৰ
দিল্লীত লাইট-এ কোৰে ভোৰ নকৈ হ'ল। অসমৰ গ্যাম্প
অনুলোক সমাজৰ সহযোগ কৰে আপনাক কোৰ-এ-ইয়াহো মিত
আপোহে আহায়ে কাল কলন্ত সাহায্য কৰে।

O&C
Osram

একটি আশ্চর্য জগৎ

S&C

આખના
ગાના

— **THE** —

এই সংখ্যায়

মেয়ে মজারিলা

খাত্তাবস্থায় মেয়েরা

শীতের দিনে খাত্তাব সংকটে বিকল্প খাত্তাব

বিকল্প খাত্তাব

খেলাধুলা

সচিত্র সংবাদ

শীতকালে রূপচর্চা

যুগে যুগে কালে কালে পোশাক

শীতে শরীরের যত্ন

—বেলা দে

অধ্যাপিকা মিনা সেন

মীরা বায়

দ্বিজেন্দ্রনাথ

—মহলা নৃপনাথ

—জ্যোতির্ময়ী দেবী

—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়



আমার সারাদিনের সাথে

লর্ডের জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা
মনোহর লজ্জিত মুখে পড়লে শরীর ও
মন মিষ্টি হয়ে ভরে যায়। মনে হয় যেনই
এক বয়সে বাই।

লর্ডের

লভেন্স ও টফি



মেম্বার লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ

কলিকাতা-১

ইনি একটা কারখানার সহকারি গোরখাল।
এই কারখানাটির গবেষণাগারে একজন
সহকারি হিসেবে যোগ দিয়ে, সাত বছরের
মধ্যে তাঁর এই পদোন্নতি হয়েছে। তিনি
নলেন, “আমি যে উন্নতি করেছি, চেটে ও বড়
থাকলে অনেকও অবশ্য এই রকম উন্নতি করতে
পারেন। তবে আমি যখনই যে কাজ করি,
তা নিষ্ঠার সঙ্গে করি। আমার কয়েকজন
সহকর্মী, ছেলেমেয়ে বেসী আর তাঁদের
ভ্ররবশ্য আমি সব সময়েই দেখছি। আমার



মাত্র দুটী সন্তান
এবং তাদের আমি,
আমার সাশাসুসারে
মাযুষ করে ভালবার
চেটে করছি। সেই
জনাই আমি পুখী।”

ইনি স্মৃথী।

আপনি ?





Sulekha
drawing ink

AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.

**SULEKHA
WORKS
LTD.**
SULEKHA PARK,
CALCUTTA - 32

ardecy

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে,
মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে

নিম এর উপকারিতা
হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

গাত ও মাড়ীর পক্ষে হিতকর বহুযুগ পরীক্ষিত
স্বাস্থ্যকরী **নিম**-এর চুই অথচ সক্রিয় উপাদান-
গুলি **নিম** টুথ পেস্ট-এ আছে। তাছাড়া
নিম টুথ পেস্ট-এ রয়েছে 'ফ্লুরাইড' এবং
আধুনিক দন্ত বিজ্ঞান সম্মত অস্ত্রাণ্ট উপাদান।
নিম টুথ পেস্ট-এর হিতকর কেনা মাড়ী সবল
করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, গাতের জ্বর ও পায়োহিয়া
নিবারণে সাহায্য করে ও গাত স্বচ্ছ করে।

নিম টুথ পেস্ট-এর সর্বগুণ সমন্বিত মার্গোফ্রিস
টুথ পাউডারও পাওয়া যায়।



ক্যালকাটা কেমিক্যাল
বর্ডক প্রাইভেট



প্রয়োজিত বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

পুঙ্খের পর হারাণবাবু এসেছিলেন আমার বাড়ীতে।

এই সব মাহুভুলিক দেখে বুঝতে পারি—কত অতুত রকমের মাহুভ আছে এই পৃথিবীতে।

হারাণবাবুর লগে কথা বলে দেখেছি—সাহিত্যের শ্রুতি তাঁর অহুরণ আছে। তবে তাঁর সে অহুরণ আন্তরিক না লোক-সেখানো দেটা টিক বুঝতে পারিনি।

আবার এমনও হতে পারে—আমি সাহিত্যিক, কাজেই আমাকে বুঝি করবার মত তাঁর এই হুতবেশ।

এবার সেইটে বেন ধরা পড়ে গেল।

সেদিন এসেই বললেন, পুঙ্খের কাখলগুলো পড়েছেন?

অর্থাৎ পুঙ্খের সময় শাহরীর সংখ্যা মান নিয়ে মানিক, দাপ্তরিক এবং বৈনিক পত্রের বেদন সংকরণ বেয়োর তারই কথা বললেন।

—কোন পত্রিকার কথা বললেন?

হারাণবাবু সে পত্রিকা ছুটির মান বললেন—তাঁদের এক ভাকে চেনা যায়।

বললাম, হ্যাঁ, সব লেখা এখনও পড়িনি। পড়া সম্ভবও নয়। তবে কিছু কিছু পড়েছি।

সেই দুটি পত্রিকার প্রকাশিত তিনটি উপগ্রাম আর একটি পত্রের মান করলেন। বললেন, এইগুলি পড়ে দেখবেন।

কি তিনি বলতে চান আমি বুঝেছি। কারণ ওই লেখাগুলি নিয়ে বাঙারে সে গুজন উঠেছে লেখা আমার কানে এসেছে।

বললাম, বনুন না কি বলতে চান। আমি পড়ো, তারপর বলবেন—তাঁহ'লেই হয়েছে! ও আর আমার সোনা হবে না।

হারাণবাবুবলবার মত উল্লেখ করছিলেন। বললেন, বেল—গেল—মলাডলেচলে বেল বাঁধা সাহিত্য।

বললাম, সাহিত্যকে মলাডলে পাঠিয়ে দেবার মত হোর ওই কটি লেখার? বলেন কি? তাঁহ'লে তো বাঁধা লিখেছেন—তাঁরা খুব শক্তমান লেখক?

তাঁরা সে শক্তমান সে কথা কিছুতেই নীকার করবেন না হারাণবাবু। বললেন, শক্তমান না ছাই!

অন্নাল—অন্নাল—চুতান অন্নাল। যেমন তাঁর মিলববব, তেমনই ভাব। পড়তে পড়তে পা নী-নী করে উঠবে। এই বেরুন না—কাগজ ছুটো আমি কিনেছিলাম। তারপর বাড়ীতে রাখতে মাহুভ হলো না।

আমার দু'ছুটো আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে বাড়ীতে, একটা ডাইকি তো একেবারে—

আর বেশি কিছু বলতে দিলাম না। হেঁপে বললাম, পড়েছি।

—তাঁহ'লে এককণ মনিকতা করছিলেন আমার লগে?

বললাম, তা যদি বলেন তো তাই।

হারাণবাবু বললেন, আপনি পড়েছেন, অথচ এর বিলুখে কলম করেননি?

—না।

—কিছু বলবেন না ?

—না। বলা আবারের চলে না। আরহাও লেখক। আরহা আপে এগেছি, ওরা এসেছে আবারের পরে। এই বা উফাং। ওরা আবারের ছোট ভাইএর মত।

—তা আপনার ছোট ভাই যদি বিপণ্যমী হয় তো তাকে তিরস্কার করবেন না ?

বললাম, না। বিপণ্যমী যদি হয়েই থাকে, সে তো আপনাকেই করেছে।

হাঙ্গাবাবু কৈতের উঠলেন —আমরা কবেছি ? তার মানে ?

হাঙ্গাবাবুকে বুঝিয়ে বললাম। বললাম, উত্তেজিত হবেন না, শুধুমাত্র Demand and supply বলে একটা কথা আছে জানেন তো ?

—জানি।

—কাজেই আপনারা যেমনটি চেয়েছেন তেমনটি পেয়েছেন। এরকম লেখা তো ওরা আরও লিখেছে। বই হয়ে বেরিয়েছে। সে বই হাজারে হাজারে বিক্রি হয়েছে। এতিসনের পর এতিসন হয়েছে। দিনেরা কোম্পানী অনেক টাকা দিয়ে সে বই কিনেছে ছবি করার জন্তে। লেখক উৎসাহিত হয়েছে। কাজেই আবার লিখেছে।

হাঙ্গাবাবু বললেন, সে-বই আমি পড়েছি, মিথ্যা বলবো না। কিন্তু গ্যাটের পরলা খরচ করে কিনিনি।

—ওট একই কথা। আপনাকে যদি না পড়তেন, একখানা বইও না বিক্রি হতো, তাহলে দেখতেন লেখক আর ও-রাতা বাফাতে না।

হাঙ্গাবাবু হুপ করে গেলেন। আর কিছু না বলে হেঁটুবে কি যেন ভাবতে লাগলেন। আমি বললাম, এরকম হয়। বৈচিত্র্য মানুষ ভালবাসে। দিল্লী খেতে খেতে মানুষের ছান-কাল-বেগুয়া মুক্তি খেতে ইচ্ছে করে। আবারের মোবনদিনে 'পতিভার আচ্ছত্রিত', 'মানবীর আচ্ছত্রাহিনী' নাম দিয়ে খানকতক ভারি মজার আল্লা বই বেরিয়েছিল। Sold like hot cakes থাকে বলে তেমনি হাজার হাজার বই দু'চার দিনেই লাবাক হয়ে গিয়েছিল। এ বইগুলো কিন্তু পেরকম নয়। এতে খানিকটা সাহিত্য আছে।

—আপনি বলছেন সাহিত্য আছে ?

—হ্যাঁ বলাছি। এই যে আপনি অমরত হয়েছেন এও শুধু সেইজন্তে। আর একটু বেশি মাজার আল্লা করে আরও খোলাখুলি ভাবে যদি লিখতো তাহলে আপনি খুশী হতেন।

হাঙ্গাবাবু হাসতে লাগলেন।

আমি তাকে আরও খুশী করার জন্তে বললাম, এ-সব বইএর বিক্রি দেখে আবার নিজেও একবার ইচ্ছে হয়েছিল ওইরকম একখানা বই লিখি।

খুব খুশী হয়ে হাঙ্গাবাবু বললেন, তা লিখলেন না কেন ?

বললাম, পারলাম না লিখতে। তাছাড়া এমন আধরা বুড়ো হয়ে গেছি। আচ্ছত্রাহিনীকর মততী যেহেতু আবারের দিকে দিওর ও তাকার না। তাহের মনের খবর জানবো কেনন করে ?

কথাটা হাঙ্গাবাবু অবিশ্বাস করলেন না। বললেন, তা হোক, আপনি একখানা লিখে দেখুন। তাহের সঙ্গে শরিতর আপনায় নাই-বা থাকলো ! কল্পনা দিয়ে আপনারা নবই পারেন।

—দেখবো চেষ্টা করে। বলে হাঙ্গাবাবুকে বিদায় করলাম।

আমিও ন্যস্তায়ের মনের খবর না জানলেও হাঙ্গাবাবুর মনের খবর জানতে আবার বেরি হলো না।

প্রতিটি মানুষের ভেতর একটি করে হাঙ্গাবাবু আছেন। হাঙ্গাবাবুর মধ্যে শুধু আবারের বেলে কেন, সব মেনেই অবশিত।

বীক একখানা বই নিয়ে গিয়েছিল, তেরত বেরার কত্রে একদিন এলো আমার বাড়ীতে ।

তারও ঘূষে সেই এক কথা ।

—পড়েছেন পুথোর কাগজগুলো ?

বললাম, পড়েছি ।

বে-বে লেখার কথা হারাপবাবু বলেছিলেন ঠিকঠিক সেই সেই লেখার নাম করে বীক বললে, শুইগুলো পড়েছেন ?

বললাম, পড়েছি ।

বীক বললে, তিন চারটা কথা নামের কাগজ কিনতে তো পারি না, হারাপ একদিন বলে আমাকে হ'বানা কাগজ । বললে, এই লেখাগুলো পড়ে হেশো, খুব ভাল লেখা ।

—এই কথা বললেন হারাপবাবু ?

—হ্যাঁ, বললে । আমার কিন্তু পড়তে পড়তে যা রাগ হচ্ছিল লেখককে ওপর !

—কেন ?

—লিখলি লিখলি, আর একটু খুলে বেশ ভাল করে লিখতে পারলি না ।

বললাম, লিখবে । এর পর সব খুলেই লিখবে । এহা না লিখতে পারে এর পর বতীকালে সেইরকম খুলে লেখবার মত লেখক আসবে । তোমরা টিক যেমনটি চোরেছ তেমনি লেখাই পাবে । আধুনিক গল্প, কবিতার, চিত্রে সবীতে তার আগমনীর বারনা বেয়েছে ।

তাছাড়া হাঙ্গের সমাজ, সাহিত্য, শক্তির কখনও চিরকালের জন্য একজায়গার চেপে বসে থাকে না । তার একটা চলমান গতি আছে ।

আমরা আজ প্রবীন হয়ে গেছি, কিন্তু 'কলোশ'-কালি-কনমের'র ঘূষে আমরা ছিলাম অতি-আধুনিক । আবার তেমনি আজ বারো অতি আধুনিক কিছুদিন পরে তারা হবে প্রবীন, আবার একফল অতি আধুনিক এসে আমকালকার লেখাগুলোকে বলবে, নিতান্ত পান্দে লেখা—ভোলা লেখা । ওদের কোমল কথটাই ছিল না । ওরা ছিল ভীতু, ওরা কাণ্ডারী ।

তিন ছেলের যা বাবীকে ডিভোর্স করে নতুন বাবীর ঘর করতে বাবে ।

ওই যে অবিবাহিতা তবু ফ্যামিলি প্ল্যানিং পেন্‌টাবে চাকরি নিয়ে বাবে ঘরে 'পুপের' মহিমা কীর্জন করে বেড়াচ্ছে, তাকে এখন কোন্‌ও সমাজতাত্ত্বিক গৃহস্থধু বিভ্রাণা করবে, তোমার তো বিরোধ হয়নি, তুমি কেমন করে জানলে এই 'পুপের' মহিমা ?

শে শুখন অবলৌলিকমে বলবে, আমি কি ছিছে কথা বলছি ? আমি নিয়ে বহবার পরীক্ষা করে বেখেছি, তবে বলছি ।

বহসিনের ঘর ভেটায় সব পক্ষকে অতিক্রম করে বহুতবে প্রতিষ্ঠিত সর্বজনমিত হাঙ্গবকে আমাঘের সভ্যতা এখন বেঘতায় সিংহাসনে বসাতে চলেছে, আগামী দিনের হাঙ্গব তাকে বিচার দিয়ে বলবে—পণ্ডবে প্রত্যাবর্তনই হলো সভ্যতার নিশর্ন । সভ্যকে অকপটে বীকার করবার শক্তি তোমাঘের ছিল না বলেই তোমরা বহুতবে বেঘব ইত্যাদি বড় বড় বুলি কপ্তে তও তপনী পেয়ে বসেছিলে ।

শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

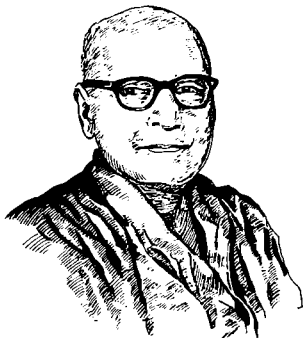
বলের উপেক্ষিত আমি যাত্রাবের মিলন-স্থান কিরেছি, যে যাত্রাবের অতিবিশালায়
গ্রাচীর নেই, পাচারা নেই। লোকালয়ের বাইরে গেয়েছি আমার নির্জনের দলী খাতা
এলছে ইতিহাসের মহাপুংগে,

আলো নিয়ে, অন্ধ নিঃ, মহাবাগী নিঃ।
তারার বীষ, তারার তপসী, তারার মৃত্যুভয়,
তারার আমার অন্ধবন্ধ, আমার স্ববর্ষ, আমার যগোত্র,
তারার নিত্য শুচিতার আমি শুচি।
তারার সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক, অমৃতের অধিকারী।

যাত্রাকে গতির মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার বেথা বেশ বিদেশের স্বকল সীমানা পেয়ে।

তাকে বলেছি হাত জোড় ক'রে—
"হে চিরকালের যাত্রাব, হে লক্ষ যাত্রাবের যাত্রাব,
গদিজ্ঞাপ করো
ভেব চিহ্নের তিলক-পর্যায় সন্তীর্ণতার উদ্ভত্য থেকে।
হে মহান পুণ্য, বস্ত্র আমি, পেয়েছি তোমাকে তমসার পরগার হতে।
আমি ব্রাত্য, আমি জাতি হারা।"

বসন্তকাল



কালিদাস মজুমদার

[গল্প-ভারতীয় কৃতপূর্ব সম্পাদক ডক্টর কালিদাস মজুমদারের পদ্মশ্রী পুরস্কারের পর বেগমতে বেগমতে এক বছর কেটে গেল। এই এক বছরের প্রতিদিন আমরা তাঁর আভার বোধ করছি।]

গল্প-ভারতীয় সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহু দিনের। সম্পাদক হবার অনেক আগে, পত্রিকার গোড়া থেকেই তিনি এই পত্রিকার লিখেছেন, পত্রিকার দর্শনীয় উন্নতি-কল্পে চিন্তা করেছেন, আমাদের নামা উপবেশ দিয়ে উপকৃত করেছেন। এমন কি বিদেশ সফরকালেও ঘুর ঘুর থেকে গল্প-ভারতীকে স্মরণ করে তিনি লেখা পাঠিয়েছেন, পত্র লিখেছেন। গল্প-ভারতীকে তিনি সর্বপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, তাঁর হিতকামনা করতেন।

ডক্টর কালিদাস নাগ সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষার অগতে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যুগপুঙ্খ ছিলেন একথা আর সন্দেহবীকৃত। পাশ্চাত্যের বহু দেশের, বহু সংস্থার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, সেই সব সংস্থার আমন্ত্রণে তিনি বহুবার সাহা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন।

বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অস্বল্প সহচররূপে, গুরুদেবের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বহুদিন থাকার ফল, ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মনে গভীর ও অবিচলিত ছিল অনায়াস। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বহু রচনা বেশ-বিবেচনের অনেক পত্র পত্রিকাকে অলংকৃত করেছে। এবং যখনই আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি যে গল্প-ভারতী পত্রিকায় তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকটি অমূল্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং কয়েকটি অপ্রকাশিত লেখা এখনও প্রকাশের অপেক্ষা করছে।

আজ আশা ও বৈশ্বনাথ তাঁকে স্মরণ করছি এবং গভীরে গভীরে পড়াপুড়ার মতো, তাঁরই 'রবীন্দ্র-মুগ' শিরোনামে একটি অপ্রকাশিত রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের অসীম অর্পণ করছি।]



[অগ্রকাশিত রচনা]

ডক্টর কালিদাস নাগ

১৯৩১ সাল। স্ববীজনাথ তখনবা বেলে করেননি, কিন্তু যুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের কাহিনী তাঁর চিত্রপত্রে ও গ্রন্থে আশ্রয় পড়ছে। আনি ১৯২০ সালে যখন যুরোপ বাই তখন মনে পড়েছিল যে ১৯২২ খ্রুন হালে স্ববীজনাথ বাসাই-এ নেমে জায়ে বিজ্ঞান করে লওনে পৌছেছিলেন। কবি হু'বার এই পথে আগেই বাতায়ত করেছিলেন (১৮৭৮ ও ১৮৯০)। ১৯১২ সালে তৃতীয়বার যান। তাঁদের লওন ছেড়ে তিনি যোগা। হার্টের স্বাস্থ্যের হীৰ (২২০ ছাঁপকোর্ড হোড) হোথেনটাইনের বাতায় কাছ ছিলেন। (যেন এও যোগায়াপ' হু'বার)। এ-সময়ে হা'বের লকে কবির পরিচয় হয় তাঁরা W. B. Yeats, হেনফিল্ড, Earnest Rhys, Miss. E. Underhill, Miss Sinclair, Travellian, ও Ezra Pound. তখন নিয়মিত তা'বে প্রতি লগাহে Imperial Libraryতে গিয়ে লওনের সাহিত্য পত্রিকাগুলি ঘাঁটতান, এই সব স্ববীজনের লকে কবির লগোপ কিতাবে হয়েছিল যোরবার অন্তে, আবার রাষ্ট্রনৈতিক আবহাওয়া বলের লকে লওনের পত্রিকা ও লেখকগোষ্ঠী কেমন প্রতিফল হয়ে উঠেছিল তাহা পরিচয় পাবা বলে। টাইমল ছাড়া আশ্রয় পড়তান 'এনিমিয়া' ও 'বেশান'। এ'ক বিশেষ তা'লে লাগত নেভিলসন-এর লেখা। শ'র লকে যোগাযোগ তেমন হয়নি, কিন্তু আইরিশ লেখকরা অনেকে আশ্রয় দেখিয়েছেন। 'স্বিতা'লির' কু'বিতার ইয়েটস বেটু'র লিখেছিলেন, তাঁর সাহিত্যিক অংশ ছাড়া কবির লম্বা ধবরগুলি তিনি পেয়েছিলেন আবার আশ্রয় ফিরেজনাথ বৈজ্ঞানিক বাছ থেকে। তিনি তখন বিলেতে ছিলেন, তাঁহার আতা অধ্যাপক হরেন বৈজ্ঞানিক লকে। আতা বাঙালী, লওন, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ মিলে, বাংলা কবিকে নিয়ে ছিলেন, তাঁদের ছনি বন্ধ অমল হো'র হেগেছেন। কবিরপ-কর হার, হু'বাবী কাছবর, মহানবীশ ও হু'বার বা'। আর একজন

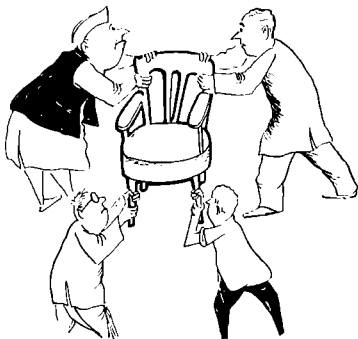
ধাক বাঙালীরা অস্ত্রাঘাতাবে হুলেছে তিনি কেহারা নাথ নাপশুভ, যিনি যথেষ্ট হুগেই ভাণ্ডায় পড়িত। প্রকাশ করে (১৯১২ সন) কবিকে সম্পাদক পদে বরণ করেছিলেন, লণ্ডনে এসে Union of East & West সভা প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ১৯১২তে কবিকে প্রথম সঞ্চর্চা করেন Emerson Club-এ। কেহারা নাথ পরে New York-এ তাঁর কর্মস্থান করেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আহার পরিচর হয়েছিল ১৯০৭-১০ সালে। ১০ই জুলাই ১৯১২ Yeats সভাপতি হয়ে Tracadaro Hotel-এ কবির সঙ্গে তাঁর পরিচর করিয়ে দেন। অস্ত্রহের মধ্যে ছিলেন Z. D. Anderson (Cambridge-এর বাংলায় অধ্যাপক) Arnold, Havel, H. G. Wells ও নিবেদিতার বন্ধু Radcliffe (Statesman-এর সম্পাদক (ref, প্রবাসী ১০১২ আখিন)। পাণ্ডিনিকেতনের প্রাক্কর ছাত্ররা কেউ কেউ তখন লণ্ডনে ছিলেন—গোয়েন দেববর্দন, দেবদ, চণ্ডী সিংহ, বখিম হাট, কালীমোহন ঘোষ, হুয়েন ঠাকুর ইত্যাদি। C. F. Andrews-এর সঙ্গে কবির এখানে প্রথম দেখা হয় এবং তিনি কবিকে তাঁর পাঠ্য বন্ধুর গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যান। ইনি Gen. Outram-এর ছেলে। দিল্লতের গ্রামের সমুদ্রি মধ্যে কবি বাংলার গ্রাম ও চাষীদের দুরবস্থা কথায় সত্যিকভাবে অল্পকর করেন। এবং অর্থাতার জীবন হলেও হুলের বাড়ী ও লন্ডর S. P. Sinha-র মনি কেনেন, পরে ঐনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এই সময়ে টংরেমি গীতাগুলির ছাপা হতে চলেছে। টাইপ কপি পেয়েছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক Stopford Brook, তিনি লেখেন "I have read them with more than admiration.....with gratitude for their spiritual help, for the joy they bring, and the love of beauty which they deepen." Wells ছাড়া আরো হু'জন, L. Dickinson, ও Bertrand Russell. লণ্ডনে এসে চাষির হয়েছিলেন। ১৯১২ অক্টোবরে আমেরিকা যাত্রার আগেই ইংরেমি গীতাগুলি ছাপা শুরু হয়েছিল এবং তাঁর এক বছর পরে (অক্টোবর ১৯১৩) গার্ডিনার, প্রেমের কবিতা প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে কবি নিজেই 'রাক্ষা' King of the dark chamber লেখ করেন এবং 'ভাক্ষর' বা 'Post office' অল্পকরও লেখ হয় দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের (বহুবার সভাকর মুখোপাধ্যায়ের ভাই) দ্বারা। এই নাটকটি Irish Theatre-এ বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল। এইভাবে বিশেষে চারমাস প্রচুর পরিচর করে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মাকিন যাত্রা রচনা হলেন। বলা বাহুল্য সে বেশ সম্বন্ধে তাঁর বাবণা খুব উৎসাহজনক ছিল না, কারণ ১৯০০ সালে লেখা Future in America by H. G. Wells-এর এই রচনাই তাঁকে মাদমলা বিরোধিতা। আশিও এইভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন প্রথম আমেরিকা যাত্রার সময়ে।

২০শে মে ১৯১২ থেকে ২ই অক্টোবর ১৯১৩, অর্থাৎ পুরো এক বছর চার মাস এখানে কাটিয়েছিলেন। তার মধ্যে ২৭শে অক্টোবর ১৯১২ থেকে জুন ১৯১৩ তার মধ্যে ৭ মাস আমেরিকায় কাটে। শিকাগোর Poetry ক্লাবের তাঁর কবিতা প্রথম ছাপে এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হুনিটেরিয়ান চার্চে অনেকগুলি প্রথম পাঠ করেন। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক অরকেন রচনায় রবীন্দ্রনাথের দেখা পান। ইনিও গীতাগুলির খুব প্রশংসা করেছিলেন। জাহাঙ্গীরী ১৯১০তে কবি 'Race Conflict' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই ক্ষেত্রে হলে গড়ে গেল যে ১৯১১-১২ সালে কবিবন্ধু আচার্য ব্রহ্মব্রনাথ শিল লণ্ডনে ভাষণ দেন এই বিষয়েই লণ্ডনের Universal Races Congress-এ (নিবেদিতার স্মৃতির ঠিক আগে)। ডঃ শিলের এই প্রসিদ্ধ ভাষণ অতি দুঃখাপা, কিন্তু সম্মান করে ছাপান হবকার। ১৯১০ সালে ডঃ শিল হুনিটেরিয়ান চার্চের ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন আভডোবের আছানো। রচনায় অধ্যাপক অরকেনের সঙ্গে

সাক্ষাৎ সেয়ে কবি যাকিন একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে বোঠেনে আসেন। বোঠনের কাগজপত্র ভালো করে খোঁজ করা হয়নি। আমি যারী বহনানকের অতিথি হয়েছিলাম। তিনি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী গায়ত্রী দেবী কবিত্ব গভীর জ্ঞান করতেন আর Tagore in America এই বিষয়ে গবেষণা করবার ক্ষেত্রে কোনো ভারতীয় ছাত্রকে USA Libraryতে কাজ করা উচিত বলেছিলেন। বাংলা নববর্ষে আইনাস্টিক পাথ হয়ে কবি লন্ডনে ফিরে এলেন, আর হার্বার্ড বস্কুডাবলী একটু অবল বহল করে (ভ্রাতুষ্পুত্র হুয়েন ঠাঁহুয়ের সাহায্যে), ব্যাকল্টন হলে দার্শন্যাত্মিক বস্কুডা বিলেন। জুন মাসের শেষে ডাচেল নাদিঃ হোমএ তাঁর পাইলন্ অপারেশন হয়, ৭২ বছর বয়সে। এদিকে আনিস অনটন, শান্তিনিকেতনের ক্ষেত্রে উৎসে, বেড়টে চলেছিল। এই সময়ের ছবন ইংরেজ শুভাহুয়াটী শান্তিনিকেতনে কবির পাঁচি বস্কু হিন্দাথে শোষণান করলেন। এগুনের সঙ্গে তাঁর লওনেই দেখা হয়েছিল এবং সেই ব্যক্তিগত টানে ২১শে সেপ্টেম্বরী ১৯১০ সালে এগুজ শান্তিনিকেতনে এসে হামির হলেন। তাঁর কিছু আগে ভবানীপুর এসে এম. এল. কলেজের অধ্যাপক W. W. Pearson বোলপুরে জীবন উৎসর্গ করবেন বলে কবিকে জানান। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এদমরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে এগুজ ৬ শিরদাঁদে হুতনের সঙ্গে মিলিত হওয়ায়। হুতনে ফিলে একটি ইংরেজি নাটক অভিনয় করেছিলেন ছাত্রদের নিয়ে। কিছু নাট্যশালা ছিল না। পুষ্করণাড়ে শালগাছের আশপাশে তাঁরা জুর ফিরে অভিনয় দেখান। জোংলা ঘাটে যেন সাতাপুত্রীর মধ্যবর্তী যেন হয়েছিল। নানা আদমারা পদ্ম শিরদাঁদের কামানো ঘুৎ (হুতত বাকী) আর হাড়িগুলায় এগুজ (হুতত saint) আর বাকী ছেলেরে হুইগোল। সে অভিনয় অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে বেবেছিলার।

বে নৃতকে অবনত করে ভারত অবনতির চরমে বেয়েছে সেকথা যেমন বদীন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর ছোট ভাই বিবেকানন্দও বলে গেছেন। ১৯০৭-১৯০৮ সালে রুশ ভার এর সিংহাসন ঝেঁপে উঠেছে—জাপানের হাতে বিরাট রুশ পরাজিত—বিষের আরও ঘটনা আরহা বেবেছি! তার ১০ বছরের মধ্যেই বেবেছি চীনে Manchu সরাট (১৯১১)ও রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) ভগতে এক নৃতন নৃত-রাষ্ট্র USSR ভয়গ্রহণ করল তার কলে USA বৈজ্ঞান্যুও যেন নিশ্চয়। এই সব বিপ্লবের হুচনা বিবেকানন্দ রেখে ও অহুতব করেই যেন বলে গিয়েছিলেন ভারত চোখ রেখে বিন্দাল চীন ও বিরাট মালিয়ার দিকে—সেকথা ভেবে আমি বিশ্বয় রাগে। চীনের ভারত আক্রমণ হুতত এক নৃতন অধ্যায়েরই শূচনা করেছে।

অন্তরীক্ষে



দেশপ্রেম ।

আমার পোনার বাংলা

আমরা তোমায় ভালবাসি ।

দেশের সেবা করছে কারা !



বাজনৌতিক ।

সাংবাদিক !

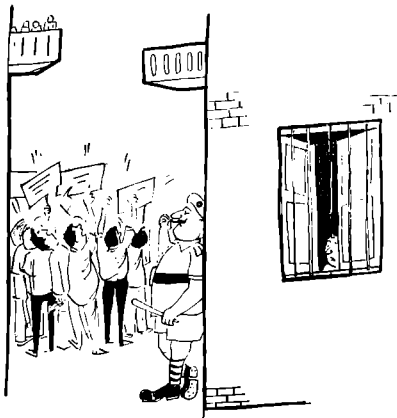
সাহিত্যিক !

সবাই বলে আমরা আমরা !!



নিকাখডো !

সাবদারো !



বাছাসেৰে ছুন্দবহা ।

বন্যা কন্যা

অষ্টকুমার সেনগুপ্ত

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

[পূর্ব কথা: সরসিধ সঙ্ঘবাহের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, পর উপজাশ লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন বেখে। কখনও বা ভাবে কার্ণালিট হই বেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে কার্ণালিটমেই বেশি দ্যাখার। দম্পত্যিক, দাম্পত্যিক, সাহিত্যিক অনেকের লেখই হহরম-হহরম করে। হুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে পবিত্রকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন এবাবে বিখ্যাপ করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনই এক উপজালিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু হুবীর যদি সঙ্ঘবাহের মত উদ্ভাস, সন্দীপ পাহাড়ের মতই খীরবির। সন্দীপও হুঃহু কিন্তু আত্মশক্তি। হাতিয়া কেন তার আত্মশক্তি জান করতে না পারে যে লম্বকে সর্বদা লম্বাপ। সরসিধ মেয়ের মতে হিমাংগ যোগ নামে এক কতী এতিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না হুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংগকেই গ্রহণ করবে? হিমাংগের বন্ধু আর মুকুন্দি বেবলোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ায় বস, তার দুটিও না কোন বনছায়ায় বিকে। বনছায়া প্রেমের মতো কেবিরর রাটি করবে, না কেবিররের মতো প্রেম?

অতঃপর সরসিধের বাড়িতে টি পাটিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংগ। বনছায়াকে পাজী হিসাবে মনোনীত করল। তার ফাৰ্বে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল হুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংগ, হুবীরকে চাকরি দিল। হুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর হুবীরের চাকরি হবার পর তার লক্ষ্যে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংগ অস্বকারে।

হিম্মন্তর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অল্পে হুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নিবিয়ে সম্পন্ন হতে পারে। সেই হতলগ্নে হিম্মন্তর কাছে থেকে মিথ্যা ওজ্বাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিভগাবু জানলেন হিম্মন্তর নিমিত্ত হুবীরের অন্তরেই তারিখটা লম্বা করছে। এমন বনছায়ায় তার তার আগেই হুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের হলিটাকা পাকা করতে পারবে কিনা।

হুবীরের সঙ্গে বনছায়ায় বিয়ে নিবিয়েই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনকথারই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিভগাবু এ ব্যাপারে উল্লেখ করে গেলেন। বনছায়া বুকল শিতপুত্র ত্যাগ না করলে বাধা পাঠ হবেন না।

একটা হুটকেশ আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাগের বাড়ি ছেড়ে হুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। বাধার আগে ছোটখোঁদে শাশতীর শিশুর কোটো থেকে শিশুর নিয়ে শিশুটিতে ঘন করে রেবা টানল—তখনকারই জানবার অন্তে যে সে অসী, সে হুবী।

হুবীরের কবি-বন্ধুটি গ্রিক করল এ বিয়ে-উপসর্গে সম্পাদক পীত্ব হস্তের বাড়ির ছায়ে একটা পাণ্ডা হবে। শাসীর করে নির্জনে যেন বনছায়া যখন শাশুছে তখন হুবীর হিম্মন্তর টোকা পড়ল। এক মুহূর্তে বিধা করল বনছায়া, হুবীর গোলে কি না গোলে। কিন্তু শান্ত করে কিছু ছিন্ন করবার আগেই হুবীর খুলে দিল।]

। বারো ।

ঘরে লোক মুহূর্তকাল শুধু হয়ে মইল হিম্মন্ত। কী করবে কী বলবে কিছুই যেন পরিবার করে হিসেবে আনতে পারল না।

তার বিধার তারিখটা কাটিয়ে যেবার অন্তে বনছায়াই চেয়ারটাকে—থরথর সেই একটা বাজ চেয়ার—হিম্মন্তর দিকে এগিয়ে দিল। স্বজন্মে বসলে, 'বহন'।

'না, বসব না।' ঘরের চারদিকে একবার চোখ ফুঁসোলো হিম্মন্ত। নিজেস করল, 'হুবীর কোথায়?'

'সে তো আফিসে।' বুধে একটি সুশীত হাঙ্গির রেবা টানল বনছায়া।

'তাকে তো ছুটি বিয়ে দিয়েছি।'

বনছায়ায় বুকটা ধাঁধ করে উঠল। সমস্ত সামাগোষ বড়-চড় যেন মিথ্যা হয়ে গেল সহসা। এই কথাটাই লোকটা বুকুহস্তের মত বাড়ি হয়ে বসতে এসেছে নাকি? সে তো বখাশিরই হুবীরের মুখ থেকেই জানা যেত। তার অন্তে এত ব্যততা কিসের? না কি, লোকটা তার আঙ্গকের লজ্জার উৎসবটা ঘটি হয়ে থাক। সমস্ত হাসি-গান-আনন্দের উত্তাপের নিচে বুকুয় ইতস্ত হাত থেকে-থেকে তাবের স্পর্শ করল।

কিন্তু লোকটা হাতে করে ঐ প্যাকেটটাকে কী এনেছে! পল বেয়ে ছুটে বানেশ স্পর্শ।

যদি আগে একটু ধরত পেত যে হুবীরের চাকরিটা খেয়ে নিয়েছে তা হলে কে চুকতে দিত

লোকটাকে ? কে চিনতে বেত ? হুদীরের আশিদের বদ, তারই ভেত্রে না তার এত সমাজ ! নইলে কত বড়লোকই তো রাজার হুশান নিয়ে বেঁটে থাকে, কে তাদের বেখে, কে গাড়িয়ে কথা কর !

‘ছুটি !’ তবু ছির খাঁকল বনছায়া : ‘কট দিছু ভূনিনি তো !’

‘সে তো আশিদের প্রথম বেখা হতেই বলে দিগেছি, আতকে আপনার ছুটি !’ হাতের বড়ির দিকে তাকাল হিমাত্ত, স্বরার ভাব বেধিয়ে বললে, ‘এখনো ফেরনি ফেখছি !’

উঃ, মন কী ভোগ হু পেয়ে উঠেছিল—ছুটি মানে ঢাকরি থেকে ছুট হয়ে থাকয়া নয়, ছুটি মানে এক মিনের প্রমোদ-বিবর্তি। ভুললোককে তো তা বলে লম্বা বলতে চম, হয়তো বা স্বার্থবৃদ্ধি। টংরিভিতে বললে, স্টোপ্‌ম্যান। যেদায় হারকেও যে উপহার বলে মেনে নিতে পারে।

বেগ বানিকটা হালকা হয়ে হামিমুগে বললে, ‘বন্ধুবাছবাবের নেহতর করতে গেছে গোববহঃ। এপুনি এসে শব্দবে।’ যেন তার চেয়ে হুদীর হিমাত্তর বেশি পরিচিত এমনভাবে বেখাল বনছায়া, বললে, ‘বহন, গাড়িয়ে রইলেন কেন ?’

হিমাত্তর বলল না, আবার একবার ঘরের চারপাশে চোখ মুলেলে, বললে, ‘এই একখানি ঘর ?’

সাম্রাজ্যের দল্লর যেন কত বড় একটা উপনিবেশ আছে এমনি পরিতপ্ত ভাব বেধিয়ে বনছায়া বহলে, ‘আর সঙ্গে ঐ এক চিলতে দায়ালা।’

‘দ্যাস, হয়ে গেল ?’

কথাটাতে বিশ্বয় না বিক্রম বৃত্তে পায়লনা বনছায়া। সবিনয়ে সংক্ষেপে বললে, ‘আশাতত এই যথেষ্ট।’

হিমাত্তর ইচ্ছে হল একবার ছির চোখে বনছায়ার চোখের দিকে তাকায়। একবার বেখে, কী নাহলে কোন অহকারে এই সাম্রাজ্যের চেয়েও কমকে সে যথেষ্ট বলছে ! কী দে জিনান বা গেলে অল্পকেও অধিকতরের অধিক লাগে।

কিন্তু অত তলিরে বেখবার সময় নেই হিমাত্তর। তাই বললে, ‘যেন, ভালো কথা। কিন্তু আমার হাতে যথেষ্ট সময় নেই। আমার দাতটার সময় স্নেন ধরতে হবে।’

‘সে কি, আপনি ফাংশানে থাকবেন না ?’ সেটা যেন কত বড় অতাব এমনি হাছাকার করে উঠল বনছায়া।

‘না। সম্ভব হচ্ছে না। জরুরি কাজে কলকাতার বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। হুদীরকে বোলো। আর এটা—’ এবার হিমাত্ত পরিতপ্ত পুরুষের চোখে বেখল বনছায়াকে, বললে, ‘এটা ছুবি নাও।’ প্যাকেটটা গাড়িয়ে গেল।

সেই অনাবৃত্ত দৃষ্টির লম্বনে লম্বা নিজেই কেনর যেন অসদার লাগল বনছায়ার। যেন হুদ তার লাজপোছে কোথাও হুপি পৈখিয়া আছে, জুত হরজা খুলতে গিয়ে লম্বা বিচ্যুতির ন্যসোধন করা হয়নি—না হোক, তবু, গুঝিকে মন না দিয়ে লম্বাভিত্তের মত হাত গাড়িয়ে নিল প্যাকেটটা। ভাড়াভাড়ি মোড়কটা খুলে কেলে ভিতরের দামি বেনারসিটা বের করে আনল ও নাটকীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল : ‘ও যা, কী অম্বর শাড়িটা ! আমি আছ এটা পরেই পার্টিতে বাব। আপনি থাকবেন না কেন ? না, আপনিও চলুন।’

শাড়িটা পরল কি তা দিয়ে বর মুহুর তাতে হিমাত্তর বিকুবান উৎসাহ নেই। ‘এদমবির’ দিয়ে, নিয়ন্ত্রণ করেছে, তাই হামুদি একটা উপহার বেগুয়া আর এই যে নিকুতে চলে এসেছে এ তবু বচকে বেখে

বাগা বেহেটীর অহঙ্কার কতদূর পর্যন্ত ছুড়েছে আকাশকে। তার থাকবার কথা তো উঠেতে পারে না। আর, আপনিও চলুন, এ অহঙ্কারে তো প্রাণল কাণ্ট।

অস্বাভাবিক গভীর হল হিমাংত। বললে, ‘আমার সময় হবে না। হলেও—খান, তোমাকে বিরক্ত করলাম—’

পাশ দিয়েও যেন গুরোগুরি শব্দ না বনছায়া। যত্নে সেই ছেলেমান্বির ভাবিয়ে রেখে বললে, ‘হৃদয়কে কিছু দিলেন না?’

হিমাংতর মনে হল যেহেটা শুধু নিভীক নয়, যেহেটা নির্ধর। শুধু উদ্ভতাই উদ্ভল নয়, হিংস্রতায় উদ্ভল। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর তো একটাই হতে পারে, সেটাই স্পষ্ট করে বললে হিমাংত : ‘তাকে কী দিয়েছি তাকে দ্বিভঙ্গ করে ছেলে নিও।’

কথাটা বনছায়াকে শুধু বিবলই না, বিচলিত করল। তার পাইয়ে দিল। কথাটার মধ্যে বিভ্রমের চেয়েও কোড বেশি আর কোড বৃত্তি কোথেরই পরিণাম। দ্বিভঙ্গ করে ছেলে নিও—এই ইঙ্গিতটাই অস্বস্তিকর। যেন স্ববীর বনছায়াকে নিজের মোহের অর্ঘ্যন করেনি, বহা করে হাবি তুলে নিয়ে হিমাংতই তাকে পাইয়ে দিয়েছে। হিমাংতর আবার হাবি কী, সে তো প্রাণী মাত্র। ভিক্ষা আর হাবি কি একমত? সে তো কোনো প্রতিবেশিতার দাঁড়ানি, সে তো সন্দীপ নয়—সে বড়জোর একটা সামাজিক পাত্র, হতে পারে হামি পাত্র, হয়তো বা একটু বেশি কাল্পনিক-করা। হামি বলেই তো হাবিতে অমিত্যর হয় না। পণ্যের বাজারে প্রতিপত্তি খাটতে পারে বলে প্রেমের বাজারেও প্রতুষ খাটবে এতটা সার্থ্য করবার সাহস তাকে দিল কে? ছেলে নিও—কী ছেলে নেবে? তার মানে, এ নিয়ে স্ববীরের সঙ্গে বনছায়ায় একটা আলোচনা হোক, স্ববীর আত্ম হিমাংত তার প্রতি একদিন আকৃষ্ট হয়েছিল—সে আকাঙ্ক্ষার আন্তন এখনো বৃত্তি চোখের কোণে উকি দাড়াচ্ছে—আর সেই আকর্ষণে অস্তিত্বের মধ্যে গুতপ্রোত হবার আগেই বনছায়া তাকে হাট্টিয়ে দিয়েছে, হাবিরে দিয়েছে, তারও চেয়ে মোক্ষম কথা, বুঝাছুঁ দেথিয়েছে। বেশ তো, স্ববীর সমস্ত আত্মক—তাকে জানতে হাও—ভর কী জানালে? বেগবে বনছায়া প্রেমের চিরদিন তরিত, কাকন বা কৌলীক প্রাচুর্য বা ঐশ্বর্য কিছুই তাকে অলিত করতে পারেনি—অপর্ণার মতো সে তার ত্রুণপুতি করেছে। এ সব জানালে স্ববীর তো বনছায়াকে আরো বেশি মূল্য দেবে, আরো বেশি মর্শা, বলার হার হয়ে ছিগ, মাথার মুকুট করে রাখবে। ভয় বোঝাবার কী আছে! বনছায়া তো আর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, অবনত বা ত্রুণবৃত্ত হয়নি—কোথায় সে তার হোঁচ বধবে? বনছায়া শুধু অবহিতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, বোকা হান্নিচ্ছে। যেমন বেহতা ভেমনি নৈবেদ্য, যেমন রোগ ভেমনি গুরু দিয়েছে। সেটা তো বনছায়ায় কুতিষের বর। সে ফুল বগডালে, লাতের মাগালের বাটবে, সেটা বেহতাকে দিয়ে বেওয়া কোনো বেওয়াই নয়। বনছায়া হিমাংতকে পাশ বেয়ার মতো গুরোগুরি করে দাঁড়াল।

বনছায় দিকে এগিয়ে গেল হিমাংত। শিচ্ছন কিরে তাকাবারও দরকার মনে করল না।

তাকে কী দিয়েছি—কুটীল আরেকটা। কথা বনছায়ায় মাথায় ঝিকিয়ে উঠল—তবে কি সেটা চাকরি?

শিচ্ছন থেকে অকুটবরে তাকল বনছায়া : ‘শুধু নয়। একটা কথা আছে।’

যেন পিঠে কে ছোঁয়া দ্বারল এঘনি আনখিত বহুগায় হিমাংত কিরে তাকাল।

‘কী কথা?’

পুঁথাপুঁথি ধরেই মধ্যে চলে আসতে হিমাংকুরে আখ্যায় পাশ দিল বনছায়া ।

‘আপনি আমার উপর খুব রাগ করেছেন, তাই না ?’

‘রাগ ? কেন, রাগ করতে হবে কেন ?’

‘বেশই আমার আর পথ ছিল না । আপনি তো জানেন না আমারে কত পুরোনো ভালোবাসা—’

‘ভালোবাসা কখনো পুরোনো হয় নাকি ? ভালোবাসা তো সব সময়ই ভালো । কেন, তাতে অপরাধ কী হয়েছে ?’ নির্দোষের মত সুখ করল হিমাংকুর ।

‘হাবা এমন অকৃত্রিম হয়ে উঠলেন—’

‘কী আশ্চর্য, সে সব কথা এখন তুলছে কেন ?’

‘জানুন,’ নরনারী মধুর হল বনছায়া : ‘আমার উপর রাগ করে হুবীরকে শাস্তি দেবেন না ।’

‘সে কি, হুবীরকে শাস্তি দেব কেন ?’

‘ওকে চাকরি থেকে ছাটাই করে দেবেন না ।’

‘ও কী করেছে ? ওকে ছাটাই করতে হবে কেন ?’

‘যা একবার ঘিরেছেন তা আর কেড়ে নেবেন না । আপনার মহাহতভব হতে কোনো বাধা নেই । তা ছাড়া হুবীর তো কোনো দোষ করেনি ।’

‘মহাহতভব-টাহতভব জুনি এখন কী বলছে ?’

‘আমার অপরাধ আমারই থাক ।’ এবার নরনারীর সঙ্গে হুবীর অস্বাভাবিক যেন এনে যেখান বনছায়া : ‘আমার ক্ষেত্রে ওর যেন না কোনো লাঞ্ছনা হয় ।’

‘জুনি কী বলছে তার ঠিক নেই । হুবীর তো খুব ভালো অফিসার—পরিচালক ।’ হিমাংকুর চোখে মুখে উৎসাহের আলো আলল : ‘তাকে তো আমার খুব পছন্দ । আমি তো তাবহি তার শিগগিরই কিছু উন্নতির ব্যবস্থা করে দেব ।’

বুকের মধ্যে শান্তির স্পর্শ পেল বনছায়া ।

‘কি, খুশি তো ?’

বনছায়া সরল মুখে হাসল । বনছায়ার অপরাধের বাবিশ হুবীরকে নিতে হবে না এ উদার জনের অহংপ্রব ছাড়া আর কী ।

‘আমি বলছি, হুই তো ?’

কথটার ইন্ডিক্ট চট করে বুঝতে পারল বনছায়া । বিশেষতঃ কৃতজ্ঞ-কৃতজ্ঞ নর নৃপাটী সহসা ভরসার পুচ্ছিত তদাভ্যস্ত করে তুলল । ব্যক্তিতে উচ্চারিত হয়ে অথচ সৌম্যে হৃদয় থেকে বনছায়া বললে, ‘যা এতদিন আকাজকা করে এসেছি তা এখন ভাগ্য বিদিয়ে দিল তখন হুই হুইনি বলি কী করে ?’ বিশৃঙ্খল ধরনের দিকে সবচেয়ে চোখে তাকিয়ে বনছায়া হাসল : ‘কেন, আপনার কী কিছু বিশদীকৃত হবে হচ্ছে :’

‘তা কেন হবে ?’ কথার মধ্যে লুকোনো ধন্যমটা ঠিক বিবল হিমাংকুর । তবুও সে দার্শনিক থাকবার চেষ্টা করল, বললে, ‘হুখ তো বাহুবীর অহংপ্রবের মধ্যে । বাহুবীর যদি অহংপ্রবটি তাবতে পারে সে হুই, তবে নিতাই সে হুই ।’

আখ্যায় পাশ দিতে সরল বনছায়া । ‘হুবীর’ কথটা ভালো লাগল না ।

এবার বেগিয়ে গিয়ে নিচ্ছেই হিমাংকুর কিরণ । বললে, ‘আজ্ঞা আমার কি আর তোমাকে ‘জুনি’

বলাটা ঠিক হচ্ছে ? তুমি এখন আমার অফিসের কর্মচারীর স্ত্রী, তোমাকে বোধহয় আমাকে 'আপনি' বলা উচিত ।'

আমো রেখা হবে না কি ? নইলে 'আপনি' বলবার কথা বলছে কেন ? কিন্তু মূখ পাতে হতে দিয়ে লাভ বেই । তাই প্রথম হাসিতে সমস্ত জেল হুছে নিয়ে বনছায়া বললে, 'তা কেন ? 'আপনি' 'তুমি' ছলেও 'তুমি' আর কখনো 'আপনি' হয় না ।' একটু বৃষ্টি বেশি বলা হয়ে গেল, সেটা অল্পভব করেই বনছায়া তাকাতাকি জুড়তে চাইল : 'তা ছাড়া—'

হিমাংগ বেতে-বেতে কান গাতল । হণিতা মোরটা নতুন কথা আর কী বলে ।

'তাছাড়া, আপনি আমার দালার বন্ধু,' তুপের খেকে মেয়েসের সেই লতা তৌতৌ হামুলি অগ্ৰষ্টাট এবার বার করল বনছায়া : 'সেই লশকর্কে আমি তো আপনায় ছোট বোন—'তুমি'ই তো বলবেন ।'

প্রত্যুত্তরে বৃষ্টি লগবে যেসে উঠল হিমাংগ । না, ওটা হাসির লজ নয়, ওটা শুও বাড়ির স্টাট ।

বহুতা বন্ধ করে দিল বনছায়া । আপন সম্বোধ্যে একেবারেই মত নিজেসে অস্বস্তি করল । নিশ্চিন্তে থাকি সামুটুকু সারতে বসল ।

এ করাবাত কার এ আর বলে দিতে হবে না । উত্তাল হয়ে বহুতা খুলে দিল বনছায়া ।

না, একমুহূর্তও বেঁধি করল না, গোপন করল না—স্বাধী ঘরে ঢুকতেই বলে উঠল : 'তানো তোমার বস এসেছিল ।'

'বলো কী, সত্যি ?' স্বাধীর লম্বাধে প্রায় ধোমাকিত হয়ে উঠল : 'এই ঘরে ।'

'হ্যাঁ, আমাকে এই শাড়িটা দিয়ে গেল ।' বলে কাপড়ের বাস্ত খুলে শাড়িটা দেখাল বনছায়া ।

ভাসিল লোকটা শাড়ি নিয়ে এসেছিল । যদি খালি হাতে আসত, বহুতায় টোকা দারত ! বহুতা খুলে না দিয়ে পারত কি বলে থাকতে ? স্বাধীর অফিসের বস, যার কপায় চাকরির আঁহু অছাড়িয়ে বস হতোয় এখনো স্থলছে, পারত তাকে প্রত্যাখ্যান করতে ? হতো তাহলে তখনি ছিড়ে বেত না ? বহুতা এখি নিয়ে হতোটাকে বাতে পঙ্ক করা যায় তারই চেঁচায় কি বনছায়া লোকটাকে ঘরের মধ্যে ভেঁকে আনত না ? কী সর্বনাশ, ভাবতেও বনছায়ায় হৃকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল । খালি হাতে একটা লোক, চরম বন্ধনার প্রতিশোধে বে-হাত এখন রিক্স-মুক্ত, প্রত্যক্ষ নির্ধনে একেবারে কাছাকাছি এসে ঠাঁড়িয়েছে, যদি সে উভত হত, লম্ফ হত, কী করতে পারত বনছায়া ? একটা উচ্ছ্বস্ত নাটক করতে পারত না নিতাই—এরটা তো শু অস্বস্তিকার, নয়, চাকরি-রক্ষা—আর যদি কোনো চতুর বন্ধনয়ে লিপ্ত হতে চত বাতে সাপও হয়ে লাঠিও না ভাঙে—তাহলে কি এমনি এখন উজ্জ্বাসেই স্বাধীরে কাছে উল্লাসিত হতে পারত ? পারত না, গোপনতার আঁজ নিয়ে হত, আঁহু জীবনে সমস্ত বিদ্যাক সাপের আঁহাসই এই গোপনতায় । না, শাড়িটা লম্বী—শাড়িটাই বাঁড়ির দিয়েছে । কেমন অনাচারে তাই বলা গেল, তোমার বস এই শাড়িটা উপহার দিতে এসেছিলেন । সম্ভাষণতাও লম্বী । গরিব তোরানির ঘরে একটুখানি শু ঠাঁড়িয়েই থাকা যায়, ছুও বসে বাওরা যায় না ।

'স্বাম্বর শাড়িটা তো !' স্বাধীর শু সৌন্দর্যেই শেব করল না, হামের হিসেব নিতে গেল : 'ছুনো-চুনো হয়ে বহুতা ।'

'কে জানে কত । বড়লোক—দিতে হয় দিয়েছে ।'

'এইটেই পোরো আঁহু লজের ।'

‘তুমি বলছ’ বহিঃ প্রত্যয়টা বনছায়ায় মনঃপূত নয় তবু যাতে কোনো বৈজ্ঞানিক না লাগে তারই ভয়ে সে একটি মনঃস্থ হাসিতে সজ্জিত তানাল।

‘কিন্তু আমি ভাবছি পাড়িটা লজ্জাতে দিলেই তো ভালো হত। সবাই হেঁথত।’

‘তোমাকে বলছি কী,’ অবিত ব্যাখ্যা হাতের কাছেই আছে বনছায়া : ‘আমাকে বললে, লজ্জায় যেন ধরবে, কলকাতায় বাইরে বাবে কী জরুরি কাজে, পাড়িতে উপস্থিত থাকতে পারবে না।’

‘সে কী, কই, আমাকে কিছু বললে না তো।’

‘তোমাকে কখন বলবে?’

‘কেন, অফিসে? এগারোটার সময়ই তো আমার শেষ বেলা হয়েছিল।’

বনছায়া কুঁচি পাড়িয়ে বললে, ‘এগারোটার পরে গোবর্ধন কোনো ব্যবস-টবস এলো, বাইর জন্তে—’

‘তাই হবে। আমাকে তো এগারোটার ছুটি দিয়ে দিলে। বললে, আমকের দিনে অফিস করতে হবে না আপনাকে, বাড়ি যান।’

‘আমি তুমি সেই হুঁসে একা-একা টাই-টাই করে ঘুরলে।’

‘না গো না, যাতে ঢেক ভাঙতে গিয়েছিলাম।’

‘ঢেক? ঢেক গেলে কোথায়?’

‘বস দিয়েছে। শুধু তোমাকেই পাড়ি নয়, আমাকেও দিয়েছে। পাড়ির চেয়েও দামি। ঢেক—
বেয়ারার ঢেক। এমনটা কী দিলে কেমন গ্রামা দেখাত। ঢেকটা লম্বা, তাই শুধু একটুকরো কানন নিজি
ভেবে বেশ নেওয়া গেল। আগলে লোকটা ভালো, শিমপায়েটিক। বড়লোক হলোই যে লোক পায়াল হবে
এ ধারণা ঠিক নয়।’

বনছায়াও অফিস দিলেব নিতে গেল। হাঁসতে হাঁসতে জ্বালান : ‘কত টাকা?’

‘এমআইউটা কিছু নয়। একটা অস্থায়ী সামান্য কেরানির বিয়েতে যে বয়স হাতে কিছু দিতে পারল
এটাই বড় কথা।’

‘তাতো মিন্‌টাই, কিন্তু টাকাটা কত?’

‘একশো। শুনেও সামান্য, কিন্তু বাইর হলো, একথোকে কালতু এতগুলো টাকা কখনো গরিনি ঘুঁর করে।’

‘কিন্তু তুমি কবি, তোমাকে একটা কলম ও লেখবার কিছু কাগজ দিলেই ঠিক হত।’

‘তুমি কী বোকা, সে তো ডের-ডের করে লাগত। না, না, টাকা অনেক ভালো, অন্তত তোমার
ঐ পাড়িটার থেকে ভালো।’

‘তুমিই তো এলো পাড়িটার দায় ছুঁয়ার মতন হবে।’

‘তা হোক, কিন্তু ওটা তো তুমি ব্যবহার করবে না, বাজেই তোলা থাকবে।’

‘কেন, আমকের পাড়িতে পরবনা?’

‘হুঁ, বসই থাকবেনা, ও পাড়ি পরে কী হবে? কে বেধবে?’ বললই স্ববিরের যেন হল, কেমন
যেন বেতালা শোনা, তাই কখনোই যোগ্য হুঁরির দিয়ে বললে, ‘তবে বাকে থাকে রাখে আমার জন্তে
পরতে পারো!’

‘তোমার জন্তে?’ বিলবিল করে হেসে উঠল বনছায়া : ‘তোমার জন্তে নেভড়া-কানি পরলেও না
বেনারসি পরলেও তাই, হেরবেরে সব সমান।’

‘তাই তো বলছি ওটা কোনো কাগজের হল না।’ সুবীর বাড়ির বাস্তুটাকে চাশা দিল : ‘তোমাকেও বাড়ির বললে ঢাক। দিলেই ভালো করত।’

‘টাকা!’ বনছাত্রার দাড়া বা বেব খিন খিন করে উঠল।

‘আই মিন, চেক। টাকাটা বিচ্ছিন্ন, চেক বেশ সস্তা। এখন আরেক দল কী নিয়ে আসে দেখা যাক।’

আরেক দল মানে বেগমোতি ভৌমিক। বনছাত্রা সজীর হল, বললে, ‘দে চেকের চেয়েও সস্তা, সে হাতি। সে বোধহয় আসবেই না।’

কী করে আসবে? বনছাত্রা তো তাকে নিমন্ত্রণই করেনি।

কী বলে করবে? বেগমোতির সঙ্গে বিস্তারিত অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল বনছাত্রাকে, চাকরি ছাড়ে কি রাখে এই নিয়ে বার সবে এত পরামর্শ, তাকে এখন বুঝানি কী করে বলা যায় যে আমার সমস্তটাই পরতা, কারো কারো ভেতল? তুমি হিম্মতকে ঠকানি, আপনাকেও ধোঁকা দিয়েছি। বুঝটা কি তাহলে খুব উজ্জল দেখাবে? সিদ্ধ কি সব সময়েই চক্ৰ, সকলের চোখে? কখনো কখনো কি সেটা কলঙ্কের চেয়েও কালো নয়?

‘তুমি এখন বলেছ তখন ঠিক আসবে।’ সুবীর আশ্বস্ত করতে চাইল।

‘তার আবার জরুরি কী কাজ পড়ে কে জানে।’

উপায় নেই, কিছুটা সোপান না করলে সন্ধ্যায় পথ চলা যায় না, বামীর সঙ্গেও যায় না। তবে এক্ষেত্রে বনছাত্রার এইটাই শুধু ভয়। বেগমোতির সঙ্গে সুবীরের মোকাবিলা করার সজাবনা নেই। যদিও সভ্যতাই শান্তি, তবু সীমাবদ্ধতা এখন বা কেবল সভ্য দিয়ে বোনা নয়—তার টানা-পোড়ানে একটিকে সভ্য, অন্যটিকে সীমাবদ্ধ। বা সভ্য তবু তাই নিয়ে সভ্যতা নয়। বা সভ্য ও সীমাবদ্ধ তাই নিয়ে সভ্যতা।

কী বকব দেখতে, তাতে নয়, কী বকব দেখায়, তাতেই মাহুকের বিচার।

ছাত্রা সন্ধ্যার সময় বনছাত্রা মিডেল করলে, ‘বলে হাও কোন বাড়িটা পয়স?’

‘আহা, বাপের বাড়ি থেকে কত খেঁচা নিয়ে এসেছ, বেছে দিতে হবে।’

বাপের বাড়ি থেকে—কথাটা ভালো লাগল না। ‘তবু বনছাত্রা তবল মুখেই বলল, ‘তোমার মনেরটা পয়স না তো?’

‘ওটা একটা সুসংস্কৃত কোলাহলের মত দেখাবে,’ সুবীর বাড়ির বাড়ির বাড়ি বলে, ‘দেখা নয় মজলা নয় এখন একটা আটপৌরে পথে চলো।’

‘আর পয়সা?’ দুই-দুই চোখে নিষ্কিন-নিষ্কিন হাসল বনছাত্রা।

সুবীর মনে গেরে সজীর চোটা করল : ‘এল বিনাক্ষণেই, দূর নেই তাতে দূর নেই।’ পরে গেরে নেবে এসে বললে, ‘শান্তি-গমনার পরিচয়-পত্র দিয়ে কী হবে? তোমার হৃদয় দূরবাসিই একটি নীরব পরিচয় পত্র।’

‘শান্তি?’ আনন্দে করে গেরে বনছাত্রা।

‘এ দূরবাসি হৃদয় কিসে? হৃদয় আমার ভালোবাসার, হৃদয় আমার চুপে।’ মনেই সুবীর বনছাত্রাকে চুপে খেতে গেল। দূর বাড়িরে চোটার কাছাকাছি হয়েই কিসে এসে। বললে, ‘ওরে বাবা, লিপিক্রমে সব লাল হয়ে বাবে। মেরেবের এ আবার একটা নতুন আদর্শ হয়েছে—লিপিক্রম। বনছাত্রা কাছ

যেঁসো না, ছাপ দিয়ে দেব। কাঁধের কাছে পাঞ্জাবিতে লিঙ্গবিকের ছাপ, তাহতে পারো, অতীত পুরুষের সে কী টাণ্ডেতি।’

‘আমী-বীতে হাসতে লাগল।

‘রাতে এর পোষ তুলব।’ সুবীর প্রায় শাসিয়ে উঠল।

‘মানে বেনারসি পরাবে।’ প্রমোদসরস চোখে তাকাল বনছায়া।

‘হী, নতুন পাতে নতুন খিচি হবে আশ।’

কিছু পাটিতে অনেক রান্না থাকলেও বনছায়া দিবেকে খুঁজে পেল না। দেবভোজি আসবেনা এ তো জানা কথাই, কিন্তু আরো একজন যে আসেনি সে বৃষ্টি সুবীরেরও অজানা।

না, লক্ষীপকেও সে কানে গিয়ে নিমন্ত্রণ করেনি। শুধু একটা চিঠি লিখে জানিয়েছে, যদি সময় করতে পারেন, একবারটি আসবেন। আসলে এটা একটা লাহিড়া লম্বাবেণ আপনি আসবেন না এ অন্তত্ব। আসবেন কিন্তু।

তারপর আবার পুনরুত্থিত লিখেছে : যদি আসতে না-ই পারেন, দূর থেকে আমাকে আশীর্বাদ করবেন।

তবু, যিরে করেছে লিখেছে, কাকে করেছে নামধাম কিছু উল্লেখ করেনি। কোনো নিমন্ত্রণ-পত্র তো ছাপানো হয়নি যে লুপে গেছে হেবে। আর লেগে বৃত্তান্ত তো মেয়ে নিজেই হাতেই লিখতে পারে না, বিশেষত যদি তা ঠিক লেখার মত না হয়। স্বামী-সুহৃদের ঠিকানাটাও দেয়নি যে এল খোঁজ নিয়ে যাবে। হুতরাং এ সম্পর্কে এ প্রক্সে কে না বাড়াহ ?

‘কাকে বিয়ে করেছে ?’ দেবভোজির কৌতূহল তীক্ষ্ণতর।

‘একটা লোকসরকে। সেটা পরেই নয়।’ হিমাত্ত ঠাণ্ডা গলায় বললে, ‘পরেই হচ্ছে মেয়েটা যুগু। আমার লুপে ভাবলভিনিঃ করেছে।’

‘একটা ব্রিচ অফ কন্ট্রোলটির মাথলা করে মিন না—’ দেবভোজি পলা নামাল।

‘মাথলা ? মাথলা চলে না।’

‘কেন চলবে না ? কন্ট্রোলি তো হয়েই ছিল, তার লাকী আমি দেব, ওর দাঁড়ানো বেবে, তারপর বেগতে হবে সেই কন্ট্রোলি ভিত্তিতে কোনো কান হয়েছে কিনা। ধরুন ওকে কোনো কিছু দিয়েছেন কিনা, কোনো উপহার, ধরুন হীরের আংটি কি নগর টাকা, কিংবা অন্য কোনো কিনানদিশ্যাল এনিস্ট্যান্স—’

‘গার বলবেন না। সেই লোকসরটাকেই আমার অফিসে চাকরি দিয়েছি।’

‘ঐ তো চুক্তির কনসিডারেশন ?’ দেবভোজি উদ্বেজিত হতে চাইল : ‘তবে তো মাথলা নিচ্ছই চলবে।’

‘না, না, মাথলা-টামলা নয়, আমি বলছি—’

‘এর আর লম্বাবসি কী, ঐ লোকসরটাকে শ্রাফ করে মিন।’

‘সে আমি বোঝি, কিন্তু’, পট থেকে আবার চা ঢালল হিমাত্ত : ‘আপনি মিল বন্ধুত্ববাহের বিকসেত কিছু টেন মিন। আপনাকেও তো ও মিথো কথা বলেছে, বোঁকা দিয়েছে, একজন লাবলভিনিঃের পক্ষে এ তো পমিটিভ মিলভিনিঃ।’

‘নিশ্চয়ই।’ বেথজ্যোতি দিগায়েট ধমাল। বললে, ‘কিন্তু দুজনকেই যদি চাকরি চলে যায়, ওরা খাবে কী? মেয়েটাকে তো বাপের বাড়িও ত্যাগিয়ে দিয়েছে।’

‘তাহলেই যুবন কী চীৎস এঁ মেয়ে।’ রেড্যোয়ার বন্ধন হিরাংভই বেথজ্যোতিকে তেঁকে এনেছে, হিরাংভই বিল চুকিয়ে দিল। বললে, ‘আগাত ভোলা যায় কিন্তু অপমান ভোলা যায় না। অপমান তো আপনাকেও করেছে। হাট চোক, আপনাকে সব জানালাম আমি। আপনি এখন বেথবেন, কী ষ্টেশ নেওয়া যায়।’ অস্বস্ত এতে তো একটুও সম্বন্ধ নেই যে মিল যজ্ঞমন্ত্র পঢ়লা নব্বয়ের মিথোখাটী, ইনসিনসিয়াও হু হি বোমস।’

‘আতর্ক, করনা কথা যায় না।’ বেথজ্যোতি দুখচোখ বোরাগো করে তুলল: ‘বেথি, ভাবি, কী করা উচিত।’

‘তা ভাবুন।’ আবার উচিত আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া।’ হিরাংভ গভীরমুখে বললে, ‘বেথানে তুল ভাবছেন দেখানোই আবার সাপ।’

[ক্রমশঃ

অভিন্ন বর্ণনের ক্ষেত্রে এক তরঙ্গ নাট্যকার আলান জানিয়েছেন এক বিখ্যাত অভিনেতা ওয়াটস রেকাককে।

অভিন্নর চমতে লাগলো আর রেকাকও তুলতে লাগলেন।

শেষবারের মত বনিক্য মেয়ে এল, নাটক শেষ হলে নাট্যকার ক্ষুব্ধ ভাবে বললেন রেকাককে

—‘আপনি বন্ধন জানেন আমি আপনার মতামত চাই তখন কি করে আপনি কেবল ক্ষুব্ধ হুলতে লাগলেন।’

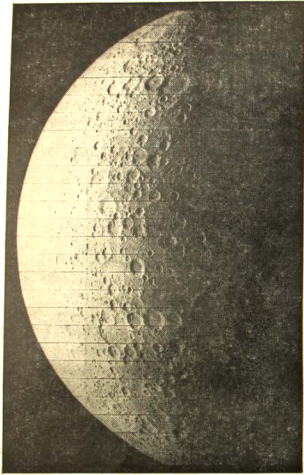
রেকাক একটি কথাই শু্ন বললেন,—‘এই ক্ষুব্ধ আবেশই একটি অভিমত।’

বিশ্ব-বাতায়ন



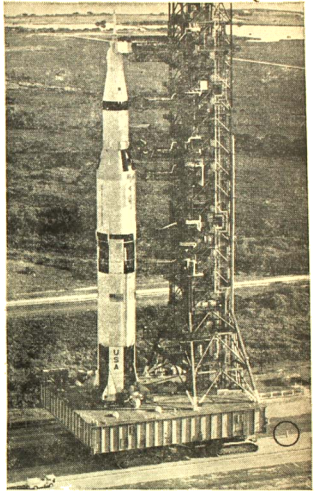
ম্যাপেলোর যাত্রীদল

১৯৬৮ সালে চক্রে যাবার আগে
মঃমুসবাতি সার্টার্ণ ১ নং রকেট
উত্তরী চক্রে ডাব যাত্রী হবেন
(১১ দিক থেকে) ওয়াশট্ট কানিঃডাম,
ডন আইসেল এবং এডালি লিবা
এঁদের এখন থেকেই প্রস্তুতিপর্ব
চলেছে সারা দিগ্ বিশ্বব্যে চেষ্টে
থ্যাৎ এই অভিযানের দিকে ।



চন্দ্রের উলটো দিক

৫ নং মহাকাশযান অরবিটার চন্দ্রের এট ছবিটি তোলে।
 চন্দ্রের এট অংশটি পৃথিবীর সামনে কোনদিন আসে না।
 গত ১০ লা. আগষ্ট কেপ কেনেডি থেকে অরবিটার ৫-কে
 মহাকাশে প্রেরণ করা হয় এবং মহাকাশ যানটি চন্দ্রের উপর
 অবতরণের অনেকগুলি সম্ভাব্য স্থানের যেসব ছবি তোলে,
 এই ছবিটি তাদের অঙ্গুতম।



অতিক্রম রকেট সার্টার ও

এই রকেট ঘে কতটা উচু তা বোঝা যায় ছবির ডানদিকে গোলাকৃতি স্থানে ট্রাক আর মাল্টিবটিকে কত ছোট দেখাচ্ছে তা থেকে। এই বছরের শেষে এই মাল্টিবটীম রকেটটিকে কেপ কেনেডি থেকে ছাড়া হবে। এই রকেটের কাজ হবে, পরবর্তীকালে মাল্টিবটী রকেট চাশে বেতে পারবে কি না তা পরীক্ষা করা।



চাঁদ থেকে তোলা পৃথিবীর আলোকচিত্র

নাসার স্পেস স্টেশন থেকে তোলা পৃথিবীর আলোকচিত্র নং ৫- ১৬০,০০০ সিলো-
মিটার দূর থেকে পৃথিবীর এই কণ্টোটি গ্রহণ করে। চবিতে
পৃথিবীর স্থানাঙ্ক ৫/৬ ভাগ অংশকে দেখা যাচ্ছে। এই
অংশে রয়েছে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল (নীচে বা দিকে),
ইউরোপ (উপরে বা দিকে), সুরেন্স খাল এবং আরব উপদ্বীপ
(মধ্যখানে বা দিকে) এবং ভারতবর্ষ (মধ্যখানে)। ছবিটি
তোলা হয় গত ৮ই আগস্ট।

পিছনের জানালায়

শ্রীকটকেশ্বর শর্মা

আমাদের ছেলেবেলায় যে ভাবে পুর্বের বছর বিহার নিত আর নতুন বছর সামনে আসত—এখনকার ছেলেমেটা সেটা কল্পনাও করতে পারবে না। এই গুটি বছরের তৎকাল যাত্র একটি বাতের, কিন্তু পুরাতন বছরের রাত শেষ হলে নতুন বছর শুরু হবামাত্র জীবন যেন অনেকখানি এগিয়ে যেতো—অমৃত সেই কালে তা মনে হতো। গানকন-পর্বের শেষ গ্রহের চক্কের পাক শুরু হতে না হতে প্রায়ই কড় উঠতো, পড়কুটো। দুলাবাগি উড়িয়ে কালবৈশাখীর খেলা চমকতো চমৎকার। চড়চড় পক্ষে বড়বড় টোটার বিজির বাগায় দুই বেগতে বেগতে ঘন চিক ঘুরে হিত চোপের সামনে তাপক্লিষ্ট ধরনী ও শরীর হ'ত ঈতল। উত্তর জীবনে বসন্তমন্ডলের বংশের কবিতাটির মধ্যে সেট অপরূপ উদ্যাদিনী প্রকৃতি রূপকে উপভোগ করেছি। তার পরের দিন কী সৌন্দর্য প্রকাশ রূপ নিয়ে আসত বৈশাখ—নতুন বছরের ত্রিভুজ রমা আত্মগোপন এর দাবী, খুলিতে ভরপুর মন। মেয়েরা বলত, ভগবতী যাত্রা। তাপহরা আকাশে নতুন সূর্য, বৃষ্টি-বোরা মতো পাতা-পাতা গাছালি—খুলিশেষদীন পথবাট উঠান—বোয়ামোড়া ককবকে প্রকৃতি—নতুন বছরের নতুন চেহারা। এত স্নায়ু হতে এখন তো আর বেশি না। কল্লুরাও এখন মতিবর রূপ, অনিহম উজ্জ্বলতার বসন্ত। জীবনে অনেকগুলি নতুন বছর এমনি করে এসেছে বলেই কি নতুনত্বের মোহ কেটে গেল। না,—গ্রিক তা নয়, নতুন বছরের পালা প্রধাণতাই এখন বোঝা বহলে গেছে। চড়কের ঘটা এখন চোপে পড়েনা। বছরে তো নয়ট—বেশির ভাগ গ্রামেতেও চড়ক গাছে পাক খাওয়ার দুটো কই! খুব বেশি হলো তো যেলাব ক্ষেত্রটিতে কিছু বোকান পাট বসে—কিন্তু ছেলে মেয়ে ভড়া হয়—গ্রাস্টিকের গুড়ুল আর খেলনা বিক্রী হয়। বানিকটা হৈ হৈ টেচামেচি তার লগে ভাল মেলায়। রতবায় পরিবর্তনের ছাপ না প্রস্টিতে না মনে, কোথাও পড়ে না। এক পদসার ভালপাতার ধাঁধা একটানা হর তুলে মেলাব কথা ঘোষণা করেন, এক আনার চোড়ার বাঁধ কাঁপা ধানের মাধ্যম বসে হাড়ির টানে তেমনি তুচ্ছ লাফ লাফায় না, হু'শসার খেলনা-ধাঁচ হাতে তুলে কচি মেয়েবেগে ঘুরে হাসি কোটেনা। ভেজাল তেলে ভাজা ভেজাল ভালের পাঁপড়, তেমন হুগুই বা কই। নিয়ম রক্ষার তাগিদে মাছব ভড়া হয়—বায়ের উপলক্ষ্য করে মেলা, তারা থাকে দূরীর বাইরে।

রথের মেলায় অবস্থাও এমনি। কাঠের বথ তো গ্রামে গ্রামে থাকেনা—বিশেষ বিশেষ নামী গ্রামের সম্পত্তি ওটা। আমায়ের গ্রামে চারগানা বড় কাঠের বথ ছিল—গ্রাম ছুড়ে বসতো মেলা। এখন একখানির মাত্র টান হয়। এখনকার রথের বামনরশ্মী ভগ্নাংশ বলেন না—তার বসলে রথুনাথ। হেতায় নবহরীমল ক্রাম রথুনি। ইনি ধ্বংসকারী যন—পদাসনে উপবিষ্ট, প্রসন্নমুখ দেবতা। উপবেশন তবিত্তে বৃদ্ধ হুতির সাদৃশ্য—হাড়ের দৃষ্টান্তটি ভিন্নতর। ধ্যান নিমীলিত নেত্রাঙ্কুরের প্রসন্নতা মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত নয়—পূর্ব-দৃষ্ট মেলে অবতার পানে চেয়ে আছেন। এঁকে রথ চাপিয়ে শক্তিপরীকার আয়োজন। রথের রসিত

হাত দিয়ে বহি নজি-ডককড়া। কয় ভারলে ঠর দোহাট পড়বে ঘন ঘন : 'বল থাকতে বল না দেয় হোচাট
হুনারেব কাছে ।'

এমনি আরও অনেক পাল-পার্বন ছিল,—কোনটা কালের যোতে ভেসে গেছে—কোনটা প্রকার
শিকল আঁকতে ধরে কোনমতে টিকে আছে। হৃদয় ডাখে টিকে থাকবে তেমন করে—সেই পুরাতন কালের
পড়াপটখানির মত যে ক্রমশঃই বিবর্ণ হয়ে উঠছে। এক কালের পুরানো স্থষ্ট মন এখন বিজ্ঞান-শাসনে বর্ণ
ও বর্তালোকের ব্যবধান স্বীকার করতে চায় না—এখন সেবভাষা মহিমাভিত্তি—মাহুকের কপাড়াশী। সেইকালে
কিছু সেবকপার গল্পগুলি শূন্য পার্বনে পূর্ণা মানে পোনানোর ব্যবস্থা ছিল। আশ্রয় বই পড়ে রামায়ণ মহাভারতের
গল্প জানিনি। ভাববত কথাই আসলে বলে গল্পের বল উপভোগ করেছিলাম। সেই জানার বাইরে চিরতর।

বৈশাখের প্রথম দিন থেকে অগস্ত্য কালে বসন্তো পে আসত। ছোট্ট সামিয়ানার নীচের উঁচু
বেড়ীর উপরে বসন্তের সপক ঠাঁকুর। পরিধানে পট্টবস্ত্র—হুড়ে উত্তরীয়—কপালে চন্দন—সন্ধ্যা ফুলের মালা—
কোনের কাছে পোলা পুঁথি। হুয় করে হোক গড়তেন, হোকেব ব্যাখ্যা করতেন, গল্প বলে যেতেন। মূল গল্প
থেকে পাণা প্রশংসার বিদ্যুত রত গল্প—সত্যাপ্ন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত তার জের টানতেন। কর্ম-জ্ঞান-
তত্ত্ববিদের প্রাচল আলোচনার বোধ্যাতীত হোহাতীত এক পণ্ডিত পুত্রের মহিমাকে উল্লেখিত করতেন, হাতে
হাতে দেহতত্ত্বের গান গেয়ে মনে অশ্রুই তল্লি রসের সত্য করতেন। একটি বটীর মত সন্ধ্যার ফুলতা
জড়তা পত্নাহুগতিক কর্মজড়তা থেকে নিখা-লোকের পরিমণ্ডলে উত্তীর্ণ হয়ে যেত জ্যোত্স্না। আশ্রয় ছেলের
বল তত্ত্বকা বৃত্তান্ত না,—গানের স্বর্গ বৃত্তান্ত না, ভাববিস্ময়ে অচেতনপ্রাণ হয়ে অপ্রবিশ্রমিত করতাম
না—তুমি গল্পের পান করে পরিতুষ্ট হতাম। তুমি কি গল্পের ? তার মনে আরও কিছু মূর রস, বা না
বৃত্তেও মন সরল হয়ে উঠত। আরও একটি মাহালোক ব্যুৎপত্তি হতেও মন থেকে মুছে যেত না। সেই
গল্পের খেই ধরে মন সত্ব পতিয়ে চিত্র স্রষ্ট্র গ্রহ নক্ষত্রের গলে। অজানা জীব, জীবন ও জগতের মাঝখানে
নিজের দস্তাকে উপস্থাপিত করতে চাটত। একথা স্বীকার করতে লজ্জা নাট—জান তখন সত্যই কেন্দ্রে
আবদ্ধ ছিল। কিন্তু কল্পনা-বিদ্যুত জগতে জীবন ছিল প্রসারিত। আত্ম স্মৃতিক-অভিযানে চন্দ্রলোক মহিমা-
ভিত্তি—বহু নব আবিষ্কারে আনন্দের মেঘা জুড়ে—আনন্দ কি লাভ হচ্ছে পরিপূর্ণতা ?

এই প্রসঙ্গে একটি বেলার সন্ধ্যার বিলম্বের কথা মনে আসছে। বেলান্তির প্রবর্তক আশ্রয়ের গ্রামের
গম্বাট বংশের সন্তান রামগোপাল মুন্সী। সন্ধ্যা বৃহত্তর ছেলে কৃতী-বাবুহায়দারী—ঐর স্রবণের বুদ্ধি ও
আইন প্রয়োগের অসামান্য বুদ্ধতার নবীয়া কোলাহালী মূর্ত্ত।

আশ্রয় তখন ইকুশের ছাত্র। হঠাৎ একদিন চেঁড়া শিলির বোকা দিয়ে এক চিলতে বতীন কাপড়
আশ্রয়ের হাতে দিয়ে পেল—তার ভাবার্থ ছিল—আগামী স্তম্ভ বড়দিন উপলক্ষে রামগোপাল মুন্সীর বাগানে
একটি বেলার উদ্ভাধন হবে। নাম—আনন্দবেলা। এই বেলার বিবিধ আনন্দ প্রাণের ও লোকশিক্ষার
ব্যবস্থা থাকবে। এখানে শৌখিনিক বটনা ও মহাপুরুষ জীবনীকে রূপ বেগুয়ার চোঁটা দিয়েছে বংশিল্লের মাধ্যমে,
হানীর শিল্পীরে শিল্প-বৈশিষ্ট্যের নমুনা বেগে নিস্তর বুদ্ধি হবেন। এই বেলার পুতুল-নাচ, হাডা ও বিদ্যেটোরের
ব্যবস্থা থাকবে। তা ছাড়া সন্ধ্যার বিদ্যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্তার জিনিসপত্রের সমাবেশও বেগতে পাবেন।
ছেলেদের মত সন্ধ্যারোগালা গাখার ও বেলনার বোকাচান এবং অনেক রকম আয়োজন ঠিকঠা হচ্ছে। একাধারে
শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করতে হলে বেলার আশ্রয়। প্রবেশ মুন্সী নাই। বহু গণ্যমাত্র ব্যক্তির উপস্থিতিতে
নানবীর বেলার ব্যাখ্যাইটে বাধ্যতায় এই বেলার ব্যাখ্যাকাটন করবেন।

একপায়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে পাঁচালঘেরা বিরাট একগুঁড়ি ভূমি—তার একাংশে একটি আয়বানান। ভূমিটির প্রান্তিক অংশেই তারি বনোয়ন। দক্ষিণ-পশ্চিম অর্ধচন্দ্রাকারে প্রসারিত একটি বাগ। বগাকালে সেটি পকার লুক মিশে জ্বলিনারাহীন লক্ষ্যবৎ, গ্রীষ্মকালে শুষ্কও নয়। বাগের ওপারে কোণের পর কোণ ঘরে চলেছে ঢাব আধাকের মাঠ, বহিঃস্ত ও আউন ধানের ভূমি। উত্তরে পাঁচা সড়ক-বরাবর চলে গেছে অধিকা কালনার বেয়াখাট পর্যন্ত। পূর্বে ঘন বীণ বনের গণিষ্ঠে কন বসতি—মুসলমান পাড়া। আয়বানান ছাড়াও এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ত তরফ বাগের অসংখ্য একটা পুহুর, ছোটখাটো বাংলা বাড়ী, টিলায় মত উঁচু একটা মাটির টিশ, অসংখ্য ছুঁই-নায়া বিন্দাল এক ঘটগাছ—আগাছার অকলে ভতি অনেকখানি পতিত ভূমি—দূর থেকে বনভূমির মত দেখায়। ভূমিটা পরিষ্কার করিয়ে পৌরাণিক কাহিনীগুলির স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল। যেখানে যেটি মানার সেই মত পরিপাটি ব্যবস্থা।

যেমন সময় সেই দিয়ে চুপলেই প্রথমে চোখে পড়বে অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্তি—যেমনটি বহিঃস্থিত হু-মহাচার রয়েছে অবিকল সেই ছবি। বহুদিন উপলক্ষ্যে মেলা, ইংরেজ রাজত্ব, উদ্বোধন করবেন উল্লম্ব ইংরেজ রাজপুত্র—হুতরাং এটি হুতরাই বাস্তবিক।

এই মূর্তির বাঁধিক থেকে ভূমিটা ঢাসু হয়ে বেমে গেছে একটা কোণের মধ্যে। সেইখানে গিয়েই ঘটগাছতলার ধানী বুদ্ধ মূর্তি। ঘন উল্লম্ব গ্রামে বনভূমিভূত বৌদ্ধিকতলার সিদ্ধার্থ বলেছেন বুদ্ধ-লাভের তপস্যার।

এরপরে ভূমিটা জমজং উঁচু হয়ে আর একটা জলসের মধ্যে শেষ হয়েছে। এই জলসের এক প্রান্তে একখানি কুটির। কুটিরের মধ্যে বহুদ্বারাদ্বিতী উৎকৃষ্টতা। সৌভ্য দেবী, কুটিরের শিখনে বৌদ্ধদেবী রাবণ উকি মারছেন। আর একটু এগিয়ে হাতে ধরবার হস্তে লক্ষণ চলেছেন রামের অধেবনে আরও দুবে রাহাঙ্গ অঙ্গলপণ্ডত বা আরাপিত বহুতে পরদক্ষানোক্তত শ্রীরাঘচন্দ্র। সব শেষে বর্ণ-দেহী-বিভিচ দ্ব্যতপী সারীত শ্রীবা বাঁকিয়ে শ্রীরাঘ:ক লক্ষ্য করছে। এক কালে ভূমি ছুড়ে রাহাঙ্গ কাহিনীটি বর্ণাবধ বিস্তৃত হয়েছে।

আর একটি স্থানে দুর্গা-পারণ চিত্র। মূর্তি অরখালি হাতে নিয়ে কিংকর্ষব্যবিমূঢ়া কৃষ্ণায়নৈক-পতি জৌপনী শ্রীকৃষ্ণ অধুবে দাড়িয়ে হাসছেন—আর একটু দূরে কৌতুকের দৃষ্টিয় মহিষ দুর্গা-পলায়নপণ্ড।

উঁচু মাটির টিলায় উপরে একটা কয়েংবেল পাড় ছিল—তার তলাতে বাঘছাল বিছিয়ে বসে আছেন হুগাণ্ডী। 'হর প্রতি প্রিয়ভাবে কন হৈমবতী'-গোছ আলাপ চলছে। এটি কৈলাস পর্বত—কয়েংবেল পাড়ের তালে কিছু কাঁথা-কানি ছাড়ি কুঁড়ির সমাবেশ এবং টিলায় অর্ধগণে দুই শির অচয় নমীকৃতি; একজন দিচ্ছি মূর্তিছে, অকল্পন শৈলপণ পাঁচারা মিছে। ছবিটা ভারতচন্দ্রের অরখামকল থেকে নেওয়া হয়েছিল কিনা সেই বহুনে আধারের আনার কথা নয় আদরা কৈলাস সমেত হুগাণ্ডী দেখে মূর্ত।

আবার টিলা থেকে নেমে এসে পুহুরের তানদিক পানে চেয়ে আধারের চোখের পলক পড়ে কিনা-পড়ে। তান ধারে জলের ঠিক মাঝখানে পলাততি তিকা দাড়িয়ে বাপিমে চলেছেন শ্রীমত ললাপের তাঁর দপ পানেরো হাত দূরে 'কমলে কামিনী' মূর্তি। একহাতে তাঁর পদ-ললাবঃকরণের তক্তি, অত্র হাতে ওটিকে উপরে আনছেন।

পুহুরের মাঝ বরাবর হুগাণ্ডিত নৌকার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধান হুগাণ্ডিত। নৌকাবিলাস। 'সব গোপীকে পার করিতে নিব আনা আনা—শ্রীরাধিকার পার করিতে নিব যোগ আনা'—বোষ্টর তিকাধীরের হুগে পোনা গান বেব ছবি হয়ে সাবনে আসছে।

এই পুস্তকের পশ্চিমে একেবারে শেষ লীয়ার কুস্তাবন লীয়ার আর একটি দৃষ্ট। অনেক মাতৃগান থেকে উঠেছে প্রচণ্ড বলশালী কালীয়নাগ—তার কণার উপরে নৃত্য ভবিতের ঝড়িয়ে বাঁধারী ব্রহ্মবালক কানাই। কালীয় পতীয়া অর্ধ নিমজ্জিত বেঁচে ছাত ঝোড় করে তবস্থতি করছে, কলসের বাবে কয়েকটি গ্রামাল বালকের বিবলকর্জ মূর্তিত বেহ।

এমনি ছবিয় পর ছবি রামায়ণ মহাকাব্যত শ্রীমদ্ভাগবত হিন্দু বৌদ্ধ ইহবা পূরণ থেকে চরন করে নেওয়া বৃত্তান্ত মেলার মাঠে চড়ানো রয়েছে। সন্ধ্যার হাপবত পাঠের আসরে যে ছবি প্রতিপথে গল্পরসে সজীবিত হয়ে উঠতো মেলার ক্ষেত্রে সেগুলি বখাখ পটভূমিকার কায়ালাভ করে আরও প্রত্যক্ষবৎ হতো। এ ছাড়াও পুস্তক নাচের আলগে প্রতিটি পালাতেই রামায়ণ মহাকাব্যতেরই জয় উল্লাস। ব্যাক্সার আসরেও কাহ ছাড়া গীত নাই। ব্যতিক্রম দেখেছিলার খিরেটারের পালায়, বক্তৃৎর মনে পড়ে—পেট আসরে প্রথম খিরেটার বেখা ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়লাভ। পালা ছিল লাজহান, চন্দ্রগুপ্ত, চাঁদবিবি। সেই বিশ্বস্তর তুলনা ছিলনা। ব্যাক্সার পালায় মধ্যে রত্ন ভরতের কাহিনীটি আল ও মন ছুড়ে আছ।

মেলার নাগরকোলা চাপা আর চাঁনেবারান ডাঙা বাওয়ার তুলিও তোলা যায় না। দুই এক পরদায় বাহার পকেটে রেখে এক একটি করে খোলা ডেবে মখে ফেসে দিবে মেলার মাঠে খুতে বেড়ানোর স্তুতি হৃৎ-স্তুতি ছাড়া কী।

মূল্যবের এই আনন্দমেলা দীর্ঘবারী হয়নি। মাত্র কয়েক বছরই এর পরদা। তাহোক, এর থেকে আমরা কিশোরের মল লাভ করছি অনেক। দুঃখের কথা, বাট বছরের মধ্যে এমন একটি আনন্দ মেলার প্রতিষ্ঠা আর হলনা। এই গ্রামের উপকণ্ঠে জুলিয়ার কবি কৃতিবাদের মেলাই বা তেরন জীবন্ত হয়ে উঠলো কই! যদিও বঙ্গরাজ্যে কবিকে অরণ কবীর প্রাথমিকক আয়োজন এখনও হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক জনমো দুঃটার কথার ভক্তি অর্থা দাবিয়ে স্ববিকল্প শোব করার চেষ্টা চলে। বাট বছর কিংবা তারও আগে রামায়ণ পানের আসরে বসে উক অঙ্গরাসের আসরে যে চিত্রগ্রন্থ আমরা সহজেই লাভ করতে পারতাম আল পূরণ-চর্চা ও রামায়ণ পানের আসর সূত্র হয়ে যাওয়ার সেই অকৃত্রিম অঙ্গরাস কোথায় খুঁতে পাব। মৃত্যং বাঃলাব আদি-কবি রামায়ণকার কৃতিবাল ও আমাদের অঙ্গরাসেকের হৃৎর নেপথ্যে একেবারে বিশৃঙ্খল অতলে তলিয়ে ক্ষেতে বসেছেন। বঙ্গরাজ্যে মাত্র একটি দিনের অঙ্গরাসে দু-এক দর্কার স্তুতিচারণার মাধ্যমে তাঁকে উজ্জীবিত করা বাবে কোন সন্দেহে। পরিবেশ নই হলে প্রাণপক্তি স্তুতিলাভ করেন। এই সহজ সত্য কে না জানেন।

মানুষ-কে মানুষ বাঁচার

আমলু আদিকারী

জীবনের জীবন্ত ঘটনা যে বইয়ে লেখা ঘটনাও চেয়ে অনেক বেশী ঘন উন্নতে পারে তার আর একটি নতুন আশ্রয়দেয় কাছে রাখছি।

মানবানেক আগের কথা। তখনো লজ্জা হয়নি। বাড়ি ভিরছি হোজের মাঝার একটি লোককে বেধে ধমকে ঠাড়লাম। লোকটি বোধকরি আমাকে বেধতে পেরেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'খিঁচিতে অস্ত্র নিক্ষেপে চলতে আরম্ভ করেছিল। আমি ভাকলাম—হরিচরণ, শোন, এখিকে এস।

আমার ভাক শুনে সে ধমকে ঠাড়াল, তারপর অস্ত্রের কুণ্ঠিতভাবে খাত নীচু করে আমার সাহসে এলে ঠাড়াল। বললাম, কবে এসেছ? কবে ছাড়া গেলে?

—কাল ছাড়া পেরেছি বাবু।

বললাম, বিনা বোঝে একজনকে বাঁচাতে জেল খেটে এলে। বাইহোক তোমার কষ্ট বিফল হয়নি। তোমায় চেনা সাধু এখন আমার বইয়ের বোকানে কাজ করে। সে এককম পাণ্ডে গেছে। তা তুমি এখন কি করবে?

অভিত কণ্ঠে হরিচরণ বললে—তা তে জানি না বাবু।

—কেন? যা করছিলে তাই করবে। হাছমিসির কাজ।

হরিচরণ বললে—আমার কি আর কেউ কাল বেধে বাবু। আমি যে দাঁড়ী আগানী।

বললাম—ও কথা তুলে যাও। আমি সাধুর মূখে সব শুনেছি। তোমার কাজের ভাবনা হবে না। কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমার এক কনটটির বহু ভাল লোক খুঁজছে। কালই তোমার কাছে আসিয়ে দেব।

আমার কথা শুনে হরিচরণ বোধকরি অভিভূত হল। তারপর হঠাৎ নীচু হয়ে আমার পায়ের ধূলা নিয়ে অশ্রুতে কি বললে বুঝতে পারলাম না।

হরিচরণ চলে গেল। আমি বাড়ী এলাম। বাবে বাবে এই লোকটির কথা মনে পড়তে লাগল। যে ঘটনাটি ঘটেছিল এবং যার সাহসুর্ধিক কাহিনী আমি পরে জেনেছিলাম তা নীচে উপস্থাপিত করে দিলাম। হরিচরণ লোকটিকে আমি অনেকদিন খেঁচেই জানি। তার আগেকার জীবনের কথা সে একদিন আমার অকপটে বলেছিল।

দাবান্ট এক হাছমিসি। কিন্তু সেই নগণা হাছমিটির মধ্যে মানবতার কী অনির্বচনীয় প্রকাশ ঘটেছিল। কাহিনীটি এবার বলি।

চকোতির হোটেলের মাটিকোটার উপরের ঘরবানিতে বসে সন্ধ্যার পর হরিচরণ একমনে তার কতুখার হেঁচা হাতটা সেলাই করছিল, এমন সময় সাধু এসে তার পাশে বসে বলল—কি হচ্ছে হরি ?

হরিচরণ তেলের কুপিটা একপাশে দিয়ারে রেখে সাধুর নিকটে চেয়ে একটু হেসে বলল—ভাল মাল্লেবের সত্ত বসলি যে এসে, টাকা চাই বোধহয়, আমার আর নেই ।

এমনি করে অনেকবার সাধু টাকা চাইতেই হরি তাকে শান্ত বলে বিরোডে—তার নেই, কিছু শেষ পর্যন্ত সাধু তার কাছ থেকে প্রত্যেক বারই কিছু না কিছু আদায় করেছে । সেজন্য তার কথার সাধু উল্লাহ না হারিয়ে বলল—দুটো টাকা না হলে চলছে না, বন্ধ লোকেরা সব বসে রয়েছে । আমি কাল বাবুদের বাড়ির হোজর পেয়েই তোমার টাকা শুধে দেব ।

তবে তো ফিজিল আজ চ'মাল ধরে । বলে উঠে দিয়ে তার ভাড়া তোমার থেকে দুটো টাকা এনে সাধুর হাতে দিয়ে হরিচরণ গভীর গলায় বলল—তোমার অনেকবার বলেছি সাধু আজও বলছি—এমনি করে বর লুকে মিলে টাকাগুলো বরবাহ করা ঘোটেই ভাল নয় ! এই নিয়ে আমার কাছে তোমার বংশগা টাকা বার হয়েছে । আমি না মিলে তুমি হুত অস্ত্র লোকের কাছ থেকে ধার করবে । দিন দিন তুমি কি হস্ত ; ছিঃ ।

বন্ধুর কাছ থেকে এরকম স্নেহের ভঙ্গিমা আজ নতুন নয় । সাধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল । হঠাৎ অত্যন্ত ভয় করত—তার কঠোর শুষ্ক চরিত্রের ক্ষত্র ।

সাধু এবং হরির মধ্যে বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন । দুজনেই গ্রামসিঙ্গির কাল করত এবং এক সঙ্গে থাকত । চ'মাল আপে হরিচরণ এখন বড়বাবুদের বাড়ি কাজে লাগে, শুধন সেইখানে নিরীহ ভাল মাল্লেব অগুই সাধুর সঙ্গে আসাশ হয় ।

প্রথম প্রথম সাধু হরিচরণের একান্ত বাধ্য ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ তার অন্ত বন্ধু ছুটল, সহরের অলংকা প্রলোভনের কাল তাকে ঘিরে ধরল, অন্তর্য ত্রিভি বাপন চলতে লাগল । হরিচরণ কিন্তু আপের সত্ত তেমনি কাছ স্নেহে সন্ধ্যার পর নিজের ঘরটিতে বসে থাকত, কখনো বা পেলাট কহত ; কখনো বা একখানা পতছির খিচোরী সজীত হুহ করে পড়ত, কখনো বা মাটিরের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিত । হাটীর লোকটিও পেট ঘরটিতে থাকত, মধ্যে হুতখানেক কাঠের পাটিগান বেজা । লোকটা যেখন লজা তেমন তোপা, ঠাপানি কান্দিতে জীর্ণ । সহরের লুহন মজা, অলংকা আবেদ্য-প্রমোদ হেলার ত্যাপ করে কেমন করে হরিচরণ এমন নিবিড়ার থাকতে পারে তা সাধু এবং তার অন্তর্য বন্ধুত্বের কাছে খুবই বিস্ময়ের বিষয় ছিল ।

হরিচরণের জীবনের প্রথম অধ্যায়টা লংক্ষেণ এই—কোন এক বড় লোকের চার তলার ডিসের ছায়ে গ্রামে কাল করতে করতে হরিহ বাপ এখন হঠাৎ পা শিছলিয়ে হাতার পড়ে সারা দেল তখন হরির বয়স পাঁচবছর ।

নিরাশ্রয় হয়ে পথে খুততে খুততে কলকাতার রাস্তার ধারে বসে একটা গরমার হোকামের কাঁচের পো কেবের দিকে বিক্ষারিত চোখে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল সে ; এমন সময় একটা বগাভরষী এসে তার কাঁধের উপর প্রচণ্ড একটা ঠাঁকানি দিয়ে বলল : —এই হুই বাও— ।

কাঁহুনি থেকে পড়ে খাবার লুহন ওবার থেকে একজন অপরিচিত লোক তাকে ধরে ফেলে বলল—কি রকম—ছোকরা যে, এমন ধী করে দাঁড়িয়ে থাকে । তারপর পথের একপাশে নিয়ে গিয়ে তার আপাহবসক বেশার পর লোকটি হঠাৎকৈ-কিহেল কবল—কোকেকে আসছ, কোবার থাক ?

হরি তার জীবনের কাহিনী বুচার কথায় জানাল।

লোকটি তখন বলল—আমাদের কাছে থাকবে ?—আজ্ঞা, তবে চল আমরা বকে।

হরি আশ্চর্য গেল। তারপর কলকাতার আধারভলির বিশেষ একটা মলে ভর্তি হয়ে বছরখানেক তার শিক্ষাবিধি করে কেটে গেল।

থরা পড়ল প্রথম দিনেই, জুয়ে ! বোকারের লোক ছাড়ল না, পানার নিয়ে গেল।

মাস তিনেক পর চরি বখন ছেল থেকে বেরিয়ে এসে তখন লম্বা তাকে চেনা যায় না, মুখের পে কখনীয়া আয় নেই, চোখের কোলে কালি পরে গেছে, সমস্ত শরীরটায় একটা দৃষ্টিভঙ্গি।

অনেক সন্ধ্যার পর সে একটা বিশেষ শরীর লোটেলেস বানসারীর কাঁচ গেল। পুরোনো বহুত্যা যাওয়া আশা হুক করল—হরিচরণ তাৎপরে আছানো লাড়া মিলেনা, প্রতিজ্ঞা করল—আরও পথে যাবেনা।

মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন পুলিশ এলে তাকে ধরে নিয়ে গেল। বিচারে জানল—সে নাকি একটি বড় লনের প্রধান পাণ্ডা। এবার ছুবছর।

বছর বেড়েইক পরে এক অস্বাভাবিক ঘটনা সন্ধ্যার হরিচরণ বখন তার নিজের গ্রামে এসে পৌঁছল তখন কেউই তাকে চিনতে পারল না। বেড়ন্তলা উঁচু কাঁচাঘরের পাঁচিল টপকাতে গিয়ে সেট বো তার পা দুটকে গিছল সে বাধা এখনো সাধেনি। সেটকর খুঁড়িয়ে চলতে চর। তার উপর তার লাড়ি গোক সেগে তড়াক যেন মূলসবনের মত দেখতে লাগে। হরিচরণ শিতা-দিতামহের প্রিয় গ্রামবাসির শব্দের উপর দিয়ে চলতে লাগল। পথের পাশে ছোট ছোট পাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে, পায়ে চলার যে পথটি লুক্ক মার্চের উপর আঁকা-বীকা লক দড়ির মত পড়েছিল—তা আজ বহু মর-মারীর চলার ফলে প্রসারিত হয়ে গড়েছে; তাদের কোঠার পশ্চিমে চান্দাচাদের বড় পালানের পিছনে যে প্রকাণ্ড পুষ্করটিময় বড় বড় পদ্ম ফুটে থাকত—আজ তার উপর কিলের একটা প্রকাণ্ড কারখানা তার চিরনি দিয়ে ক্রমাগত বোঁরা ছাড়েছে। দীর্ঘ বার বছরের পরিবর্তন হরিচরণের চোখে আজ যেন বড় অস্বস্তি হয়ে দেখা দিল—যেসকি চার শেলিকেই আজ মজুন দূর।

বুঝে গ্রামের পাঠশালাটি কিন্তু আজও তেমনই আছে, আজও ওর উজ্জ্বল প্রাঙ্গণে শিশু ও মাছের আনন্দ গুঞ্জন শোনা যায়। দারনের মাঠে ছেলের বল কুটোয়টি কবে থেলা করছে। তাদের মুখে পবিত্র হাসি, চোখে তারের শিশু হাস্য স্নায়তা। শিশুদের কলকণ্ঠে দীর্ঘ প্রাঙ্গণ মূরতি হয়ে উঠেছে।

হরিচরণ সেইখানে দাঁড়িয়ে বসল। হঠাৎ তার অন্তর কি এক বিচিহ্ন রসে আঘাত হয়ে উঠল; সেই প্রথম তার কঠোর প্রকৃতির যে কোমল অহুত্বিত্তি খুঁজিয়েছিল—হঠাৎ তারো মধ্যে উঠে মনের মধ্যে কীপন জাগিয়ে জ্বলল। না, আর সে জীবনটাকে এমন করে বরখাষ হতে দেবেনা, সে হীন নয়, নীচ নয়—তবে প্রাণের মধ্যে কেন এ আতঙ্ক ? এখন থেকে সে আর কাউকে ভর করে চলবে না, সে মাছুব, মাছুয়ের মধ্যে মাছুয়ের মত হয়ে সে বাঁচতে চায়।

পরেরদিন সকালে হরিচরণ কলকাতার এসে রাধমিথির কাছে লেগে গেল। প্রথম দিন কাজ সেরে রোজ নিয়ে সে বখন তার মার্কোঠার ফিরে এল তখন গাটুনির বেদনা লম্বাও তেতরে বাইরে সে একটি দৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করতে লাগল।

দিন গনেনো পরের কথা।

সেদিন সন্ধ্যার পর হরিচরণ অন্ধকারে মত্তবড়ে কাঠের সিঁড়ি ঘেরে উপরে উঠেছে, এখন লম্বা তারের

করের মধ্যে দুজন সাহেবের জোর পলায় কথা শুনে খবকে ধড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই আনতে পারল উত্তর পলায় অন্তর্যাম মঠারের। ঠাপাতে ঠাপাতে মঠার বলছে নিশ্চয় কেউ আমার গ্যাটাটা খুলে টাকাটা নিয়েছে, না হলে কি হাত পা হয়ে উড়ে গেল, বিল, বিল টাকা, ব্যা! এ ঘরে যে দুজন থাকে। নিশ্চয় তাদের মধ্যে একজন নিয়েছে, কাণড়ের খলির ভেতর পুরে গ্যাটারার লব তলায় টাকা রেখেছি—বাইরের লোক কে নেবে? এ সম্বন্ধি লোকের কথা—

এবার কথা বলল চকোতি, সবাইকে তো মিথেন করা হল কিন্তু—

ঘড়নত করে মঠার বলল—বানী, ওহা কেউ নেয়নি, নিয়েছে এদের দুজনের মধ্যে কেউ, আমার ঐ মিটিমিটে সাধুটাকে লম্বের হয়; আপনায় সামনে আমি গুয়ের বাজ বিছানি সার্জ করব।

চকোতি একবার মুক্ত আপনিত করল—বনি না পাওয়া যায় তাহলে ওহা কিন্তু—

ততক্ষণে মঠার ঘরের ভিন্মনত তোলপাড় করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

বাইরে পড়িয়ে হরিচরণ প্রমায় গুণল—বনি টাকা বেহিয়ে পড়ে! সাধুকে সে আত্মকাল মিছেই লম্বের করতে আরম্ভ করেছিল।

হঠাৎ মঠার চীৎকার করে উঠল—এই যে আমার টাকার বলি, উঃ! বেখেছেন কি পরতান—বলেছি বেটা মিটিমিটে সাধু, পাভা চোর। রেখুন রেখুন, মোটে ৭৭ টাকা রয়েছে,—ব্যা, হুড়ি টাকার তেতর—

এমন সময়ে দিড়ির নীচে সাধুর আবার সাভা পাওয়া গেল।

ঘরের ভেতর চকোতি তখন ধোঁয়া পলায় গর্জন করছে—আমার এখানে এরকম চোর কখনো দাশ করেনি, এখনি ভাকছি পুলিশ, বাছাধন যুগু বেখেছেন—চেনেন না শর্মা, মজাটী একবার—

দুহুতকাল চিন্তা করে হরি হঠাৎ বাক্স টেলে ঘরের ভেতর ঢুক পড়ল। হঠাৎ তাকে বেখে দু'জনেই খবকে গেল। হরি বলল—মিছে আপনায় সাহুকে গাল মিচ্ছেন, আমি টাকাটা নিয়ে সাধুর বাসে রেখেছি, হুড়ি টাকা ছিল, ৭৭ টাকা আমি পরচ করেছি, ও আর আমি হিতে পাওব না; আপনাদের ইচ্ছে হয় পুলিশ জালুন, আমি পালাব না, কেবল সাধুকে দুটো কথা বলে দাব: এট যে—

তার কথা শেষ হতে না হতেই সাধু ঘরে ঢুকল। শেষে সবে হরি তাকে জোর করে নিজের দিকে টেনে এনে চুপি চুপি বলল—চুপ। একটি কথাও বলবি না। তারপর মঠার আর চকোতির দিকে ফিরে বলল—আপনায় বাইরে যান। তার নেই, আমি পালাবো না।

এই বলে সে ঘরজার দিকে হাত বাড়াল। মঠার একবার কটনট করে হরির দিকে তাকিয়ে চকোতির লম্ব বেহিয়ে গেল।

মঠারের উগ্রমুখি দেখে সাধু বুঝতে কিছু বাকি ছিলনা। সে পাণ্ডুপুণ কাঠের ঘরের উপর বলে পড়ল। হরি তার হাত ধরে তাকে টেনে ফুলে বলল—শোন, আমি লব বুঝছি। বা করছে—তার নামা হচ্ছে—ছটি মাস, শুধু তাই নয়—যারা একবার যার পরে তাদের বারবার যেতে হয়। বাই হোক, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি লব ঘোষ নিজের বাড়ি নিয়েছি।

এতক্ষণে সাধু আলল ব্যাপার বুঝতে গেলে কেঁবে কেলল—কিন্তু তুমি আমার জন্তে—

হরি হেসে বলল—তা হোক! ও আমার খুব অভ্যাস আছে, তুমি জান না—আমি দুবার খুঁজে এসেছি; একবার ভিন্মান, একবার বেধ বহর। ও আমার লম্ব পেছে।

সাবু অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

হরি বলল—আমার ক্ষেত্র ঘঃখ কোরো না। শুধু মাকালীর নাম নিয়ে লগ্ন করো ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কখনো করবে না।

অক্ষরকণ্ড কঠে সাবু লগ্ন করল।

হরি বলল—কৈশো না সাবু—ঐ ওরা পুণিণ নিয়ে আসছে,—সিঁড়িতে পারের লক্ষ হচ্ছে, চুপচাপ, ওরা তোমায় অবধি লক্ষ্য করতে পারে।

লগ্নে বরষা খুলে গেল। চক্ৰোত্তি আর মাকালীর পিছনে তিনজন সাহারাওলাব লকে একজন ইন্সপেক্টার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

হরিচরণ এগিয়ে এসে হেসে বলল—এতগুলো লোককে কষ্ট দেবার দরকার ছিলনা মাকালীর মশায়। একজন আগলেই হোত।

এই বলে যে সাহারাওলাটায় হাতে হাতকড়ি ছিল তাব দিকে হরিচরণ নিজের হাত চুখানো বাড়িয়ে দিল।

ইংরাজী সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রচনাকার চার্লস ল্যাভ বক্তৃতা দিচ্ছেন।

হঠাৎ একজন লম্বোরে পিস দিয়ে উঠল।

বক্তৃতা বানিয়ে ল্যাভ কিছুক্ষণ চুপ করে গাড়িতে রইলেন, তারপর বললেন, আমি বক্তৃতা বানি 'বিস্ হিন্স' লব করে মাস্তুবিন জাতেরগ্রাণী—লাগ, রাজহংসী আর নিবোধ।

বিনি পিস দিয়েছেন তিনি কি অল্পগ্রহ পূর্বক এগিয়ে আসবেন যাতে আমরা তাঁর পরিচরটা জানতে পারি।

চেতনা

মৌজাবারী চন্দ্রাপাণ্য

ঘটনাটা ঘটলে চোখের লামনেট।

অপ্রত্যাশিত অদৃষ্টপূর্ব। রান—ভামতাড়া, কাল—এপ্রিল মাস বিকেল প্রায় পৌনে চারটে।

চলেছিলাম নিতের গ্রামে। মনে আমার অগ্রজ ও আমার স্ত্রী।

ভামতাড়া থেকে আমার গ্রাম প্রায় ২৫-২ কিলোমিটারের পথ।

আমার হাঙ্গা এসেছেন হানবাস থেকে আর আমার সান্নী-স্ত্রী পাটনা থেকে। রক্তাশ্রের ছোট বাস। প্রচণ্ড ডিঙ। বাসটাতে কোন রকমে তিরিশজনকে বসানো চলে কিন্তু চারটে বাঁকতে না বাঁকতেই তিরিশের ভাগবায় পল্লিঘর উঠে পড়লো।

হাঙ্গা আগেই এসেছিলেন তাই আমাদের ভেত্রে দুটা সীট আগে থেকেই বসল ক'রে রেখেছিলেন। এই ভেত্রেই এত ভিড়ও আমরা বসবায় হুযোগটুই পেরেছি।

পাড়ির ভেতরে ভাগ্য কল। ছাউটা এত নীচ যে একজন লম্বা গোছের লোকের সোম্বা হ'য়ে গাভানোও চলে না। তার উপর কাঁচো হাতে বাঁপড়ের বৌচকা, কাঁচো বসলে কোটের হলি হত্যাযজ্ঞ, কাঁচো হাতে চাউ। হত্ ধরে একভাবে গাভাতে না পেরে কেউ কেউ আবার পাশে উপবিষ্ট লোকগুলির মাথার উপর দিয়ে হুঁকে পড়ে বাঁপড়ের জানলার রড্ ধরে কোমরের বাধা লাথব করতে বসবান হয়েছে।

ফলে সওয়া চারটে বাঁকলো। পনেরো মিনিট সেট হওয়া সত্ত্বেও বাস ছাড়বার কোন লক্ষণ দেখা চারটের মধ্যে কিন্তু লকলেরই টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

ছাউচারের পাশে বসেছিল একটি যুবক। ঐ সীটটা অধিকার নিয়ে অকস্মাৎ কণ্ঠাচারের সঙ্গে বচসা শুরু হয়ে গেল। ঐ সীটটা নাকি দুজনের ভেত্রে আগে থেকেই রিকার্ডত রাখা হয়েছে। যুবকটি একথা মানতে রাজি নয়। তার বক্তব্য ঐ সীটটা যে সার্বজনীন রাখা হয়েছে তার প্রমাণ কই? সীটের উপর কোন কোলিও ব্যাগ, কাবল বা টুপি বা ঐ ধরনের কোন চিহ্ন তো সেখানে ছিল না, তাহলে কণ্ঠাচারের কথা মেনে নেওয়া বাধে কেমন ক'রে? তা ছাড়া প্রথম বসন সে ঐ সীটে এসে বসলো তখনই কেন তাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়নি। এখন বসন সে একবার বসেছে তখন আর সে উঠতে পারে না।

কণ্ঠাচারও জানিয়ে দিল যে তাহলে পাড়িই ছাড়বে না। যুবকটা বললো যে সে তো দুটো সীটই অধিকার করছে না। বাঁকে ঘোরা কথ সে একটা সীটে অন্যায়সে বসতে পারে। অত সীটটা সে ছাড়বে না অত অত সীটের যদি ব্যবস্থা হয় তো সে ছেড়ে দিতে রাজি আছে। কিন্তু কণ্ঠাচার যুবকটিকে যদি অত

একটা নীট দিতে পারে তো সে লোকটিই তো। দেখানে বলতে পারে—যুবককেই ডাউডারের পাশের নীট ছেড়ে দিতে হবে তার কী যাবে!

বিতর্ক প্রায় কলহে তপাধরিত হবার উপক্রম করলো। ডাউডার ও কণ্ঠাঙ্কির উত্তকর্ষে ঘোষণা করলো। আর আর গাড়ি যাবেনা। যুবকও পোনাতে চাকলো না। একজন লোকের ভুলে বহি এতগুলি লোক এখানে আটকা পড়ে তো গাঢ়ক। তাছাড়া সে যাত্রীটই বা কোথায়? ডাউডারের সমস্ত বাস ডাউডার কথা। সাজে চারটে অনেকজন বেতে গেছে অথচ তার টিকির দর্শন পাওয়া গেল না। বাসটা যেন সে ভ্রমলোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বাসটাকে সময়ে না বেতে দেখাও কী অপকার তার?

কণ্ঠাঙ্কির কথা ভেসে এলো, বড়বাবু এসে তবে বাস চাঙতে। এতকনে অস্ত্রাঙ্গ ব্যক্তিগত প্রতিবাদ করলো। এ তো বেশ ছদ্মস্ব। বড়বাবু বহি হুকটা পরে আসে তো বাসও কি হুকটা পরে চাঙবে নাকি? একজনকে ভুলে আনাবের এতগুলি লোক কষ্টভোগ করবে? বাস থেকে মাঝতেই সন্ধ্যা হবে হুতরাং বাড়ি পৌঁছতে রাত হবেই। লক্ষ্যে যেখানে আছে, বাছাড়া আছে। এ কী রকমের ব্যবস্থা মশায়!

যুবকটি এতকনে যেন উৎসাহ পেল। সে কথ উঠলো। পাঙ্কির চালক ও কণ্ঠাঙ্কির উদ্দেশে বলতে লাগলো: গাড়ি বহি অবিলম্বে না ছাড়ে তো সকল যাত্রীই গাড়ি থেকে নেমে যাবে। টিকিটের দাম কেবল নিয়ে ওরা বা বৃশি করুক। এরপর সোনারহুতি যাত্রীদের অহুরোধ জানালো নেমে যেতে। জন-সাধারণের ইচ্ছা বা বাহীর কাছে এদের চমকিতকরণ চলতে পারে? পণ্ডতয়ের মূল এরকম খেজাচাণ্ডিতা লক্ষ্য করবেনা কি কেউ? তারপর সকলকে মিনতি জানালো:—চলুন, নেমে পড়ুন দয়াই।

ও দাবা, বাহুন না?

কণ্ঠাঙ্কির বাস্তব ধাঁড়িয়েছিল। বলে উঠলো: আপনি নীটটা ছেড়ে দিলেই আমবা গাড়ি ডাশাই।

এবার যুবক টেচিয়ে উঠলো; শুধু আমি নয় সব যাত্রীই এবার নীট বালি করে দেবে। বাহুন না ভাই, দরকার হলে আমরা আগু তড়া করবো।

হু'একজন যাত্রী যুব-চাণ্ডা চাওরি করলো কিন্তু উঠবার ভুলে বিশেষ আগ্রহ দেখালো না। নীট ছেড়ে দিলে বহি পরে আর জায়গা না পাওয়া যায়? যুবকের অহুরোধে কয়েকজন অবন্ত নেমে গেল। বারো থাকলো তাইবের হু'একজন প্রায় করলো; নেমে যেতে তো বলছেন, কীপের ভড়া কে দেবে তনি?

যুবকটা বললো: আমি দেব। আপনাদের পৌছে দেওয়ার বাসিন্দা আমবার। আহুন।

বেগতিক বেখে কণ্ঠাঙ্কির ও চালক না পাতা।

যাত্রী নয়—এমন হু'একজন লখচারী বললো। ওরা বাণের মালিককে খবর দিতে গেছে। আর সেই বড় বাবুকেও তাকতে লোক গাড়িয়েছে।

সে না এসে কি আর বাস ছাড়বে!

পাঁচটা ঘাঘতে প্রায় হশমিনিট। একজন গোলগাল মথর চেহারার লোককে বাসের দিকে আসতে দেখা গেল। কী হয়েছে, ঘাণার কী ইত্যাদি হুতরা করতে করতে তিনি যুবকের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। সব কথা শুনে তিনি ব্যক্তিগতী ধাত বার করে অধাক হবার ডাণ করলেন। বললেন; বেশ দাবা তো এরা ভুলে এত বাণাধারি; তর্কাতর্কি।

আরে দাবা, একটা কথা তো জানুন—এই বাস্তব এই একটমাত্র বাসই চলাচল করে। একবার বাসটি ছেড়ে দিলে বাহুন তো ঐ ভ্রমলোকটির অবস্থাটা কী রকম হবে! সে বেচারা বাড়ি বেতে পারবেনা,

সামান্যই তাকে এখানেই পড়ে থাকতে হবে। আগনি নিজেকে একটু তার ভারসার্য বশির্বে দেখুন না তা'হলেই বাগটা সেটে ছাড়বার প্রস্তাব হেঁতুটা আগনি উপলব্ধি করতে পারবেন।

কথাগুলো সব যাত্রীরা হৈঁ হৈঁ করে উঠলো। এমন কি আমার হাঙ্গাও বেশ বিয়ত হয়ে উঠলেন। সকলের উক্ত বিবৃত কর্তৃপক্ষ শোনে : এ আর কোন বিশিষ্ট ! লোকটীর ঘর ঠিক সময়ে কাঁচ না হয়ে থাকে তো তাকে অবশ্যই পড়ে থাকতে হবে কিংবা তিনি জীপ বা মোটর তাক করে বাড়ি ফিরবেন। তারপরে এতগুলি প্রাণী কেন অহবিধা ভোগ করবে ? সে ভ্রমলোক কি জানেন না যে বাস ছাড়ে চারটের ? এই বৃত্তি নিরমাহবৃত্তি ? অস্ত্রপ্রবেশ হলে একজন বাসের চালক এবং কণ্ট্রোলার বেতের অধি আর অটুট থাকতো না।

আগন্তক বললেন : আপনারা শুধু শুধু চটছেন। অস্ত্রের অহবিধার কথাটা বুঝতে চাইছেন না। অস্ত্র যেনের লোক নিজস্বই এটা বুঝতো। কে কেন বলে উঠলো ; বৃত্তিরে হিত বাসখানার আশ্রয় দিয়ে। আর ঐ চালক এবং কণ্ট্রোলারের গলার গামছা দিয়ে সকলের সামনে টেনে এনে কথা দিকা কজাতো।

এবার লোকটীর গলার হর একটু বেন মোলায়েম হল।

বললো : তা অস্ত্রার হলে একবার কেন হনবার কথা চাইতো—কিন্তু—

দুইকটি বললো, এর মধ্যে কিছু নেই মশার। আপনাদের কণ্ট্রোলার কেন আমার নেমে যেতে বসেছেন ? সে সকলের কাছে মাগ না চাইলে আমার কেউ এ গাফিলতে চকুঝো না।

বহরজাতি ভ্রমলোক বললেন :—গ্রাণ করছেন কেন ? কণ্ট্রোলারকে আমি বহরকে দিচ্ছি আপনাদের উঠে বহর। এছবি বাগ ছাড়বে।……আর বাবুও এই এলেন বলে। ওকে ভাঙতে লোক চলে গেছে অনেকক্ষণ। এখন সকলে আমার বাসে চড়ে বসলো। দুইকটি আমার ভাইভারের পাশের নীটেই বসলো। বললো :—বাবু এসে আমার অহরোর করলে তখন চেবে যেখানে তাকে আরগাটা ছেড়ে দিতে পারবে কিনা।

বিশিষ্ট চুপে পড়েই কবিত বাবু এলেন। সকলেই বেললেন :—

বাবুটী অপর কেউ মন থাকি পোষাক পরিহিত বহর : খানার পুলিশ ইন্সপেক্টর। সুচিন আমলের ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহা প্রভাণাধিত প্যারোপার কথা মনে পড়লো। তখন নাকি লোকে 'তুমি বারোণা হও' বলে আশীর্বাদ করতো। উক্তিটির মধ্যে পৌরব বা বর্গাধার নামগতক ছিল না। ছিল দুর্ভক্তকারী নিপীড়ন করতার ইতিহাস। জীবনে স্বপ্ন স্বাক্ষর্য সাক্ষ্য কিছু আপত্তো সে কথাচার ও অগাধতার পথ অহরয়ণ করেই। আর এই বাবুটিকে বেগে মনে হয় বেশ তো স্বাধীন হয়েছো হুচি বহর আপে। এম মধ্যে কত পরিবর্তন এসেছে বেশে, শিক্ষিতের হার বেড়েছে, বলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিল্পোন্নতির ফলে উৎপাদন বেড়েছে, বাড়ি বাড়ি নগর বেড়েছে কিন্তু শূন্যতা নিরমাহবৃত্তিতার দিক দিয়ে আমার কোথায় পড়ে আছি ? সর্বাচার সাধুতা ইত্যাদি বহর বৃত্তি আমাদের বাড়লো কোথায় ? বেশকে বারো পড়বে, স্টাইলকে বহর করে সংগে চালনা করবে, শিল্পকে পালন করবে, জনসাধারণের সামনে ন্যূনিকার দুইটুকু বহরবে সে কি আমাদের ঐ বহরবাহুর হল ? এমটি কি হবে আমাদের পরিভূত ? এই বহরবাহুরের পদাক অহরয়ণ করেই কি আমাদের উত্তরপুলকরা হবে বহরী ?

• পত্র নং :

মুসাফির

মল্লিক্‌জাদার যক্ষোপাখ্যাত

“অনেক দিনই কাম করছি বাবুজী, বহোৎ বেগমের পোশাক।”

মরলা গাছাটা আরেকবার কপালে খাড়ে বুলিয়ে নিয়ে কাঁধে কেসতে কেসতে বললে, মুসাফির সিং হাসল।

জ্যেষ্ঠের চড়া রোজ। কলকাতার আকাশ শিউ মলে উঠেছে। রাতের ওপরই আমার বলাবাহ বহ, রবিবার, ছুটির দিন, খোলা দরজার চম্‌ চম্‌ বলে গলজ আলফাটের দিকে ডাকিয়ে ছিলুম অলস চোখে, করি করি ক’রেও বরজাটা বন্ধ করা হচ্ছিল না—এমনি সময় সামনে দিয়ে যেতে যেতে মুসাফির আমার বেখে বেখে গেল।

খালি বাড়ির হাতল মাটিতে মাঘিয়ে গেলে পা-পা ক’রে বরজার সামনে এগিয়ে এসে খিখাওয়াতাবে বললে, বাবুজী, খোঁড়া পানি দিলাবেন? বহোৎ তিরাশ—

“নিশ্চয়ই পাওয়াবে,” বলে আমি বললুম, “এসো, ভেতরে ঢলে এসো।”

একটু ইতস্ততঃ করছিল ঘরের ভিতর ঢুকতে। বোম্বের ডাবছিল, বুলি মূগুরিত ক্যাবিনের জ্বলে। সমস্ত পা আর ঘাম-শুশ্ণে ছেঁড়া জামা নিয়ে ‘বাবুলোকে’র বৈঠকখানায় প্রবেশ করাটা ঠিক হবে কি না। আমি আবারও বলার সন্দেহে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল।

একশানে একটা ছোট কার্টের বেকি ছিল, সেটিকে বেধিয়ে বললুম, “ব’সো।”

আমার এই কথাটা কিছু ও শুনলে না কিছুই হেঁটে। দু’তিনবার বলতেও নহ। জৌকঠি খেবেই বলে গড়ল মাটিতে। কাঁধ থেকে মরলা গাছাটা নিয়ে ঘূষ, গলা, খাড় আর ডট হাতের ঘাম মুছল।

“ভূমি এখানে একটু ছায়ায় ঠাণ্ডা হয়ে নাও,” আমি বললুম, “বোম্বের ডাব থেকে এসেই ভাল খাওয়াটা বাগান। যদিগনি হয়ে হাছব বারা পর্যন্ত যায়।”

লোকটি আমার চেনা। রিস্তা চালায়, ওতেই রজি-হোজগার। আমাদের সকলটাতেই ওকে বেধা যায় বেশি। বরষ হয়েছে বেশ, কুড়া বললেও কিছু কুল হয় না। সে তুলনার কিছু খেতে শক্ত সমর্থ। মাঝার কবরজাট তুল আগাগোড়া লাধা, খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, তারও পেই হা, চৌকোপা চোয়াল হাড়-জাপা, গায়ের হা কালো, মাঝার মাঝারিকরম উঁচু এই হাছবটির দিকশর আমি অনেকবারই চোখেছি। অবন্ত মেহাৎ বাধা না’ হলে আমি টানা-রিকশার উঠি না, এই বেমন হরত তিন যিনের বাগার একসঙ্গে ক’রে আলমু কোমফি (অডট) জরি হু’বাতে বয়ে আনা সম্ভব নয়। কিংবা—বখনকার কথা বলছি তখন আমি কলকাতা থেকে হাইল পণ্ডি দূরের এক কলমে অধ্যাপক, তেলী প্যাসেজারী কবি, দকাল সাড়ে

সাতটার মধ্যে খেয়ে বেরে বেরিয়ে যায়, কলেক্ট ফেরত। সন্ধ্যার সময় প্রাইভেট টিউশন দেয়ে বাড়ি কিয়—
সাবানি বেধে বসলে পর রাত পড়ি। মাথা বন্ধন শরীরাটা প্রায় অচল, বাস থেকে নেমে বাড়ির পাঁচন বন্ধ
পড়িই পারি হবার ভয়ে রিকশা নিতেই হয়, তখন এরাই রিকশার কতবার উঠেছি। কাজেই মাহুগটিকে
চিনতুম, ও-ও চিনত আমাকে। মাথা কান ছিন না এখানে, তাই ওকে একটু ঠাণ্ডা হাতে বলে সিকেন
করতুম, “নাম কী তোমার?”

জবাব দিলে, “জী বাবু, মুশাকির সিং বাবু।”

“বাড়ি কোথায় তোমার, বাসে বেশ?”

উত্তর গ্রহণের একটা তেলার নাম করলে মুশাকির।

“অতদূর থেকে তুমি এই কলকাতায় এলেছ রিকশা চালাতে?”

“নাথ তো নেহি, অন্তত দিন ই তাহা করছি বাবুজী। বহোৎ বেখলম।” ময়লা দামছাটা
আরেকবার খাড়ে কপালে জ্বিরে নিয়ে কীবে রাখতে রাখতে ও বললে।

মায়তপণ্ডা গ্রামের ছেলে মুশাকির আড্ডে গোশালা—পক খোদ ছুঁ ঘি ছানা নিয়ে কারবার ছিল
ওর বাবার। মুশাকির যখন বেহাংই ছোট, তখন ওর মা ওকে সকালবেলা খাইয়ে হাঁটবে রাখালবেশ
পরিঃ বিড়—অল্প বেগে রাখাল ছিল মাইনে করা, তারের সঙ্গে পক-মোষ চরাতে যেতে ভালবাসত ছেলে।
বেশ বেগে বেলেই কাটছিল দিন, মুশাকির আরেকটু বড় হয়েছে, তখন একদিন হল কী, ঘটায় এক গো-মড়কে
জ্বের লবকটা পক-মোষ বেশ মাগড় হয়ে—দুইটি লোকসান, পথে বনার অবস্থা। রোমজারের গ্রামান
খুঁটিটা এইভাবে নাড়া খেয়েছে ওর বাবার খালগল খুব এক পেে আঘাত লাগলে উঠতে পারলে না
শেষ পর্যন্ত। রাখালগ ছেলে নিয়ে মুশাকিরের মা বিববা হল। জাতিপন্থা ও পেতেই ছিল বোধহয়,
হাবর অব্যবহা বা কিছু ছিল, চলন্ততো করে আশ্রয়ান করলে সব, রাতায় এসে ঠাণ্ডাল মারে-পোয়ে।

আমার এককণ্ঠে খেচাল হল, তুফার্ট হুঁই এসেছিল, বল তো বেওয়া হরনি খেবো। শুধু বকিয়েই
যাচ্ছি বেজারীকে। বলতুম, “বাঁদো, তোমার ভাল মানি।” ভিতরে গিয়ে একখটি অল, আর কয়েকটা
বাঁতারা ছিল, তাই এনে খেতে চিন্তা ওকে। আলগোচে চল খেতে চারনা, ওতে নাকি জোটা এঁটো হয়ে
যাবে, পেটা ওর উজ্জ্বল—অজলি পেতে বলল, “যদি তাইতে ভাল চলে দিতে লাগলুম, ও খেতে লাগল
তো তো করে।” বটি শেষ চলে বললুম, “আর আনব বল?” পরিতৃপ্তিহত একটা লব ক’রে মুশাকির
বললে, “না বাবুজী আর হরকার নেই।” গাঘড়া দিয়ে হাত ঘুঁ মুছল।

আমার মনে তখন ওর কথা পোনবার ভগ্নে কোঁড়ুল—বলতুম, “তুমি কি আরেকটু বলবে, তোমার
কথা জনতে খুব ভাল লাগতে আমার, বা বোদ্ধ বাইবে, অবজ তোমার বোমজারের ক্ষতি হয় যদি তাহলে
আটকে রাখতে চাই না”—তখন রাতায় দিকে একবার তাকাল মুশাকির, একবার রিকশার দিকে—
অবর হাফসীতল আবহাওয়া বোধহয় একটা আবেশের সৃষ্টি করলে ওর মনে—একটু বেন ইতস্তত ক’রেই
বললে, “না বাবুজী, লুকনান আর কী—”

“ভবে বনো তোমার কথা,” আমিও বো পেয়ে গেলুম।

“এলাহাবায়ে মা এল আমার নিয়ে। ছেলেকে মাহুগ ক’রে তেলিবার দার একলা মা’রই, আমার
তো বোমজার করবার বরই নয় তখন। কোথা থেকে কী দুটো দিকে কাক বোমজার ক’রে নিলে মা।
তাছাড়া আর বাড়ি ওর বাড়ি ক’তোর ছোলা তেড়ে ছাড় ক’রে বেওয়া। কি অতদূর তেড়ে ভাল বানানো—এসব
কি’খোও কিছু পয়সা আনত। একটা শাপনার ঘরে কোনরকমে মা’বা ভঁকে থাকতুম দু’কনে।”

“তারপর ?”

ঈশাবেই কাটে বছর তিন চার। কোনওকমে দিন গুজরান। তের বছর বয়স ছেলের বয়স তখন হঠাৎ তিনদিনের অরে খাওয়া খেল মুশাকিরের না। অস্তের পথে মুশাকির তখন থেকে একা থাকে।

মুশাকির নামটা জীবনের শূন্যে মিলে গেলে সেই বয়স থেকেই, তের বছরের নিরাক্ষর অসহায় বাসক হল জীবন-পথিক। শুক হল চেপে চলার পান। টুকটাক পাত এক-আধটা কখনো মেলে, কখনো মেলে না, তার করে জায়া মজুরিও পায় না। টাঁকে পরণা বইল তো বাওয়া হল, কিংবা নেতায় বহি কেউ ভেঁকে দুটো তুটি কি একটা সকাই ফিলে। অথবা মিলে গেল কোনও ধরমশালা, তো দুটো একটা দিন সেখানে অস্থিভে বাওয়া-খাওয়া চলল। কোনদিন অল খেয়ে পানি পেট ভটি করত।

এইভাবে ভাগতে ভাগতে ভাগলপুরে এসে পৌছবার দিন-পাঁচেক পরে এক বৃষ্টি ভরসোক তাকে পথ থেকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। “বড় ভালখারস ছিলেন পাণ্ডেজী,” মুশাকির বললে, “কী যেখলেন তিনি আমার মধ্যে জানিনা, কিন্তু তাঁর কাছে অশ্রয় মিলল কিছুদিনের। একটি মেয়ে ছাড়া—তা সেও বড়বাকিতে—সাদারে আর কেউ কোথাও ছিল না তাঁর, বশাক খাতার করতেন, তাই থেকে আশ্রয়ও গুটি হয়ে বেত দুবেলা।”

এও বেশিদিন কিন্তু সইল না বরাতের। করেচটা মাস খাবার পর হঠাৎ একদিন খবর এল, পাণ্ডেজীর জামাইটি সারা গেছে—বিধবা মেয়ে বাশের কাছে ফিরে এল ক’দিন পরেই। বয়সে মুশাকিরেরই প্রায় সমবয়সী, এক-আধ বছরের ছোট বড়োয়, বাতুল গড়ন, কন্দী হস্তী। পাণ্ডেজী মুশাকিরকে আড়ালে ভেঁকে বললেন, ‘আমার গুণাগুণ তো ভেগুচই বাবা, একমাত্র মেয়ে, তার মলিব যে এমন হবে তা কে জানত। তা ওকে তো এখন রাখতেই হবে নিজের কাছে, আর ঐ বয়স, বুঝতেই তো পারছ, সাদারের মধ্যে বাস—তোমাকে আর তো বাবা আমি রাখতে পারব না।’

অতএব আবার ভেঁরাভাও তুলতে হল।

ভাগলপুর থেকে বহিরা। করলার খনিতে কাজ গেলে মুশাকির। সাঝাটা ছিল মোহাম্মদ মত, ঘাটতে পায়ত খুব। থাকার একটা আত্মনিও বিলেছিল বাওয়ায়।

এইখানেই ওর মনে রং বয়াল লছমিরা।

“লছমিরা কে ?” জিজ্ঞেস করলুম আমি।

বিহারের দেহাতী মেয়ে, এইটুই কেবল জানত মুশাকির। কী ওর পূর্ব পরিচয়, কী জাত, নিজের লোক বলতে সাদারে কে-আছে না আছে, কী ক’রে কেন এল করলারখনির কামিনের কাছে—কিছুই জানত না, জানতে চায়ওনি কখনো। প্রাপবন্দ্যে উজ্জল টপ-ধরে এই মেয়েটিকে প্রথম থেকেই নলরে ঘরেছিল। যেমন চালিপুনি তেমনি আবার হঠাৎ হঠাৎ লজীর হয়ে যায়। রসনার এই মিটে গল, এই লজার খাঁর। অটুট খাবা আর ভরা বৌমন বেহের কানায় কানায়, পরিশ্রম করার কবিতা অপরিসীম, পাল-পয়রে নাচপানেও জুড়ি নেই বেন।

“আর—অদ্যাবধি ডেজী মেয়ে,” বললে মুশাকির, “আদলারমজান ছিল বড়।” কোলিয়ারিও এলেকার কেউ কোনদিন লছমিরাও বেচালগিরি করতে যেখনি। অশ্রুস্রব থেকে আরও ক’রে সাধারণ স্মিরবহু—কাউকে কোনদিন সূত হাত বাড়াতে যেখনি দেই মেয়ে—জানত, কিভাবে নিজের মধ্যা নিজের কব-জার মধ্যে রাখতে হয়।

"কলকাতা শহরে এতদিন রিকশ চালাচ্ছি, কিন্তু সে রকম সহজ সরল অথচ তেজী বেয়ে পথেঘাটে বেশি বেশিরা বাবুজী।"

"কতদিন তুমি এখানে রিকশ চালাচ্ছ, মুশাক্কির?"

"তা বহোৎ দিন হল। আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন এই শহরে এত লোকজন, পাতিখোঁড়া আমো-বাড়ি,—এসব ছিলনা কিছু। আরগার আরগার কোপকড়, অমন, থানা, পল্লী, পুহুর ছিল, বিদ্যালয়ের বেড়াও সজ্জার পর। কলকাতা তো আমার চোখের সামনে পড়ে উঠল, বেড়ে উঠল। আমারেই বেশোয়াসীরা বিহারীরা আজ এখানে এত, দেখিনি ছিল অনেক কম, আরাই হত কোন কারণে বেশ কেঁকে ছিটকে এসে পড়েছে হয়ত। সেইরকম দুটায় জনকে দেখা যেত।"

একটু থেমে বললে, "আমি যখন রিকশ চালাতে আরম্ভ করি তখন পথঘাট দিক-বিদিক ভালরকম জানা ছিল না, কী মুশকিলেই যে পড়তে হত অনেক সময়। তখন চার আনা পরশা দিলে তামাম কলকাতা রিকশার ঘোরা বেত।"

"রিকশ চালান কাজটা কেনই লাগে তোমার?"

"কাজটা বেহনতী তবে হৈ, বেহনৎ না করলে পরশা বেবে কে বাবুজী এই ভনিয়ায়? তা আমার বেহনতী বাবুজ, বেহনৎকে ডর করি না, করলে চলেও না।"

"রিকশর যে মালিক তার সঙ্গে তোমার পরসার বঝাবত কিরকম?"

"দিন দুটোকা মালিকের ঘরে ভরা দিতে হয়। বাকি বা তাকু গাই সওয়ারীকেই কাছ থেকে, সেটা সবটাই আমার।"

"কত হয় দৈনিক?"

"তার ঝিক নেই। কোনদিন আড়াই টাকা, কোনদিন তিন, এক দিন হয়ত চার টাকাই লাভ হয়ে পেল। তবে সে খুব একটা বেশি কিছু নয়।"

"কেন, তুমি তো একা বাবুজ, তোমার আর খরচ কত?"

"একা মাত্র, কিছু জিনিসপত্রের দান কী হচ্ছে দিন দিন, বলুন বাবুজী! দিন আনি, দিন বাই, তাতেই দুরিয়ে যায় সব। আগেকার দিনে তিন পরশার এক বেলার ভরণেট খাওয়া হত, আর আর?..... আমার কথা বলা দিন, আর বেশির রিকশাওয়ালারা আছে, বাবের বেশখরে ছেলেমেয়ে পরিবার আছে, বড়টা পার হোজগারের চেষ্টা করতে হয় তাহলে বাধ্য হয়ে।"

আমি এবার রিজেক করলুম, "আজ্ঞা মুশাক্কির, তুমি তো কত কায়াগার বাও, কত রকমের লওয়ারী নাও, কত কী ঘটনাও বেশ মিস্তরী। তারই দু'একটা গল্প শোনাও না।"

মুশাক্কির বলে, "কী হৈ, ঠা কান্দে বহোৎ বেবা ভি, ভনা ভি বহোৎ। উল্লেখ শিবা হয়। কী, ইয়ে দুনিয়া ছায়া এক চিত্তিরাখনা, বিসমে বহোৎ কিসির চিত্তকে সাধ হরবখত হি মুশাক্কাত হোতা ছায়। সেকিন সবলুহ তো ইয়ার বহতো নেহি ছায়—"

ওকে শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলুম, "সে তো হটেই, সব ঘটনা কি আর মনে থাকে, তবু দুটো একটা বা মনে হয়, বল।"

হুন ক'রে বাক্যে কিছুকণ। তারপর টোটেই কাকে একটু হাসি কোটে। বলে, "একদিন হয়েছে কী, আগনাঘের মাসাঙ্গী সোংকো শাখির দিন সেটা, এবিকে এতট বৃষ্টি হয়ে মাতার এক হাঁটু জল। এক

বা নৈমজ্জর খেতে যাবেন, খুব সাংগোষ করেছেন, জামা-কাপড়-জুতো, উঠলেন আবার গাড়িতে। যে বাড়িতে যাবার কথা, সাঝানো গোছানো, গোপনাটগুলা, লোকজন ভতি, তার নামনেও খুব মল—রিকশার হাতল সিঁড়ির চাতাল তুলে দিয়ে শাঁকো বানিয়ে বিলাস বাসুর জুড়ে। গাড়ির পাহানি থেকে একটা পা গাড়ির হাতলে রেখে অস্ত্র পাটা বেই বাড়িতে যাবেন সিঁড়ির চাতালের বিকে, অমনি পাটা পাটা কী করে যেন গেল হুককে, বাস, রপাং করে সেই কাছাখোলা হাতার জলে—জামাকাপড় গেঁষগোলা হাত, মুখ-মাথা কাছাখলে মাঝামাঝি, হামী জুতো আমসব, শাখা-আগাখোড়া চান করে উঠলেন, আর তাই দেখে নৈমজ্জরবাড়ির হরমার হাসির হররা। আবারও হাসি পেয়ে গেছিল, বাবুকে আর চেনাই যায় না, চেপে ফেললাম হাসিটা। বাবুর লম্বা আর হাগটা দিয়ে পড়ল আমার ওপর, খুব বানিক গালমন্দ—আমি তো পরমা নিয়ে পালিয়ে বাচি।”

মুন্সাকির কল্পনা করে হাসি পেল আমারও।

মুন্সাকির বললে, “গরিব লোকেরা তো হাওয়াবাড়ি কি ট্যাঙ্কি চড়তে পারে না, খুব পরিবর্তন তো নয়ই—এখনও হুঁ-একবার হয়েছে যে, শাবির নতুন বর আমায়ই রিকশার বিয়ে করতে গেছে, বা বিয়ের নতুন কনেকে আনিই আমার গাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি বস্ত্রবাড়ি।”

“আরেকবার হয়েছিল কী, এক খুব মোটা গিরী-বারী মানুষ আমার রিকশা নিলেন। অত মোটা আর পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড শরীর দেখা যায় না বড় একটা। তিনি সীটে উঠে বসতে বসতে আমি মাটি থেকে হাতল তুলে নিয়েছি, ততহাওয়া বোধ হয় টাল সাহসাতে না পেরেই শিখন বিকে ঢলে পড়লেন ঐ পতর নিয়ে, একিকে আচম্ভা শিখনে তার পড়ার আমার হাত থেকে হাতলটা কলকে গিয়ে আমার মাথায় কাঁছে লাগিয়ে উঠছে। আরেকটু হলই হয়ত তিনি ডালগোল পাকিয়ে ভিগবাড়ি গেয়ে পড়তেন উলটোদিক দিয়ে রাস্তায়—ভাগ্যিস আমার ভাগ্য ছিল মোহাব মত, তাই কোনমতে লাফিয়ে উঠে হাতল চেপে বীচু করে সে বাজা রকে করি।”

আবার একটু চুপ করে থেকে বললে, “কতকমই যে লোক আছে দুনিয়ায়—একদিন খুব সকালে বেগিয়েছি গাড়ি নিয়ে, ডাল করে লোকচলাচল আরম্ভ হয়নি তখনো হাতার, একটা পার্কের সামনে যেখা পুঁটলিমত কী একটা বেন নড়ছে। কাঁছে গিয়ে যেখা, ঐই এতটুকু একটা বাজা বাবুজী—মাছবের বাজা—চোখ লোটেনি তখনো, কাপড় জড়ান, পড়ে হাত-পা ছুঁতছে। বানিকটা ঘুরে যে থানা ছিল, সেখানে গিয়ে জানালায় বাপারটা। থানার লোক এসে বেবল, ভুল, আমাকে বানিকটা লগুলায় ধরাব করে ছেড়ে দিলে। বাজাটার কী হল শেষ পর্যন্ত তা আর জানতে পারিনি।”

কিছুক্ষণ চুপ করে বইলুম আমিও। তারপর কথাটা মনে পড়তে বললুম, “আজ্ঞা, মুন্সাকির, কল্পনাখনির সেই লছমিয়া বলে কোন মেয়ের কথা বলছিলে, তার কী হল?”

মুন্সাকির একবার আমার বিকে তাকাল, তারপর বাইরের বিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্তবনভের মত হয়ে গেল। বেশি অপেক্ষা করতে হল না, ও নিজেই আয়ে আয়ে বলে গেল ওর মনের মাহুনের কথা।

হ্যাঁ, ওরা দুজনে পরস্পরের মনের মাহুণই হয়েছিল—উভয় প্রবেশের ভাষা লগুলায় মুন্সাকির সিংহাস আর বিহারের সরল তেজী মনের বেয়ে লছমিয়া। মনে রাখার কথাটা টের গেতে দুজনে কারোই বেগি হয়নি। লছমিয়ার কীভাবে যে পুঙ্খ প্রথম অভ্যর্থনা ও প্রথম পেল, সে হল মুন্সাকির। দরদ-এর আগে কোনো বেখেছে সে, কিন্তু ঐ প্রথম তার মনে হল—হ্যাঁ, এ হল সব-সে দরদ—সবদিক থেকে। বুঝতে

পারলে সে, পুরুষের কাছ থেকে তার নিজেকে বাঁচিয়ে চলার পালা আত এই বিশেষ পুরুষটির কাছেই এসে শেষ হয়ে গেছে। এখিকে মৃণালিনীও অসুস্থত্ব করছে যে, এ হল এমন মেয়ে যার কাছে নিঃসংশয় আশ্রয় নেওয়া চলে, যে তার ভবজ্বর জীবনটার আনতে পারে সিদ্ধতা, ফিরতা, যাকে দিয়ে মিটে যে তার মনের চাহিয়া। অতীত ইতিহাসে প্রয়োজন নেই মৃণালিনীর, সে ভুলে বহি ঠকতে হয় ভবিষ্যতে, ঠকতে সে রাজি।

না, ঠকে নি সে। ঠকে নি লছমিরাও। বিয়ে করেছিল ওরা, দুই হয়েছিল। বিশ্বাস দৃঢ় ছিল : এ দু'মিলন আত্মীয় স্বাক্ষরে আটুট।

“ভারপর ১”

একটা কীৰ্ত্তিখান চাপতে গিয়েও পারলে না প্রায়-বৃদ্ধ মৃণালিনী।

“হঠাৎ না বাবুজী। অত বৃদ্ধ সইল না বরাত্তে। ঐ সন্নিধ্যা, ঐ কল্যাণিনি, ওরাই একদিন এনে দিয়েছিল লছমিরাকে আমার জীবনে, হেসেছিল হাচারেরা হোশনাই। আমার ওরাই একদিন সরিয়ে নিয়ে গেল সেই হোশনাই, কেড়ে নিলে আমার লছমিরাকে।”

খনির গল্পের একটা দুর্ঘটনা। কোনও একটা ঘরে কোনও একটা বিভাগে করণ্যর ছাঁহ পাঁসে পড়েছিল পনের কুট। আরো অনেকের সঙ্গে সেখানে তখন কাজ করছিল লছমিরা। অল্প চোরকনের সঙ্গে চাপা পড়ল সে, আর উঠে এল না।

কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবু অসুস্থত্বভাবে বলল, “ভারপর ১”

সুঁতানে অগর খাঙতে পায়লম না বাবুজী। আপনার মনকে বললম—চল্ মৃণালিনী বাছ পাঠায়া। নোকরি ছোড়কে বেরিয়ে পড়লম।”

আতে আতে উঠে পাড়াল মৃণালিনী সিং যাব্ব।

বাইরে তখন হোসপাইপে ক’রে রাখার জল বিচ্ছে কর্পোবেশনের লোক।

“কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। অবিস্মরণীয় দিন। কংগ্রেসের নবজগলাভ।

নাহেবী পোষাকে লামনের আসনে আর নেই রাজনীতি বিলাসী হল। তার পরিবর্তে জলধর পরিহিত রাজনৈতিক কর্মীর হল।

ভাষা আত ইংরাজী নয়...বেশী...প্রত্যয় নয়, নিবেশন। কঠোর কর্ণের ও ত্যাগের মর। আত বলহবোণ আবেশন। ভয়কে মর করার সফল আয়োজন।

অম্ব...বিবাহ...কবির কলহরীণ হুনিরমিত আশ্ববর্ধন।

বাক্স আত কঠকমর পথে...কাতাধারে নৃতন জাতিয় ভিত্তি...মহাবিশ্ব হুংকের হল... নেতা এক কলী।

অধিবেশন আতে জগদ্বরলাল মহাশয়াজীর সঙ্গে চললেন বিহার পথবাড়ী এক মহাপুরুষের কর্পনে। হস্তিদাল যোষ তখন শেষ পথ্যায়। পথ্যায় পাশে দিয়ে বললেন দু’জনে। অত্যাচল পথবাড়ী বৃদ্ধ সাংবাদিক হস্তক স্পর্শ করে মহাশয়াজীকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, আত আশায় পরম শান্তি। আমি চলেছি এমন এক ঘেঁষে যেখানে নেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।”

রামপ্রসাদের সাধনা

সারদারজন পণ্ডিত

আম থেকে গ্রাম আড়াইশ' বছর আগে বাংলা ১১২৯ সালে হালিশহর গ্রামে এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবগোষ্ঠে সাদিক কবি রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।

এই বাঙ্গালদেশ তত্ত্বসাধনার শীর্ষস্থান। এদেশ চক্ষু ও কানীর দেশ। চক্ষু ও কানী এই দুই যেশ-কেশীকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সৌন্দর্য ও ভাবুকতার মার্ফু প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে শাক্ত-শ্রীতি বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ণ সম্পদ। প্রলাহ পদাবলী শাক্ত-সাহিত্যের মহামণি।

শ্রীগ্রন্থক পদমহাসংকেত রামপ্রসাদী গান খুব ভালবাসতেন। হৃদয়েগরে তিনি ১২ বছর ধরে যে কঠোর সাধনা করেছিলেন, তখন ও তার পরেও তিনি রামপ্রসাদের গান মধুর হুগে গাইতেন। আগন্তুক ভক্তগণ সেই গান শুনে মুগ্ধ হত।

বাংলাকাল থেকেই রামপ্রসাদ সাধনার রাসো জুবে গিয়েছিলেন। সেই সময় সাধকশ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক প্রধান আশমবাগিন হালিশহরে আসেন। রামপ্রসাদ তাঁর সঙ্গে নির্মমে একদিন দেখা করলেন। রামপ্রসাদকে দেখে আশমবাগিন হৃৎপলেন এ সাধাত্ত হানব নয়। সাধকের সমস্ত লক্ষণ এর মধ্যে প্রকাশিত। সাধন বিষয়ক নানা উপদেশ তিনি রামপ্রসাদকে দিলেন। তারপর থেকে প্রলাহ তাত্ত্বিক সাধনার মর হলেন।

কিছু তাঁর এ সাধনা ছিল গিঠিহ। সরলভাবে তিনি মাকে ডাকতেন, মায়ের কাছে আশ্বার করতেন আর প্রাণের ভক্তি ভালগাণা মাকে নিবেদন করতেন। তাঁর এ ডাক গানের সুবের ডাক, যে ডাক আজও বাংলাদেশ সারবে হৃৎ পবে ধ্বংগে। মাংবের মাংব গান বটনার তিনি এখনই ময় থাকতেন যে, সাধারণ জনতের বাস্তব জ্ঞান তাঁর একেবারেই থাকত না। তাঁর মন তখন চলে যেত লগায়ের লক্ষীর্ষ সীমানা পেরিয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর প্রদেশে।

চাকরি করতে গিয়ে হিগাবৈধ খাতার রামপ্রসাদ গান লিখলেন—

আমার হাও মা তুলিলায়ী

আমি নিমকহারাম নই শকরী।

গানটির বেবে লাইন হচ্ছে—'আমি বিনা মাহিনার চাকর, তোমার চরণ মূলার অবিকারী' প্রলাহের রনিত খাতার এই গানটি বেবে বিনেব করে শেষের লাইনটি পড়ে ভক্তিরসে সঞ্চারিত হয়ে কাঁধতে লাগলেন। বেবে তিনি প্রলাহের মাসিক ডাটার বসোবত্ত করে উচ্চ হালিশহরে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, 'আগনি নিশ্চিত যনে সেখানে গিয়ে সাধনা করন। জগজ্ঞানবীর অভিজ্ঞার সিদ্ধ হোক।'

বাড়ি এসে মনের আনবে মায়ের মায় গানে রামপ্রসাদ জুবে গেলেন। সে গান বাংলার আকাশ-বাতাসকে মাহিত করতে লাগল।

হামগ্রসাহ পল্লীর ঘরে পাড়িয়ে গান গাইছেন, পল্লীথেকে নৌকারোহীরা নৌকা ধামিয়ে তাঁর গান শুনছে। এককম ঘটনা প্রায়ই হত। এইভাবে নৌকারোহণে নবযৌগ অধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একদিন নৌকা ধামিতে হামগ্রসাহের গান শুনলেন। তারপর তাঁকে আমন্ত্রণ জানানলেন নবযৌগ দ্বার। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বুকেছিলেন, এই হামগ্রসাহকে দিয়ে বাংলার শক্তি সাধনার, বিশেষ করে হাটু-সাধনার পথ প্রদর্শন হবে। তাই তিনি প্রদাহকে একশত বিধা বিধর ভূমি দিয়ে সাংসারিক চুক্তিগার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন।

হামগ্রসাহের সফল অভাব দূর হল। তিনি বুঝলেন মহারাচার কৃপাতেইই সব সম্ভব হয়েছে। মনের আনন্দে তিনি হাটু এনে বসালেন তাঁর ছবরের সিংহাসনে। আর আনন্দে নাচতে নাচতে গাইলেন :

‘ভুব বেরে মন কালী বলে।’

ছবর সমুদ্রে ভুবে দ্বারার ভরে তিনি কৃতসম্বর হলেন।

সাধারণ দ্বারব বুকতে পারে না কেনন করে দ্বারের সাধনা করতে হয়। শুণু এইটুকু জানে তাঁর কন্তে নানা আত্মোজন উপচার প্রয়োজন। হামগ্রসাহ বললেন, কিছু দরকার নেই। ছেলে মাকে ভক্তিবে, তাঁর আবার আত্মোজন উপচার কি? তাঁকে প্রাণ ভরে ভাকলেই সব পাওয়া যায়, সব আকাঙ্ক্ষা মিটে যায়।

তাই বাঙালীর চিরচুগর পল্লীর দ্বার করে যেরে গেলেন তাঁর প্রসাধ-শ্রুতিমালা। যে মালা দুই পতাধী পার হয়ে গেছে কিন্তু আলগও আম্রাধের কঠে উজ্জল অঙ্গান হয়ে রয়েছে।

তু কি শক্তি সাধনা, প্রসাধের গানে রয়েছে অজের হাটুনাথের উদাত্ত আঙ্গান, যাতে বাঙালীকে আলো তক্তিমলে দলীবিভ করে রেগেছে। তিনি বলেছিলেন—বড় গভীরভাবে বলেছিলেন—‘এবার মা আমি তোমার দ্বার।’ অর্থাৎ মা তোমার আত্মর করব।

হামগ্রসাহের ভোটিভির প্রকাশ আর তাঁর নির্গুচ হল প্রজ্ঞার রয়েছে হামগ্রসাহের গানে। তাঁর গানই হাটু-সাধনার স্রোতর অবলম্বন, বাঙালীর হাটুগতর অপূর্ণ সম্পদ।

বাংলার সাধক কবি ও সিদ্ধ পুরুষ শ্রীহামগ্রসাহের আবির্ভাবের পর বাঙালীর শক্তি সাধনার এক নতুন যুগের প্রবর্তন হল। তিনি যে অভিব্যক্তি শাক্তপরাধলী রচনা করিলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার ভূমনা নাই। জগজ্ঞানীর চরণ আলয় করিয়া শ্রীহামগ্রসাহ যে তু সফল ভা-ভাবনায়ে অভিক্রম করিয়াছেন তাহা নহে। পার্থিব জননীর কাছে আম্রাধ যেমন আম্রাধ করি, অভিমান করি, শ্রীহামগ্রসাহ তেমনি বিভিন্ন সম্পর্কের দ্বারা দ্বিঃ আনন্দবর্ধী সত্ত্ব লীলা করিয়াছেন।

নাট্যমঞ্চ

সংস্কৃত

“বাংলার রঙ্গালয়ে সত্যিকারের বাংলা নাটক খুব কমই অভিনীত হয়। আজ যখন জাতি আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বেগিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আত্ম-পরিচয় লাভের প্রয়োজন কি উপস্থিত হয় নাই? আজও কি চলিবে কেবলই বাতাসে স্বপন বপন? শুধুই ভাব-বিলাস? আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাহীন অধুরাগের অভিনয়? চাই এমন নাট্যকার যিনি নাটকের ভিত্তর দিয়া সত্যিকারের বাঙ্গালীর, সর্বকালের বাঙ্গালীর নানা রূপ ফুটিয়া ফলাইয়া ধরিবার প্রয়াস পাইবেন। চাই এমন নাটক বাহার পাত্র-পাত্রীরা চোঁহারা বাঙ্গালী, বেশে বাঙ্গালী, ভাষায় বাঙ্গালী, ভাজিয়ার বাঙ্গালী দেখিলেই মনে হয় একান্ত আপনাত্মক।”

মুদ্রণালয় সমাপ্তি

নাট্য চিন্তা

নাট্যের ইতিহাস

শায়ের প্রণেতা। অনেক বলেন, মহি ভরতের প্রকৃত নাম ভরত নর, তাঁর কার্য কারণের পরিচয় থেকে এই নামের উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে The Dramatic History of the world-এ লেখা হয়েছে—

Bharata, some say, is not the name of the man. What his real name is, is not known for certain. Bharata consists of three syllables—Bha—Ra—Ta. Bha stands for Bhava, which is gesticulation, Ra stands for Raga which is vocal music, Ta stands for Tala, which is keeping time by means of symbols. These are known as Bharata.

মহি ভরতের পর পানিনিতে শিলালী ও কণাথ নামে দুজন নাট্যকারের নাম পাওয়া যায়। খ্রীঃপূঃ ৩-২ নারায়ণের গ্রন্থে উল্লেখ আছে। পাণ্ডুরের অভ্যাসকালে বিরাট রাক্ষসের প্রাণে উত্তর ও

দেবগণ ইন্দ্রকর্তৃক অহঙ্কর হয়ে গমনোনিবন্ধা তাঁর তপ্ত-বিধানের সঙ্গে চতুর্বেদ যুক্ত করে নাটক প্রণয়ন করেন, সেজন্যে নাটকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। পুরাকালে মহি ভরত কর্তৃক নাট্যকলা যত্নসহকারে প্রচারিত হয়, তিনিই নাট্য-

অন্তান্ত রাজকুমারদের এবং সেই পক্ষে উত্তরা ও পুরাকনাদের নাট্যাভিনয় দেখাবার জন্যে চত্বরলাভেপ অস্থানকে আদরা দেখতে পাই। হরিদ্রপেও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। গ্রাম্যস্থ পহাভারত থেকে অনেক নাটকের সম্ভব হয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় নাটকের বথেষ্ট আদর ও বিকাশ দেখা দেখা যায়।

পাকাতো ইতালির অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে গীতিনাট্যের যতনা দেখা যায় বোলো সভ্যতায়। এই জনপদের সঙ্গীতজ্ঞ ও অভিনয়কলাবিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিদ্যে করলেন, শুধু পান না করে তার মনে যদি কথাবার্তা অর্থাৎ সংলাপ ছোড়া যায় এবং হাবভাব ও অভিনয় পহকারে যদি সেই সংলাপ বলা যায় তাহলে তা বর্ণক বা শোভারের কাছে আরও ভাল লাগবে। এই ভাবেই ফ্লোরেন্সে গ্রন্থর অপেক্ষার স্রষ্টি হয় ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে।

জীবনী ও স্মৃতিকথা

শিশিরকুমারের উপাধি বর্জনের
মেম্বার কাহিনী

["আমি যেতাম চাইনা, রাজসম্মান চাইনা, আমি চাই জাতীয় বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠা। আমি মনে করি বঙ্গালয় ও নাট্যাভিনয় একটা জাতির সভ্যতার ও অগ্রগতির ধারক ও বাহক। এই জাতীয় সম্পদের প্রতি আদরের সন্তোষের কোনদিনই কোন মহাত্ম্যবৃত্তির ডাব দেখা যায়নি। সেটা শুধু আদর নয়, অনেকেরই কোডের কারণ হয়েছে। আদরকে যেভাবে বেওয়ার বদলে জাতীয় সন্তোষ যদি একটি জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন করার কাজে ত্রুতী হয়, সেই হবে আমার স্রেষ্ঠ দার্বিকতা। "]

পদ্মকুমার উপাধির প্রাপ্তিগতের উত্তরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ডাঃ সন্তোষকে যে পত্র লিখেছিলেন তার মোক্ষ কথা উপরে লেখা হ'ল। তবুও না হলেও এই কথাগুলিই সেই পত্রে ছিল।

নাট্যকার ভাষ্কর্য্যের মুখোপাধ্যায় সেই হয়ে যে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন আদর জানি, তা প্রাচীনিক। আজকের দিনে সেই তথ্যটুকু পরিবেশন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে ইতিপূর্বে এই পত্রিকার ভাষ্কর্য্যের মুখোপাধ্যায়ের শিশিরকুমার সাক্ষাৎ লেখাটি পাঠকের স্থনী করেছিল।

হাতী ভারত সরকার প্রতিবন্ধক দেশের স্ত্রী, হাতী ও স্ত্রী সন্তানদের মানাভাবে জীবিত করেন। শিশির বাপকে তাঁরা সে বছর 'পদ্মকুমার' করলেন। সাংবাদিকের দেখান শিশিরবাবু সে-কুমার বর্জন করেছেন। বঙ্গদেশের শিশিরবাবুকে দেখতে যেতুম। সেই সন্তোষ দীর্ঘ করেকদিন বহিনি। তাই কুমারদের বহরটি তাঁর বিশ্বের মুখে না পেয়েই কুমার-বর্জনের বহরটি সাংবাদিকের দেখলুম। তিনি যে এরকম সরকারী কুমার যেনে না বহর, তবুও, সন্তোষের বহরটিকে জানবার আগ্রহে সেদিন চলে গেলাম তাঁর বাড়িতে।

জর তুকেই বললুম, "বহরটা কাগজে রেখে সন্তোষ জানবার কৌতুহল হ্রাস করতে পারলুম না। তাই—"

হেসে বললেন, "এখনা সরকারকে প্রত্যাখ্যান পত্রখানি পাঠাইনি। টাইপ করা হয়েছে। ভোমারের দেখাবো কয়েকজনকে। নিম্নই পাঠিয়ে দেবো।"

যে বসেছিলেন তাঁর জাতি-জাতি। গিরীশনাথ, ডাঃ অনিকারী, এবং আরও একজন পুরোনা বড়।

সকলেই পত্রখানি বেগতে চাইলেন।

পত্রখানি জনৈকজন নিজে এলেন। শিশিরবাবু নিজেই সেখানি পড়লেন। যে-যে মুক্তি পড়ে ছিলো তার স্বার্থতা অনস্বীকার্য। সত্তার ক্রিয়ামাত্র করে অনুগ্রহ হওয়াও স্বাভাবিক। তাতে পাওয়া যায়নি। শিশিরবাবু বরাবরই বর্তমান রাষ্ট্র খুসখুসেই কঠোর সমালোচক। তাঁরা যদি ভালবাসেন, বেশকি ভালবাসেন না বিশ্বাস—এমন কথা শিশিরবাবুকে বরাবরই বলতে শুনেছি।

“নবম্ন আনন্দ দেয়েছি একম্ন সুখখানে”—উত্থানি শিল্পাচার সম্বন্ধে পুতনা পড়ে ছিলো। প্রত্যাখ্যানের কারণ ছিলো। এই যে, সরকারী কলাচর্চের তমার অধায়ে হবার হাশ্ব তিনি নন, বেশ ও জাতি ঠীকে হাধর কলেউে তিনি আনৃত। সরকার বহি তাতীয় নাট্যশালায় হ্রবণোবধ করে জাতিয় নাট্য-সাধনার সাহায্য করেন তপে সেট হাযী প্রতীষ্টান ঠীকে আননিত করণে। এবং সেই সরকারী বনাগ্নতাই শিল্পিবহাবকে বধেই সম্বানিত করণে।

ভাষাতত্ত্বের প্রকাশনার এই বকম লগাই তাকে দিলো। পত্রের একখানে উমা একটু বেশি এসে
 দিয়েছিলো বলে আমায়ের মনে হলো। সেই কথা বলতে, অনিচ্ছা স্বমন করে শিশিরবাহু সেইটুকু ছুঁতে
 লম্বত হলেন।

সংবাদপত্রে এই ভূষণ-বর্জম নিয়ে প্রশংসা যেমন বেধা গিয়েছিলো, তেমনি শিশিরবাবুর এই তেজস্বিতাকে শ্রদ্ধা বলেও সমালোচনা করতে দেখা গেছে কোন কোন চক্রে।

একদা নারি বশিরের হাতে নিজেস্ব বিক্রিয়ে হিলে নহরে তিমিট হাওড়ায় একটি বিয়েটায়ের হস্তাকর্ষ হরে নিজের কৃত্তিষ আঠার আন। কয়ার দুই লোডকে সহজেই বিলগ্ন হিয়ে শিরিরবার্ণ বর্ণাধে বেল-গ্রেমিকের কাছ করেছিলেন। বহি হোঅমহির কথায় তিনি রাতি চতেন তবে তাঁর অনেক হবিবা হতো অর্ধের ব্যাপারে। কিন্তু বাধার বিয়েটায়গুলি ধনীরা হাপুট টিকতে পারতো না। হতোই এতিজানারী হোন শিরিরবার্ণ, তাঁর একার হাতে নাট্যশালা একতরী হয়ে গতি হাওড়াতো অনেকগানি।

বেশক ভালোবাসেন বলে তা তিনি করেন নি। আশুও বেশক ভালোবাসেন বলে তিনি এই সত্যকারী কৃপণ বর্জন করেন। আমাও মনে হয় বেশের কর্তব্যেরই যদি স্বার্থ সেম-প্রেমিক বলে তিনি মনে করতেম তবে এরকম বর্জনী কাজ তাঁকে করতে হতো না। একথা বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হাভিসিং-এ চরম স্বাক্ষর সময় তাঁকে যে আশাও বিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে মনে হয় সেই বেশবন্ধুর মতো বেশমতের হাত থেকে কৃপণ তিনি সাফরে গ্রহণ করতেম।

সংসার সন্ন্যাসী মহলেও পৌছে গেলে। কিছুদিন পরেই তিনি একখানি পত্র দিলেন গড়ে বেথুতে। অত্যন্ত হরীষর তাঁকে লিখেছেন। স্তম্ভ-বর্ণনায় ওও যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে শিশিরবাণ্ডকে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন হাতে এরকম বর্ণনা কাঁচ শিশিরবাণ্ড না করেন।

পরের তিন চতুর্থাংশ শিও ও গুণগ্রাহিতারূপে। সেখানে বীকা কথা আছে। কুবর্ণটি যে রক্তের নাড়ক এখানে, কাজেই সম্মত যে অত্যন্ত সমুদ্র তা তিনি পরের শেষাংশে বিশিষ্টবাক্যে অবশ্য কথিয়ে দিতে ভালেন নি।

‘আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, “পত্রের উত্তর দিয়েছেন?”

“দিয়েছি। না হলে অভ্যস্ততা হবে যে।”

“কী লিখলেন?”

“লিখলুম যে, ‘আমার শরীর অস্থির। এখন সবকথা লেগা লগ্নব নয়। পরে জানাবো।’ অদিক কি—”

“চরৎকার”

“কেন?”

“চাপকা মীতি।”

খুশি অথচ অগ্রহভরে হালি হাসলেন শিশিরবাবু।

দেশের জাতীয়তায় হিন্দুশি শিশিরবাবু জগত অরণ্যে রেখেছিলেন। ঐ অরবিন্দ তিলকের জাতীয় আন্দোলন, কানাই খুসিরাহের আত্মাহুতি, বৈশবন্ধুর স্বয়ং-হাতহা—শিশিরবাবু এসবেরই ভক্ত। পহুবর্তীকালের রাষ্ট্র আন্দোলনের কার্যকারিতা অমনীকার্য বলে জানলেও শিখিৎসাবু অহিংস পন্থার ভক্ত ছিলেন না। স্বাধীন ভারতের ক্রিয়াকলাপকে হীনজরে বেঁধে প্যারভেন না।

শিশিরবাবু ষট্টিস ব্যক্তিবৈ সমাধেয়। তুল যে তিনি করেন নি, তা কে বলবে? তিনি নিজেই নিজেই পর্যালোচনা অনেক করেছেন অস্তরঙ্গ সন্ধানে। কিন্তু স্বা দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়, তা তিনি কখনই স্বীকার করেতেন না বলগেই জানি। কৃষ্ণ-বর্জিত শিশিরবাবুর আলমশ্রী হাততালির লোভে নয়; এ-কাজ তিনি আত্মহনিক পীড়ার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। প্রথম শিশিরকুমারের রত্নমকের আড়ালে আজ নিজে স্বত্বপন্ন সন্ধানী বেশসেবক কতোবারই না রাতি বাপন করেছেন, তার কথা আমি কয়েকবারই তাঁর মুখে শুনেছি।

উদাত্ত হবার পূর্বে শিশিরবাবুর লগ্নে হুজাখল্লের হু'বার সাক্ষাৎ ঘটে। হুজাখল্লই বেধা করেছিলেন। তার কারণ ও সবিচার প্রসঙ্গ এখানে অগ্রাসঙ্গিক।

যুগ-চিন্তা

বাক্সের বাজা

যোজা !! কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাজার নামে বাংলার তথাকথিত

উচ্চতম বাছুরা নাক সিটকেছেন। কিন্তু বাজার ঐতিহ্য যে

কত বড়, দেশের পড়িয়ে এর শিকড় যে কত অজ্ঞেয় সে লম্বা জেট

বিবর্তন সাহস নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তা বাহ্যিক স্বীকার করেছেন। বাজার পূর্ব বিবরণ আমরা কিছু জানি না কলেই হয়। কিন্তু জানা উচিত। সে যুগে ধীরা বহু কষ্ট ও নিগ্রহ ভোগ করে বাজার প্রবর্তন করেছিলেন এবং তারই সাহায্যে দেশের অভিনয়শিল্পের লক্ষ বরজা খুলে দিয়েছিলেন তাঁদের কথা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিবরণ দিয়েছেন প্রখ্যাত বাঙ্গালিরা কষ্টকৃত্য বিজ্ঞাবিনোদ। এই প্রবীন নটের সেবার প্রামাণিকতা লম্বা জেটের কোন অবকাশ নেই। সেখানটি পড়ে অল্পসঙ্কীর্ণ পাঠক আনন্দ পাবেন।

ঐতিহ্যের সুন্দর বৈবরণীয় বাহ্যিক অবলম্বনে রচিত পালাপান অভিনয়রূপে বাজা বা পীতাজিনের

পরিণত হয়। ইনিই সর্বপ্রথম পালার পাঠ পাজৌদিগকে গোষ্ঠাক প'রুজ্জদে লাভাইয়া বাজার আসরে আনিয়া জোতাধের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত করেন। তৎকালের আচার্য্য-বর্গ চম্পনেশ্বরের আশিনায় বাজার আসর করিয়া মহাশত্রু ঐচ্ছিকতঃ বয়ঃ স্ত্রীবেশে হুচিজন শাকী, বর্ষদার, বলয় ও হুপুগাদি পরিয়া মাথায় কৃত্রিম বেণী দাঁদিয়া সমাজে বাচিয়া গাহিয়া কীর্ত্তন ও অভিনয় করেন। ঐচ্ছিকতঃ চরিত্রভাষিতে ইহার উল্লেখ আছে—
 'আচাধ্যায়ের নাম ঐচ্ছনেশ্বর, বীর বরে বেণী ভাগে নাচেন টবরী, এমন কি বিজয়া দশমী উপলক্ষে মহাশত্রু ভক্তবৃন্দকে বানরবাহিনী শাকতিয়া বয়ঃ হুহমান বেণে 'কাঁহারে যাবণ' এবে বীররসের অভিনয় করিতেও হুচিৎ হন নাই। মহাশত্রুর সমসাময়িক রাগ রামানন্দ ও বাজাভিনয় করিতেন। তিনি নিগিফাট চিত্রে হুমায়ী সুবতীকৃপ পরিবৃত্ত অবস্থায় মহলাও আদরে বসিয়া অভিনেত্রীদিগকে কুমিকার পাঠ দ্ব্যভাষ্য দিতেন। হাকী প্রাচ্যশক্ল ও অমাত্য ও পারিষদবর্গ সহ বাজাভিনয় করিতেন। তৎকালে বাজাভিনয়কে দেখা দীলা বলা হইত।

পরবর্তী যুগে সবি ভারতচন্দ্র কিছুটা উন্নত রীতিতে 'বিজয়বর্ষ' নাটক রচনা করিলে বসিক সমাজ তাহাকে অবলম্বনপূর্বক বাজার আদর পরিপূর্ণভাবে পাঠিতে থাকেন। এই সময় কেইলী গ্রামনিবাসী নিমন্তায় অধিকারী প্রচলিত বাজার পৌষ বাজাইয়া ঐচ্ছিক দীপা অবলম্বনে 'কলীয়বর্ষ' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। তাহার পালা 'রুকমাবা' নামে পরিচিতি পায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে জনসাধারণের নাট্যাভিনয় শ্রুতি বাজাভিনয় বর্ণনাই পরিতৃপ্ত হইত। প্রাচীনকালে এই বাজা হইতেই আধুনিক যুগের থিয়েটারের উৎপত্তি। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে বাজার উল্লেখ আছে। হিন্দু রাজত্বের পর মুসলমান যুগ আরম্ভ হইলে তাহারা হিন্দুধর্মের বৈধ পূরণ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থাদি পুড়াইয়া দিতে থাকিলে তখন হইতে শিক্ষিত সমাজের কোন কোন ব্যক্তি কীর্ত্তন প্রভৃতি সন্মতাদিহি ব্যাঘ্র বচনেন। বহুলোক সমবেত করিয়া আমোদ-প্রমোদ উপভোগের সঙ্গে লোকদিক্কার ব্যবস্থা করেন। এখন কেবল বাজাগানের দ্বারা জোতাধিগকে আকৃষ্ট করা হইত। পরে সেই সঙ্গে দুই একটি চরিত্রের সঙ্গী করিয়া পালা দাঁদিয়া তাহাদের সলাপ দ্বাধা কথা ও গীতাভিনয়ের আয়োজন করা হইত। অতঃপর ইহাই 'বাজা' নামে অভিহিত হয়। বহুদিন ধাব্য এই আদর্শেই বাজাগান চলিতে থাকে। কালক্রমে মুসলমান শাসকগণও বাজাভিনয়ের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। হিন্দু রাজাদের আদর্শে মুসলমান ব্যবসায়গণের দ্বাবায়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল এইরূপ ভোজ্য ও সংহার পাওয়া গিয়াছে। ইংরেজ আমলে নব্যযুগের আবর্তনে নাট্যকার, বক্তা ও ব্যবসায়িক মহাপ্রয়গণ প্রাচীনকালের 'বাজাকে' আধুনিক করিয়া ও কালোচিত 'অপেরা' নাম দিয়া বর্ণিত তপাভিত্তিক করেন।

খ্রীঃ ৮-৭৭৭৭ পূর্বে দ্বার্য্যচরণ বক্তাওয়ার এক বাজাবল ছিল, লোকনাথ রাস ঐ বলে বাসক গায়ক ছিল। লোকনাথ জাতিতে সচ্যবী, বাকী ছিল বেনিয়াপুত্র, লোকে তাহাকে 'লোকা বোণা' বলিয়াই ডাকিত। দ্বার্য্যচরণের বৃত্তার পর লোকা বোণা ঐ বলের অধিকারী হয়। 'ঐমন্তের মনান' ও 'নল-বমবতী' এই দুইখানি নাটক ঐ বলে অভিনয় হইত। এই সময় ভবানীপুর কাশ্যাদিগাভার রামকৃষ্ণার কীশোরি বলও যুগ প্রসিদ্ধ ছিল। রামকৃষ্ণার বল 'নল-বম' নাটকের অভিনয় হইত এবং সে অভিনয়ের যুগ সুখ্যাতিও ছিল। নরীয়া কেলার অঙ্গার্ত বৈউলিয়া গ্রাম নিবাসী কালী হালদার ও ভগ হালদারের একটি বল ছিল। ঐ বলে 'নল-বমবতী' ও 'ঐমন্তের মনান' অভিনয় হইত। তৎকালে চাণাডলা নিবাসী নারায়ণচন্দ্র কল্লের একটি বাজাবল ছিল। সেইবলে 'কল্লীই হরণ' 'রাবন-বম' 'প্রলোভ-চরিত্র' ও 'সুজনিত-বম' অভিনয়

হইত। চাঁপাতলায় বেচাবায় চট্টোপাধ্যায়ের একটি হল ছিল; এইখানে প্রায় ঐ সকল নাটকেরই অভিনয় হইত।

দে সময় কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় বীর সুদীপ্ত মল্লিক 'বিদ্যা হুম্মত' বাজার হল খোলেন। পালা লেখেন পিকুলের উদ্ভবচন্দ্র হালদার। দুই বৎসর ধরিয়া মহলায় পর তিন রাজি মাত্র অভিনয় হয় এবং ইহাতে লক্ষ্যবিন্দু টাকায় যায় হয়। তাঁহার বাগানের মাঠে গোপাল উড়ে এই পালায় মালিনী শান্তিয়া ছিল। গোপাল উড়ে ছিলেন উজ্জ্বলা মাধবপুরের অধিপালী। পবিত্রতা বাসো বলিতেছেন ও হাবজাবে সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন। মল্লিক মহাশয় তাঁহাকে ইহল পুরস্কার দ্বন্দ্ব দান করেন। এই বলে দিয়ার কৃষিকার অভিনয় করিতেছেন উদ্দেশ্য বিদ্র, আর হুম্মতের কৃষিকার অভিনয় করিতেছেন জোলানাথ দাস ঘংচানী। জোলানাথ দাসের তিনটি পুত্র। তাঁহাদের মধ্যে মহাম গগন ও কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গকমে বিদ্যা ও হুম্মতের কৃষিকার অভিনয় করিতেছেন। ঐ সময় হগলী জেলার অন্তর্গত ভান্ডারীপাড়া কৃষ্ণনগর নিবাসী বৈষ্ণব গোবিন্দ চন্দ্র দাসের একটি কৃষ্ণ-বাজায় হল ছিল, লোকে তাহাকে গোবিন্দ অধিকারীর হল বলিত; ঐ বলে যান, মাথুর ও কলকল্লভ অভিনয় হইত। ঐ সময় পুর নিবাসী ব্রাহ্মচর্য দাস বৈষ্ণবের একটি বাজায় হল ছিল। ঐ বলে 'প্রভাত-মিলন' 'কল্লভী হরণ' 'হানবৎ' 'নৌকাগও' প্রভৃতি অভিনয় হইত। ঐ বলে হগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর নিবাসী মহিমচন্দ্র আচার্য্য নামে একজন বালক ঐকান্তিক কৃষিকার গান করিত, তাহার কৃষি কৃষি দশ ছিল।

চন্দ্রনগর নিবাসী রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় স্থল মঠারী করিতেছেন, তিনি একটি বাজায় হলের প্রতিষ্ঠা করেন। বাজায় হলের 'জুড়ির' গানের তিনিই স্রষ্টাকর্তা; তাঁহার বলে নাটক অভিনয় হইত— 'দশভক্তিক্ত-গদ্যিনী' 'ক্রম-চরিত্র' 'রামবেদন্য' প্রভৃতি। ভাবপূর্ণ বড় বড় বক্তৃতা ও জুড়ির গান দিয়া তিনিই প্রথম বাজায় পালা রচনা করিতে শুরু করেন। লোকে তাঁহাকে 'রঘন মঠারী' বলিয়া ডাকিত। যেহেতু নিবাসী ভান্ডারী, আতিথে কৈবর্ত, তাঁহার একটি বাজায় হল ছিল; তাঁহার বক্তৃতাকালে সেইসকল তাঁহার ভাষিনের অন্তরচরণ দ্বারা কান করেন। পরে সেইসকল অন্তরচরণ দ্বারা হল নামে খ্যাত হয়। সেইসকলে 'লব-সুন্দর বৃদ্ধ' 'শীতার-বনবাণ' প্রভৃতি অভিনয় হইত। অত্র দ্বারের বক্তৃতার পর তাঁহার জামাতা অম্বর দাস ঐ হল চালাইতে থাকেন।

হগলী জেলার অন্তর্গত মেলেবেড় গাওঁদা গ্রামে বহু মিকা ও লোকে মিকা দুই ভ্রাতার একটি বাজায় হল ছিল। ইহাও আতিথে মূলময়ান। 'ক্রম-চরিত্র', 'লব-সুন্দর বৃদ্ধ', 'কল্লভী হরণ' প্রভৃতি নাটক ঐ বলে বেশ বেশের সহিত অভিনয় হইত।

পরে মতিলাল গায় ও ব্রহ্মমাধব গায়ের দুইটি হলের স্রষ্টি হয়। যখন মঠারকে টেঁকা দেখায় কল্লভ এই দুই বলে বাজায় পালায় আরও বড় বড় বক্তৃতার স্রষ্টি হয় এবং সেইকল্প প্রায় বাহো দটো কাল বাজা গাহনা হইত। পরে হাওড়া জেলার অন্তর্গত কুলেশ্বর নিবাসী অম্বিকার আভ্যন্তর চক্রবর্তীর হলের স্রষ্টি হয়। আভ্যন্তর চক্রবর্তীও গায়ের হমিমোহন প্রায়ের বাজায় হলের পরে হগলী জেলার অন্তর্গত চাঁদকা নিবাসী নবীন ভাট্টারের হলের স্রষ্টি হয়। ঐ হল হইতে কতক লোক ডাকিয়া আসিয়া গগন অঙ্গিলের বাজায় হল হয়। পরে বিধিরপুর নিবাসী নারায়ণচন্দ্র ঘোষ একটি হলের স্রষ্টি করেন। পূর্বেকল্প ব্রহ্মমাধবের হল হইতে বাহুবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলের স্রষ্টি হয়। যশোহর জেলার অন্তর্গত রায়গ্রাম নিবাসী বলিকল্লভ চক্রবর্তী বালক লইয়া নৃত্য দ্বন্দ্বের বাজায় হল স্রষ্টি করেন। এই বালক-দলীত-লজ্জাধারের দ্বন্দ্বই হন্য ছিল। এইসকল হইতে পরে বর্ধমান তট্টাচার্য্যের হলের জন্ম হয়।

স্বর্ঘ্যমান কোলাহল বজ্রবর শাইন ও তক্ত সাতা। পীতাম্বর শাইন উভয়ে তুটী বলের সঙ্গি করেন। পরে পীতাম্বর শাইনের পুত্র জৈলোক্য শাইনের বলের সঙ্গি কর এবং ঐ তিনটি দলই এক সময়ে চলিত। বজ্রবরের দল চটেতে ভঙ্গ্য হাসের বলের সঙ্গি। জৈলোক্য শাইনের দল চটেতে নরোচ্ছ্বাস চক্রবর্তী দল। ঐ দল হটেতে হামিনী ভাগ্যবীর বলের সঙ্গি। অজয়বালের দল হটেতে নীলকান্ত হামের দল, পরে ঐ দল হটেতে মধুরানিধ সাহার বলের সঙ্গি হয়। মধুরানিধ সাহার দল ভানিয়া গেলে উক্তদলের লোক লইয়া "রয়েল বীণাপানি অপেরা"র সঙ্গি হয়। বাহুবল্লভ বন্দোপাধ্যায়ের দল হটেতে প্রচুর ভাগ্যবীর 'সিম্ফিটা নাটা নরাত' এর সঙ্গি, পরে উক্তনাম পরিবর্তন করিয়া "ভাগ্যবী অপেরা" নাম হয়। মদন মাঠিয়ার দল হটেতে মধেন চক্রবর্তী বলের সঙ্গি। মধেন চক্রবর্তীর দল হটেতে পীতরা কোশানী ও রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের বলের দল। রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের দল হটেতে প্রসন্ন নিয়োগীর দল এবং প্রসন্ন নিয়োগীর দল হটেতে বর্তমান গণেশ অপেরা শাটীর সঙ্গি।

অজয় হামের বলের কয়েকজন লোক এবং অজয় বলের লোক লইয়া শক্তি অধিকারী বলের সঙ্গি হয়। শক্তি অধিকারীর দল হটেতে কতকগুলি লোক লইয়া সত্যাবর চট্টোপাধ্যায়ের দল এবং সত্যাবরের দল হটেতে শব্দ অপেরার সঙ্গি। মতি রায়ের বলের কতক ভানিয়া নৌকুণ্ড বলের সঙ্গি হয় ঐ দল হটেতে অজয় চক্রবর্তীর দল এবং ভদ্র চক্রবর্তীর দল হটেতে সত্যচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের রামকৃষ্ণ নাট্য-সমিতির সঙ্গি হয়। সত্যচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের দল উঠিয়া গেলে উক্ত দলের হামবর্তী লোক লইয়া 'আধ্য-অপেরার' সঙ্গি হয়। শক্তিচন্দ্র হামবর্তীর 'শক্তি অপেরা-শাটী' 'হরিশচ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রিয়োদ্য অপেরা-শাটী' বজ্রবর হামের 'বজ্র অপেরা শাটী' ও হুবল্লভ বন্দোপাধ্যায়ের 'বীণাপানি নাট্য সমাজ' প্রভৃতি আরও কয়েকটি সম্মানার্থের সঙ্গি হয়। মধ্যে অনেকগুলি মেয়ে বাজারবলেরও সঙ্গি হয়; তাহাতে সীলোকের কুমিরা সীলোকেই অভিনয় করিত। তন্মধ্যে জৈলোক্য হামবর্তীর দলই বহুদিন চলিয়াছিল। ইহা ব্যতীত পূর্ববঙ্গের কয়েকটি বিখ্যাত বাজারবলের নামও শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নট কোশানীর বলের নামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

নব নব রূপে

গতকালের নামা অভিনয়

"শেষ নৈই" নতুন চং-এ লেখা রোমাঞ্চ নাট্য প্রচেষ্টা। বাবুকেতুকের বধ্য দিবে আধুনিক সমাজের যে চিত্র এই নাটকে উপস্থাপিত তা পতীর জীবনবোধের পরিচায়ক। এই নাটকটিই সেদিন শিল্পীদের সভার অভিনয় করলেন। প্রথম অভিনয় রজনীতে পূর্ণ প্রভৃতির অভাব সত্ত্বেও নাটকটি দর্শকদের প্রভুত আনন্দ দান করে। নাট্যপরিচালক অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় সেখান বিশেষ প্রসংগে হাবী করতে পারেন। অভিনয়ে, অরবিন্দ দ্বাদশপ্র, পরিদল খর, অমল নাগ, সত্য শেঠ, চিত্ত বন্দোপাধ্যায়, শীলাঙ্গী চট্টোপাধ্যায় ও নাট্য পরিচালক অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় চরিত্রাঙ্গ অভিনয় করে নাটকের ঘটনাক্রমে জীবন্ত ও প্রাণোদ্ভব করে তোলেন। আগামী দশে বর্ষান্ত পর্য্যন্তের স্টেজিয়ায় যাকে নাটকটির পুনরভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে।

বিশ্বনাথ কালীকঙ্কর জন্মদ। এঁদের তৃতীয় বার্ষিক জন্মদিন উপলক্ষে দম্পতি দুটি একাংক নাটক অল্পকিছু হোল। হুম্মার দায়ের 'লক্ষিতচক্রী' ও লতা বন্দোপাধ্যায়ের 'আনন্দমত বতি'। দুটি নাটকের

শিল্পীদল। বেহালায় এই স্থপরিচিত নাট্য সংঘটি পুণ্ডার সমগ্র একটি নতুন নাটক মঞ্চ করন স্বামীয় পুণ্ডা প্রাধিক।

"টাকার হাং কালোর" নাট্যকার দললেখক হুম্মার চক্রবর্তীর

বিভিন্ন চরিত্রে তপ দিয়েছেন—অতঃ পর, দলিল যুগান্তী, স্তম্ভ মিত্র, দেবভদ্র চায়চৌধুরী, গোপাল চায়চৌধুরী, সীতকনাথ চায়চৌধুরী, অমল চৌধুরী, বিকাশ মিত্র, বিশ্বনাথ মিত্র, বিশিষ্ট ডট্টাচার্য, অচিন ডট্টাচার্য, কল্যাণ যুগান্তী।

বঙ্গ আঁদ্র অগ্রাণী সংঘ। সম্মতি এই সংঘের সভাপতি জগৎ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'আত্মকাল' নাটকটি পরিবেশন করলেন। কয়েকটি চরিত্রে অভিনয়-প্রতিভাও স্বাক্ষর রেখেছেন—তপতী সুরকার, রেখা সুরকার, বাহুবল সুরকার ও পোভনকুমার। নাট্য নিশ্চিনার ছিলেন পোভনকুমার।

বঙ্গবিদ্যা সার্বজনীন লুগোঁহসব। এই উৎসব উপলক্ষে অরুণকুমার দেব 'বাঘনব' নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। নাটকটির সংঘত অভিনয় প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্মরণে রাখা যখন যুগান্তী উদ্বোধনপরে চিন্তা দলগঠিত করতে পেরেছেন। হু-অভিনয় করে প্রাণশা পেরেছেন—যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, জাহাঙ্গীর সুরকার, বাহাদুরচন্দ্র দে, উজ্জল চ্যাটার্জী, সঞ্জিব দে, সীতক চৌধুরী, অরুণ সেন, অমল চৌধুরী, তপন ব্যানার্জী, বোমকেন সেন, শিবচরণ চ্যাটার্জী।

উত্তরপাড়ার 'আমরা' নাট্যসংস্থা। সম্মতি এঁদের প্রযোজনায় দুটি নাটক বকর হোল। 'নব সত্যরথ' ও 'কর্ণি'। শিল্পীদেও হু-অভিনয় ও প্রযোজ-পরিচালনার অভিনয়বে এই সংস্থা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। দুটি নাটকের শিল্পিতা হলেন—অনোক্ত গুপ্ত, প্রতিমা পাল, হুমিত ঘোষ, বঙ্গা গাঙ্গুলী, হুমিল বহু, প্রিন্সেবা বসু, অতিথি মিত্র।

রামপুরহাট ফেলোয়ে জেনারেল ইনস্টিটিউট। এই সংস্থার শিল্পীসম্মতি সম্মতি দুটি একাত্ম নাটক অভিনয় করেন। বনোজ ডট্টাচার্যের 'হেঁড়া তমস্ক' ও শার্বপ্রতিভ চৌধুরী 'লালকাটা বর'। অভিনয়ে দর্শকদের প্রাণশা পেরেছেন—বৃতিবিন্দু পাল, প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, মলয় চট্টোপাধ্যায়, শিশির চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ, যুগান্তী, বীরেন ভৌমিক, অসীম সিংহ, লবণ দাস, বিজুপদ বসাক, কালীদাস সেন।

নবচক্ৰবর্তী। এই গোষ্ঠীর শিল্পীসম্মতি সম্মতি প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে সমীচকুমার ঘোষের নাটক 'সোলাইটি' অভিনয় করেন। এক প্রেক্ষাগৃহে মাহুদ দাস দর্শকের মধ্যে শুধু অর্ধেক সোলাপতা আর অপর পাশে ছাড়া নতুন কিছুই কল্পনা করতে পারেন। দেহরকম এক হল লোকের জীবনধারা এই নাটকে যেখানে হয়েছে। সামগ্রিক অভিনয় ধারাও নাটকের গতি অটুট থেকেছে। বিগর দাসের 'ভাবল' অন্যতম। 'প্রতি' চরিত্রে সত্যী সাহস্ক হুম্ব। 'সুন্দরুনওয়ালা' ও 'লালকাটা' চরিত্র দুটিতে মিলন হোম ও ঘিরির মিত্রের অভিনয় প্রাণসন্নিয়। অস্ত্রাচ চরিত্রে অভিনয় করেছেন—রুপেন সুরকার, অমল ডট্টাচার্য, সারল গণোপাধ্যায়।

সেবা নাট্যগোষ্ঠী। সম্মতি বিনোদী বিয়েটোয়ে এই গোষ্ঠীর শিল্পীসম্মতি পদ্ম চক্রবর্তী 'রত্নাবাহী' নাটক বকর করেন। কলকাতা শহরের এক নিরমধ্যস্থিত পরিবারের কল কাদিনী নিয়ে রচিত এই নাটকটি। বেকবন শিল্পী অভিনয় করে প্রাণশা পেরেছেন। তারা হলেন গোপাল মলিক, বেনু বহু, বৃগেন্দ্র দত্ত, পদ্ম চক্রবর্তী তপন চ্যাটার্জী, হতা যুগোপাধ্যায়, হতপা ডট্টাচার্য। অস্ত্রাচ চরিত্রে ছিলেন—রজত বম্বোপাধ্যায়, তপন যুগোপাধ্যায়, মক্টু ঘোষ, নকোব পালিত, কালচাঁদ দে, কমলেন্দ্র মিত্র, গুপ্তপতি মায়, হুমার সামস্ক, কান্তিকচন্দ্র চন্দ্র, হুগো দাস, পানালাল বসু, অমল সেন, নীলিমা চক্রবর্তী, অরুণ পাল।



চিত্রমিত্র

ছায়াবাণী সম্পর্কে প্রবীক্ষনাম্ব

একবার জাহাঞ্জে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিল, দেখলুম, তার প্রধান অভিনয়টা হুজ্জে জুত লগ। ঘটনার জুততা পারে পারে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্ব সাধারণের একটা প্রকাণ্ড মেলা! ছেলে বুড়ো সকলকেই প্রতিদিন একে মাতিয়ে বেগেছে। তার মানে হচ্ছে সকল বিভাগেই বর্তমান যুগে কলার চেয়ে কারনামিকেই পছন্দ করে দিচ্ছি, ইংরেজীতে থাকে লাক্সেল বলে, তার মধ্য দিয়েও দোট নৈশুণ্যের লীলা দূত আদ্য সকলের কাছে উপাধেয়। অসম্মানে কল্যাণকে উপলব্ধি করার মতো শক্তি ও অবকাশ প্রতিদিন প্রতিহত হতে চলল, শিখির ঘোড়কোড়ে জুয়ে পেলার উত্তেজনা পশ্চিম দিগন্তে কেবলই ঘূর্ণি হাওয়া দইয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিম মহাদেশের অন্ধকার গটের উপর আবর্তমান পলিটিশের দুস্টাফে একটা সিনেমার বিপুলাকার চলচ্চিত্রের মতো দেখতে হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, জুতলগের প্রতিযোগিতা। জলে বলে আকাশে কে একটু, মাজ এগিয়ে যেতে পারে তারই উপর হারমিত নির্ভর করছে। পতি কেবলই বাতুছে, তার সঙ্গে শক্তির কোনো সম্বন্ধ নেই।

ঘটকের পথে বৈধ চাই, আত্মপতন চাই। শিখির পথে চাতুরীর বৈধ নেই, লুপ্ত নেই, তার হস্তগতালনা বতই জুত হবে ততই তার ডেলসি বিশ্বাসের হয়ে উঠবে—ভাট জাহাজের অভ্যন্তর বেগের পরিমাণ সকল দিকেই এত বেশি বরাহিত যে, বাতুয়ের মন অসতো নক্ষিত ও আশাত সজাবনার পড়িত হবার সময় পাচ্ছেন।

জার্মান ছায়াছবির কাহিনী

লিনী

লিনী কাক করে বাগিনের ওয়েস্ট এন্ড-এ একটি হেলগ—ইয়ের সেলক রেজোয়ার। দিগারেটের কুটিকায়ে। বাগ করে বাগিনের উত্তরে এক বসিতে। নিজেই এলাকাস তার পরিচয় লাইসেন্স নামে। এক শোশাল তেবোকেট এবং টোট ইউনিয়ন নেতায় দে মেয়ে কিং বস্তির বাসভোগী পরিবেশ থেকে চিরকালের মতো বেরিয়ে আসার স্বপ্ন লিনী রাখে। লিনী তপসী, পুঙ্খ তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে।

ও এই বিষয়ে সচেতন। সিগারেট কাউন্টারে বসে নিজের রূপ-লাবণ্যের ভেতরে সজিব কর্তব্য পরিবেশ থেকে মুক্তি কখা ভাবে। হারা তাকে পছন্দ করে তাদের একত্বের নাম আলফ্রেড ক্রমেইয়েট।

ক্রমেইয়েট-এর সঙ্গে বিয়ে হয় লিনীও। কিন্তু বাড়ি ভাড়া এবং আসবাবপত্র কেনার মতো অর্থ স্বেচ্ছায় আগেই লিনী হয়ে পড়ে লজ্জা-সম্মত। আর্মিনীর শোচনীয় পরিস্থিতির সঙ্গে ক্রমেইয়েটেরও অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। চাকরী চলে যায়। ফ্রান্সে ফ্রান্সে পোস্টার পড়ে: “জার্মানী ভাগ্যে: জুতা নিশাচর থাক!” ভয়ঙ্কর শ্রী-কন্ঠ্যের খবর চালাতে না পেয়ে ক্রমেইয়েট ভিন্ন করলো আর্মিনীকে আগাবার কাজেই যোগ দেবে।

তবু বোধহয় সে নাৎসী কটিকা বাহিনীতে যোগ দিতে না। কিন্তু এটো সময়ে বেধা হয়ে গেলো ফুলের পুরোনো এক সহপাঠীর সঙ্গে। তার কবার ক্রমেইয়েটও যোগ দিলো কটিকা বাহিনীতে। অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের আশায়।

ক্রমেইয়েটের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপত্তি বাড়ি লিনীরও। কিন্তু এটো উত্থান একই সঙ্গে পতনেরও সূচক। কিছুদিন হঠাৎ লিনীও সত্য অস্বত্ব করছিলেন। মানসিক কষ্ট আরো বাড়লো যখন সে দেখলো তার চাই পলও নাৎসী কটিকা বাহিনীর পোশাক পরেছে।

কতকদিন পরে পল মারা গেলো। নাৎসীরা তার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। কারণ সে বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছিলেন। তাই নাৎসীরা পেছন থেকে গুলি ক’রে তাকে হত্যা করে। আর লিনী? সে অস্বত্ব করে ক্রমেইয়েটকে ‘বিয়ে ক’রে সে দাঁড়ান তুল করেছে। তার শ্রী হয়ে থাকা আর তার সম্ভব নয়। তাই লিনী বেছে নেয় আত্মত্যাগের পথ আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই শেষ-পর্বত মুক্তিলাভ করে।

পোলিশ ছাত্রাছবির কাহিনী

হুজুরাং

পরের নায়ক এক তরুণ পথযাত্রী। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেছে। ভালো চাকরী পেয়েছে। পড়াশুনার ব্যাপারে প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন বাবা। মায়েরও বয়স ২০। চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধি ও সঙ্গমত্বের ভাষা বলার সরিষা। অল্প সম্পর্কে তার উৎসাহ দৃষ্টিভঙ্গী।

নারিকাত ভালো লাগার মতো মেয়ে। হুমতী। দুবতী। তাকে দেখে মাথা ঘুমে গেছে বহু পুরুষের। তবে মাকে-বাবকে সে হয়ে ওঠে চমক আর প্রশংসা, নাচিয়ে বেড়ায় বহু পুরুষকে। তবে যখন সে বিয়দ থাকে তখনই ধরা পড়ে তার ভিতরকার আসল চেহারা। হোটেল ফুলের সে ছাত্রী। বরেন্দ্র মাত্র উনিশ।

ভাষার দুমুনেরই বাস বর্তমান কালে। অতীত ভাষার কাছে পাঠ্য বইয়ের একটি পাঠ্যার মতো। বা—বাবার কাছে শুনে একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে অতীত সম্পর্কে। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এই নায়ক নারিকার। যেন হয় ভাষার ভালোবাসার পথ ততো নিঃশব্দক। পরিণামে তারা সুখীই হবে।

সেহেরটির নাম ইয়া। পোম্যাওর মেয়ে। থাকে ওয়া নদীর ধারে রোজ নামে একটা আরণ্য।

ছেলেটির নাম কাট। ভাতিতে সে জাওয়ান। তাদের বাড়ির জানালা থেকে চোখে পড়ে রাইন নদী।

একদিন সে তার দুজন পাণ্ডিতে চ'তে থাকিলো রোজ-র পথে। হঠাৎ বুধেরাঘের মতো তার মনে কিরে এলো বিশবছর আগেকার ঘটনাবলী। অবিরাম ধারায় দাঁড়িতে এলো বিগত মগাযুগের বহু ঘটনা : মাইনের বিফোরণ, ঘুড়া, এক কুন্ডের বাচতে উদ্ধি একে বেধা, অসংখ্য কনসেন্টেশন ক্যাম্পের এক কয়েদীর মূখ, পাস চেম্বারের বীভৎসতা, বরমাণ্ডার কয়েদীদের আত্মদাহ। ওই দুঃখের মতো অতীতকে কুলে ধাওয়া, বিধায় কেবা নাগের পক্ষে সম্ভব হলো। তাই এসে দুঃখের প্রেয়-মগ্ন এটলো অপর।

জার্মান অভিনেত্রী সেবাইন সিল্জেন

জার্মানীয় প্রিয় অভিনেত্রী সেবাইন সিল্জেন। ২৫ বছর বয়স। এই অভিনেত্রী জার্মানদের প্রিয় 'কিন্স চাইল্ড'। কখনো কখনো এখনো তাকে মনে হয় নিজস্বই কিশোরী।

শশ্বত-জীবন, লাক্স, বৃহস্পতি সেবাইন সিল্জেন-এর সঙ্গে আর্থস জোনার-এর প্রথম সাক্ষাতের সময় সেবাইনের বয়স মাত্র ১৪। জোনার তখন জার্মানীর এক নব্বু চিত্র প্রযোজক। বাসিন্দে তখন তাঁর কাছে পৃথিবীর খ্যাতিমান নট-নটী, প্রযোজক এবং চিত্র পরিচালকদের আনাগোনা। জোনার-এর বিচার-বুদ্ধি তরুণীত। অনভিজ্ঞা, চিত্র-জগতে থেকেবাবেই আনকোরা সেবাইনের সঙ্গে সাক্ষাতের হুজুতে আবদ্ধ হলেন।

অগতঃ চারদিকে অসংখ্য আর সম্পট পুরুষের তিত। এর ভিতরে থেকে এবং চলচ্চিত্র ক'রেও নিষেধ শুচিতা বজায় রাখছে এক অসাপবিত্তা তরুণী। এই অনায়াস নারীর হৃদয় কৃষিকার সকল অভিনয় করলে সেবাইন। নারীর নির্দেশ চরিত্র আপন শুচিতার ছোঁয়ে কেনন ক'রে বহা-বহক পুরুষের মন থেকে লামনা-কলুস দূর করলো তা-ও ছুটিয়ে তুললো নিপুন অভিনয়ের মাধ্যমে।

চিত্র-জগতের অভিজ্ঞতা সেবাইনকে ব্যক্তিগত জীবনের সাহায্য করলো। কেবা হলো চিত্র পরিচালক পিটার জুডই-এর সঙ্গে। বয়সে তিনি সেবাইনের চাইতে ২৫ বছরের বড়ো। এক টেলিভিশন ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে ওই সাক্ষাৎকার। কিছুদিন পরেই তাঁর সঙ্গে গিয়ে হলো সেবাইনের। এর আগে আগত তিনি আরো দুবার গিয়ে করেছেন, মানে সেবাইন তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী। সেবাইনের অভিনয় জীবনে এখন থেকে তাঁর অপরিসীম প্রভাব গুচিত হলো। সেবাইনের জীবনে তিনি এমন উপযুক্ত সহকর্মী, কেননা সেবাইনের পিত্রী-জীবন এই সময়ে ত্রিমিত হয়ে এসেছিলো। পিটার তরুণী স্ত্রীকে আবার চাখা ক'রে তুললেন।

চিত্র-প্রযোজক এবং চিত্র পরিচালকেরা অভিনয়ের অল্প অল্পোখ করেন কিন্তু ক্রমাগত অসম্মতি জানিয়ে চলে সেবাইন, অভিনয় করে শুধু টেলিভিশনে। টেলিভিশনে সে অভিনয় করেছে গোল্ডেনি-র 'দি সাহার রিসোর্ট', শোকত-এর 'আফল জাভিফা', ইৎসেন এর 'ওয়াইল্ড ডাফ', সৌগাৎ-এর 'এ টাচ অব

প্রত্যাহার' ইত্যাদি নাটকে। দিনেবার নাহতে আর তখন ভালো লাগেছিল। এই সময় বুডেই-এর আবির্ভাব। বামীর প্রভাব তার মনের ঘোড়ি ফিরিয়ে দেয়। চিত্র-পরিচালক আলফিট ডায়নি-র অল্পোবে রাজী হয় 'ইট' ছবিতে অভিনয় করতে। আর্গান্ডির নবনাটা আন্দোলনে সব-চাটতে লক্ষ্য নাটক রূপে 'ইট' খ্যাতি অর্জন করলো।

সেবাইন তার অভিনয় নৈপুণ্যের ব্যাপ্য প্রমাণ করলে কেবল নির্দোষ নারী-চরিত্রের কৃমিকায় নয়, বরং অটল-চরিত্র নারীর কৃমিকায় অভিনয়েও সে পারলো। এই অভিনয়ের জন্য তাকে সম্মানিত করা হলো কেডারেল ফিল্ম পুরস্কারে। তার সঙ্গে নাটকের কৃমিকায় অবতীর্ণ হন রেনো ডিবেট্টে। এক তরুণ ও তার বাচ্চবী বালিনে একসঙ্গে কিছুকাল কাটাবার পর তেমন ক'রে ছাড়াছাড়ি হলো 'ইট' গল্পে তাই দেখানো হয়েছে। শিল্প উৎসর্গের জন্য নাটকখানি উচ্চ প্রাঙ্গণে লাভ করেছে।

গল্প-সঙ্গে সেবাইন প্রমাণ করলে মক-অভিনয়েও সে সমান পারদর্শিনী। এট ব্যাপ্যেও সে সক্রিয় সাহায্য এবং সজীব প্রেরণা পেয়েছে—বামীর কাছ থেকে। বালিনের শিল্পার খিয়েটরে সে অবতীর্ণ হয় উন্মাদিনের কৃমিকায়।

মক-অভিনয়েই নিজের বেশির ভাগ সময় ও সামর্থ্য নিয়োগ করলো সেবাইন। এ ব্যাপ্যে সে পেলো বালিনের সমালোচক ও দর্শকদের অকুণ্ঠ সমর্থন। তন্ম পরিচালক আলফিট তাকে রাজী করালেন 'টাইম অ্যাণ্ড টাইম এগেন' ছবিছবিতে অভিনয় করতে। অভিনয় করলে সে মাদিকায় কৃমিকায়। পেনে বালিনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একটি বিশেষ পুরস্কার। সেবাইনের সামনে এমন এক কলমে পোনালি ভবিষ্যত।

বাধশাহ আকবর তানসেনকে বললেন : আচ্ছা তানসেন, তুমি ত এখন গাইতে পার, কিন্তু তোমার গুরু গান তো আমাকে কখন শোনালেন না ?

—বেশ, আজই চলুন শ'রাগনা আমার সঙ্গে আমার গুরুর আজ্ঞে। সন্ধ্যার সময়ে নিত্য তিনি ভজন গান করেন।

বাধশাহ আকবর ও তানসেন চললেন বনপথে নদীতীরে। বেগানে শাধক হরিদাস বামী আছেন তাঁর আজ্ঞে।

সন্ধ্যার হরিদাস বামী গান বললেন। আকবর শুনে লগলেন সে গান। তখনই হয়ে তিনি ভাবলেন এমনটি আর কোথাও শোনেন নি।

কিরে এসে বাধশাহ তানসেনকে বললেন : আচ্ছা তানসেন, এখন গানতো তুমি আমার কোন বিন শোনাও নি ! আমার সঙ্গে এ কি প্রত্যাহার করেছ ?

—তানসেন বললেন, শ'রাগনা, তফাৎ তো হ'বেই। যে গান আমি গাই, সে গান যাঁরা শোনেন, আর যে গান আমার গুরুর গান সে গান শোনেন রাজার হাঁচা ভগবান।

ব্যাপার যা চলছে

চক্রপাণি

(মতামতের মন্ত পর-ডারতী সম্পাদক দ্বারা নয়)

আমি একটি কথাও নিশ্চয় জানেচেন—বাগবাঝারী খবর। অর্থাৎ গাঁজার ধোঁয়ার মত যে খবরের কোনো ভিত্তি নেই। বাগবাঝারের ঐ একটি দুর্নাম চিরকালের। বাগবাঝারের আদি বাসিন্দার মাকি খুব গাঁজা টানতেন। তাই ঐ বিজ্ঞাপনক উক্তি—বাগবাঝারী খবর, বাগবাঝারী ব্যাপার ইত্যাদি। কিন্তু আজ বা জনহি তাকে বাগবাঝারের ঐতিহ্য ও মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। জনহি বিগতমুগে দেশের বিকশাস অগ্রিমত। বাগবাঝারে ছিলেন তাঁরা গাঁজা খেতেন। ঐ অফলেও দুচারজন বড়বড় খেলোয়াড়রাও গাঁজাখোঁষী ছিলেন। তা এ আর এমন কী কথা কি। জনহি আমাধের বেশের একজন মতবড় ঔপন্যাসিকের এই পরম আনন্দ-হাস্যক অভ্যাসটি ছিল। তা ছাড়া বড় বড় সাধু সন্ন্যাসি, সিদ্ধাইবাবা, অসাধারণ বৌদ্ধ পুত্র, এঁদেরও মাথা সাফ করতে এটি মহাপুত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। এতদিন এর মাহাত্ম্য আমাধের বেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ কী জনহি। গাঁজা বিখ্যিত করেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকেরা গাঁজা টানছে চরম টানছে। প্রথমে এটি খবর পেয়েছিলাম গ্রিকিউমো-কীলার কেলেকারীর সময়ে। ক্রিস্টিন কীলার সিগারেটে চরম গাঁজা ভর্তি করে টানত। তার সঙ্গে আরও অনেক। এখন জনহি আমেরিকার হিশিহ হল গাঁজাকে গ্রহণ করেছে চিত্তসংযমের অব্যর্থ উপকরণরূপে। বহু মহানদের ডক্তরা যে খুব পান করে জুজীয়াবন্য উপভোগ করতেন তার স্তম এতদিন পরে পাশ্চাত্যের মাহাত্ম্যও বীকার করেছে, এটা আমাধের পক্ষে তো পর্বের কথা।

আমি সেই সঙ্গে বাগবাঝারও এই পর্ব করতে পারি যে পাশ্চাত্য দেশের বহু বড় বড় বাজার ঐ পর্বে আজ বাগবাঝারকে অঙ্গনরূপ করেছে।

আমকাল বিজ্ঞাপনের মূল। কত রকমের, কত কায়দার, কত চণ্ডের মনোবোহিনী টটকদার, ভাবোব্রেককারী বিজ্ঞাপনই যে বেতার তার আর ইন্তরা নেই। এখন ছবি দিয়ে মডেল দিয়ে বিজ্ঞাপনের মূল। শুধু লাহামাটা লেখা চলে না। তার মানে বিজ্ঞাপনদাতারা আর্টিস্টকে দিয়ে কাজ সারেন, কপি রাইটারকে দিয়ে অল্পের আকর্ষণীয় লববোজনা করে (দবসময় লববোজনি অর্থ যে টিক থাকে তা নয়) লক্ষ্য পৌছোবার চেষ্টা করেন। নিজেদের লববোজ নিজেরা মাথা ঝামিয়ে কপি তৈরী করার লববোজও নেই, আর সে মাথাও নেই। এইই মধ্যে এক অব্যাতনামা কাগজের পঠার একটি বিজ্ঞাপন লববোজ পড়ল। বিজ্ঞাপনটি নিজেছেন এই লববোজই ছোট একটি উৎপাদন-ব্যবসায়ী। বিজ্ঞাপনটিই মধ্যে চিত্তার ছাপ আছে। বিজ্ঞাপনটি পড়ে পাঠক আশ্চর্য আশ্চর্য লববোজ একমত হবেন।

যোম কালী কলকেস্তাওদালী!

সেই প্রবুধ অতীতে—পার্ক স্ট্রীট আর ময়দানের ঘোরতর বায়-নবুল মলমল আর জলার শব্দ দিয়ে, চৌরেচৌ কালীমর্শিনগ্রাসী বাড়ীরল কণে-কণে হেঁকে উঠতো—বোম্বকালী—কলকেস্তাদালী।

বাড়ী হল সাধা ভারত থেকে নানা রঙে নানান বেগে আসত। আসত ঠগের দলও, কাহন কালী-ঘাটের কালীই ছিলো ঐ সম্ভ্রমারের আরাধ্য দেবতা। সেই পুরোনো ঠগেরা আর কলকাতার আগের না—ওরা আর নেই। কিন্তু নিত্য নতুন আধরণাবৃত্ত হয়ে নতুন নতুন ঠগেরা আসছে অব চার্লস সায়েবের মানস কস্তা—এই ক্যালকাতাতে—এই কলিকাতাতে—এই ক্যালকুটাতে—এই কলকেস্তাতে। আসছে আর যাচ্ছে—নতুন নতুন রোগান উঠছে আর নামছে—খালি গং বহলাচ্ছে।

নতুন ঠগেরের উৎপাতে ক্যালকাতা আর একদুপোটার প্রবেশ থেকে ইম্পোটার প্রবেশে নেমে গেছে। যে কোন বোকানে দুই বিন—১.০% মের ইন-ক্যালকাতা গুড পাবেন না। ক্যামিকেল ইণ্ডাস্ট্রি আর কল-কাতাতে নেই, সাগান ইণ্ডাস্ট্রি বহুদিন আগেই সেলাম জানিয়েচে—কলকাতাকে। মাস্ট্রিক ইণ্ডাস্ট্রি গড়েই উঠলোনা। হোমিস্টারী ইণ্ডাস্ট্রি ভুতুপথ বাড়ী। সর্বভারতীয় প্রতিনিধিত্বের আর দাঁড়িতে পারছে না। দুর্বল লক্ষ্য এক একটা ইণ্ডাস্ট্রীকে ঘিরে বেগে আছে নতুন ঠগের দল—নতুন বুলি নিয়ে। ‘তামাকুলাও’—বাগ! খতম। কলকাতাতে আর তার চিহ্ন নেই, সেং। সুটের মাল ড্রিম প্রফেশ পাজার।

অকাল মৃত্যু বধন আসে—ঠগেরের কাছে মানবতার দোহাই দিয়ে লাভ নেই—~~কলকেস্তা~~ নেই।

বাংলা ঠগী মুক্ত হউক।

* * * * *

সাগা ভারতে অমরকট, অর্থাভাব আর ভাষ্যভোল চলচে। তার মধ্যে অকস্মাৎ শোনা যাচ্ছে যোগ যোগ হব। হঠাৎ বেশকি দেশে বিশেষে ভারতীয় বোম্বেরা বেশ আসর জমিয়েছেন। মহাকাব্যি মহেশ বোম্বের কথা গল্প শুনায় বলেছি। সেদিন কাগজে দেখলাম, ভার্মাণীতে এক ভারতীয় বোম্বী নাকি অসুস্থ সব কাণ্ড কাহণনা করছেন, যোগবলে হঠাৎ মাথক থেকে কড়াচ্ছেন, এমনি সব কাণ্ড! এদিকে ভারতে এই যোগের ব্যাপার নিয়ে আন্তর্জাতিক আসর বেগেছে। এলাহি কাণ্ড! লাই লাগ টাকা খরচ। বানাপিনা! নানা বর্ণিতা বেশকুবার বাহার। নাপপুরের একশো মাইল হুঁরে গোন্ডিয়া নামক জনপদে এই আন্তর্জাতিক যোগ-মেলা বসেছে। এবং বধন আন্তর্জাতিক ব্যাপার তখন একজন রাজপুত্র যে তার উদ্বোধন করবেন তাতে আর সন্দেহ কী! উপগ্রহানময়ী মেগারাজীডাই সেই চতুর্থ আন্তর্জাতিক যোগ সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন এবং বলেছেন, (বলতেই হবে, বধন যেমন তখন সেই ডাবেই বলতে হবে) রাজনীতি প্রমুখ সকল নীতিই বাকে, যোগই হচ্ছে মানবমুক্তির একমাত্র পথ! গালভরা কথা বলতে আবারেই নেতাধের ক্ষুদ্রী নেই। তা মে বাই চোক গোনভিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রোচা ও প্রতীচোর বিভিন্ন মিলন ঘটছে, জানাচ্ছেন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। ঘটবেই তো! বিভিন্ন এই যেসে বিভিন্ন মিলন ঘটবে না তো ঘটবে কোথায়! চেকোস্লোভাকিয়া থেকে এক বোম্বী এসে মনস্টপ “শ্রীমার অর রাম, অর অররাম” ভজন গাইছেন। তাঁর বাহুভক্তি দেখে অনেকেরই বলছে ইনিই সেই জেতার পরমহামহত্মক! এক মার্কিন ধনকুবের শিল্পপতির কস্তা যোগ দিয়েছেন এই সম্মেলনে। তাঁর নাম তক্তি দিলবোর। তিনি কেবল তক্তিমূলক পান গাইছেন। আপান থেকে এসেছেন সেক্সাগা মহিলা প্রতিনিবি; তাঁর দু’চোখে অহঙ্কণ ডক্তিরসের হরনিখলিত দারা। এক ফরাসী মহিলা ও তাঁর কিশোরী কস্তা দুদিন আগে যোগফলে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন। হুঁ দু’দাড়র থেকে আরও অনেক মহিলা

ও পুত্র সেখানে সমবেত হয়েছেন ! মোক্ষের সঙ্গরম । তা, মাঝে মাঝে এরকম সম্মেলন হওয়া স্বাভাবিক !
খানীয় লোকদের কয়েকদিন অনেকে কাটে এবং কিছু উপরি বোম্বারও হয় ।

পত্র লংঘার "হু লিগারেট-এর" সর্বনাশা প্রচলন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মত্রে একটি পত্র
পেয়েছি । পত্রলেখকের বক্তব্য হচ্ছে, লোভা কথায়, এই লগ লিগারেট বিলি করছে, আমেরিকান টুরি
নাথমে এক জেলীর বিশেষ পর্বত ! কে জানে তারা কৃত্রিম দি, আই, এর অস্বস্তিক কিনা ! পত্র লেখক
নাকি দুদিন শহরের হৃদয়াকলে চোতলার বস্ত্র এলাকার দু'জন বিশেষকে প্রথম দিন মোটর যেকোনেক
বেশে, দ্বিতীয় দিন সাধা আলবারা আর ক্রান্তের মালা-গলায় হেওয়া বেশে ঘোড়াকরে। কথতে যেয়েছেন ।
"উন্ন পিগারেট বিতরণ করে দু'জনে মাত্রকত। আমি এবং গোপনে স্ত্রীকর চলিত্ত প্রদর্শনী দেখিয়ে ও যৌন
বিষয়ক পত্র-পত্রিকা বিলিয়ে বর্তমান যুগ সমাজের তরুণ-তরুণীদের মোহগ্রস্ত করাই এরই উদ্দেশ্য ।

পত্রলেখক উপলংঘার কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে ব্যাপক অহুদস্বান করতে বলেছেন । কিন্তু হায় ! কোথায়
কর্তৃপক্ষ ! তাঁরা তো আর আসছেন, কাল নেই । তাঁদের কে দেখে তার ঠিক নেই । বাংলাদেশ আর অন্য
যে যে সেই পেশের দিনের পর চেয়ে বেশ আছে, যেদিন হয় নিঃশেষে অবস্রুতি বা হয় অস্রুতি করে
পুনরুজ্জীবন । সেই নব অস্রুতির নেতার জন্তে যুযুর্ বেশ অপেক্ষা করছে ।

"আইন উঠল, না, গভর্নমেন্ট উঠল" ?—সুভাগ্যভাগিত বাংলা দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিমিত্তি
সম্পর্কে উপবেশ কথাতলি আপনার আবার কথা নয়, পোষ মুখ্যমন্ত্রী মুখো মণ্ডারের আওনার । নিজেদের
মাঝার ঘারে কৃত্রিম পালাচ্ছে তার ওপর সর্বশেষে অহুদস্বান জনতা-জমাবন্ধের মধ্যে আক্রমণ । লগ সম্রাই
তাঁর এবং অস্ত্রায় মন্ত্রীদের বাতীর দরকার আকিদের দরকার লোকে লোকাণ্ডা, জয়কনি আর ইনক্রব ।
শেষ পর্যন্ত গত ৮ই নভেম্বর বিকালে মহাকরণের সামনে জনতার উৎসে বিদ্রোহ প্রাণবন্ত ধার্যকাম
মুখ্যমন্ত্রী তিরুণের বলেন, "আপনারা কি আশ্রয়ের কাত করতে যেবেন না । আইন উঠল না গভর্নমেন্ট
উঠল ? আপনারা পেয়েছেন কি ? বোম্ব রোজ এখানে এলে হামলা । আমি আর কোনো কথা বলব না ।
জানেন না, এখানে ১৪৪ ধারা রয়েছে ?"

জানেন বৈকি ! জন-গণের দল সম্রাই জানেন । কিন্তু এই অশ্রুতার জন্ত তাঁরা তো দায়ী নন
দায়ী তাঁদের নেতারা, ধীরা অলংকার গণেরকে বোতল থেকে বার করে ছেড়ে দিয়েছেন ।

মনে নেই, সেই বাহুরকের কথা, যে হয় পড়ে একটা বোতলের ভেতর থেকে প্রকাণ্ড বৈতাকে
বার করত, আবার হয় পড়ে বৈতটাকে লক একাকালী বোঁটার পরিণত করে বোতলের মধ্যে হুঁকিয়ে
ছিপি বন্ধ করে দিত ? একদিন হল কী ? বৈতটা বেলবার পর, বাহুর বৈতাকে বোতলে ঢোকাবার মর
কুল বেশ ; বৈতা আর বোতলের ভিতর গেলনা, মহানন্দে তার ডাঙবলীলা বন্ধ করে দিল ।

অন্তঃমুখ্যমন্ত্রীর ভবেন্দ্র আর আর কাম হবে বলে তো মনে হচ্ছেনা । হওকা বগন মিলেছে
তখন জন-গণেরকে আর আর পাণ কে ।

চলতি দুনিয়া

জন্ম-নিরন্তর, তবে উল্টোদিকে

আমাদের দেশে চোঁটা হতে জয়ের হার কমানোর ক্ষেত্রে, আর ফ্রান্সে চলছে জয়ের হার বাড়ানোর। জেনারেল ড'পল এই বিষয়ে চক্করী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। ওয়েসে জয়ের হার ক্রান্ত করে থাকিলো। নিয়মাবলি অনুযায়ী পিতা অনেক সন্তানের জন্ম হলে তার বেশ আরকর করে দাবে তাকে ভাতা দেয়া হবে এবং তার জন্ম উন্নত ধরনের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্ম চাপু করা হবে একটি তথ্য-সহযোগী সংস্থা।

অবশ্য এই মাপ শেষ হওয়ার আগেই কৃষি হবে ৪০,০০০,০০০ টি হাজারী পিতা। তবে গত কয়েক বছর ধরে ফ্রান্সে জয়ের হার কমতির দিকে। তাই ওখানে উৎসাহের স্রোত হয়েছে। আগ্রহী করা হচ্ছে ওই হার আবার কমে যেতে পারে। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

পাদি-প্রার্থীদের ভিত্তি

১৭ নভেম্বর তারিখে সোভিয়েট রাশিয়ার অল্পবয়সী হলো অক্টোবর বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিক উৎসব। এই উৎসবের প্রাক্কালে সেখানে এক অকৃতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। ৯,৪০০-এরও বেশি তরুণ তরুণী বিয়ের অল্পবয়সী চেয়ে আবেগ-পত্র পেশ করেছে। ওখানকার সংস্কৃতির কারণে 'ইউনিয়ন স্টোর' বলেছেন এক সপ্তে এত বেশি বিবাহাচার-ভিত্তি আর কখনো দেখা যায়নি। মধ্যে রয়েছে একটি রেকর্ড স্রোত হয়েছে।

মহিলা বৈমানিকের রেকর্ড

৩০ বছরের এক ব্রিটিশ মহিলা বিমান চালনার রেকর্ড স্থাপন করেছেন। একক ইঞ্জিনের একটি বিমানে পূর্ব থেকে পশ্চিমে দূর ১৭ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়েছেন।

মহিলা বৈমানিক মিস সেন্সা কট মহাসাগর পাড়ি দিয়ে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তবু তাঁর আনন্দের সীমা ছিলো না। কেন না তিনি মনু রেকর্ড স্রোত করেছেন। এর আগে ১৯৫৪ সালে নিউজিল্যান্ডের মিসেস ডেব্রি বট্টার আয়ারল্যান্ড আর পেনসিলভেনিয়া-এর আকাশপথেও ব্যবধান অতিক্রম করেন। মিস কট তাঁর চাইতেও বেশি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। প্রথম বাতাসের সাহায্যক বাধা সত্ত্বেও মিস কট শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। তাঁর সাক্ষ্যে মহিলা মাত্রই আনন্দিত হবেন।

হিপ্পো পার্বত অবাচ

মহিলা স্টেট পেট্রোল হেডকোয়ার্টারে দাবাও পথে একমুখ হিপ্পো পার্বতের স্টেটের সাহায্যের পথপ্রদর্শন করে এবং তাঁর সঙ্গে লাক্সাকারের বাণনা প্রকাশ করে। গভর্নর রাষ্ট্র হন, তবে এক পর্তে। তিনি কোর্টের পক্ষে একবারা কীটি কন করে বেশ ক'রে বসছেন, "রাষ্ট্র, তবে আপনাদের সঙ্গে আলোচনের আগে

আমাকে একটা কাজ করতে হবে, আপনাদের এই লগা চুলগুলি কেটে ফেলতে হবে।" সত্যের গুই কথা বলাবার চেয়ে বেখসেন হিঙ্গিরা উদ্বিগ্ন হয়েছে।

লাস লুকানোর ছালামা

কথারই বলে খুন করা সহজ কিন্তু লাশ লুকানো বড়ো কঠিন ব্যাপার। সম্প্রতি আগ্রার এক ঘটনার এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। পঞ্চোল বেঁধেছিলো সেডের ভলের বিতরণ নিয়ে। একবল দুর্ভুক্তকারী এক পরিবারের পাঁচজন লোককেই গুলি করে মেরে ফেলে। কিন্তু এর পরেই ভুল হয় আসল সমস্যা। মেরে ফেলা তো গেলো, কিন্তু লাশগুলিকে লুকানো ব্যাপার কেমন করে। প্রথমে লাশগুলিকে তারা ফেলে বিলো নদীর ধরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেগুলি ভুলে ফেলে চোঁচা করলো পোড়ারে। সে-ও সহজ কাজ নয়। তখন কেটে ফেললো মাথাগুলি। মাথো ভী করতো বলা যায় না। কিন্তু বার লাখলো পুশি। এগুটার করলো সব ক'টি দুর্ভুক্তকারীকে।

পছন্দ খসে যাচ্ছে

কোমিটীঃ চীনের রাষ্ট্রদূত টাইপেই প্রতিবেদন চার টুক ক'রে মাটির তলায় ব'লে যাচ্ছে। কবানকার এক সরকারী মুখপাত্র এই চাকলাকর তথ্য প্রকাশ করেছেন। কেবিনেটের সমস্তরা এক সভায় মিলিত হয়ে সভর ক'রে দিয়েছেন যে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হ'লে এই বছরের ১০ মিলিয়ন অধিবাসীদের নিরাপত্তা ক্ষয় হতে পারে। বিভিন্ন শির-সংস্থা মাটির তলা থেকে অন্তরিক্ত জল পান্য ক'রে তুলবার অস্ত্রই নাকি পহরটির এই বিপদ দেখা দিয়েছে।

মাতালদের জন্ত বিশেষ বাস

লিভারপুল শহরের পৌর-পিতারা মাতালদের জন্ত একটি বিশেষ বাস চালু করার কথা ভাবছেন। ব্রিটেনে সম্ভ্রতি ড্রিঙ্ক-ড্রাইভিং আইন চালু করার পর মাতাল ড্রাইভারদের লব থেকে লড়াবার সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার মোকাবিলায় জন্ত এই ব্যবস্থা। মাতালদের বলা চলে বাড়িতে তাদের পাড়ি রেখে আসতে! তারপর বিশেষ বাসে মাতাল ড্রাইভারদের পাড়িয়ে দেয়া হবে শহরে এবং শহরের বাইরে তাদের বাড়িতে।

অস্ত্রিয়ার সমস্যা

দেশের বেশির ভাগ মহিলাই যদি বাইরে বেরিয়ে পড়েন, তবে ঘর সাখলাবেন কে? অস্ত্রিয়ার সরকার এই জরুর সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছেন। এই জন্ত একটি আলোচনা-ভরতের আলোচন সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছিলো। কম-কারখানার ও অফিসে এত বেশি লংঘক মেরেয়া যাতে কাজ না করেন এবং গুঁরা বাড়িতে থাকেন তার জন্ত নানা উপায় অবলম্বনের কথা বলা হয়। দ্বির হয়েছে যে সব মেয়েরা বাড়িতে থেকে ছেলে-মেয়েদের দেখাভরনা করবেন গাংগের আয়কর দিতে হবে খুই কম।

লণ্ডনে 'সতীদাহ'

ফেস্টেজ হেথ-এ এক মহিলা আঙনে সীপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। অনেক এই ঘটনাকে প্রাচীন ভবিষ্যের সতীদাহ প্রথা'র অছত্রণ ঘটনা ব'লে ভুল করেছেন। মৃত মহিলাটির নাম মিলেস ক্যাথারিন ওয়ালেন। ভারতীয় নারীরা আঙনে পুড়ে প্রাণত্যাগ করতেন স্বামীর মৃত্যুর পর। মিলেস ওয়ালেনের স্বামী কিন্তু মায়া বাননি। তিনি স্বী-কে ত্যাগ করেছেন! এই বিবাহ-বিচ্ছেদের চরম খবর পেয়েই মিলেস ওয়ালেন আঙনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

আজব ভাকাতি

কলকাতার এক প্রকান্ত রাক্ষসে সম্ভ্রতি এক আজব ভাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে অনুল্লীয়া। একজন অবাঙ্গালী একশাল ছাগল-ডেড়া নিয়ে বাড়িলো মাণিকতলা বেইন রোড ধরে। হঠাৎ একটা ট্যান্ডি এসে খামলো ওই পজ্জালিকা প্রবাহের ধারে। চারজন লোক চটপট বেবে গোট। কয়েক ছাগল আর ডেড়া বগলকাধা করে আবার চটপট উঠে পড়লো পাড়িতে। পজ্জালিকার মালিক তার-থরে টেঁচালো 'যেরা ছাগল লেকার ভাগ'। কিন্তু ততকণে ভলিকাতরা হাওয়া।

পৌত্তালিক দেবতার অজ্ঞগ্রহবাসী

এক জনপদাধিপে ভাবণ দিতে গিরে সুইকারল্যাণ্ডের ঠানেক ঐতিহাসিক বলেছেন পুরাণে বারের দেবতা হ'লে বর্ণনা করা হয়েছে আসলে তারা ভিন্ন গ্রহবাসী আগন্তুক। প্রাচীনকালে তারা রঙে এসেছিলেন। যেইংস নহরের কাছে কিছুদিন আসে যে উড়ন্ত চাকি দেখা গেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে সুইস ঐতিহাসিক ওই মন্তব্য করেছেন। ঐতিহাসিক সিন্টার এরিক ফন স্ট্রেনিকেন বলেন বেবিলনের বিখ্যাত রাজা হাম্মাবির প্রস্তরফলকের বর্ণনা এবং প্রাচীন খ্রি-পত্র থেকে এ-কথাই মনে হয়। কেবলমাত্র কল্পনা করে ওই বর্ণনা দেয়া সম্ভব ছিলো না। তিনি বলেন, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা বারের দেবতারূপে বর্ণনা করেছেন, আসলে তারা মহাকাশচারী।"

হিপি ফাণ্ট

উল্টেই নিত্য নতুন আমদানী চলেছে বিদেশে। এতদিন শোনা গেছে বীটের নানা কীড়ি ও অশকতিয় করা। এবার সামনে এসেছে হিপি বল। এটি হিপি কারা? কোথা থেকেই বা এদের আবির্ভাব?

হিপি সম্ভারবুদ্ধক বৃক্ষ-বৃষতীরা নোংরা শোশাক পরে, মাথায় লম্বা চুল রাখে, যন্ত্রিষ্মান নামে মাগাঙ্ক এক বাধক ধূশান করে আর লুচচারীনের উপহার দেয় ডেকোভিল কুল। হিপিরা দুশ্মিত্রোবী ও ব্যক্তিগত প্রেম গিখানী। হিপিদের লকে ও বিশকে ওলেনে ডুফুল তর্ক-বিতর্ক চলেছে। কেউ মনে করেন হিপিদের আবির্ভাব সমাজের লকে কল্যাণকর আবার অনেক মনে করেন তারা সমাজের লকে বিশল্লমক।

চাকিল্যকর গ্রেপ্তার

ওরাসিটনের পুলিশ খবর গেলে এক ব্যক্তিতে মারক তব্বা বোটা-সিনিয় ঘাঁটি রয়েছে। খোঁজ-খবর নিয়ে, আট-বাট বেঁধে পুলিশ হানা দিলো ব্যক্তিটাকে। সতি-পতি একটা ঘরে দুটি হুটকস খেতে আধিকৃত হলো ২০ পাউণ্ড হারিকুমান নামে মাসাঙ্ক মারক-তব্বা। কীটো খুজতে বেহিয়ে পড়লো সাপ। জানা গেলে ওই মারকতব্বা বিক্রয়-কেন্দ্রের পরিচালক বিখ্যাত মালিকী ঔপন্যাসিক কেইনথকের ছেলে। পুলিশ লম্ব-লম্ব তাকে গ্রেপ্তার করে। ইনি মালিক সেনাবাহিনীতে কাজ করেন।

টোকিয়ার নাইটক্লাব

খারাই আগানে বেড়াতে গিয়েছেন তারাই একবাক্যে বীকার করবেন টোকিয়ার নাইট ক্লাবের মতো আনো-প্রমোদের ছায়না পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। এ-রকম নাইটক্লাব টোকিয়ারে আছে আটটি। প্রত্যেকটিই আটতলা ব্যক্তিগত। ওই ব্যক্তিগতসিতে পানপানারও ব্যবস্থা রয়েছে। আনো ক্লাবে মেয়েরা নাসের্ণ বেশে অভিবিশেষ বাগত ভানায়। রোমাঞ্চ ক্লাবের মেয়েরা পরে বিয়ের কনের বেশ। সবটাইতে বিখ্যাত নাইটক্লাব 'মিকাতো'। সারা দুনিয়ার মধ্যে সবটাইতে বড়ো এই নাইটক্লাব। এই প্রমোদ প্রাঙ্গণে আগন্তুকদের বরণ করে নেবার লজ রয়েছে এক হাজার কাপানী হুণ্ডী। এই প্রাঙ্গণের আক-মমক আর বিলাসের আয়োজন প্রাচীন যোজের গ্রাণপ্রাসাদের আক-মমকের কথা মনে করিয়ে দেয়।



বন্দী বিধাতা

প্রথম মুদ্রণ ১৯৭৮

এক

৪ চলচ্চিত্র ।

সাতঘণ্টা সালের কলকাতা। সতেরে সাতচল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে রীতিমত সাতটা মানুষ লাগে একটা খেলে কিনা সম্ভব। সাতবাড়ীর পাঁচ বাড়ির এ খার ও খার যে লাগে দু'লাখ লোক বাদ করে তাবের মধ্যে এই ধরনের অন্তরঃ একটা মানুষ তিনে ভীষনবাণু, ভালো নাম ভীষনজ্যোতি গাঙ্গুলী আর চলতি নাম বাবু। ব'লে রাগা উচিত যে এই নামটা গাঙ্গুলীর কোষ নয় জুজোর অন্তরঃ। এটা ঠিক বছর বয়সে দিদিমার বেওয়া আদরের নাম যেটা উনি হাজার চেষ্টা করেও কাঁধ থেকে কিলতেই নাযাতে পারেন নি।

বাঁহর বয়স কত বলা মুশিল তবে লোকটা যে নিখুঁত খাটি এটা ও অকলের গ্রন্থক বাক্য। ঠিক ইচ্ছার পতিতশাশুর থেকে আরম্ভ করে ব্যাধের বড় সাহেব পর্যন্ত সবাই একবাক্যে বীকার করেন যে বাঁহু বাবুবাটা এমনই সাজ। যে চার বছরের বাচ্চাও হার মানবে। এই মন্তব্যের পেছনে ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে।

বাঁহর বাবা ছিলেন সাত টাকা মাইনেতে কমিটারের সেরেস্তাদার। মিথো সাক্ষী দেওয়ার ভাবনার আর কমিটারের অত্যাচারের ক্ষেত্রে উনি লসায় নিয়ে রাতারাতি চ'লে এসেন সহরে আর লসে আনলেন অল্প হাফে। সাতদিনের সংস্থান সতাই ছিল কিন্তু তারপর হুঁশি অন্যায়ের থেকে এমন দুর্বল হ'রে পড়লেন যে হাঁটতে হাঁটতে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন হাওয়া আর হা হা করার আগেই ট্রান্সটানা খোঁড়া হাফি লাগি। সেই যে অজান হ'লেন আর চোখ খুললেন। এবং সেই পোকে বাঁহর মাও ছিলেন পলায় বড়ি আর তার ফলে বেড় বছরের বাড়িগে নিয়ে অল্প হুঁজি পথে বসলেন! পথের বেখানে বসলেন তার ঠিক উল্টো দিকেই যে সাল বাজীটা পেটা ছিল টেবায়বাঁহর বাজী অর্থাৎ টাম কোম্পানীর বড়বাঁহর বাজী। সব শুনে তিনি লাহেবকে হ'লে বাসে হুঁটাকার একটা খোঁড়াকির বাবুবা ক'রে ছিলেন হুঁকে আর হুঁকী ট্রান অকিলে বাড়ির নাম লেগালো বাঁহু।

তখনকার হিসেব দু টাকার আফকালকার হুশে। টাকার কাঁচ হ'লেও বাঁহর ইচ্ছার বাবুবা হল না, কারন পড়াভনা করাটা যে গ্রন্থোজন একথা তাঁকে বলার মতন কেউ লোক ছিলো না। বাঁহর বপবহর বয়সে

খন বুড়ী মরল আর টাকা আনতে গিয়ে খন দেখা গেল যে বুড়ী মরলে আর টাকা বেওয়া বাবে না তখন সবাই মিলে হাতকে শিগিরে দিলে। যে 'অল্প ক'রেছে ব'লেই কিরিয়া আসতে পারেনি' এই কথাটাই বেশ সে সাহেবকে বলে। টেরামবাবু খন ও'কে সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন তখন ও অজান বহনে সাহেবকে ব'লে দিলে। যে ওর কিরিয়া ম'রে গেছে, সবাই ও'কে সে কথাটা সাহেবকে বলতে দাবি ক'রেছে এবং ও'র ক্ষিপ্তে গিয়েছে। সেই থেকে ও'র জ্বালাময় গুল আর দুর্ভাগ্যের ইন্টারভ্যাল। সাহেব লিখে দিলেন যে হত্যারিন না ও কোথাও চাকরি পাও ততদিন কোম্পানি থেকে পাও মাসে পাঁচ টাকা, থাকবে টেরামবাবুর বাড়ীতে আর পড়বে ইচ্ছা।

বন বছর বয়সে আ আ ক ব লিখে উনি খন ব্যাক্তিকের কাছাকাছি পৌছোলেন তখন ও'র বয়স একশ। সে বছর টেরামবাবু বিচারায় করে বেশ গেলেন আর মিল হরিয়া সাহেবটি গেলেন বিলম্ব। ব্যাক্তার আশে এ'য়া দুজন পরামর্শ ক'রে সাহেব করলেন উপকার—ও'কে ক'রে দিলেন ব্যাক্তের কেরানী আর টেরামবাবু করলেন অপকার—মিষ্টের কলিকার মেয়েটিকে ক'রে দিলেন ও'র বোয়ালী। নেহাৎ তখন মেয়েটির বয়স দাত বছর নইলে বিয়ের পর বহিন বছরে এগারোটি ছেলে মেয়ের জায়গার সংখ্যাটা বাড়িয়ে বেশ বেশ তখন।

দুস্তানদের মধ্যে লকলের হিসেব নিম্নরোক্ত। উল্লেখযোগ্য হল উমা, লকলের বড়, এবং এবছর বি এ পরীক্ষা দিয়েছে। তারপর পর পর পাঁচ বোন। তারপর ছেলে, নাম তার বেববি কিন্তু একেবারে ধীর। তারপর কুচোকাটা ছেলেমেতে মিলিয়ে চারটে আর সবচে ছোট মেয়ের বয়স তিন। উমা হ'তেছিল বিয়ের বন বছর পর (ন'বছর টেরামবাবু হাতকে বস্তুরবাড়ী হাত কাটাতেই বেন নি।) আর সবচেয়ে ছোট 'আহা' হয়েছে তিন বছর আগে অর্থাৎ উনিশ বছরে এগারোটি সন্তান জন্ম পড়পরত। বছর দুয়েক একটি হিসেব খরলে কিন্তু তুল হলে। ওটা আসলে হবে প্রায় বছরে একটি, কারণ উমার পর আর আবার আগে গোটা চারেক গলে গেছে এবং তার জন্মে টে'পি অক্ষত: অশুশি হয়নি। টে'পি হলেন একবারে হাতের বাণ এবং দুগর। অক্ষত: এই ধরনের কোন ছুটিনার পর হাত দীর্ঘ নিঃশাল টেনে বহি বলতেন 'আহা' তো দল্য চড়িয়ে টে'পি বলত—

● বাব, খুব হয়েছে, আর আধিখোজার কাজ নেই।

● ছিঃ, টে'পি, অমন ক'রে বোল'না।

● না, বলবে না! বছর বছর মেয়ে বিউবো আর বলব না—

● তুমি আবি কে—সবই ভগবানের হাত!

বাদ—একথা জ্ঞানলেই টে'পি একেবারে ফেপে আওন, বলত'—

● যে'ব একদিন ঐ ভগবানের হাতখানা ধীট দিয়ে কেটে তখন দূরবে!

● আঃ টে'পি, কি বে বল ছাই—

বলতে বলতে হাতু পালিয়ে যাচেন।

আবার পর খন দস্তান আলা খামল, দেই বছরই হাতের সাইনে বাড়া খামল' অর্থাৎ উনি এগেডর নীয়ার পৌছোলেন। ইতিমধ্যে অক্ষত: অভিজ্ঞতার ভোরেও হাতের উন্নতি হওয়ার কোন বাধা ছিলোনা। কিন্তু উনি নিজেই বাধা দিলেন, বললেন—

● পেটে বিড়ে থাকলে তবে না বড় কাম। তার চেয়ে এই ভালো। এখানে কুল চুক হ'লে বড় আও কানমালা; ওগরে উঠে কুল ক'রেছো কি বেশ! ধরকার কি বাপু উন্নতিতে!

এইভাবে চলতে চলতে চৌবন্ধিতে এসে বেণা খেল তিনখানা ঘরে ওরা আঠারোজন লোক। নিজেবা তেবো, টে'শির বিদ্রোহ বোন আর তাঁর দুই মেরে এক চেলে আর লাড়ক দু'ব ল্পাকের নিশি। টে'শি পোয়াতি হ'লেই এঁরা নাহায্য করার মত্রে শৌছে যেতেন আর চ'লেও যেতেন তারপর একদিন আর সেলেনই না। এঁরা এজাবার আসা যাওয়া করেছেন যে না খাফাটা অস্বাভাবিক মনে হত এবং থেকে যাওয়াটা চোখেই পড়ল না।

মাসে দুশো আঠার টাকা আর, স্ত্রীর পায়ে একটাও গয়না নেই আর সব মিলিয়ে হাজার বেড়ন্ত হেনা। হিসেবটা হল একদিন রাত্রি উমার বিরোধ কথা নিয়ে।

উমা দেখতে ভালো গান গায় ভালো, ব্যবহার ওর আরো ভালো আর সবচেয়ে ভালো ওর বতাব। এ হেন মেয়ের দিকে ছেলের মায়েরাই নজর দেয়, ছেলেরা তো কোনে ছায়। কাকেই, বি এ শরীফা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর বিরোধ কথা উঠল আর সে কথা শুনে বাড়ীতে নিয়মিত আনাগোনা করে এমন করেকজনের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোকা খেল যে মাসিমা কাকিমা বলে বাবা এ বাড়ীতে আসে মায় আর বাবার করা থেকে আরম্ভ করে হরকার হ'লে বাটনা পর্যন্ত বেটে দেয় তাদের গ্রায় প্রত্যেকেরই আসল উদ্দেশ্য উমার হন আর অসিহের লক্ষ্য উমার উবাহে পড়া যৌবন। উমা অবতাই তার উমেদারদের দমরে চলে এবং কোন হকম আপকারাই বেয়না কিছু হ'লে কি হবে, তাদের আশা করাটাতে আর আটকাতে পারে না। অতএব, এ বাড়ীতে খটক আশার সঙ্গে সঙ্গেই মাঝে মাঝে হত্যা প্রেমিকদের হাফজান শুক হ'রে খেল আর সেই তড়ের হাপটে কড়া দিয়ার মধ্যে ভগড়াও হ'রে গেল। টে'শি বিরোধ কথা পাড়লেন আর লাড়ক হিসেব ক'রে জানিয়ে ছিলেন যে কালীঘাটে গিয়ে মালাবহরের ব্যবসা হ'তে পারে তার বেশী ব্যয় করা সম্ভব নয় কারণ সংখ্যান নেই।

টে'শি বেশে একবারে টং কিত্তি লাড়ু না রাম না গদা। তাতে টে'শির বেকাজ খেল আরও বিগড়ে আর গলা উঠল উচ্চতর সুবাবায়। উমা খামাতে এসে থমক খেল মার কথা শুনে। তিনি পাড়াগুজ লোককে গুলিয়ে বললেন :

● তাতো বলবিই! যাণের দিকতো নিবিই, নইলে টে'শিও উঠে বেই খেই ক'রে নাচই বা হবে কেবন ক'রে আর নলেনের সঙ্গে কিসলাস বা হবে কি ক'রে ? —ডাবছিপ্ মাটা দুখু কিসলু বোকে না। না!...

উমা কিছু বলবে ব'লে মুখ খুলতে থাকিল কিন্তু টে'শির উগবগানিতে সে হা হাই চরে গেল. দেখান দিয়ে কথা আর বোঝানো না। টে'শি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন—

● দেখে নিলু তোরা বাপ বেটীতে আশিও যদি সাতপাক না দু'রিরে বিয়ে দিয়েছি তো আশাব নার নেই।

উমার কোন ভাবনা নেই, আসলে বিপদে পড়ল' কথা, উমার ঠিক পরেরটা। সে আই এ পড়তে গুরুতাই বিয়ের বখ বেখছিল নলেন ওরকে নলিনেশের সঙ্গে। উমার সঙ্গে নলেনের কিসলাসটা আর কিছুই নয়, ক্রমকে নিয়ে বয়ে গালিয়ে যাওয়ার একটা ধ্যান করেছিল নলিনেশ আর উমার কাছে বরা প'ড়ে গিয়ে দিন তিনেক ধরা হিতে হ'রেছিল যাতে ও দালা মানবেপকে না ব'লে দেয় এবং সেই সময় উমা ওর ভগ্নত দুর্গও প্রত্যাপে বিদিশিবি কলিয়ে ছিল। আগলে, উমার হন তার মত্রে ঠাহুয়েথ কাছে মানত ক'রে তার মায় বাকিবশ, নলিনেশের দালা। এম, এ পাশ ক'রে এবার বি এল দিয়েছে।

পাশাপাশি বাড়ী হলে কি হবে কবের অস্বাভাবিকতা আর মানবেশের আলাপটা প্রথমে হয় রেশমেরশির মধ্যে।

এম. এ. গড়ার সময় টে'পির চিংড়ারের অধির হ'য়ে মানবেশ একদিন গলা তায় এক পলা ওপরে তুলে বলেছিল "বিশ্ব বৃত্তিটা কি চেঁচায়।" কথটা উমার কানে আসতেই সে খেপে আগুন কিছু তখন কিছু বলল না। মানবেশের পরীক্ষার ঠিক আগে উমা এমন গলা ছেড়ে পান পাওয়া আরম্ভ করল 'যে মানবেশ হুমকি দিয়ে পান খাবাতে এসে হুমকি খেয়ে টে'পির মাও পায়ে পড়ে কমা চাইল আর উমার প্রেমে পড়ে ছোট তায়ের হাতে চিঠি পাঠিয়ে এক বিয়ে করতে চাইল। চিঠিখানা প'ড়ে উমার চক্ষুস্থির হল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হনটাত ওর হির হ'য়ে গেল। বিয়ে যদি কখন করে তো ওকেই আর কথা যদি পাতা হয় অল্প কান্নো সঙ্গে তো বিয়ে করবে না, করবে বিস্ত্রাহ।

অর্থাভাবের আধিক্য বিয়ের কথাটা আপাততঃ চাপা পড়লেও স্বাধীন ওপর অল্প টে'পির অত্যাচারটা কিছু বাড়ল। উঠতে বসতে সে বামীকে কথা শোনাতে আরম্ভ করল যে সন্তানের জগৎ বিশ্বেই জু'র না তারের ভয়ে কবরও অনেক কিছু থাকে এবং এই প্রসঙ্গে আরও জানিয়ে দিল যে নিজের আট মেয়ে তো আছেই বিফিন্নও দুই মেয়ে ওকেই পাগ করতে হবে!!

হাড়র চোব কপাল ছাড়িয়ে রীতিমত টাকে উঠে গেল, আর ডয়ে তাহনার হাত পা খেন পেটের মধ্যে সোঁদিয়ে গেল। বাড়ীতে স্ত্রীর বহুনি, গায়েবে চাল ভালের মরিবুল, বাসে টানে পকেটমায়ের অত্যাচার আর অফিসে বড়বাবুর ঘানখানানিতে কি যে হল—হিসেবে অনবরত তুল হ'তে আরম্ভ হল। বাধ্য হ'য়ে একদিন বড় সাহেব ডেকে বহুনি ছিলেন আর এরপর আবার যদি কখন তুল হয় তো জোর ক'রে রিটার্নস করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানেন। দেখানে তিনি নিজের কান হ'রে সাধনান হওয়ার লগ্ন নিলেন আর বেরিয়ে এসেই ছোট সাহেবের পা হ'রে আঁজর চাইলেন। তিনি ওকে বহুনি ক'রে ছিলেন ভুলটে।

ভুলটেটা মাটির নিচের তলায়, দারিদ্র অনেক বেশী অথচ কাজ নেই একদম ব'লে ব'লে রিমোনে ছাঁকা ভাট বৃত্তি টাকা মাইনে বেশী হ'লেও ওখানে কেউ যেতেই চায়না। বহুনি আগে হাড়কে এখানে একবার বেওয়া হ'য়েছিল কিন্তু নিঃশ্বাসেও কষ্ট ছিল ব'লে কাজটা বেননি। এখন নিজে রীতিমত হাপ ছেড়ে বীচলেন। টে'পি অথচ রেগেই আগুন, বললে, তা আর নেবে না? এতদিন বেঁচে আমার হাড়-মাস কালি করলে এবার না মরলে আর লুপ হুচ্ছেনা!

টে'পি হাই লুক এ ভিউটি অনেক লক্ষ্য। সময়মত বাও, ওহিচ কখন কেউ এসে সই মিলিয়ে আর চাবি মিলিয়ে ভুলট তুলে হাও আর সাগরিন ব'লে সাধারণতের বত কঠিন সমস্যা দেই নিজে চিন্তা কর। বিকেল তিনটে বাজলেই, বই মিলিয়ে, তালো বন্ধ ক'রে কোতলায় চাবি জমা দিয়ে বাড়ী। হৃদয়নের মধ্যেই হাড়র রীতিমত দুঃসের ওজন বাড়ল।

ভুলটে আসনে ভালোমত মিলিয়ে বহ লোক এবং লগাট বড় লোক। বেগতে বেগতে মাল দুইবেকহ মধ্যে প্রায় লকলের সঙ্গেই হাড়র মুখচেন। আলাপ হ'য়ে গেল আর মাল তিনবেকহ মধ্যে ওদের লকলের আসা হাওয়ার একটা মোটামুটি আদ্যাকও হ'য়ে গেল, যেমন ব্যবসারিতি বাহুবু পোষায়ে এসে নিজেদের নামের আট নম্বর ভুলট থেকে টাকা বের ক'রে নিয়ে বান আর বৃথার এসে স্ত্রীর নামের লকলের। লকরে টাকা রেখে বান। কিন্তু স্ত্রীর অকপা আসে স্বজনবার লকালে আর টাকা বের ক'রে নেয় যদি মিলিয়ে ভুলট থেকে। কাননিকা প্রতি সোমবার আগবেই, কারণ পরিবার তার মুখেরো থাকে বাতোরিতিদের বাসানে আর

ইনকার টাকসের অফিসার অরি পাখুলীও পৌ আসে বড়ের হা-মাস ফেডরারি আর মার্চ আর এই নিয়ে তার নিজের নামে চারটে, তির নামে দুটা আর ডুটিভারের নামে একটা ভল্ট টল। আফিসারের বুড়োর বতন ব'লে ব'লে কিয়ের ব'লে সবাই ভাবে ভল্টবান্ একেবারে ডাক। মাচটি-উল্টে খেতে জানেনা। আসলে ও যেনে সবই, জানে অনেক আর বোরে আশ্বাজ মতন। সখল কথা বলেন। টাকসে দেওয়ার ভয়ে। তাছাড়া ছোট সাহেবও সাংধান ক'রে দিরেছেন বড় পেয়াড়া তারপা—মুখ খুলেছে। কি করে?

ভাট ও মুখ খোলেন। আর এমনভাবে চোখ খোলেন যে কেউ জানতেই পারে না। ও জানে ওখুনের কারখারি রায়হালাদের কম ক'রে বাবে। লাগ তো আছেই, বেস্টই হবে তো কম নয়। ও জানে অমির বাহুলীর বৌর বা অতোয়ার গরপা আছে পাঁচ ভল্টে ভাঙে ওর মশটা। মেয়েই রাজার লকে বিয়ে হ'তে পারে। ও জানে সামাই অফিসার পৌরেন পেনের কটা ভল্ট, ও জানে চালের আভতহার চানারিয়ার আশ্বাজ কত টাকা' আর ময়ী অমিত সেনের কতন মেয়েমাচর [কারণ তাহের প্রত্যেকেরই ভল্ট আছে অমিত সেনের বন্ধু হুলাল সেনের লাফো!] আর বেশ বেশা রামমোহন সত্যিয়ার কটি ভল্ট, আশ্বাজ কত টাকা আর কে কে দেয়! বাহু সব জানেন কিন্তু কথাটি বলেন না।

কথা কিছু বলিয়ে ছাড়লেন কলকাতা। সহরের আঁকিরেল বাবদায়ার আর নামকরা গরোপকারি আলোকময় সেন। লাটির ওপর ভর দিয়ে উনি এলেন একটা চামড়ার হুটকেন নিয়ে আর অসহায়ের মতন ব'লে পড়লেন বাহুর সামনের চেয়ারে, বললেন, চাবিটা নিয়ে যান আর রেখে আনুন টাকাগুলো। আচরকা লাগ বেখলে মাহুপ বেমন সাত হাত পেছিয়ে যায়, বাহুও অনেকটা তাই করলেন এবং মশটাকা হবলিস্ কয়েক বে-আইনি কাজ করলেন না বলে গেই যে মুখ বন্ধ করলেন পর পর দু মফলবার আলোকময়ের লাহনে আর সে মুখ খুলেগোই নয়। ওর লজতার মুত হ'য়ে আলোকবান্ তাঁর সাতমুখ গ্রন্থপা করলেন লাহেবদের কাছে আর কম ক'রে হুটি টাকা মাইনে বাড়ানোর স্থাপরিপ করলেন শতবার। ওর মতন অমন মজেল লাহে একটা মেলেনা, কারণ বছরে কোটি টাকার কাজ হয়, অতএব বাহুর মাইনে আরও মশ টাকা বেড়ে গেল'।

কুজজতার ডায়ে বাঁচর কঠ বুললো। আলোকবান্ এসেই ওঁদের আজ্ঞা করে ওঠে। বক্তা লাহারপত: আলোকবান্। নানান গর করেন আর সাচল শেষে বাহু একদিন জিজ্ঞেসই ক'রে ফেললেন যে এতো টাকা হোখগার করেন কি ক'রে?

● হুঁচি দিয়ে! আপনাবা মাখার বাস পায়ে কেলেন আর আমরা স্তের মাখার ওপর পাঠকি। হুঁচি দিয়ে বাহুব এল চালায়, রাফা চালায় আর আমরা চালাই ময়ী। কি জানেন, জীবনবান্, তাঁরা আবারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ময়ী হন আর আবারের টাকা দিয়ে নিজেরের ময়ীও বজায় রাখেন।

● আজ্ঞা, সেন সাহেব, আপনাবা কত টাকা?

হো হো ক'রে হেসে ওঠেন আলোকময় সেন। একেবারে গ্রাণ খোলা, বর কাটানো হাসি। বাহু হকচকিয়ে তাঁকালেন। উনি বলেন—

● টাকা গোনে, বাঁকের টাকা গোনা যায়। আবারের কি আর সে উপার আছে—আবারের বা আছে সব কাগজে কলমে!

● কেন?

অবাক হ'য়ে যান বাহু। ওর ভল্টগুলোর দিকে আঙুল তেপিয়ে বলেন—

- ঐ যে গুহে ? গুহে নব্বই কাণ খোঁজা যায় !
- ও গুলো ? ওদর হিলেবের খাইরে—
- টাকা তো !
- টাকা হ'লে কি হবে, একবারে অকেজো তাই আর ভাবনা—তা হবে লাখ হুড়ি পঁচিশ !—

উঠে পড়েন আলোকময় পেন আর ভাবতে ভাবতে ব'লে পড়েন হাড় । লাখ হুড়ি পঁচিশ ! ওর থেকে হাজার হ'লেই তো হ'রে যায় সব কটা পাঁচ । হাজার হুড়ি পঁচিশ ! হাজারও চাই না শ হুড়ি পঁচিশ হ'লেই তো আশান্ততঃ উমার বিয়েটা হ'য়ে যার, অস্ত্রওলো না হ'র পরে বেধা যাবে । আর যেন কি বললেন ! অকেজো টাকা ? হাসি পেল হারুর । এমন বোকাও হারুর ছয় ? অকেজো ? আলোকময় কি যে বলেন ! কিছ, এমন লোকই হয়না—সাক্ষ্য ওগবনি ! আলাপ হওয়ার আগেই হুশারিশ ক'বে মিলেন হাইনে বাড়ানোর—একই বদে সভ্যজ্ঞসী মহাপুরুষ ! লামাত্র একটা সভ্যতার চিহ্ন দেখেছেন কি অমনি হুশারিশই হ'রে গেল ! সত্যি, অনেক ভাণা করলে তবে এমন ভালোমাহুকের সর্পণ মেলে ! আর হান ? হান কি কম ? কোথার মন্দির, কোথার মহামহীর ফাও, কোথার বস্ত্রের স্তম্ভ প্রধান মন্দির চ্যারিটি, কোথার কড়ের স্তম্ভ রাষ্ট্রপতি ফাও, বেওয়ার আর শেখ নেই ! এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই হাড় বাড়ী দিয়ে বেগলেন এবং জানলেন যে তাঁর বিপদেরও কোন শেষ নেই ।

আজ তিনদিন থেকেই বাড়ীতে একটা পরামর্শে ভাব, সবাই যেম কথা বলতেই তুলে গেছে হার তিন বছরের আরা পর্দায়, কেবল, ছয়দশ পেনেই পানের বাড়ীর মাদেপে আগে আর টে'পি, উরা, আর মানবেশ মিলে কি যে কুহর কাহুর হয় তা ভগবানই জানেন । উনি যার দ্ব্যেক ওহের সবার কান পাভবার চোঁটা ক'রেছিলেন বটে কিন্তু কমা নাটো ছাড়া আর কিছুই কানে আসেনি । আজ বাড়ী এসে যখন বেগলেন যে উরা বাড়ী নেই আর টে'পি পানের বাড়ী তখন জমার সাজ থেকেই সব জেনে নেওয়ার আগ্রহে তাকে তাক হিতেই তার পরের তিন বোন তুকের কৈদে উঠল এবং তখন খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে সে নিখোঁজ এবং নগিনেশও নিরুদ্দেশ ! টে'পি বাড়ী আসতেই হাড় বাজখাট পলার বললেন—

- তা আমাকে বলনি কেন ?
- বললে কি করতে ভনি ?

কথাটা বুঝি সত্যি । হাড় গ্রন্থটা কেবেই পেলেন না কি করতেন কিছু পলা যখন তুলেছেন তখন চোখ নাবালে আর চলবে না, তাই বললেন—

- কিছু একটা করতাম ।
- থাক । যুগ যে কত তা জানা আছে ! নিজের কাজটা যদি সমরমত করতে তাহলে আজ আর এই হোপা হতনা ।
- আ-আ-মি ? কি-কি কি করিনি ?
- মাসীর যুগের শাবনে প্রকাণ্ড হাত দুটে। সাক্ষীও ভবিষ্যৎ বেড়ে বললেন—
- বিয়ে-বিয়ে ! ধেরেধেরে বিয়ে হাওনি ! বুকেছ ? হিতে যদি সমরমত নিয়ে.....
- বাকিটা আর বলা হলনা কারণ এরাই মরো বেধা গেল উরা করে তুকেছে । চোখের সঙ্গে চোটেটাও দিয়ে পড়ল তার ওপর :
- যদি থাকে উনি—

কোমরে বাড়ীর খাঁচল ভড়াতে ভড়াতে বললেন—

● তুই নাকি কোন নাচের গোটেলে চাকরি নিয়েছিলি ?

কথাটা ঠিকই। মিন মনেয়া হল উমা। হোটেল ঠিকারজ্ঞানজালে বিশ্লেষণনে কাজ নিয়েছে। ভিনদেশে টাকা খাটিনেতে। সংঘাতটা বাড়িতে কেওয়ার মারল হয়নি, কারণ এ বিষয় মার মতামতটা ওর অবদিত নেই। আশ্রিতা আরত। ক'রে বলল—

● কে ব'লেছে ?

● তুই আগে বল নিয়েছিলি কি না ?

একবার বাবার মুখের দিকে চেয়ে আর সাহসের স্বর টেনে বলল—

● হ্যাঁ !

বলার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত খেয়ে এসে টে'পি লাড়ব ওপর গড়ে বলল :

● 'বেব', বেবে বাও তুমি তোমার আরুরে বেবের কাও—বলে কি না হ্যাঁ ! আমার বাবার এতোখত বোনেদি যেন সব সোজায় দিলো !

মার কথাই হ'তে বোঝা গেল যে এরপরই ভূত বাবার নাম নিয়ে উনি কৈনে পাড়া। বাবার ভরবেন তাই উমা মার কাছে এসে বোঝাতে চাইল বাবার কষ্ট লাঘব করবে বলেই সে চাকরি নিয়েছে কিন্তু টে'পি শুখন নিজের বাপের যেন যথাক্রমে নিয়ে এমনই উত্তেজিত যে কথা তো ভুলেনই না, বরং, 'বেবে' আবার লামনে থেকে' বলে এমন কথা। মারলেন যেহেতু যে সে গিয়ে ঠিকরে পড়ল ঠাকুরসোব ওপর, কোনো জেগে কপালটা ফাটল আর জান পাটা ভাগল বেকারখার পড়ে। এলো ভাকার, এলো ট্যাকসি তার পরই এলো পবর 'টাকা পাঠাও নইলে মজা বিপদ' বলে থেকে তার করেছ তম। পরদিন লকালে লবিখারিত ববর পাওয়া গেল যানবেপের বড় লুবিমসের মায়কং। কথা আর নলিনেশ হিমি চবিত্তে হিরো-হিরোইন হওয়ার গোতে কলেক পানিয়ে কেটে পড়েছিল ববে আর সেখানে হোটেলের ছিল বানী-স্রী হ'রে। সেখানকার এক মায়করা পত্রিচালক প্রথমে কন্যাকে বিধি ব'লে আপ্যায়িত করে, হিরোইন করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশ্বপেণ পেটে পড়বার পরই জড়িয়ে ব'য়ে দালালিটা হাবী করে। সেই নিয়ে নলিনেশের সঙ্গে লাগে ঝগড়া আর ওরা যে পানিয়ে গেছে এবং বানী-স্রী নয় এ কথাটা জানাজানি হওয়ার ফলে আসে পুলিশ আর হোটেলের টাকা দিতে না পারায় আপাততঃ আছে হাজতে। সব শুনে নলিনেশের বাবা বললেন 'ও ছেলে আমার হয়ে গেছে আর তাকে যদি এ বাড়ীতে কখন তো মাথা কাঠিয়ে বেব'। তিনি বলতে পারেন, নলিনেশ ছেলে কিন্তু কন্যাকে তো আর ও ভাবে ভালিয়ে কেওয়া হার না। অতএব টে'পি কৈবে পড়লেন বানীর পাখ টাকার ব্যবসা করার ক্ষেত্রে এবং এ কথাও বুঝিয়ে দিলেন যে বানী-স্রী হ'রে হাত কখন কাঠিয়েছে তখন বিবে দিয়ে থাকি আঁবনের ব্যবসাসিও করে দিতেই হবে, নইলে হান ইচ্ছা থাকবে না ! বিবেহ কথা তো গঠে আসে আনাখার ব্যবসায় অতঃপানের শেষ, হাতে আছে মাত্র পাভটাকা। পাভার নয় পরমা ! লাগারাত কেবে কোন ছল পাওয়া গেলোনা এবং অন্য মাতকের কাছে অনেক বলে ক'রে একটা পরমাও হার পাওয়া গেল না।

বাছারের বহাদুর টাকটা আঁক খাজে নই হল ধারের ক্ষেত্রে বহাবিরি চৌর্য আর ভাড়াভাড়িতে কেছার লম্বা বাছারের খেজটা থেকে গেল ট্যাকসিতে। টে'পির এক ঘরকে সেটা মনে পড়তেই বাছ একটুটে বেরিয়ে এসে ট্যাকসিটা বাসাতে গিয়ে খেলেন রিকশার বাজা আর ছিটকে পড়লেন নরখায়। হুটিটা অল্প ভি'তল আর চপচাপি ভাগল'। আর বোধহয় জীবনে প্রথম টে'পির ওপর মেছার ক'রে লাছ একবারে অন্যায়ের অঙ্গিনের দিকে পা বাড়ালেন।

আজ ভল্টে লোক আশার কোন দৃশ্য পড়ে গেল। সকাল বেগে বড় হাছ দমর চাইলেন বন ভরে তাবনার তত খেন লোকভলো হুড়ুত করে এসে হাড়মাশ কালি করে দিল। আসবার পর এক মিনিট অবসর পাওয়া গেলোনা আর ঠিক তিনটের পর যখন সব একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস তোলার অবকাশ পাওয়া গেল তখন আলোক সেন এসে হাজির। তিনটের এক মিনিট পর ভল্টের দরজা খোলা রাখার নিয়ম নেই, ইনস্পেক্টর কোশানীর বাগন আছে এবং লাহের জানতে পারলে চাকরি হাওয়ায় সবুজ সজাবনা কিন্তু আলোক সেনকে কি না বলা যায়? তিনি গুর হাত ছুটো হ'রে বললেন, অনেক টাকা, কোথায় নিয়ে যাবেন? অতএব তাঁকে আর হাছ না বলতে পারলেন না এবং উনি সন্তুষ্টি অন্তরে আড়াই লাখ টাকা ছুটো ভল্টে ভ'রে আর আড়াই হাজার কিছুতেই ধরানো গেল না ব'লে আক্ষিপোশ করতে করতে যখন কোমর পোতা করলেন তখন বেলা সাড়ে চারটে।

দিনটো না হয় কোনরকমে কাটল কিন্তু কথার সমজাটার তো কিছুই সমাধান হয় না—আর সেটার কিছু বাধ্যবাধনা ক'রে বাড়ী কিরবেন এমন সাংস হাড়র নেই। অতএব আর এক প্রত্যাশার চেতনায় এ কেবানী ও কেবানী করে আর হরবারির একশেষ হ'রে যখন হাড়র বাড়ীর দিকে মন গেল তখন ছটা। কি করা যায়? তাবনার সময় চাই অতএব হেঁটে হাওয়াই প্রসঙ্গ। ভল্টের চাপরাশি উত্তরলাল বোঝাই যেটে বাড়ী যায়। সে বৃত্তি দিল হাটতেই যদি হয় তো ময়দানের মধ্যে দিয়ে। তাহা বাড়ালে মনটা অনেক সম্বন্ধে ভক্তে তৈরি হ'বে যায়।

ময়দান পেরিয়ে আলিপুর এসে পৌছোতে প্রায় আটটা বাজলো আর বিরল। পার্ক পেরিয়েই যে বড় বাড়ীটা। তার বায়ে আসতেই মায়েরান হাত দেখিয়ে হাড়কে ধাক্কা করিয়ে দিল। তার সাহেবের প্রকাণ্ড গাড়ী চুকছে গেটের মধ্যে। হাড় থমকে দাঁড়ালেন। গাড়ীঃ মধ্যে দু'নামকত পরোপকারি ক্রীমালোকবর সেন। তারপর নব্বই আর রাত্তা মিলিয়ে দেখা গেল বাড়ীটা ঠাণ্ডাই। হাড়র হঠাৎ মনে হল একেই বলে ভগবানের ইঙ্গিত। জীবনে কখন পাঁচটার পর আলিঙ্গন করেন নি, আজ কেন ছটা পর্যন্ত রইলেন? জীবনে কখন হেঁটে বাড়ী কেনে নি অথচ আজ সারাদিন অনাহারে বাসা দশেও হেঁটে কেন কিরলেন? এটা ঠিক গাড়ী কোয়ার পর নয় সবচা উত্তরলালকে নিমিত্ত ক'রে ভগবান ঠিক ওকে এই পথেই পাচার ক'রে দিলেন আর উনিই বা ঠিক এমন ভাবে সেকেন্ড মিলিয়ে কিরলেন কেন বাতে ঠিক গুরই বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে হাড় ওকে দেখেন আর গুর কাছেই টাকা চাইবার কথা ভাবেন। আর পাণ্ডরায় হয়ে এটাও ঠিক নইলে ছুটো ভল্ট দশেও আড়াই হাজার বাইরেই বা থাকবে কেন? ভগবান যে এমন ক'রে গুর হাত ধরে আর দিয়ে আসবেন একথা কে ভেবেছিল? যেন যেন তাঁকে কোঁচ হাত ক'রে আর কোঁচা পাঠার অধিকার ক'রে হাড় গেটের ভেতর ঢুকলেন। হাঃহাঃ প্রথমে আপত্তি করল। কিন্তু ব্যাকের বাহু প্রবল আর আটকালো না।

বারাংবার এসে বেয়াটার কাছে জানা গেল' যে সাহেবের সঙ্গে বেয়া করতে গেলে সকাল আটটার আসতে হয়। অনেক লাখ সাধনা এবং ব্যাক ও বিশেষ প্রয়োজনের বোঝাই দিয়েও কোন লাভ হলনা। শেষে যখন ভল্টের প্রসঙ্গ হুলে বেয়াটাকে কিছুটা ভয় পাওয়াতো তখন সে 'খবর দিচ্ছি' বলে ধান করক সিঁড়ি উঠে আবার নেবে এসো এবং একটা দিড়ি ধরিয়ে কোরে কোরে টান দিল। তখনই জানা গেল যে সাহেবের বা বেলাজ এখন, সাহেব বেতে ভর করে। হাড় তাবনার পড়লেন এবং যখন ভুললেন সকালে বেলাজটা অনেক লাখ ব্যাক তখন 'আচ্ছা, সকালেই আসব' বলে প্রকাণ্ড আশার সামান্য হ'লেও আপনায় একটা ছায়া নিয়ে বাড়ী কিরলেন। টাকা না পাঠানোর অর্থ টে'পি স্বাধীর প্রায় হুঁটি চেপে ধরে

আর কি কিছু সব সনে আনন্দের আতিশয্যে সেও এক ছোড়া পাঠার প্রাতিভ্রতি দিয়ে বামীর সঙ্গে এমন ককাকড়ি করল' যে সে রাতে আশ্রমে বাসির সঙ্গে রাখাঘরে শুতে হল। শাকরারো বন্দু বন্দু আওরাজ শুনে টে'পি বললে—

● কি বের করছ পা?

হাছ গ্রাথমে তো কিছুতেই বেথাবে না তারপর সন্ধ্যার মাথা গেয়ে বেথাতেই চল। টে'পি বললে—

● তাই বল! মতলবটা আপে থেকেই ছিল তাই'লে?

● বা:

হাছ বললেন,

● সন্ধ্যার বিনা পরসায় হিজে কিনা তাই একটা বচনিন আগে মানে ইয়ে ক্যামিলি ম্যানিং.....
বুললে না...

টে'পি অবশ্যই বুলল এবং তিন দিন ধরে বামীর এবং ছোড়া বলরের চোক পুরুষের গুটি ধরে টান মারল পচা জিনিষ পাচার করার জন্যে। নেহাৎ কিছু হল না, সেটা আগার দিহি হতে না পারায় নৌভাণ্ডা।

পরদিন সকালে আলোক সেনের আকস্মিক হাছ বখন চোয়ার টেনে বসলেন সাহেব আলাহ প্রাতীকার গড়িতে তখন আটটা বাজতে পাঁচ। প্রকাণ্ড অফিস ঘরের শেষ প্রান্তে জানলা আর তারই ধারে আড়াআড়ি ভাবে সাহেবের মেহগনি টেবিল। ঘোবনে সাহেব শিকারি ছিলেন, চারিধিকে তার চিহ্ন, বাঘের মুখ, হরিণের শিং, মোহ-মাখার ককাল। ঘোবন বখন ওঁর ঘাঘ ঘাঘ তখন শিকার করতেন মেয়ে হাছব কিছু তার কোন স্বীকৃতি নেই। প্রোফ্রেসর গ্রাথম পর্থায়ে বখন বেশে বলরের রাজত্ব শুরু হল তখন তিনি প্যাণ্ট ছেড়ে বুড়ি পরলেন আর কামিনী ছেড়ে কাকন। চারিধিকে উনি চ্যারিটির বে চার কলেছিলেন ঘরের চার বেওয়ালে তার ছবি আছে—মাখার সাধা টুপি, মাখনে অনেক লোক আর শাশে হয় মহাযম্মী না হয় মুখা ময়ী, নিবন পক্ষে গভর্নর আর উনি ঢেক ভুলে ধ'রেছেন। হাছ বতে টুকলেন ডয়ে ডয়ে আর চারিধিকে চেয়ে বেথতে বেথতে চোয়ারে বনতে গিয়ে, পাণের লোকটা সাবধান না ক'রে দিলে হাতলের ওপরই প্রায় ব'সে পড়েছিলেন আর কি। তখনই লোকটার সঙ্গে হাছর আলাপ হল।

বয়স অল্প, সাতাশের খেঁচী কোন বতেই নয়। হুশর চেহারা তার ওপর ছুট্টা এমন হুশর মানিয়েছে যে মনে হল সাহেবের ছাড়া। উজ্জল ভ্রামবর্ণ রং আর লফলের ভামল আলোর চেহারা জৌলুবট। আরও জুন্দাই। হাছর চোখে চোখ রেখে লোকটা বলল—

● এতো নার্কাস কেন?

আমতা আমতা ক'রে হাছ বললেন

● না, মানে...

মুচকি হাসল লোকটা কথা আর শেখট করতে নিলোনা, বললে—

● ধায় বৃত্তি?

চোক দিলে হাছ বললেন:

● আজ্ঞে হ্যাঁ।

● কত?

● এই—যানে হালাব খানেক।

● বেহের বিয়ে কুতি ?

হাডু কিছু বলান আপনই সাহেবের আশার সফেদ পাওয়া গেল তাঁর প্রকাণ্ড আলপেসিগানের আগমনে।

● টাইগা, কহ—

গলে সাহেব ঘরে ঢুকলেন, পেছনে পেছনে ঢুকল তাঁর পার্শ্বেবর্তী বেস সাহেব। ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই হাডু উঠে দাঁড়ালেন আর পাশের দু'কটি বললে—

● শুভ বরনিং স্যার।

সাহেব জুই বেরলেন। বৃহৎ কৌটুকানোর বহর বেখে বোঝা গেল ছেলটির আসা তাঁর মনঃপূত চেয়ারে বসতে বসতে বললেন—

● তুমি কি মনে ক'রে ?

● কথা আছে।

● হুম।... আর আপনি ?

হাডু ঝিক বুবতে পারলেন না এই 'আপনি' টা কাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলা হল। উনি এদিক ওদিক চেয়ে বেরলেন স্বধাটা কাকে বলা হচ্ছে বোঝবার জন্তে।

● আপনাকে বলছি।

হুমার চোক বিসলেন হাডু, বললেন

● আজ্ঞে হ্যা, আমি।

● আপনি কে ?

● ঐ যে—চিনলেন না ?—যানে ব্যাঙ্কের ডল্ট।

● কি ডল্ট ?

মহা বিপদে পড়লেন হাডু। কথা অনেকই হয়েছে কিন্তু নামটা তো নিজের কখন বলেন নি, এখন পরিচয় কিসেবে বেওয়া যায় ? আমতা আমতা ক'রে বললেন—

● আমি ডল্টের ইনচার্জ !

● আঁহা। কোন ব্যাঙ্কের ভাতো বলবেন।

বললেন, ব্যাঙ্কের নাম এবং সাহেব ডাবলেন এবং সাহেবের মনে পড়ল' এবং তখন সাহেব বললেন—

● ইয়েস। কি চাই ? সরর আর সন্দেশে বসুন।

● আজ্ঞে আমার বেহের বিয়ে কিনা, তাই...

● নেবডার ? কার্ড বেখে যান।

● না যানে কিছু টাকার দরকার ছিল।

● ধার ? দিই না।

● স্যার যানে আমার এপারটি দস্তান।

● শুভ, লর্ড—

● তাই যানে—

এলা ওল না, টেলিফোন এলো। অনেকক্ষণ টংরেজিতে কথা হল—ও হল মাথের কথা। শেষ ক'রে সাহেব বললেন—

- হ্যাঁ ক'খন হৌ বললেন?
- আজ হৌ একঘনাই, মজান
- তা আমি কি করব?
- মানে, তার আমার এক ঘেয়ের বিয়ে আর এক ঘেয়ে পা হেতে হাসপাতালে আর—
- আগনার ফ্যামিলি ছিট্রি জনগার আমার সময় নেই। ধার দেওয়ার মতন টাকাও আমার নেই। ব্যাপারটা আশা কর মতন থেকে না যেহে হাঙ্ক একটু মরিয়া হ'য়ে উঠে বললেন—
- মানে তার—ঐ যে ডল্ট, হিসেবের বাটরে...আর কালকের ঐ আড়াই বাজার
- সাট আপ

হঠাৎ ঘড়িটা ছাড়া আর সব খেয়ে গেল—এমন কি বাড়ুর নিঃশ্বাস পায়। সাহেব বললেন—

- আপনি আমেন নিচ্ছ যে ডল্টের সব ব্যাপারটা সিনেট।
- না...আ...আজ্ঞে হ্যাঁ।
- আপনি বাটরের লোকের নামনে সে সবছে আলোচনা ক'রে বে-আইনি কাজ ক'রেছেন।

তবে বাড়ুর গলা ভাঙিয়ে লাঠ হ'য়ে গেল। দাঁড়াই তো পানের লোকটির নামনে ওলটের উল্লেনটা টিক উঠিৎ হয়নি। সাহেব ধমক দিয়ে বললেন—

- ক'রেছেন কি না?
- আজ্ঞে হ্যাঁ।
- হুঁ।

পার্সটাবিলিটিক বললেন

- মিল বোস।
- তার।
- ব্যাডের ম্যানেজারকে টেলিফোন করুন।

মিল বোস টেলিফোন জাইরেইরি খুললেন আর হাঙ্ক প্রমাণ জনলেন। সর্বশেষ হ'য়ে গেল। চাকরি বাবে নিঃশব্দ আর টে'পি পেটিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেবে। নিঃশব্দ হ'য়ে কান কাণ কটে দাঙ্ক বললেন—

- তার...
- বা বলবার ম্যানেজারকে বলবেন।

উনি আবার ফাইলে বন বিলেন। এটিকে ডায়াল বোরানো শেষ ক'রে যেমনসাহেব অপেক্ষা করছেন উত্তরের। হাঙ্ক হিসেব ক'রে দেখলেন কথা বলার সময় নেই। তথ্যিক মিল সাহেব যেমনি বললেন—

- ইচ্ছা ছাট বি ম্যানেজার?
- এটিকে সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্ক সাহেবের পা গড়িয়ে ধরলেন আর বরা গলায় বললেন—
- তার—আর করব না তার...

সাহেব টেলিফোনটা হাতে নিতে নিতে বললেন—

● পা ছাড়ুন । যেন থাকে যেন ।

তারপর টেলিফোনে খানেকার সাহেবকে বললেন, তাঁর আরও একটা ডল্টের স্বরকার । এ বাড়ী তাহলে চাকরিটা রটল । বাড়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল বীচলেন । টেলিফোন শেষ করে সাহেব বললেন—

● আর কখন বে-আইনি কার্য করবেন না ।

● আজ্ঞে না স্যার ।

● আর নতুন ডল্টটা ট্রিক ক'রে রাখবেন ।

● আজ্ঞে ইয়া স্যার ।

বাড়ী আর ঠিকালেন না । বাইরে এসে বাড়ী হাক ছেড়ে বীচলেন । ধারের কথা আর যেনই রটল না ।

ও চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোক সেন ছেলেটির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন ।

● বল ।

● আর বাড়ীতে শেয়ারা বিয়েছিল ডিক্রিডারি করতে ।

● ওটা কোর্টের নিয়ম...

● তার আমি বসছিলাম...

● তোমার বা বক্তব্য সে তো কোর্টকেই বলেছে ।

● আপনায় কাছে আমার একটা প্রার্থনা...

● বেশ হে ছোকরা টাকা আমি বুদ্ধি খাটিয়ে হোজগার করি এবং সেটা ভিক্ষে বেওয়ার হতে করি না ।

ছেলেটি উঠে পাড়ালো, উদ্বেজিত কণ্ঠে বলল—

● আমিও ভিক্ষে চাইতে আসিনি । এসেছিলাম সময় চাইতে । আমার বাবা বা টাকা আপনায় কাছ থেকে নিয়েছিলেন, দাবা যাওয়ার আগে তা সব তিনি শোব ক'রে গেছেন ।

● সে কথা তো কোর্টেও বলেছে ।

● বলেছি—কিন্তু প্রমাণ করতে পারিনি কারণ আপনাকে বন্ধ বলে মনে করতেন । যদিও নেন নি । তার বলে আপনি ব্যবসাটাতে লবই নিয়েছেন—অন্ততঃ বাড়ীটা ছেড়ে দিন ।

● আর কিছু বলার আছে ?

● না হয় সময় দিন বাকি টাকা আমি সব শোব ক'রে দেব ।

● আর কিছু ?

● না ।

উনি হাঁক দিলেন—

● গার্ডিয়ান ।

● হজুর ।

● একে সেটের রাডাটা বেধিয়ে দাও ।

● তার আর স্বরকার হবে না । বক্তব্য ।

ছেলেটি আর পাড়ালো না বই বই ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আর যাওয়ার সময় বলে গেল—

● বুদ্ধি ? বেখা হয়ে ।

● ইজিবেট !

গেন লাহোর যের লাহোরকে তিহি লেখাতে আরম্ভ করলেন—

মহীম্বোর

আপনি অন্যে আশ্রয়ের ভঞ্জে বে দু লাখ টাকা চেয়েছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি

দুই

চক্রাঙ্ক

অশ্রমানে এবং উত্তরমার আলোক গেনের উৎসাহন করতে করতে ইজ্রনীল পেট পথায় এসে থমকে গাভালো। শিঠে ফুলের ব্যাগ ফুলিরে ছোট ছেলেটা। লোহার পেটটাকে গাড়ী ক'রে বেল করতে করতে ওর পথ আটকায়ে। বললে—

● হাটে আমার গাড়ী আছে।

ছেলেটার খালটা টিপে আদর ক'রে ইজ্রনীল পুলিশের মতন হাত তুলে গাভালো। ছেলেটা আনন্দে আঁচখানা।

ইজ্রনীলের সময় নেই, হন হন ক'রে পা বাঁড়ালো কিন্তু বেশী দূর গেলেনা—হঠাৎ থেমে গেল, আর পেছন ফিরে তাকালো। ছেলেটা তখন চাকরের লগে ফুলে আছে। ইজ্রনীল, যেদে ফুরন্তেই দেখল লায়নে ওর একটা টাকসি। উঠে বলল।

আলিপুর থেকে এলমানেডের ঠাম ধরলে ঠিকিট লাগে লমেরো। পয়সা—হাছ তাই হাটছিলেন চিড়িয়াখানার সাহনে থেকে তিন এ বাস খ'রে ধন পরদায় যাবেন ধর্মভালা আর লেখান থেকে হেটে। মোড়ের মাথায় ইজ্রনীলের ট্যান্ডি ওকে পেরিয়ে গেল। তালি দেওর, ছাড়াটা যেখাই ইজ্রনীল চিনে নিল বুড়োকে। ওকে পেরিয়ে আর ত্রিক পথায় বাগদার পর ইজ্রনীল পাগলের মতন ডিংকার ক'রে ট্যান্ডিটা খামালো এবং দু'র এগে প্রায় বাগের বরমা থেকেই হাটকে ট্যান্ডিতে এক রকম জোর ক'রেই তুলে নিল, আর হুমকি দিলো ছাইভারকে।

● ভালিও ভালহাউসি !

হাছ হক চকিরে বলল—

● মানে, আপনি আমার মতে

● যেটেও না—

ওকে থামিয়ে দিয়ে ইজ্রনীল বললে

● আমার ওরিকে কাক আছে আর আপনিও যখন ওরিকেই যাবেন—বেখা হয়েছে আপাশ হুমনি আমার নাম অতন গেন—

● ও !

হাছ একটু থতমত থেয়ে গেলেন।

● :আপনার নাম ?

গল্প-ভারতী

● ও হ'ল—জীবন, জীবনযোজি গাছুলী।

● শিখাচ বুলেন একবারে শিখাচ, তার চেয়ে খাপস।

চমকে উঠলেন হাড়, লোকটা বলে কি? আশস্তা আশস্তা ক'রে বললেন—

● আমি?

● আপনি নয়—ঐ ভাউন্ডেল আলোক সেন। দামান্ত কয়েকটা টাকা হয়।

যায় যে পাননি কথাটা হাড়র মনেই ছিলোনা চাকিটা বীচার আনন্দে। এগার মনে পড়তেই মনটা যুগড়ে পড়ল। কি বলবেন কিছু ভেবেই পেলেন না। ইঞ্জিনীল বললে—

● কত টাকা?

● এই মানে শ পাঁচেক হলেই আপাততঃ

ইঞ্জিনীল এমনভাবে তাকালো গুঁর দিকে যে হাড়র কথাই শেষ হলনা। ইঞ্জিনীল বললে

● বাস? হাড় পাঁচশো?

খতমত বেয়ে লাগি বললেন—

● না মানে চারশো হ'লেও চলতো—

● বাস? আর তার ভেত্রে এসে! অপমান?

উৎসাহিত হ'রে হাড় বললেন

● কি আর করা যায় বসুন সবই ভাগা—

● তা অবত টিকই—

কথা বুঝিয়ে ইঞ্জিনীল বললে

● তা টাকার শোধ বেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে?

● তা আছে বৈকি—হাইনে গেকে আমি মালে পচিপ টাকা—

হাড়কে ধামিয়ে ইঞ্জিনীল বলল

● ওটা মালে পকাশ করতে পারেন?

● আছে পকাশ?

● আছে চলি?

● গারি।

● ঠিক আছে। আমি বেব'। চারশো। চলবে?

চলবে? চলবে? হাড়র চোপে মল এলো, কোন দকমে বললেন

● চলবে? কি বলছেন? আমি বেঁচে থাকো। নাইলে আমার মন ইচ্ছা কিছু থাকবেনা।

আপনি—মানে ভগবান—

হাড় নিচু হ'রে ইঞ্জিনীলের পা ছুঁতে গেলেন। ও পা সরিয়ে আর হাড়কে দূরত্ব তুলে বলল—

● ছিঃ ছিঃ ওকি করছেন—ওর কোন প্রয়োজন নেই।

তিনটেব সময় ইঞ্জিনীল হাড়কে তিনশো টাকা দিলো আর হাওনোট লিখে বেওয়ার কথা তুলতেই ও হাড়র দিকে এমন ভাবে তাকালো যে হাড় খতমত বেয়ে গেলেন। ও বললে—

● আমি আলোক সেন নই আর আমার আটটা ভগ্নী তিন হিন্দের বাইরে টাকাও নেই। বা আছে সেটাকে আমি বলি মন আর হাড়ের ভেত্রে বসে—

আনন্দে আর আবেগে হাতের চোপ কেটে চল এলো। আতঙ্কের দুদিনে এতোখানি বরষের কথা যেন ভাবাই যায়না। চোখ দুটতে দুটতে হাতু ঝলসেন—

● তুমি বাবা হাতু নও, বেসবুত! আর কি বলব' বল!

ওরা দুজনে গেলেন পোড়ি অকিল আর ইন্দ্রনীল টি এম ও করে কথার নামে টাকা পাঠালো হাতু হ'তে আরও একগো। ডাকঘর থেকে বেরিয়ে বললে—

● আটটার বখন ও বাড়ী এসেছেন বাওয়া নিক্তর চরমি।

হাতু চোখ আঁচিয়ে মাথা নীড়লেন। 'ইন্দ্রনীল বলল'

● ছি ছি এট বরষে এতোখানি অত্যাচার শরীর পইবে কেন? আর আপনি করবেনই বা কি? আনন্দ—

ওরা গিয়ে বলল' এলগ্যানেতে মিষ্টির দোকানে আর খেতে গেতে ইন্দ্রনীল বলল—

● ভাবছেন নিক্তর যে আমি কেন এই ভাবে ওপরদা হ'য়ে টাকা দিলাম। 'তাটনা।

হাসিলেন হাতু। কথাটা ঠিকই কিছু ভিজেন করার সাহস হতনি। 'ইন্দ্রনীল বললে

● কি জানেন, আপনাকে দেখেই আমার নিজের বাবার কথা মনে পড়ে গেল'। তিনি ছিলেন আপনাই মতন আপন ভোলা। আবেগে ওর কঁরোব হয়ে এলো আর হাতু চোখে জল এলো। ও বললে—

● তিনি বখন বেঁচে ছিলেন আমি বোকা ছিলাম তার কথা কখন ভাবিনি। আজ বুদ্ধির অগতে এসেই মনে হল, আপনাব দেবা ক'রে আমার বোকামোর প্রায়কিত্ত করি ...নিম খেতে নিম।

পাওয়া শেষ হল। হাতু খুণ ইচ্ছে হল আর বমতা কিছু টাকা বরত ক'রে বাড়ীর সকলের জন্তে বিট কিমে বেগতার অকল-আধিবাদের আনন্দ উদ্ভব করেন। কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বেধা গেল ইন্দ্রনীল হ'হাত ভরে বিষ্টির প্যাকেট তুলেছে। বাওয়াও পথে টাকনি ধামিয়ে মার্কেট থেকে কল মিল আর ফুলের তোড়া নিল' আর বিপন হালপাতালের বরষার ঝড়িয়ে হাতুকে ছেলেটুলে ওপরে পাকিয়ে দিল। হাতু অনেক ক'রে শুকে আসতে বললেন সঙ্গে কিছু ও কিছুতেই গেলোনা, বললে, সে কি হয় নাকি? আলাপ নেই পরিচয় নেই হোপ নবাব পাশে বাওয়া যাও? হাতু বললেন, আসিবং বায়। ও বললে, আগে হয়ত বেত, আধুনিক ভগতে শুটা অত্যন্ত অসত্যতা।

বাবার হাতু ছোড়া। কল কল বেধে উমা মুকুর্দী যায় আর কি। শন ওনল এক মনে মনে এই লভিকারের বরষী হাতুখটাকে মমতার আঁচিয়ে পাঠা ভাঙা বা হলে নিচে গিয়ে শায়ের হুলা নিয়ে আসার ইচ্ছেটাও বাবার বাধ্যমে জানিয়ে দিল। বাথাকে ছেড়ে আশার অজুহাতে মানবেশ পেট পর্যন্ত গেলো, অকল মায়ীর ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আলাপ করল এক তাকে অপলক বেধে এসে উমার কাছে অপলাপ করতে কহুর করল না, বললে

● লোকটাব মতলব ভালো ব'লে মনে হল না!

এই কথা নিয়ে কবেব মধ্যে মনোমালিন্তও হয়ে গেল এক 'এই বরষের মন নিয়ে হাতুবেব সঙ্গে না যেনাই ভালো' বলে উমা যে পাণ কিনে আসে। আর মূখই এথিকে পোয়ালো না।

ইন্দ্রনীল বাড়ীতে পৌছেই সোজা চুকে গেল মাদামের, টে শিকে যা ব'লে প্রণাম করল। মাদিকে বেধে 'বেধতে ঠিক-আমার বায়ের মতন' বলে মিনিট দুয়েক চোখ বুজে, ব'লে ঠাইল, ডাঘপের বিষ্টির বীতিমত হরিষ লুঠ দিয়ে একগো টাকার ছানা মোটের একটা চৈশি-মাকে দিল বায়ের বক্কো আর অস্তটা

হাসিকে দিল যাহু শ্রমায়ী তারপর বাপ লবেত যারা পর্য্যন্ত লবাইকে নিয়ে বেহিয়ে গেল দাঁকিণ বেগতে, তিনখানা ট্যাকসি ভাড়া ক'রে। হাকরিতে বাতী কিয়ে ছেলেমেয়েরা অকণহা বলতে অজ্ঞান হল, টে'পি-মা বার বার কপাল হুঁকে বললেন তর মা! ভেলেটাকে হাজার গভর খাঁড়িয়ে চাখ! আর যদি প্রায় সাধারণত চোখের ভুলে ভাগলেন। খারী মাগা যাওয়ার ঠিক সাত বছর পরে আশু উনি প্রথম নিজের বলতে পয়সা বেপসলেন আর তাও একশো টাকার মোট। ওরা সবাই ঘ'রে নিলেন ও অকণ নয়, অকণরনী অহবেশর।

এ বাহবা ক'বেব দিনে দিনে বহুদুল ছ'রে উঠল' এখন বেখা গেল যে অকণ হীতিমত নিরুদ্দেশ। কমা এলো আর তার দিনগয়েক পরে হাড়র নামে অনিচ্ছাভারে দুশো টাকাও এলো কিন্তু অকণ এলোনা। উমাক হাসপাতাল থেকে অন্তে গিয়ে বেখা গেল যে হাসপাতালের টাকা ডো পুরো বেওয়ারী আছে, যাহ ট্যাকসি ভাড়াটা পর্য্যন্ত আলাদা খানে আফিসে উমার নামে জমা আছে। ওর আশার অপেক্ষার এবং না আশার আক্ষেপ করতে করতে মাপ সাধারণ হয়ে গেল' আর পয়সা বিকেল বেলাই ইঞ্জিনীলকে বেখা গেল ব্যাডেও দরকার ঠিক সাড়ে চারটের সময়; সে হাতখানা হাড়র কুকর নামনে ঘ'রে বললেন—

● হাড়—টাকা!

হাড় অকণ! যে হাড়হাটা একশো টাকা শ্রমায়ী দেয় না চাইতেই, টাকা পোদার হুতির যতন ছড়ার আর মাঝে বাস উৎসাহ ছ'রে যায় সে পয়সা তারিখেই হাতির হর কি ক'রে?

● কৈ হাও!

তাড়াডাড়া হন টাকার তিনখানা মোট বেব ক'রে হাড় বললেন

● এ মানে তিরীপই দি, কি বল?

● উহ! কথা ইক কথা।

হাড় অভিমানে ক'রে আরও হুখানা বেব ক'রে বললেন—

● নাও তাহ'লে যা আগে চেয়েছিলে।

● উহ!

ও একটা হন টাকার মোট কিরিয়ে দিয়ে বলল—

● চলিণ। কথা ইক কথা!

ট্যাকসি থেকে উঠে বসল। গবে আগর রিষ্ট কিনল', ফল কিনল', টে'পি-মা অস্তে পাঠী কিনল', হাতির অস্তে খান আগর অস্তে বিল' ছোট্ট ইয়ানসিটাও আর কহার অস্তে সোনার তার ধীকানো ন'খা। টে'পি-মা বাব ক'রে বললেন,

● যাহ অস্তে টাকা চাইতে গিয়ে তোমার গবে আলাপ সেই কমা এলো, বিয়ে হল, ছুটি টাকাও পাঠালে কিন্তু নিজে এলেনা!

● রূপ কোর'না টে'পি-মা, পনাতন পতী মন কিনা, ঐ পই করা বিয়ে মানতে মন চায়না!

● বল বাবা ছুটিই হল!

টে'পি ওকে বলে গেয়ে হাতে বেন বর্গ পেলেন, বললেন

● জনলে তো? কি বলেছিলাম? হু

হাড় বললেন

● তা কি করবে বল? মাঝে যদি সাত পাকের ফিরে বরচা না কুলোয়—

● টিকই তো—

উমা বলল’

● যেমন দিন কাল ডেমনি বাবতা। আন্ধকাল

ঘোর আছে ?

ইজ্ঞনীল বললে

● সব আছে। তোমার বিয়েতে কেপে নিও !

মানবেশ চুল ক’রে একদাধে ব’সে এদের কথা শুনিছিল, উমার বিয়ের কথায় কানটা উচু ক’রে লপাটা মন দিয়ে শুনে বলল’—

● কে বেথাবে ? আপনি ?

● উহ’। আমি একলা নয়। আমার লকলে।

এমন ডাবে ও তাকালো উমার দিকে যে মানবেশের ইচ্ছে চল লোকটাকে পুন করে। কথাটা না বাত্বালেও চলত কিন্তু উমার মাছব বুদ্ধি হারিয়ে মারে মারে ছেলেমানুষের তম হ’য়ে যায়। তুম্বা কাকিয়ে ও বলল—

● তা বিয়েটা কবে ?

এক পাল হাসল ইজ্ঞনীল, এক চোখ চাইল উমার দিকে, বললে—

● যেদিন উমা বলবে !

গাণারটা কমেই বাগ্ন হক্ষে কিছু কৌতুহলও মানবেশের কমছে না। বলল—

● শামটি কে ?

● উমা জানে।

বলে ইজ্ঞনীল আর পাঁত্বালো না বেশ একটু নাটকীয় ভাবেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাগ্ন কিছুট বুললেন না। টে’শি মনে মনে ভাববানের পরে আরও একজোড়া পাঠা। মানত ক’রে রান্নাঘরে গেলেন ওর খাওয়ার বাথবা করতে। ঘরে রইল মানবেশ আর উমা। মানবেশ বলল

● হ’বু।

উমা পাঁত্ব দিয়ে নথ কাটল। মানবেশ বলল’—

● কিছু বল !

● কি ?

ইচ্ছেটা ছিল, বলে ‘তোমার বিয়ের কথা’ কিছু অভিমানে ক’রে বলল—

● কিছু না।

ব’লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল’। উমা বাগ্ন হ’য়ে গেল রান্না ঘরে মাকে সাহায্য করতে।, রান্না শেষ হল নটায় আর প্রতীকা শেষ হল রাত একটায় উমার ডানাবার। ইজ্ঞনীল সেই যে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—আর কিয়ল না—সেদিন না, তারপরদিন না—পুরো মাপটাই না। এলো সেই পরল্য টাক। নিতে, চল্লিশ টাকা, আর গেল পুরো একশো চল্লিশ বিসিয়ে দিয়ে। এবার উমা শুকে চোখে চোখে বেশেছিল, তাই খাওয়া পর্যন্ত থাকতেই হল এবং খাওয়ার পর উমা বনন নিম্বের দাঁধানে থেকে অমানো টাক। ওর সামনে ব’য়ে বলল’

● আপনাব হা পাখনা নিয়ে নিম্ন—

ও তখন উমা'র দিকে এখন অসহায়ের মতন তাঁকালো যে উমা লজ্জার মরে যাওয়ার উপক্রম।

ও বললে—

● কেন ? আমার এ বাড়ীতে আদা যাওয়া কি তোমার পছন্দ নয় ?

● তা নয় ।

তাহ'লে ?

● ভীষণা আমার পছন্দ ।

● টাকা দিলেই তো পো'ব হ'য়ে যাবে । ভয় কি !

রাগ হল উমা'র, বোধহয় পরাজয়ের প্রাণবলো । বললে—

● মেটা যে হবে না তা আপনি জানেন ।

● জানিনা তবে আশা করছি ।

● তাই বৃষ্টি আপনি আমারে ছুঁলত'র সুবিধে বেন ?

অবাক হল ইন্দ্রনীল । মেয়েটা বলে কি ?

● সুবিধে নিই ? কি ক'রে ?

● আপনাব টাকা আছে আর আমারে টাকা নেই প্রতি মাসে এই ছুটো কথাই আপনি চোখে

খাঁকুল দিয়ে দেখিয়ে যেন ।

কথাটা এক পলক মনে মনে অস্বাভাব্য ক'রে ইন্দ্রনীল বলল

● বোধহয় ।

সঙ্গে সঙ্গে উমা চেপে ধবল,

● কেন বলুন তো ?

অনেকক্ষণ কি তাবল ইন্দ্রনীল তারপর আঁতে আঁতে বলল—

● সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক জানিনা । কখন তাবি যে এটা আমার রিক্ত জীবনের একটা বন্ধিন আমায় আবার কখন বৃষ্টি এটা আমারে বৃষ্টিজীবী জীবনে আমার একটা বিলাট ইনভেস্টমেন্ট ।

এবার হুণ ক'রে তাবল উমা, তবে খুবই অল্পক্ষণ, বলল—

● কি চান আপনি ?

নাটকীয় ভঙ্গিমা'র ভুক্ত তুলসো ইন্দ্রনীল, তারপর আঁতে বলল—

● বলব ?

একটু তর পেলো উমা, তাড়াতাড়ি বলল

● তার আগে আমার একটা কথা আছে ।

● বল ।

● আমি মানবেশকে ভালোবাসি ।

হো হো ক'রে যেলে উঠল ইন্দ্রনীল । বললে

● তুমি অত্যন্ত অসংকারি ।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাহিনী ইন্ডোনীল, হাণ্ডে জলে উঠল উমা ; দুটো ডতি বোট ছুঁতে মিল গর গায়ে বলল—

● নিয়ে যান আগনার পাওনা টাকা ? আর কখন এ বাড়ীতে আঁগনি পা য়েবেন না !

যেতে যেতে খেদে গেল' ইন্ডোনীল, শেছন কিংবে ডাকালো, বললে—

● বে টাকা ইনডেস্ট করি দে টাকা লাভ সম্বত নিই। বাববা কেদে হাত ভাট্টে বেওয়া আনার অক্সেল নয়।

বেদিয়ে গেল। হা হু ঘরে ঢুক বললেন—

● আরে বাবা ! এতো টাকা ?

দুড়তে দুড়তে বললেন—

● ফেল গেল' দুর্ভি ছেলেটা ? পাগল, পাগল, বদ পাগল—

● পাগল ?...পেশানা...

উমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হা হু হুতত হ'য়ে চেষ্টে রইলেন।

পুরো মাসটাই ইন্ডোনীল এলোনা আর' মাসের মাসখানে না আসাটাই ওর নিয়ম হ'য়ে গাড়িয়েছিল ন'লে কেউ সেটা নিয়ে মাথাও ঘামালোনা। শরের শয়লা, অড্রাপ মতন চল্লিশ টাকা আলাখ। বের ক'রে, হা হু ব্যাক থেকে বেরিয়ে এলেন লাড্ডে চারটার আর অবাক হ'লেন ওকে না বেথতে পেরেই। এই আসে এই আসে ক'রে খটা। ভুয়েক ব্যাকের সামনে পাশচারি ক'রেও যখন সে এলোনা তখন বেকনার একটা বোকা নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন আর মনকে প্রবোধ দিলেন যে সে নিকর সোঝা বাড়ীই পৌছে গেছে।

চৌশিয়া আর মাসি বে ওর মা, ধরেই নিয়েছিলেন ও কড়ার সঙ্গে আসবে—যেমন আসে। আর উমা, গভবরের মতন, ওর ওপর চৌকিদারি করবে আর পাবার সম্বন্ধ করবে বদরখানি। মাসি বাতায়ের হস্তে টাকা বের ক'রে দিলেন কিন্তু ক'রায় বাবী সে টাকা কিরিয়ে দিয়ে নিজেই প্রথম পাওয়া মাইনের টাকা থেকে এক দুটে বাতায় আমল ; আর মা মাসির সঙ্গে ব'লে ক'রায় বাবী বোকা রাখা করল। কেবল একজন জানতো যে অরণ নাও আসতে পারে। তার নাম উমা। মানবেশের কথায় এবং কিছুটা তার হুজিতে উত্তেজিত হ'য়ে ও অরণকে সেদিন খানিকটা অপমানই করেছিল এবং ও চ'লে বাওদায় পর অপরায়ের একটা ছায়া এমনভাবে ওর মনের ওপর ছড়ালো যে লাবা মাল অরণের আশার অপেক্ষায় বলতে গেলে ব'লেই রইল। মানবেশ বাড়ি রেখে ব'লেছিল যে অরণের হতলব ভালো নয় এবং সে আসবেই আর উমাও বনে মনে চেয়েছিল যে অরণ আহুক হাতে মানবেশের কথামত, মোকটার হতলব যে ভালো নয় এটা প্রমাণ হ'য়ে থাক। কিন্তু, চাইলে কি হবে ?—মনের কোণায় যেন তার সম্বন্ধ ছিল যে অরণ কিছুতেই আর আগবে না। আশ তাত লম্বের অগ্নেই ও ডিউট লারল, আর জত পথে কিরতে কিরতে হু হু থেকে আশাকে রক্ত ব'লে থাকতে দেখেই বুকে মিল' যে অরণ আসেনি। আশাকে আশর ক'রে কোলে তুলতেই সে ওর গলা দড়িয়ে'কেদে ফেলল' আর অরণের কথা বলতে বলতে কৌশাতে আরক্ত করল'। অগ্রহিন ও কিরলেই হা হু একখাল হেলে যলেন 'এলি ?—কিন্তু আশ আর দুখ তুলে বেথলেনও না—যেন অরণের না আসাটা ওরই অপরাধ।

মা আর মাসি রাগা গেরে উঠলেন লাড্ডে মটার আর তখনও সে আসেনি ব'লে দুঃখের মতো

আলোচনা করি ত্রিক হল যে এলেই তাকে বেশ কয়েক বঁকে বেওয়া হবে। কমা বসটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দ্বিতীয় সপ্তক বাড়ী চলে গেল, হাছ এগারোটার সময় আঙ্গুর কোলে নিয়ে বসে যেসেন আর রাত একটার সময় ওর না আশা নিয়ে আলোচনা করতে বসে দেখা গেল যে অঙ্গুরের ঠিকানা থেকে আরম্ভ করে ঠিকানা নিয়ে পঞ্চাশ কিছুই এঁদের জানা নেই। ওর যা বাবা নেই এটা কথার কথার জানা গেছে, ঠিকানা জেনে নেওয়ার প্রয়োজন এখন হয়নি আরও যে কলকাতার বাইরে থাকে তা বোধহয় একদিন কটেকে কিছু একটা কথা প্রসঙ্গে বলেছিল। গতবার বাওয়া হাঁওয়ার পর আর চলে বাওয়ার আগে উয়ার সঙ্গেই কথা হয়েছিল বলে টেপির কাছে উমাকে কথা জেনতে হল এবং কৈকিয়ন্ত কিছু দিতে হল। “মা এবং মাসিমা দুজনেই একে শাক প্রকারে বুঝিয়ে দিলেন যে অঙ্গুরের মত ছেলে লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ আর মানবেন যে ওর নব্বেরও অযোগ্য তা নিঃসন্দেহ। পরদিন মানবেন মন দিয়ে সব কথা শুনে রাখল আর প্রাণ দিয়ে একটা কথা বলে রাখল যে ও যদি অঙ্গুরকে বুঝতে চুল কয়েক থেকে ডো ওর শিকাই চুল।

পরের পরলায় সকলেরই অপেক্ষা বেশ খানিকটা অবৈধ হ'য়ে উঠল এবং তাঁর পরের পরলায় থেকে সকলের মনেই অঙ্গুর হ'য়ে উঠল, প্রথমে স্মৃতির সত্তার ভাষায় অঙ্গুর বিনোদন তারপর স্মৃতির ইশারা আর মাল ছুরেক পরে শুষ্ক অতীতের অদম্ব্য ছায়া। আত্ম আত্মে আত্মা একে কুলে গেল। কমা অনাগত সন্তানের যন্ত্রে ভুবে গেল, টেপি জন্মের পর শত বাস্তবতার হারালেন, মাসি মনে মনে প্রতিদিন তাঁর কল্যাণ কামনা করলেও বুঝে কিছুই বললেন না; উমা নিজের অপরাধের বোঝার মনের কাছে অবনত হ'য়ে রইল আর পরের পর স্মৃতির অসহজে অগতির পাহারা পাওয়ার কারণে হাছ কলকাতার তার কাছে নিজের মনেই কেনা গেলার হ'য়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে, আলোক সেনের সঙ্গে হাছ নিরন্তর দেখা হল ভুল্টে আর প্রথম দিন অগম্যের আশা মনে মনে উপলব্ধি করলেও, ওঁরই বাড়ীতে হাছের ভাগ্যে অঙ্গুরের হ'য়েছিল বলে ওর সব অগম্য কুলে গিয়ে, মনে রাখলেন দুটো মধুর অভিজ্ঞতা—বাইনে বাড়ানোয় হুপারিশ আর চাকরিটা না পাওয়ার করণ। এই ভাবে আত্ম আত্মে সকলের জীবনে ও যখন স্মৃতির সপ্তক হ'য়ে উঠেছে আর হাছের জীবনে শোভাগায় স্মৃতির আনন্দ জন্ম হঠাৎ একদিন ইজ্ঞার মূককণ্ঠের মতন এসে উপস্থিত।

তিশ

১ ছুরি ৯

সেদিন সোমবার। ভুল্টের অক্ষিপে হাছ ভ্রমার থেকে গনককে বের করে, গল্প হ'য়ে প্রাণের সেয়েই জোখ তুলে যেসেন সাহসে স-শরীরে অঙ্গুর। গারে তার ময়লা হুট, মূখ ভক্তি বাড়ি আর টাইটা হস্তির মতম পল্লীর মূল্যে। একে দেখে হাছ অবাধ আশা চেহারা দেখে হতবাক। প্রথমে তো বিবাসীই হল না যে এ জীবনে দেবতার দেই পরমতম এবং প্রত্যেক আশীর্বাদ অঙ্গুর, আর যখন হল তখন হুখ হল ওর দুর্ভাগ্য দেখে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর বললেন—

● কি ব্যাপার ?...এ কি চেহারা ?...

হাতের ইশারায় ওকে খামতে ব'লে ইন্ডোনীল চেয়ারে বসে পড়ল আর টেবিলে মশকুতের মিনিট-খানেক কাঁদল। হাছ আবার বললেন—

● কি ব্যাপার ?...অকণ। বাবা ?

● ভয়ানক বিপদ।

● কি হল ?

ইন্ডোনীল উঠে গাড়াগো, বললেন—

● সে অনেক কথা। এখানে হবেনা আপনি খটা। দুয়েকের মধ্যে দুটি নিয়ে আমার দবে আপনতে পাবেন বড্ড উপকার হয়।

● কিন্তু কি হয়েছে বল না !

● আমার স্ত্রী...

ইন্ডোনীল বেধে গেল লক্ষ অবশেষে, চোখ দুটো আবার ছল ছল করে উঠল। হাছ বললেন—

● তার মানে ? বিয়ে করেছে ?

● অনেক দিন। আট বছর। এতোকণে বোধহয় শেষ হয়ে গেছে।

● দে কি ?

● সব বলছি আপনি আছেন বড্ড বিপদ।

● বোল—দুটি নিয়ে আসি।

বড়শাবুকে বলতেই দুটি বছর হয়ে গেল চার খটার মধ্যে।

বাইরে এসে ওরা দুজন গাড়ীতে উঠলেন। একটা পুরোনো-ফিফটি। সংক্ষেপে যা বলল ইন্ডোনীল তাতে গোড়া গেল যে আশ দিন মশেক ও বেশ বেধে এসেছে স্ত্রীকে নিয়ে। কলকাতার ভালো একটা বাড়ী গায়নি ব'লে আশাত্তত আছে আটোরিয়ার। আশ লকানে ছেলেবেলা থেকে পৌছে ওরা চত্বর ঘিরে আসছিল সহরে; রাগায় হঠাৎ গাড়ীর ধরল গুলে যায় এবং ওর স্ত্রী চন্দনা চলন্ত গাড়ী থেকে পড়ে যান আর পেছন থেকে একটা গাড়ী এসে তাঁকে চাপা দেয়। প্রচণ্ড আবেগে অকণ দুঃখাটার ওপর বার কয়েক ঘূঁষি মারল। 'বাহা অকণ, এতো উত্তলা হ'লে কি চলে বাবা ?' বলে হাছ ওর হাতখানা ধরে ফেললেন আর তখনই লক্ষ্য করলেন যে অকণের কোটের হাতার ক্ষেত্রের দাঁশ। বেধে অকণ বলল, যে আশখটা হল আর জান হওয়ার লক্ষ্যে লম্বাই চন্দনা 'বিবেক বিবেক' বলে ছেলের ক্ষেত্র কাঁচাকাটি করছে অথচ ছেলেকে ছল থেকে নিয়ে আসবে এমন সময় ওর হাতে নেই কারণ একুনি একটা ইনসেকশন ওকে কলকাতা সহর খুঁজে বের করতে হবে। অন্ততঃ ও একটা চিঠি আর বশটাকার দুখানা নোট হাছর হাতে স্ত্রীকে দিয়ে বললো—

● এই চিঠিপনা দেখিয়ে আমার ছেলেকে আপনি ট্যাকসি করে নিয়ে আছেন ওর স্থল থেকে।

জিজ্ঞেস করলে যেন দুখটার কথা বলবেন না শুধু বলবেন যে ওর মা চন্দনার খুঁজ অস্থব।

● কোথায় নিয়ে আসব ?

● ও ঠ্যা তাও তো হটে। পোছা নিয়ে যাবেন ওরালডাকে আর আমার নামে না হয় একটা তবল কম নিয়ে নেবেন

● তা তুমি যে বললেন

● আটোরিয়া ? সে আপনায় আর আর কিছুতেই নয়।

● ঠিক বাবা। ঠিক বলেছ ও অপরা ঘরে—

হাতুকে ধানিয়ে ইন্দ্রনীল বলল—

● তাই'লে আপনি

● নিশ্চয়। আমি এতুনি খাচ্ছি।

হাতু বরাহে উঠলে উঠে ট্যাংকসিতে লাফিয়ে বসলেন আর ইন্দ্রনীল গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

আলিপুরেব ঘোড়ে, মারোবাড়ি শস্তাগারের নতুন ব্যবসা 'জ্যাক মাও জিল' হল আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির বাকলমে অতি আধুনিকাসের পরিচালিত একটি শিল্প অঙ্গঠানের নামে শিক্ষিকাদের অবসর বিনোদন। এখানে শিক্ষার চেয়ে সাহেবদারানা বেশী মিয়নেব কোন খালাই নেই আর খরচের বাপ-মা নেই। কিওয়ারগাটেন বলে পরিচিত হলেও আসলে আশুপক। বড়লোক সংসারের এটা শিল্প-আলয়। খানীয় হল কাকে বেড়িয়ে বাওয়ার পর, আধুনিক স্ট্রা, কফি পার্টি সপিং অভিবান এবং বয়স্কত আশা-বাওয়ার হবিবে তর বলে এখানে দবাই শিল্পের গাঠিয়ে নিশ্চিত হয়। আটটা থেকে-বেলা একটা পথ্য ছেলেমেয়েরা এখানে পড়া-ভনার নামে দুটোদুটি করে আর শিক্ষিকারা করেন অর্থোপার্জন।

হেটে এসে হারোয়ান স্বত্বই দাঙ্কর পথ আটকাতো কিন্তু ট্যাংকসি বেগে সরে গাড়িয়ে জালুট দিল। উনি সোঝা গাড়ীবাগান্দার বোঁবেই ঠাক দিয়ে বললেন—

● বড়ো বেবদাহেব, বড়ো লকরত।

'বড়ো বেবদাহেব' কথাটা ওমনে ভাবি কিন্তু যিনি এলেন তিনি শালকের মতন চালকা। চিঠিখানা পড়ে তিনি ঞ্চার ব'গেই পড়লেন বাখার হাত-কিরে। বললেন,—

● চন্দ্রবাহিব এতো অস্থ, জানতার না তো।

বেশী কথা বলা বাগর, তাই হাছ শুধু বললেন—

● এককম শাভন। হঠাৎ।

● হম্।

বেমদাহেবের হুকুনে বাবুদান গিরে 'বিরেক বাবাকো' নিয়ে এলো আর উনি ৩২ গাল টিপে আধর ক'রে বললেন—

● টাটা।

বিরেক এখিক ওখিক দেখে বলল—

● ভোলাবা কৈ ?

ভোলাবা বে কে লাঙ্কর সেটা অবতাই জানা ছিলো না, তাই কথাটা খুঁিয়ে দিয়ে বললেন—

● কেন আমার পছন্দ নয় ?...আচ্ছা বেবদাহেব ?...

বিরেককে নিয়ে হাছ ট্যাংকসিতে উঠে বসলেন। বেবদাহেব বললেন—

চন্দ্রবাহিকে বলবেন আমি বিরেকে নিশ্চয় দেখতে আসবো।

হাছ একবার ভাবলেন বলেই দেন ওকে যে তাই'লে হয়ত' আর বেগাট হবে না, কিন্তু তখনি আবার মনে হল, কি স্বরকার বেচারাকে দুখ দিয়ে ?

হাছ ওকে নিয়ে এলেন আর অকপ সেনের নামে চরৎকার একটা ভবল ক্রম নিলেন 'ওয়ারলডকে'। অলকপ গরে একরাশ খেলনা নিয়ে করে ছুলা ইন্দ্রনীল আর সেগুলোকে উজাড় করে বিরেককে দিয়ে হাছকে বলল,—

● কি যে উপকার করলেন কি বলুন—এখন চন্দনার সঙ্গে বেধা হ'লে হয়...আগে ওকে একটু হুসিয়ারি [আরও একটা বশটাকার নোট হাটু হাতে তুলে] আপনি আর মিথি মিথি দেখী করবেন না, চলে যান। আমি ওকে একটু লায়লাই...

হাটু বেধিয়ে এসে ট্যাকসি ধরলেন।

আলোক সেনের ঘরে বাঙালী কেরানীরা বেগানে কাজ করে দেটা অফিস নয় আত্মবল। আসলে ট্রাফিকের কারবারে অনেক রকম ব্যবহারের দরকার তাই, বেশির ভাগ কাকট উনি নিজের বাড়ীর অফিস কামরায় লাইনেন আর কাগজ সই করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে। ডিনেটে নাগাৰ হুটাকিন ট্রাফিকের ওপর ও'র প্রকৃত পাঁচতলা অফিস বাড়ীতে গিয়ে বসেন ঘটা ছুরকের সঙ্গে। এ অফিসে আসতে না চাওগার আরও একটা মত বাধা হল ওর একমাত্র ছেলের অকল্যাৎ। বছর পাঁচেক আগে অকল পাঁচতলার বারান্দা থেকে অতকিতে পড়ে গিয়ে মারা যায় ঘটে কিছু লোকে বলে যে চন্দনার সঙ্গে চট্টাচটি করে অফিসে এসে ও টেকে করে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে... বিবেক ভখন বহর খানেকের ছেল। চট্টাচটির কারণে নাকি আলোক বাবুর কাগোবাধারি ব্যবসা। অকল এখন ল পাশ করে বাবুর ব্যবসায়ে খ্যানেগার হল, চন্দনা আপত্তি করে বগেছিল বরকার সেই ও কালোবাধারি ব্যবসা, তার চেয়ে ওকালতি কর বাণীবচাবে। এট নিয়েই এসের মধ্যে চট্টাচটি হয় এবং চারদিন পরেই ই হুগটনা। সেদিনই আবার স্ক্যালবেলার অফিসে একটা খানাতল্লাসীও হয় তবে সেটা নিতান্তই ঘটনাক্রমে।

সেই থেকে চন্দনা হুপচাপই থাকে। কারো সঙ্গে বড় একটা মেশেও না। বিবেক হল বিধবা মার মত ভালোবাসা আর ব্যবহৃত ঠাখুরগার অন্ধের মত। ওকে ছাড়া কারো এক পা চলেনা। আর, আর দিন চারেক যেদিন থেকে ও অহর সেদিন থেকে তো চন্দনা ওকে মনকে হারায়। ছুদিন তো ছুলেই যেতে দেখনি তবে আশ একটু ভালো ছিল বলে আপত্তি করেনি।

দশটার কিছু পরে চন্দনাকে ঘেঁষে ভাঙ্কার চলে বাওগার সময় আলোক সেন নিচে নাথতে নাবতে জনলেন টেলিফোন বাজছে। মিস বোস টেলিফোন ধরলেন আর আলোক সেন এখন ভাঙ্কারের সঙ্গে আলোচনার ব্যস্ত তখন এসে বললেন—

● অকলী টেলিফোন।

কথার মাঝখানে কথা বলাটাকে আলোক সেন বলেন অমার্জনীয় অপরাধ। উনি কড়া মজরে চাইলেন মিস বোসের দিকে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন—

● পরে টেলিফোন করতে বগেছিলার কিছু লোকটা জনলোনা। সে বলল বরকারটা তার নয়, আপনার।

● কে লোকটা?

● নাম বললি।

● কেটে গাও লাইন।

মিস বোস চলে বাজিলেন, কি মনে করে ওকে খামতে বললেন আলোক সেন।

● ধরতে বল আমি আসছি।

বাংলা সাংবাদিকতা : একটি দামী দলিল

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাংবাদিকতা নিয়ে আর আশ্রয় অনেক পাব করি। কিন্তু কুলে বাই, এম শিচ্ছেন পূর্ণহৃদয়ের
কী প্রচণ্ড আবেগধর্মী উচ্চর আধুনিক সাংবাদিকতার পথ প্রণয়ন করেছিল সেই অনেককাল
পাশে বাংলা সাংবাদিকতার দল্লিগর্বে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে আর থেকে যেভাবে বহু পূর্বে।

সেই আধিযুগেই বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বেন জীবন এম্বেল্লি আশ্রয়ের মেনে। বচ মনীষী
ও বিখ্যাত বাংলায়িক বার্ষিক লক্ষ্য না করে মূল্য আধিপ্যে উৎকৃষ্ট হয়ে এই বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন।
হয়তেনই বিপুল অর্থকতি বীকার করেছেন, বহু পত্রিকাই অত্যন্ত পরমায়ী-স্তায় ছিল। কিন্তু কোন পত্রিকাও
সাহসিকাল দিয়ে তার পিছনে যে উচ্চ বা যে আশ্রয় ছিল তার বিচার করা যাবেনা, বিচার করতে হবে সবত্রায়ে
সে যুগের সেই চেতনাকে।

প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকারই নিজ নিজ বক্তব্য ছিল, আশ্রয় ছিল, প্রচার করার বিশেষ বাণী ছিল।

এক বিবরে তাঁদের মধ্যে মতবৈধতা ছিলনা। তাঁ হচ্ছে, দেশের লোককে সংশ্লিষ্ট। যেহেতু, তাঁদের মনে
মহৎ চিন্তার প্রেরণা দেওয়া, তাঁদের মস্তিষ্ক তেজা, তাঁদের মধ্যে সেন্সেগ্রন সঞ্চারিত করা। পববর্তীকালের
কংগ্রেসীয় ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃত রূপে তাঁদের অবদান অবসীকাধ। নিজদের পত্রিকার বিক্রি
বাড়াবার জন্যে পট্টেকের লক্ষ্যচিহ্নকে বদলিত করে ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্যে তাঁরা মানতেন না।

আরকের পাঠকের পক্ষে সেই সব পত্রিকাগুলির ও তাঁদের সম্পাদকের নাবগুলি জেনে রাখা
সরকার বলে মনে করি। এই সম্পর্কে খাতিয়ামা ভারতবর্ষ ও পিন্ধাপ্রচারক রেডারেল লঙ্ক ১৮৭৫ সালে
একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে সেটি সরকারের কাছে পেশ করেন। সেই প্রামাণ্য স্মরণান হলিল থেকে আশ্রয় যে
তালিকা পেরেছি তা নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম।

১৮১৮ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রের তালিকা

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	স্থায়িত্ব	সম্পাদকের নাম
সমাচার বর্ষ	১৮১৮	২১ বছর	ডে মার্সিয়ান
সংবাদ কোমলী	১৮১৯	৩০ "	ডাবিটাইল বসন্ত ও ডাবানী
			চরণ মুখোপাধ্যায়
সংবাদ তিমিরবাণ			কৃষ্ণ মোহন দাস
বঙ্গবত			নীলমতন হালদার

ସଂବାଦ ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୦	ଦିବରାତ୍ର ଶୁକ୍ର
ସଂବାଦ ସୁଧାବର	୧୮୭୦	ଫେବୃଆରୀ ସାତ
ଜ୍ଞାନାବେଶ	୧୮୭୧	ବିକ୍ରମାଦିନ ସୁବୋଧାଧ୍ୟାୟ ଓ ହସିକ ନାଟକ
ସଂବାଦ ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୧	ଅଭ୍ୟୋହନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ମାତ୍ର ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୧	ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଶ୍ରୋତାବର
ଜ୍ଞାନାବେଶ	୧୮୭୧	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସଂବାଦ ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୨	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସଂବାଦ ପୂର୍ବଜ୍ଞାବେଶ	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସଂବାଦ ସୁଧାବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସଂବାଦ ବିବାହବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସଂବାଦ ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସଂବାଦ ନୌବାସିନୀ	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସମସ୍ତ	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବାଙ୍ଗା ପେଟେଟ	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସୁନିବାସର ପତ୍ରିକା	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଅଭ୍ୟୋହନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜ୍ଞାନବର ପତ୍ରିକା	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ନୂଆବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସମାଚାର ଜ୍ଞାନବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କାବ୍ୟ ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜ୍ଞାନାବେଶ	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସଂବାଦ ବାର୍ତ୍ତାବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବିଦ୍ୟୁତ୍	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସଂବାଦ ଅଭ୍ୟୋହନ	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବାଙ୍ଗାଳୀ ଶ୍ରୋତାବର	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସମସ୍ତ	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସମସ୍ତ	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସମସ୍ତ	୧୮୭୩	ସାମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

কৌতুহ কিরণ
সত্যধর্ম প্রকাশিকা
স্বপ্ন শুভকরী
সত্য প্রহরণ
সংবাদ বর্ধমান
বর্ধমান চন্দ্রোদয়
সংবাদ হৃদাংগ
উল্লেখ্যক
সত্য সন্ধানিকা
জ্ঞানবর্ধন
বিবিধার্থ সংগ্রহ
হুল্লভ পত্রিকা
সংবাদ নিশাকর

রাহনারায়ণ মিত্র
গোবিন্দ চন্দ্র দে
মতিলাল চট্টোপাধ্যায়
এম. টাউনসেন্ড
কালীধাম বন্দ্যোপাধ্যায়
রামভারত চট্টোপাধ্যায়
রেঃ কে. এম. বানার্জি
বেঃ ভে. গুয়েনবার
জামচরণ বসু
ঐশক্তি মুখোপাধ্যায়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র
ভারতনাথ দত্ত
নীলকমল দাস

লঙ, সাহেবের রিপোর্ট থেকে আরও জানা গেছে যে উল্লিখিত ১০ খনি পত্র পত্রিকা ছাড়াও ঐ সময়ের মধ্যে কলকাতা এবং আশপাশ থেকে আরও কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা বেরিয়েছিল। কিন্তু তাহের পরমাণু ছিল মাত্র কয়েকমাস এবং তাহের স্বল্পে বিশদ কিছু জানাও যায়নি। তাই তাহের তালিকাভুক্ত করা হয়নি। লঙ সাহেব আরও লিখেছেন, ঐ সমস্ত সাময়িক পত্রিকাগুলি (তাহের মধ্যে ২৪টি দৈনিকও ছিল) গেই আবিষ্কৃতও হয়, নিতীক এবং লিপিনুপুণ্য পত্রিকাগুলি সাংবাদিকতার যে মজীর উপস্থাপিত করেছিল, তা বীভীষত বিশ্বকর এবং যে কোনো দেশের পক্ষে গর্বের ও গৌরবের কথা। সম্প্রদায়িক মতব্য ছাড়াও পত্রিকাগুলির বিভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও কম আশ্চর্যের ছিল না।

আগামী সংখ্যায়
আদিকলিকাতার ইংরাজী সবাদপত্র
বাতালী মনোবীদেব
ইংরাজী সবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা
এবং
তাদের মাধ্যমে জাতীয় চেতনাকে উদ্ভূত করার প্রয়াস।



সুখের দিনে সে ছিল না

মূল : জর্জ কেট

ছায়াব্রহ্মসম—সিডাই সাহা রায়

ঘর থেকে কণ সেপাইবা দেখিন তাকে বন্দী করে নিয়ে গেল। ডাক্তার আলেকজান্ডার পদ্মনের
জীবনে এটা একটা বিরাট ছন্দপতন। সেবার যীততি ঘরে খাঁড়ক অকারণে বন্দীকরা। কোভ
নানা রোগা আর শারীরিক অত্যাচার চললো পুরো এক বছর। ইতিমধ্যে আলেকজান্ডার বৃত্তে পাতেন সে
কোন এক অজ্ঞাত অপরাধীর শাস্তিটুকু ভোগ করেছেন তিনি। কিন্তু উশায় কি! কোম অসীকারতো
কয়েকী হাইই করে থাকে। কয়েকীও কথাই আঁধা হাসন করতে থাকে কে? বিশেষ করে দেশহোদীর কথা।
বালিনে আটক নাশীঘের পালাতে সাহাবা করাও অপরাধ কখনা সহ করে এটা আঁপা করাট চলে না।
কখনা জানতে পেরেছে নাশীঘের পালাতে সাহাবা ক'রে কে একজন বেশ পরল। সুইছে। চুখের কথা
ব্যাশারটা চলছিল রেডক্রস্ কনবীঘের মাধ্যমে। হামবুর্গবিত সুইডিস মৃত্যাবান-প্রধান পরিচর-পত্র দিয়ে
ডাক্তার আলেকজান্ডারকে বালিনে পাঠিয়েছিলেন রেডক্রস্ কনবী হিসাবে। ঘটনাক্রমে কণবীর সকল সন্দেহ
গিয়ে পড়ে আলেকজান্ডার থমসনের উপর। বাস্তবক্ষে মূল দোষী গেল নজর এড়িয়ে, সংকটে পড়লেন এট
নবীন ডাক্তারটি। বালিনে থাকাকালে উদ্ভাসনের তত্ত্ব প্রত্যাহ চৌধ থেকে পনর ঘটী বেটে তিনি যে খ্যাতি
লাভ করেছিলেন তার সবই হান হয়ে গেল এই ঘটনায়।

দীর্ঘ এক বছর পর, বাতিরক্তি মেল থেকে ডাক্তার আলেকজান্ডারকে পাঠান হয় ডরহুটা বন্দীশালায়।
উত্তর বেহর কাছাকাছি এই বন্দীশালাটি যেমনি বিরাট ভ্রমনি ভরঘর ঠাঁও। চাহিদিকে কেবল বরক আর
গরক। উকতা হিমাকের পকাশ ভিত্তী নীচে। ডাক্তার আলেকজান্ডার থমসনকে একটি ক্যান্স হানপাতালের
সার্জেন করে এখানে পাঠান হয়। কাছে যোগ দিতে এসে আলেকজান্ডার ডিসপেনসারীর ঘরকায় দুই আঁদাত
করণে ভিতর থেকে এক নারী কণ্ড তাকে হাসত জানায়। জুরী, হুম্বী এই মহিলা ডাক্তারটি তখন বেটিংঘের
রোগীদের ভিটামিন সি ইনজেকশন দেওয়ার এক তৈরী হচ্ছেন। আলেকজান্ডার আম্বলেন ইনি সন্দকনী
ডাক্তার ওলিট গ্রিৎ। গ্রিৎবর্নিনী এই সহকর্মীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত ডাক্তার আলেকজান্ডারের মনে পড়ীর

বেখাপাত করে কিশ্ব কাছের চাপে সেদিন মানসিক কোন অস্বস্তি তেমন সৃষ্টি ছিল না। বেধুতে বেধুতে একটি বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে বন্দী জীবনের ছোট আকাশটা অনেকটা বড় হয়ে এসেছে। এখনকার সীমাবদ্ধ আলো বাতাসের মধ্যে তাই প্রাণের তাগিদ অস্বস্তি করতে লাগলেন। নিরা-উপনিহার রক্তনোত, ভাকার আলোকজাগরকে আগাবাদী করে তোলে। সব ব্যাপারটা গুলিটেরও অত্যাশা ছিল না। একদিন তাই ভাকার আলোকজাগরকে হিজাঙ্গা করেছিলেন, “তাহলে ডব্বর আশনি কিছু বলছিলেন কি?” ভাকার আলোকজাগর বুঝলেন তিনি অস্তায় পথে একজনের না; তাই মনে মনে চরম খুশী হলেন। প্রথম দুই ডালবালা কমে যাওয়া উপ নিতে থাকে। এই ক্রমবিকাশের পথে একদিন আলোকজাগর স্ট্রটের হলেন। গুলিটকে উদ্বেগ করে বললেন, “আমি আমার বন্দী, আমার প্রেমের কেউ বা মৃদা হিতে যাচ্ছে— তাহলেও আমি তোমাকে যে ডালবালা তা না বলে পারছি না।”

ভাকার গুলিট আলোকজাগরকে ডালবালেন বটে কিন্তু এট বড়খট তে। শেষ কথা; কারণ যে কোনদিন তাদের মধ্যে ভাড়াভাড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটি বছর একসঙ্গে কাটাবার পর গুলিট একদিন সব কথাই মূল হলেন আলোকজাগরকে। “আমি মত পরিবর্তন করেছি; হুঁজুতি তোমাকে হারানো আমার পক্ষে কিছুতেই আর সম্ভব নয়। তোমাকে কাছে পাওয়ার একটি মাত্র পথই খোলা আছে... আমি প্রস্তুত।”

অন্ধকারের মধ্যেই তাঁরা পরিণত হয়ে আনন্দ হন। ছোট অনাড়ম্বর একটি ঘরোয়া পাটিতে এই আনন্দোৎসব গলিত করা হয়। এর কয়েকদিন পরই আলোকজাগরকে অল্প একটি কাপোশ বন্দী করা হয়; কলে পরশ্রমের মধ্যে বেধা সাক্ষাত খুব নিরস্ত্রিত হয়ে যায়। এরপর হুঁজু বৈলিন্যে বন্দী পিথিরে বন্দী হয়ে আলোর পর আলোকজাগর আর গুলিটের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করতে পারেননি। উপাচারীরা অবস্থার সমস্যা গড়িয়ে যেতে লাগলো। শেষে গুলিটের এক গোপন পথে একটি হুমাবাস পেলেন। পরে গুলিট লিখলেন, “প্রিয়তম, আমি সত্যানু সত্য। আমি এখন গৃহবীর হুঁজু লোকদের একজন। দুঃখ কষ্ট বতই গভীর আর বীর্যবাহী হোক তা জীবনের প্রতি আমার আশাকে আর মই করতে পারছে না।”

১৯৫০ সালে গুলিট প্রিয়, জনবীর মর্যাদা লাভ করেন। পুস্তকশ্রমটিকে পেয়ে কত না আনন্দ! জীবন অর্থপূর্ণ।

দীর্ঘদিন বন্দী-জীবন কাটিয়ে ভাকার আলোকজাগর ১৯৫৫ সালে ছাড়া পেয়ে বাড়ুঝনি ভেনমার্কে ফিরে আসেন। তার বিলম্বে আনন্দ পুরানো সব অভিজ্ঞাপ পরে বিখ্যা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ভাকার আলোকজাগরের বিপি বায়। পড়লেন দেশবাসীর সম্মুখে। কোপেদেহগেলে দাবা রটে যে বন্দী থাকাকালে নিজের বেপার বিলম্বে আলোকজাগর বাঁসীয়েব হয়ে কাম করেছেন। পত্রিকাগুলোও সেই খবর সমর্থন করে লোকটাকে দেশবাসীর কাছে হের করে তোলে। পুরানো বন্ধু-বান্ধবরাও এ কারণে ঘৃণার দৃষ্টি করলেন। প্রাকটিক অল হলো পকেট প্রায় অর্থপূর্ণ। সব মিলে অবস্থা দুর্বল। আইনের ঘরে আবেদন নিবেদনেও ফল কল্যা না। সেবে হতাশ হয়ে, যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা বিয়ে পুরানো বাড়ী অগাধীন বার্গের উদ্দেশ্যে একথানা টিকিট সংগ্রহ করলেন। আর কিছু না হোক তাইয়ের রিজালভারটা পাবেন সেখানে।

ঐরাণের সন্ধ্যা। বাড়ীতে একথানা করে আলো অলছিল। ভেষ্মের গাধা কাগজ পত্রের মধ্যে ঐ মর্যাদা বৃদ্ধি হলেন ভাকার আলোকজাগর। বাটাঘাটিতে আবিস্কৃত হলো একখানা দলিল চিঠি, এফিডেভিট। মিলিশত্রস্তো সখই তার দেহপ্রেম ও মানবিকতার প্রমাণপত্র। সাধারণত ছাপানো অগাধীনগুলোকে বণ্ডন করার মতো প্রচুর তথ্যপূর্ণ কাগজপত্র। একথানা ঐরাণ কাগজের সঙ্গে এগা কাগজ পত্রগুলো জড়িয়ে বাঁধা

ছিল। হস্তাক্ষর যেনেই ডাক্তার আলেকজান্ডার নুভে গারলেন এ কার্ড তার হাথা হেন্স খম্বলেনের দেখা।
 ক্রটিতে একটা বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখে গেল। অদীম আগ্রহের সঙ্গে পড়লেন লাইন কটি : "প্রিয় চোট-ডাট... আজ
 ঐটমাল সন্ধ্যায় তোমাদের কথা বলে পড়ছে। মনে পড়ছে ছোটবেলার সেইসব কথা যখন আমাদের কাটিনকা
 শিশী বেঁচে ছিলেন। মনে পড়ে বাগানে সন্দের্যে ধারে খেড়ানোর কথা। আশা করি অগ্রহিনের মধ্যেই
 তোমার সঙ্গে দেখা হবে তখন গ্রাণপুলে বিগত দিনগুলোর কথা আনতেও জানতে পারবে। শুভ ঐটমাল...
হেন্স।"

হেন্স খম্বলেন, ডাক্তার আলেকজান্ডারের হাথা। ডেনমার্কের রাতি, আলোবাতাস এদের বেতাবে
 বাড়িয়ে জুলেছিল তা নিঃশব্দেই বিসল এবং আতর্জনক। খুব ছোট বেলার এঁদের বাপ-মা থালা বান।
 কাটিনকা নামে এঁদের এক শিশী তখন এঁদের সত্যাবধানের হাতিব বেন। কিন্তু অগ্রহিনের মধ্যে শিশীমাও
 মসার থেকে বিদায় নেয়। ক্রটি তাই শৈশব থেকে তাই বহুর পথের পথিক। কালে হেন্স চলে যান
 আমেরিকায় এবং অদীম অধ্যবসায়ের ফলে ভাববিভা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতী লাভ করেন। উর্দ্ধ
 বৈজ্ঞানিকের মধ্যে তিনি নিজের কৌশল প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। ছোট তাই আলেকজান্ডার কালে
 ডাক্তার হন। কর্মক্ষেত্রে এঁরা দুজনে দুটিকে ছোট্ট পড়লেও পরস্পরের প্রতি পড়ার আকর্ষণ এদের কোমল
 করেনি।

হেন্স চাহুরী হতে যখন আমেরিকার ইনটেলিজেন্স সংস্থার কর্মী হিসাবে যুক্তিমিত ছিলেন তখন
 থেকে তাইকে কল-বন্দী হতে মুক্ত করার চেষ্টা করে আসছেন। গ্রহিকের বেশে আত্মগোপন করে ডাক্তার
 আলেকজান্ডারের সংবাদ সংগ্রহ করে আনতেন। নাৎসীদের অবৈধভাবে সাহায্য করার ব্যাপারে কে বা কারা
 সত্যিকারের অপরাধী তা যেমন বুঝে ধার করেন তেমনই তিনি যিনি পয় দিন সংগ্রহ করে আনেন প্রচুর
 হলিল, চিঠি, সার্ভিসিক্রেট, খেড়লো তাইকে নির্দোষ প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট। নিজের শারীরিক অসুস্থতা
 সংঘে প্রচুর বিপদের স্রষ্টা নিয়ে এবং কঠোর এবং কাগজ-পত্র উদ্ধার করেন। ১৯৫২ সালে সব কাগজ-পত্র
 নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরেন। অকর্মী কাজের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি তাঁকে হুজুমাৎ দিয়ে আঁকতে হয়। তাই
 সংগৃহীত কাগজ-পত্র জেয়ে রেখে যান। এতো অষ্টাদিত কাগজ-পত্র তিনি আর কাজে লাগাতে পারেননি।
 ১৯৫০ সালে হেন্স ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৯৫৪ সালে সেই সব কাগজ-পত্র হাতে এলে, ডাক্তার আলেকজান্ডারের মনে একমিত্র প্রতিজ্ঞার
 স্রষ্টা হয়। একটিকে আত্ম-বিরোধ থাকা অগ্রহিক ভীমেন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আভাস। কাগজ-পত্রের মধ্যেই কদিন
 মনটা পড়ে বইল বিভাগভরের কথাটা আঁতে আঁতে স্রষ্টা থেকে মুছে যেতে লাগল ডাক্তার আলেকজান্ডারের।

এবার অবশিষ্ট সবচেয়ে কাজ হলো। কাগজপত্র দেখে প্রধানমন্ত্রী সহবেবনা প্রকাশ্য করলেন। এর
 পরবর্তী ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ে গলিত প্রিঙ্ক ছাড়া পেয়ে বীর আটবছর পর আবার মিলিত
 হলেন বাবার সঙ্গে।

নজরান

সামবেশ পাঙ্গ

দুই ছেলে—দুই বো। ছুটি বউই সমান।

এক বউ যদি বলল, যা, আর কিছু আগনি উকলতি যেতে পারবেন না। অমনি আর এক বউ বলবে, সত্যিই তো এ বয়েশে এমনি করে ছোট্টাটুকু করে বেড়ানো কি পোষায়। কোন্ দিন বিগল না ঘটে। বড়ো বউ বলবে, সন্তরের কাছে বরেন হতে চলল মা, এবার শরীরটাকে একটু মিরোন দিন। যেহেতু বউ বলবে তার গুণের চোখের নম্র কমে আসছে। যেহেতু ছেলেমেয়েরাই লখ চলতে কত ব্যয় বিগলে গড়ে তো আগনি—।

ভ্রাস টেনে পড়া নাতনীটি টেষ্টপেশার থেকে মুখ তুলে বলবে, বিহিমাকে তোমরা মিথ্যেই বোঝাচ্ছ কোনোবার কি কথা পোনেম? এই ধানকাটার সময় আত্মক তখনই বেগবে বিহিমা ছুটছেন।

এদের এইসব কথার উত্তর বুঝা যেন না। তিনি শুধু নিঃশব্দে হাসেন। হাসার লক্ষ্য মুখে ততটা নয় বরুটা চোখে। হাসবার সময় চোখ দুটো কুঁচকে যায়। যারা তাঁর লগ্নে ঘনিষ্ঠ তাগো তানে এই হাসিটি তাঁর অকৃত্রিম—বতঃস্ফূর্ত।

অবশ্যই অকৃত্রিম হাসি—কারণ এ যে প্রাণের কথা। এই যে পূরবধূরা—নাতনিরা তাঁর লগ্নে লগ্নেতন, এই যে তাঁর কথা এত করে ভাবে এতে আনন্দ হবে না?

কিন্তু একটা প্রশ্ন তাঁরও স্রগতে ইচ্ছে করে। তবে করেন না। মুখ বৃদ্ধ থাকেন এই ভেবে যে, তাতে এরা হয়তো আঘাত পাবে।

যাপারটা এই—

বুড়ার বস্তর বাড়ি উপলভি। উচ্চারণের ফলে 'উপলভি' হয়ে গেছে উকলতি। ঐরাবপুর থেকে অনেক দূরের গর। ট্রেনে করে যেতে হবে বাঘনাপাড়া পর্যন্ত—হাইল চল্লিশ তো বটেই। তারপর গোকির পাড়ি করে বেলর হাটের দ্বায়ে দিয়ে উপলভি। গোকির পাড়ি সব সময় পাওয়া যায় না, তখন এই আড়াই তিনি হাইল গর মাঠ হয়ে হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

এই উপলভিতে বুড়ার বাপের বাড়ি। বস্তরবাড়িও কাছে—মাত্র কয়েকটা মাঠের ব্যবধান। এখানে বুড়ার প্রচুর ধান মসি। তাছাড়া বাড়িখানাও আছে। একতলা বাড়ি। কড়ি-বসুগা ভেঙে পড়ছে। ছোটো ছোটো তিনখানি ঘর। ছোটো ছোটো আমলা। কেমন যেন নিঃশব্দ আটকে যায়।

এই বাড়িতেই বুড়ার গয়—এখানেই তাঁর বাপ মায়ের শেষ নিঃশব্দ পড়ছে। বুঝা প্রতি বছর

এখানে আসেন হুঁতিন বার। সমস্তঃ দুবার ; একবার চাঁদের আঁবে একবার ধানকাটার সময়। ভাগে চাষ। বহিও কৃষাবরা অনেক দিনের পুতনো আঁবে বিশেষ, তবু বুঝকে হাতির বাকিতে হয়। ধান মশা—শেট ধান শোলোক্তা কতা। শেখান থেকে প্রগোজনমতো ধান ঐরামপুরে নিয়ে আসা, কখনো কখনো প্রগোমনে উত্তর ধান বেড়া এসব উল্লেখই করতে হয়। শেট ছোটোবেলা থেকে অভ্যাস। কৃষাবরাও হাশাংগি করে তারিক করে 'হুঁতিনার নজর' একবার উপায় নেই।

এই উপলক্ষি থেকে ঐরামপুরে চাল বার প্রতি বছর—আঁবে শেট চালে দুটি ছেলের সংসার চলে। অপর বুড়ার আক্ষেপ এইখানেই, তাঁর দুটি ছেলের একটিও এক বারের ক্ষেত্রও উপলক্ষিত হামির ধোঁস নেয় না—উপলক্ষি বার না পর্যন্ত। কী কষ্টে কত দুর্ভাবনার মধ্যে দিয়ে যে ধান আঁবার থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত সময় কাটে তার এতটুকু আঁচ হেলেনের পরে লাগে না। যে দেশের অসিকান লোকের চাষই ভরসা আঁকাশের গুণ বরাত দিয়ে যে দেশের চাষীকে লোমবন্ধেরের পোষাকের ক্ষেত্রে বলে থাকতে হয় তার যখন চাকরিসর্বস্ব-মাল্যানের চাল পাওয়া শহরে-বাকুলা বৃত্তে পাহেন না। বুড়ার ছেলে দুটিও সলকাতার চাকরে বাবু। তারাত সলসে নাকেরুণে ভঁরে আপিসে ছোটো, সন্ধ্যার ফেরে। পলিটিক্স করে—সরকারের শাসনোক্তি নিয়ে সমালোচনা করে—কালোবাকরিদের পালাপাল দেয়, ভাতের বদলে একবেলা দুটি খেতে গেলে বিরক্ত হয়, কিন্তু তাৎপরেই দেশের কুঁয়ে যে সোনার ধান প্রতিবছর এক মাল সোনার মধ্যে তাৎপরেই ভাতা পাতিল, ফাটা ছাফের নীচে গড়ো হক্ষে সেটুকু দেখবার ক্ষেত্রও কারও ইচ্ছে হয় না।

এইখানেই বুড়ার আক্ষেপ। তাই বউরা যখন তাঁকে বেতে বাৎন করে, মাতনীর যখন হনিকতা করে তখন এক একবার বুড়ার ইচ্ছে করে, বলে ফেলেন—আমি না গেলে তোমাদের ভাত দুটো কোথেকে বলা। জমিওলো দেখবার আঁবার কি কেউ আছে ?

কিন্তু পরক্ষণেই বুড়া নিজেই সামলে নেন—শুধু যে বউরা আঁবার পাঁবে বলেই নয়, কর্মজ্ঞান নিয়ে পুত্রদুটির কথাও একটু অজ্ঞতায়ে মনে লাগে বৈকি। এই ছেলেরা ছোটোবেলা থেকেই শহরের পরিবেশে বাহুব। ইলেকট্রিক আলো, পাখা, কলের মল ছাড়া এদের চলে না। লোকের ডিক্সে এসে প্রতি পরে চলতে হয়, টানে ও বালে কুলতে কুলতে জীবন বিপন্ন করে প্রতিদিন বাতায়তেই তারা অভ্যস্ত। পল্লীগ্রামকে হটাত ভালোবাসা এদের পক্ষে সম্ভব কী করে ? তা ছাড়া দেশের বাড়িতে থাকবেই বা কখন। সগ্রাহে দুটি তো মাত্র ওই একটি বহিবার। তারপর ধানও চালের হিসেব ? কত ধানে কত চালি ?—এত দুঃখেও বুড়ার হাসি পায়।

তা ছাড়া আরও একটা বিক আছে। এই বয়েলও এই যে বুড়া মেনে ধান একি কেবলই ধান চাষ করতের ক্ষেত্রে ? ছেলেরা কেউ বার না বলেই কি তাঁকে একা একা এমনি করে বেতে হয় ?

বুড়া আপন মনেই মাথা নাড়েন। না, তা নয়। আসলে, তিনি জানেন ধান ভালো উপলক্ষ্য মাত্র। বছরে এই দু তিন বার বেশে না গেলে যে ধানিয়ে ওঠেন। দেশের ওই ভাতা বাড়িবাঁদিতেই যে তাঁর শৈশব কেটেছে, ওই বাড়ির দালানে কোন আয়তায় তাঁর দায় হুদু হুয়েছিল তার শাক্তি আঁব কেউ নেই, কিন্তু তাঁর শরৎ তো আছে। এই বাড়িরই উঠোনে ওই আশপাছটার নীচে তাঁর বাবার স্মৃতিস্তম্ভ ঘর থেকে বার করে নামানো হয়েছিল—বরের ওই ছোটো জানালাগুলির কোনো একটি দিয়ে তিনি এক সময়ে গণ চেরে বাস্তবতন কখন তাঁর দামী আঁমবে কামিশপুর থেকে। এসবই যে তাঁর চোখের সামনে আঁমও হাবত হয়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর ঐ সবুজ ধান পাছ—বতব্ব দৃষ্টি বার শুধু সবুজ আঁব সবুজ।

মাথার ওপরে যেমন সৌম্যহীন আকাশের নীল—রাতির ওপরে তেমনই সবুজের সমারোহ। এ সবই যে তাঁর। এই বান ক্ষেতের ওপর দিয়ে বশন বাতাস বয়ে যায় তখন ছোটো ছেলের খুশির মতো। গাছগুলো কেঁপে কেঁপে উঠে। বুঝা যানবে শিউরে ওঠেন। এদের সঙ্গে তো তাঁর পরিচয় আজকের নয়। তারপর অগ্রহায়ণের শেষে বান কাটার পানো। পোষের প্রথম দিনে বশন মিলি শোনার গোয়ে চারিধিক ছেয়ে যায় তখন চাবার উত্তোনে বান কাড়ার মূহ। যেয়ে পুঙ্খপে মিলে এক একটা। আট নিয়ে আছড়াক্ষে আর বান ঝরে ঝরে পড়ছে। বান কাড়ার পর বান সাহা। বান খোলাজাত করার আগে হুলো দিয়ে বাতাস করে দানের ওপরকার দু'লো উড়িয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া। হায় এ মৃত্ত কি বেধা হবে বাবদ্যাহরের গুহাম ঘরে টন টন বজাবনী 'সেস্ত্রীর বরাক্ষে' ?

এ মৃত্ত হেবার লোভ আজ এতদিন পর বুঝা সাহলাবেন কী করে ? তাইতো প্রতিবছর ভখনো আবাড়ে সখনো বা অগ্রহায়ণে বুঝাক্ষে বেধা হবে ফ্রৈন থেকে বাখনাপাড়ার নিচু মার্টকমে কোনোবকনে নেমে এসিয়ে চলেছেন। পোষের গাড়ি শেলে ভালোই। মইলে—

মইলে একবার চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে দুর্বের দিকে তাকিতে বেলা ঠাঁওর করে নেন তারপরই শুক করেন হাটা। থা থা শতশূত্র মার্টের ওপর দিয়ে এসিয়ে চলেন বুঝা। মার্টের ওপর অদ্যাপ্য বানবে আলি—হুঠাং বেধলে মনে হয় যেন মাঠ জুড়ে অনেকগুলি খড়ের বগ, কিংবা মূরে বান বোঝাই পোষের গাড়ির মধ্যগতি বুঝাক্ষে মনে করিয়ে দেয় বেলের হাটের পর আর বেশি দূর নয়।

উপলতিতে বনই বান হাস জুয়েক কান্নির আশেন। বিধবা বাহুব। বাওয়া-বাওয়ার বাছ-বিজার হঠোতা আছে, কিন্তু হাঝাঝা নেই। বাড়ির কাছেই পুতুর। সেখানেই দুটো ডুব দিয়ে নেন। তারপর দুটো ভাতে-ভাত।

মঝে মঝো বত্তরবাড়ি বান। বত্তরবাড়ি কাছেই। উপলতির উত্তর দিকের একখানা আশনের মদি পার হলেই বেনপুর। কেউ কেউ বলে জ্বরপুর। বেনপুর থেকে দু'শা গেলেই একটা সীকো। তার পরেই বাক দু'গলেই বাঁশতলা। আর তারপরই কাশিমপুরের বুড়া বটগাছটা। ঐ সীকোর ওপর দাঁড়ালে উপলতির পাননের দোতলা বাড়িখানা পাট দেখা যায়।

বত্তরবাড়িতে বুঝা ব ভাতরগোয়েবর কেউ কেউ আছে। এখানে আজ তাঁর ঠাই নেই, কিন্তু খাতির আছে। সেই খাতিরটুকুই অন্তরে বুঝা প্রায় বত্তরবাড়ি বান। ছপুয়ে বান, আবার স্খো লাগবার আগে ফিরে আসেন।

এ এক বিচ্ছিন্ন জীবন—বিচ্ছিন্ন আশাবন। বুঝার কাছে তাই উপলতি বাসের এই বস্ত্র ক'টাকিন মদুহস্ত আশনের উৎস। প্রতি বছর বুঝা এখানে আসেন—একাই আসেন, কেবাব গণে বশন বত্তরবাড়ি হয়ে মূরে বান তখন প্রতিবার বেনপুর পার হয়ে এসে ঐ সীকোর ওপর দাঁড়িয়ে আর একবার উপলতির দিকে তাকান। মনে মনে ভগবানকে বলেন, ঠাঁকুর, বয়েল তো অনেক হল আর কি বস্ত্রছুরিতে আসতে পারব ? চোখে হল টলটল করে ওঠে। দুটি কাপলা হয়ে আসে, বুঝা তাড়াতাড়ি আচল দিয়ে চোখ বোছেন।

সেদিন হুহনাথ মাকে বেঁধা একটা কথা বলে কেসলে। অবস্ত্র হাসতে হাসতেই বলেছিল, কিন্তু হাণির ব্যাপার শেষ পর্ব্ব হয়নি।

কমি নিয়েই কথা হচ্ছিল। এখন আর সেদিন নেই। বান-চালের অবাধ চলাচল বহু হয়ে গেছে।

কর্জনঃ সেতি প্রকৃতির নানা রম্যতা। নিবেদন করি ধান নিবেদন খাবার ভজ্ঞেও লভ্যে আনি যাতে না।
কোণার অকলপ্রধান কোণার বি. জি. ও-র ডাউন। তার পরেও আছে রাত্তির সোফার লুক দৃষ্টি।

—তার ধান খাব রে ?

—বুড়ি মায়ের।

—তা, টেনে কেন ?

—দিয়ামপুর বাবে।

—তার মনে ধান পাচার।

এতো খেল রাত্তির লোকের জের। তার পরেও আছে পুলিশ আর হোমগার্ডের ভেদ দৃষ্টি।
এম্ব হালাফা আর এ বসে বুঝা একা পারছিলেন না। তার ওপর চোখের ছানিটাও পেড়ে এগেছে এলো
করে বেগতেও পান না। সেইরকম ছেলের বদছিলেন কিছুদিন পালা করে ছুটি নিয়ে সঙ্গে যেতে।

হেলোয় কেউ রান্না নয়। এ বলে, আমার অনেক কাজ দাবা দাক। হানা বলে ভাইকেই নিয়ে যাও।

বুঝা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, কেউ যেয়ো না। সাতের ধান মাঠেই পড়ে থাক, পাচ
জুতে লুটপুটে থাক। নিজেদের তো এ বাঁধারে চাল কিনে খাবার ঘুরেই কত ভা আনতে বাকি নেই।

এ কথার ছোট ভেসে হরনাথের মাথার নশ্ব করে আগুন আসে উঠল। বললে, তোমার ভয়
ধানের পরোয়া করি না। বসত হামই হোক চাল কিনে যাও। না হয় একবেলা উপোস দেব।

এ কথার বুঝা। কী বলতে বাচ্ছিলেন, বড়ছেলে হতিনাথ হাসির ছল করে বললে, তা ছাড়া এই
বে জুদি মা, ভয়-ভয় করত, এই ভয়ির পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা কি জানো ? 'লালস খার
ভয়ি তার' এ ঘটনা পাল হল বলে, তখন তোমার এত কালের এইসব ভয়ি থাকবে কোথায়। তার চেয়ে
এখন থেকে শক্ত হও। ভয়ির ওপর মোহ চাড়ো। বরক ভয়ি যা আছে এইবেলা বেচে দিয়ে সেই টাকার একটা
হাকিঃ যেদিন কেন, একটা প্রেশাও-ক্লার কেন, কিছু টাকা থাকে ফেল রেখে যাও, মদ্যে কাজে দেবে।

হতিনাথের কথা শুনে বুঝা তক্তিত হয়ে গেলেন। তাঁর মাথার ঘুঘুছিল 'ভয়ি যার লাঙ্গল তার'
কথাটা। শেষ কথাগুলো বোধহয় শুনে পাননি। কিছুক্ষণ ধরে এমনি একটা ভ্রমব তিনিও শুনেছেন
অন্তের মূখ থেকে। বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বাস করতে পারেন নি। সত্যিই এ কি বিশ্বাস করা যায় ? যে
ভয়ি তাঁর পৈত্রিক, যে ভয়ির মত্রে তাঁর এত দিনের এত আশা আকাঙ্ক্ষা এত কল্পনা, যে ভয়ির প্রতিটি
মুনিরপার সঙ্গে তাঁর রক্তের টান সেই ভয়ি আর তাঁর থাকবে না ! যে ভ্রমণের তিনি ছোটবেলা থেকে
যেবে আশ্রয়ে—পূজাধর্মকে যে ভ্রমণ তাঁরই ভয়ি চাব করে হাসতে হাসতে অর্ধেক কলম করে ফুলেছে। দ্বারে
বিপদে দ্বারা তাঁর কাছে অর্ধ দাবা পাচ্ছে বিনা হুদে, আত্ম ভায়াই দাবি করবে সমস্ত ভয়ি ! এ কি সত্য ?

বুঝা ঠিক কলেন, যদিও এখন অসমর্থ, তবু এমনি একবার বেলে যাবেন। এমনি একবার যে
মদ্য, পদাই আর সুরেরের সঙ্গে বেলা না করলেই নয়। সত্যিই কি তাহের মনে কোনো অভিসন্ধি মাথা
চাড়া দিয়েছে ?

কিন্তু বুঝার এগার ঘাওয়া হল না। কারও বাধা বেওয়ার মত্রে যে ঘাওয়া হল না তা নয়, কারও
বাধা তিনি মানেন না, কিন্তু বহু বিদ্যি যদি বাম হন তাহলে আর কী উপায়। বুঝার চোখেও অংখ্য এমন
হল যে তখনই অপারেশন না করলেই নয়।

বুঝাকে একটি আই-স্লিনকে তক্তি করে বেওয়া হল। হুত্যা—যত লভ্যে হানামাটা হুকে যাবে

মনে চড়েছিল তা হল না। অশাবেশান হল, কিন্তু লোকটিকে হয়ে গেল। একটি চেপের দুটি এমনিতেই কীল পরাবেও দুকড়ার শক্তি কম, বরষ তো। পঙ্কজের কাছাকাছি—তার ওপর এই সেক্টিক! তিন মাস বুঝা পড়ে চলে গেল বিছানায়। তারপর যেদিন বিছানা ছেড়ে উঠলেন সেদিন ছুটি চোখের সাহায্যেই শুধু অন্ধকার! এক লাটির ওপর ভর করে বুঝা টুপ টুপ করে ঘুরে যেতাকে লাগলেন তাঁর চিরপরিচিত সংসারের মধ্যে।

শ্রাবণ মাস কেটে গেল। এবার দেবতার করুণা মাটির বুকে নেমেছে অজল ধারায়। নিভের বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুঝা কান পেতে শোনে বুড়ির শব্দ। আর মন ভরে ওঠে। কল্পনার বেগতে পান মাঠে মাঠে টে সময়ে কৃষাগরা লাগল নিয়ে বেয়ে পড়েছে। তাইবর গায়ের রঙ আর মাটির রঙে মিশে গেছে। বুড়ি অসুখে দুই মাসের ওপার থেকে বৌওরার সঙ্গে বুড়ি—হুঁশিয়ার মতো রুগি! আর তারই সঙ্গে শব্দ শব্দ করে বক! আঃ, এ আনন্দ যে কী তা কাউকে বোঝানো যায় না। বুঝা এই কৃষকদের ছুপের শরিক তাই আনন্দেরও শরিক।

যদিও তিনি গর শেয়েছেন তাঁর মনিতোও চাষ লেগেছে, অহর গমাই তাগের সবটুকু শক্তি নিয়ে নেমেছে এগারে ফলন ভালো। করবেই, তবু বুঝার জুখ—টিক এই বছরেই তিনি মাঠে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেন না। শ্রাবণের এই বুড়ি কৃষাগরার সঙ্গে মাঝা পেতে নিতে পারলেন না।

বউরা হাসতে হাসতে বলে, আর ভেবে কী করবেন? বেশে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আপনার। এয়ার শামরা বা বলব তাই অন্যতে হবে।

বুঝা চুপ করে থাকেন।

নাভনীরা ঠাট্টা করে—দিদিমা এয়ার সারা বছর শ্রীরামপুরে থাকবে কী করে? হাশিয়ে উঠবে না? হুঁশিয়ার বললে, এয়ার বছর গমাইবের কপাল খুলল।

বুঝা এসব কথাই উত্তর কোমোদিন যেন না, আশও হিলেন না।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনে একদিন জুপুরে শ্রীরামপুরের বাড়িতে কে যেন কড়া নাড়ল।

নাভনী বললে, ও দিদিমা, এই বেশ কে এলছে।

—কে রে।

—বুড়ি মা, আমি। কেসন আছেন?

—কে অহর? বুঝার স্বর আনন্দে বাশলল হল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ মা, এ বছর তো আপনার গায়ের মূলো পড়ল না। তাই আমিই এসাম। এয়ার বা আরা কিছুশা করেছেন—আঃ! মাঠে যেন শোনা চলে যিয়েছেন।

বুঝা আনন্দে উৎসাহে উঠে বললেন। গমাই হুয়েন ওরা ভালো আছে?

সব ভালো আছে মা। তারা কেউ আপতে পারল না। বান কাটিতে যত। আহি আনছি জেন এই বানকটা পাঠিয়ে দিল।

—বান এলছে! নতুন বান! বুঝা আনন্দে উত্তেজনার কণ্ঠিত হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন।

—হ্যাঁ, মা, যেখান না বানাকলো। কীরকম পুচ্চ হয়েছ।

বুঝা হাতের মূর্তায় বানাকলো নিয়ে অভ্যাগমতো চোখের সাহায্যে তুলে ধরতেই দুটিশুট দুই চোখ বেয়ে ছুঁ কোটা। জল গড়িয়ে পড়ল।

সে আজ বেধনার কি আনন্দের কেউ বুঝতে পারল না।

যেখানে বাঙালী সেখানেই বাংলা

বিন্দু

ফিরেজ্জালাল সাত্তার (দকনো)

মামার বাড়ী।

বহুদিন পরে মামার বাড়ী গিয়েছি।

পঞ্চাশ বছরের ওপর মামার উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। ঢালচন্দনও সেটেরকম। কিন্তু অন্ধপুরে যেখানে মামীর দরবার কর্তৃক সেখানে বাংলা গৃহস্থালীর সেই চিরস্থান বাগবা, উঠানের এক পাশে সেই তুলশীমক, হাতমুখ বোবার জন্ত সেই ভলচৌকির পাশে পাত্ত গামছা সাঝানো, সেই একটি ছোট ঠাকুর ঘর, সেই বাংলায় গ্রামের বংকরা দায়া, কুলো খালা ইত্যাদি। মামীর অন্তঃকরণ তো আছেই তার ওপর আছে সকাল-সন্ধ্যা ছুর করে বাংলা রান্নাঘর নড়।

যেখানে বাঙালী সেখানেই বাংলা—কথাটির তাৎপৰ্য মামার বাড়ীতে এলেই দৃষ্টতে পাঠি।

যথাযথি আদর আপ্যায়নের পর খেতে বসলাম। পাশে মামা।

মামা আর মামী আপাতদৃষ্টিতে মনে হলে খেন খালা আর কাচকলা। কিন্তু মনের মধ্যে দুজনের কি অনাবিল শ্রুতি আর আকর্ষণ। তারই একটুকরো ছবি তুলে ধরছি।

খেতে বসার পর, মামীমা এলেন, হাতে ছোট একটি পাখা। "আমি বসলাম, "আপনি কই করবেন কেন? বিছালী পাখা তো রয়েছে।"

তিনি হাসি মুখে বললেন, "ইতো। এটাও যাকোনো বাগা যে ও হাওরতে মাছি দাড়া গেলে এসে পড়বে। ওতে আবার ভাতও জ্বলিয়ে থাকবে।"

খিবে প্রবল তবু খালা বাটার দস্তার বেগে উলিতা করে বসলাম, "মামীমা, আমাকে বেগে কি ঢাকস বলে মনে হয়, এত কি বাহুবে খেতে পারে।"

মামীমা একটু দুই হেসে বললেন, “তোমার পাশে যিনি, তাঁকে মিছামিছা কর নিজেই কী ভাবেন। একই বাটার ছাপে দুজনের ভাত এবং অল্প বিধেও কোন তারতম্য নেই।”

বললাম, “এত পদ ! এতে চাপা আর কেনা হবে, তুণ্ডি ক’রে খাওয়া আর হবেনা।”

মামীমা একটু পল্টীর ভাণেই বলেন, “তিন আবাঙ্গি যা ছাইভর পেরেছে হেঁথেকে। আবার বাতের ঘরায় হাত নড়ার উপায় নেই (অথচ পাখা অনবরত অবিরাম নড়ে চলছে) তাই তো চেবে ঠাণ্ডা করতে পারি না ওরা কী ইচ্চে রাঁধলো আর কী ইচ্চে খাওয়ালো—আমি তো ওসব বুঝিই না, তাই বুঝিও না—”

আমার খুব মৃদল অবস্থা। ডেডেরে হাসি গুহরে উঠছে। মামীমা এতক্ষণে পক্ষ বেবতা ইত্যাদি শেখ করে পড়ুসের সব আমায় বাঁচালেন, মামীমার কথা মূখ থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন, “না না তোমারও পবিত্র গোরল আর ভাতের-মুঠা চিড়ের গোমরই ভালো। ওসব ইচ্চে অস্তের পাত্রেই যিরো।”

মামীমার মুখটা যেন ফুলে খসখসে ডাব গ্রহণ করল। পাখাটি রেখে তিনি কিছু না বলে উঠে গেলেন। বরজার কাছ থেকে তাঁর বিভূষিতা যেন জ্বললাম, “জীমরতি আর বলে কাকো, খাবার সময় বত সব বাকো কথা !”

মামীমা বললেন, “জ্বলে তো, এই হোল পেটেই ঘেয়েমাছব। বাক এখনি আবার আসবেন সব কুলে। সেইটাই মাছুয়ের বিকাশ।”

জল ও নাকভাষা পর্যায় সবো রাসি শেষ হয়েচে, এমন সময়ে মামীমা সত্যিই এসে পড়লেন—ব্যাপারটাকে হালকা করতে আহমিই কথা পাড়লাম, জানতে, বিভিন্ন শব্দভি কী।

মামীমা বলেন, “কী জানি বাবা। কত সব ইক্কী মিক্কী নাম—৪০০০ বছর এখাতীর বাইরের খবর রাখিবা—উনি চিরকালই নির্বিকার—হালি মছরায় জীবন কাটালেন—সিরিঙ্গাল কোনো দিন হোলেন না—তাই ভঁকেও কউ নামে না। আমারও হাতীর হাল, হানী চাকরানীর ইছাং। সর্বনাশের মাঝায় পা, তিন থিকী এখন বুরকতী—আমি কালজু। এথিকে বাটুনির তো শেষ নেই।”

মামীমা বলেন, “হাতিকে খাটো, বাতের ওহু পাও, এথিকে ক্রনিক কোলাইটিসও বাগিয়েছ, এখন দুহু-তা হু খাট সাং, এতে আমার অপরাধটা কোথায়—”

মামীমা হঠাৎ সংঘত হ’য়ে বলেন, “শোনা বাবা, এসব তর্ক বাড়লে তোমাদের খাওয়া মাঝায় উঠবে। আমি মেছামি টিক রাখতে পারি না। উনি যেন আমাকে সহ করতে পারেন না, তাড়াত্তে পারলে হাঁচেন। বাকুপে ! ওটা হোল চাপড়খাট, বাগিনির রাসা আবারের বেশের, ওটা পটলের হরিহর, ওটা বেগুনের বিরিকী এক রাস পাখা দেওয়া (মাগো), ওটা আদু প্যাংকের পটল ভান্সা (আর কী বলি) আর ওটি মাজাতী বড়া সাধবন্। কি ছিরীর সব নাম আর তেমনি কি খাং।”

মামীমা কথা কেড়ে নিয়ে বলেন—“তুমি জানলে কী ক’রে ৩০ বছর তো তুমি ও রলে বসিত। জয় শুং ! তিনি তো তোমার কানে কজিঃ ছেড়ে দিয়ে তোমাকে সর্গ-পরিভ্রমণ করে দিয়েছেন।”

মামীমা তেড়ে বলে উঠলেন, “আবার !—দেখছ, উনি খালি আমার রাগিরে দেবার তালে আছেন—বাক সহজে আর রাখছি না, তবে ওকে বিশ্বাস নেই, তাই সত্যিই কাষের কথাগুলো সেয়ে নিই—আমাদের বাড়ীতে ২০০ বছরের ঘট মা মলচতীর নিতা পুখা হয়, তাই যা করণা সেই মাকিক বলেছিলাম, মলবাবরে একেবারে নিমামিস হবে, প্যাংক মলম খেওনা। ওয়া, তিন বৌ কোরাসের হয়ে বলে উঠলো—‘কেন,

ওভলো তো ডেভিটেসন মা—আমি খাব কোথা! খাক খাবা, ভূম কোরোনা, আক রাত আশুর খোই, মূলোর পথোটা, নড়াইট ভাটির কচুরী দিয়ে কোলো রকমে চালিয়ে নিও, কাল পেট আর মন ভরে... ”

মায়া টিলু নী কাটলেন, “অখাচ হুখাচ খেয়ো ।”

“ছি: খাবার বিষয়ে এ কথাগুলো নাকি—ও, আমায় টিউঁকিও দেওয়া হচ্ছে খাই খাবা ।” এই বলে মায়া মা ঘেন, ক্ষতপথে নয় ক্ষতবেগে চলে গেলেন ।

পরক্ষণেই তাৎপর্য বুকলান—বেশ কঠিন ঘরেই মায়া হলছেন, “বলি ও তিন কপ্পে, পাঁচনের হাতনে কুলে গেলে একটি ভরলক্ষান খেতে ব’সেছে, আর ব্যাক্তন্থ যে তার পরকার হ’তে পারে, সে হ’লটি নেই অবত পিরী হবার আখা খোস আনা ।”

সঙ্গে সঙ্গে পাতে এসে পড়ল চার হাতা ভাত, অস্ত্র তাল, কিছু ডাঙ্গা আর একটা অস্ত্র তরকারী খেতে অবত লবই ভালো । মায়া সতর্কবে খাওয়া শেষ করে হত গুটিয়েছেন, “খাইয়ে ছুটেছে তপ্তি করে হীরে-হুহে খাও, আমি ততক্ষণ একটা গর হলি স্নমতে থাক—”

“কতকাতার এক ভরলোক পারন্ত ঘোঁষি রাসুচের ব্যবসা করতেন । একদিন চিঠি পেলেন যে কারবার বৃদ্ধির অস্ত্র তাঁর দরবরাহকারী বড় মিজা পারন্ত দেশ থেকে অমূল্য দিন আসছেন । এতদিন চিঠি পয়েই আলাপ ও লেনদেন চলতো । নিশিই বিবে তিনি এলেন । বিরাট বেহ, লাগ লাগী, ইংরাজী জানা মূলধান । তিনি জানালেন যে তিনি যেখানের নানা প্রদেশে ফুর বেধবেন কী করে ও লাখ টাকার কারবার অন্তত ১০ লাখে বাড়ুকরতে পারেন । তিনি বাংলার বাজারে যুবধেন প্রথম দকার একশককাল, পরে দক্ষিণ, মধ্য ও আসাম প্রদেশগুলি ফুর কিছু তিসতী পাখর ও অস্ত্রান্ত্র মায়ায়ী নেপাল, তুতান, শিকিম থেকে নিয়ে, কলকাতা হয়ে এসে লগ্নাথ থেকে, যেখাে ফিরে যাবেন । বাঙ্গালী ভরলোক আনন্দ প্রকাশ করলেন—বিশেষতঃ যখন মিজা জানালেন আখা মূখা কুমার ।

খাবার সময়ে বিরাট খালা মিজার সামনে ধরে দেওয়া হ’য়েছে, সেটি বিবে তিনি লারী নানা আকারের বাটি, বেলিফি, রেকারী ইত্যাদি । মিজা আগন্তি করলেন, ‘এত কেন । বহু নই হবে । আমরা এ রকমে অস্ত্রান্ত্র নই’—ইত্যাদি । বহু লক্ষান বৃদ্ধ কুলিয়ে নানারকম যুগোচ্চ ও প্রতিমুখ বাখা প্রদোষ করলেন । মিজা খিড়ীযবার ফুর এলেন, এবার সেই খালা এবং দু লারী বাটী । ক্রমে দিয়ে দাড়ালো এক লারীতে এবং শেষপর্যন্ত পাতে বা ধরল তা ছাড়া কোনো বাটি নেই । মিজার কাঁচা মাল যা পরকার, কেনা হ’য়েছে, এবার বাড়ীর দিকে রওনা হ’লেন । খাবার সময়ে বলে গেলেন ‘বাবু মাল খানেক পরে আমার বাড়ী এসো, নতুন নতুন ভিভাইনের বহু মাল সঙ্গে দিয়ে দেব জুহি কোটিপতি হ’য়ে যাবে ।’

‘বাবু’ খুব খুশী, দিটার মুখে হরষ নেই । ‘কী গো, জুহি যে কিছু বলছ না ? কত বড় হু-ববব !’ পিরী ভিটুকী দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বললেন ‘ছাই’—হাড় কালী করে কোটিপতি আর ভিভারী ও একই কথা । ‘সে কী গো, কত গরনা হ’বে.....’ বলে উঠে খীরর বরেন, ‘ছেলে নেই, মেয়ে নেই টাক। গরনা নিয়ে হবে কোন ছাই । ছোটোলাকটাকে লক্ষ করতে হবে । ও পুড়িয়েছে তিন মাল জুহি দিয়ে থাকবে দু-মাল—টাকা ! জুহি বহি কর এক কোটি ও মারবে, তোমারই মাখা ডেসে, ৬ কোটি, বৃদ্ধে বৃদ্ধমান !’

দ্রী হুঁচি বাই হোক, শেষ পর্যন্ত মানতেই হয়, যখনযেও হার মেনে লজীবেহ বহন করে নাঞ্চোলাল হ’য়েছেন । ভরলোক উপস্থিত হলেন বড়মিজার চেয়ার । এটা ওটা ক’রে মাল খানেক কাটালেন, পরে আতি অতিষ্ঠ হয়ে এক ঘেরে সাঁজ বিধান খাচ লক্ষ করতে না পেয়ে, ঢেঁকীর প্রদোষ করলেন ।

হালপাশ গুছিয়ে ধীরে, আরো গ্রাম দগাং খানেক লাগলো। গ্রাম বার এমন অবস্থা। তা বার গ্রাম গিল্লীর প্রকোপেই থাক এই মনোভাব, তবু এখানে আর নয়।

বেশ কিছু টাকা ব্যয় হাতে দিয়ে, মিক্সা সাইকেল বদলেন 'বাবুজী', একটা কচা বলি, কিছু মনে কোরোনা। তোমরা যিশেষতঃ বাঙালীরা মিত্রকে বোকা এবং নিজেদের বৃত্ত বৃদ্ধিমান মনে করো এটা ঠিক নয়। তবুপরি তোমরা যা নও, তা দেখাতে গিয়ে নিজেকে বিব্রত কর। কী রংকার? ইংরাজীতে বলেছে অর্থ বহুতা বোকার করে নিলে তার দুইটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তোমরা তা কর না কেন? নিজেরা যা সাধারণতঃ খাও তাই, না হয় এক আঁটা পুজুতে, সোকেব সায়েনে দিতে বাবা কী? তারা তোমাদের প্রকৃত মান বুঝবে। বন্ধু হ'লে সহানুভূতি সহযোগে। আর বাবা তা নয় তাদের অস্ত্র পরোয়া কেন কর?

তোমাদের ব্যবহারে আমি কৃত চাইনি, ছুঁত হতেছি মাত্র। বুঝি টিকার লোক দিয়ে আপ্যায়িত করতে, তিন সাতা বাটা বিশেষ, পরে হোল দুই, তারপর এক, পরে বাটীতো উড়েই গেল, বাটার মধ্যে যে আরও ছিল না। বেশ বোকা গেল তোমার অন্তর মহল বেজার হ'লে উঠেছে—

আমার কিন্তু একটুও বাজেনা যদি কেউ এসে এক বছর থাকে, কারণ তোক আমি দু-সের মাসে বরাদ্দ করে রেখেছি। অতিথি দুজনই হোন আর বিশজনই এই দু-সের মাসে পরিমিত আনাত আর আমার বাগিচার আদু, মলমল, শাক, ঘাই বরবটী মিলিয়ে যানেক করে নিই, তবে ঠ্যা বাগের শীশু কোনওদিন পাবে আঁটা এবং কখনও একটা! ওটা সহ্য করতেই ল্যে। তার গণার রাগ একই হবে তৎকাল জু নিবরণার তরকারীর পরে। বৈচিত্র্য তো বিলাস এবং পরগণের রাগতো অস্বাভাবিক। ওগলে লাভের চেয়ে কতিই বেশি। তোমার স্ত্রী যে ইয়াবেই অহু ও খিঁখিটে হয়েছেন বেশ বুঝতে পেরেছি।

'এই যে! বাগরা শেষ হ'য়েছে। এলো উঠে পড়ি, তামাক আমার ভাঙছে। পদ্ম পাচ্চনা? ওখিৎ তাহাজ্জী, তোমার মামী আত আর মূব বেখাজেন না। কেন যে এসব ক'রে লজ্জাকে নিয়ন্ত্রণ করে, কে জানে। আমি নিবেব করলে বলে তুমি হাড় কেমন, সকালে কেউ তোমার নাম করবে না। দুদিন লোক এসে তাকে কি সাধারণ ভালভাত চছড়া হ'রে দেওয়া যায়! কালকে তিন বৌ তোমার বেহু করছে, মানে মায় তোমার অস্ত্র এবং আমি রাতে তো খাই না, তাই দুপুরে লগে থাকব বলে আমার অস্ত্রও হবে চিত্তল হাচ্ছে তাহা, কই হাচ্ছে তক্ত, মূতীবট, তেইকী ফাঁই। সকালে দুটো ভিষের অরলোট আর ফ্রাইড্ টোস্ট। বিকালে ত্রেক টোস্ট বোশা, রাতে সোপলাই পরটা আর রোগন সোশ। মাকালী মান রাগলে হয়, দেখো বাবা হাত যেনে বেও, তা না হ'লে তোমার মামী হুইলাইড্ করবে।'

কোথা থেকে মামী বলে উঠলেন, "ওদব কী অনুসরণ কথা। ছেলেমাছব বোরা আখাখ করতে পারেনি। আখ হাত থেকে আমি যেনে দেখ। আছা বাছা, ছেলেমাছব, তা বলে গেট টেসে থাকে না। আর আমি কি এতই নির্বোধ যে তোমাকে কুল বুঝব? তোমার ইচ্ছিত না থাকলে আমারের সাখি কী ওদব করি। মূব খাই বলি, তোমার উরাব নির্বেদেই তো সব কাজ হয় বাবু। আমাদের বরনাম করে লাভ কী।'

মনে মনে মামীর বিরাট হাতককে প্রণাম করলাম। তাবলার বড় বিলা মামীকে দেখলে মত পাটোতো! মামার বাড়ী থেকে কেহবার সময় একটি বন্ধু নুতি বহন করে নিয়ে গেলাম। মামা-মামী এতদিন প্রবাসে থেকেও বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার অতিথি-সংস্কার, বাংলার পূর্ণাঙ্গা অমুঠান একলি ভোলেন নি। শুধু তাই নয়, আশে পাশের গাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে তাঁদের সেই ভাবগাঢ়াকে স্ফুটিত করেছেন। মামার বাড়ীতে গেলে মনে হয় যেন বাংলা দেশে দিয়ে গেলাম।



খাদ্য ব্যবস্থার মেয়েরা

বেলা দে

আধুনিক জীবনযাত্রার দ্বারা পরিবর্তিত হওয়ার দরুন অস্পষ্ট অনেক কিছুই সঙ্গে সঙ্গে সংসারের প্রধান অঙ্গ বাসা-বাগান বাবুজীদিরও অনেক অফলসফল হয়েছে এ কথা লম্বাই স্বীকার করবেন। অস্পষ্ট পুষ্টিগতীয় কালের মধ্যে বাসা-বাগান বাবুজী বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। যে দুহিনী এই পাকতীয়ে সুস্থভাবে পরিচালনা করতে পারেন তিনিই আত্মকের হিনে সুস্থিহীনীর সম্মান রাখতে পারবেন। কিভাবে ঠাণ্ডা খরচে, অল্প পরিশ্রমে দুগ্ধোৎপাদক ও উপদ্রব্যক দাবার প্রস্তুত ও পরিবেশন করা যায় সেটাও দুহিনী হুচিন্তিত উপায়ে দিও করবেন। সংগঠিত অশচয় না করলে অভাব হয় না এ সত্যটা তিনি অবশ্যই হনে রাখবেন।

খাতে কৃষ্টি ও আনন্দ বহু পরিমাণে নির্ভর করে পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতার উপর। খাতে লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ্রিত। কিছু ভাবের দ্বারা বাস্তুকত্বের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। পাঁজাবে দু-বেলা কলী, চাপাটী খাবার রীতি আছে। আবার উল্লেখ্যের লোকেরা খাওয়ার ব্যাপারে বহুদুশ্পূর্ণ হবার ক্ষেত্রে ততুল আতীত খাওয়ার সঙ্গে ক্রমেই সম্পর্ক শেষ করতে তার বহলে পাক সহজি দুই দুখজাত খাদ্য আশ্রিত ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে। হুতমায় বাস্তুকতার তত্ত্ব বিশেষ কোনো খাদ্য অবশ্য প্রয়োজন এমন কথা বলা যায় না। অবস্থা, আবহাওয়া, পরিবেশ ভেঙে খাবার বহুলায় এবং সব খাড়েই খাওয়ার লম্বান ঈশতি সম্ভব।

কিছু যে খাড়েই আদর বাই না কেন তার মধ্যে বহুটা সম্ভব বৈচিত্র্য আনা বরকার। খাওয়ার ব্যাপারে বাবুজী একঘেয়ে কোনো নিয়ম না থাকাই উচিত। একই খাদ্যবস্ত্র একই এবিক শুধিক করে খাবলে তার প্রতি আকর্ষণ থাকে এবং খেয়েও কৃষ্টি হয়।

এখন তো শীতের সময়। সব জিনিসের চেয়ে পাক সবজি এই সময় সত্য ও সহজলভ্য। কাছেই ভাত কলীর বিকল্প হিসাবে এগুলো খাওয়া যেতে পারে।

এখানে আশি কতক বহুদুশ্পূর্ণ কথা বলছি—

ট্যামাটো সূপ :—আধপের টামাটো, দু-পেরালা আলু, আশি আউল রাখন, একটি পাজর, একটি পেঁয়াজ আদ চাখ চিনি, একটু আটার জল, লেনুও রস গোলকিচ। পেঁয়াজ ও পাজর ফুটো করে খেতে

নরম ঝাঁচে রাখেন ভাঙ্কন। বাকী সব জিনিষ লেঙ্ক করে পাঁচলা ছাঁকনিতে ছেঁকে আবার পরম করবেন। এরপর দুবের সঙ্গে একটু আটা গুলে যুগে ঢেলে ঘিন তাললেই হবে।

পালং পাকের সূত্র :—আধসের পালংশাক লেঙ্ক করে ভলটা ছেঁকে নিয়ে তাজে দু-তিনটে চামাটো ঘিনিয়ে বিয়ে অন্ন গোলমরিচ গুড়ো ঘিনিয়ে পরিবেশন করবেন।

সুপ্তর তালের সূত্র :—দুইশ তাল লেঙ্ক করে ছেঁকে তার সঙ্গে ছোট আঁচ পেঁয়াজ পোঁচাকতক ছাড়িয়ে বেবেন। অন্ন হুন মরিচ গুড়ো ঘিনিয়ে আর পাউকটির ইঁচরো ভেঙ্গে যুগে ছড়িয়ে বেবেন ইচ্ছে করলে হলেপাতা কুঁটেও খেওয়া যায়।

সবজির সূত্র :—বে সময়ের বা তরকারী পাওয়া যায় তাই লেঙ্ক করে বেশ যুগ তৈরী করা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শুঁ হুশ পেয়েই কি খাকা যায়? মোটেই নয়। একখানি বাঁধ তালিকা তৈরী করে নিন। সামান্য বা চাল পাওয়া যাযে তাতে সব রকম তরকারি ঘিরে কেন না ফেলে ঐ ভাজে সবজি তাজ খাওয়া যেতে পারে; সম্ভব হলে পরম তাতে একটু ঘি বা মাখন। সঙ্গে রইল যে কোনো একটি ভাল খায় শীতের একটি তরকারী সংশোধে অন্ন চামাটোর চাইনী। কোমরিন বা গিছুড়ি করা যেতে পারে এতে চাল কম পাওয়া গেলেও বিশেষ স্বত্ববিদ্যার পড়তে হবে না। রাজের বাঁধ তালিকার প্রতিদিনই একটি করে হুশ। হুঁগায়া হাতেগড়া কটি আর তরকারী। তবে বাঁধ তালিকার দিকে হুগুদিলী কিছু কড়া নম্র হিতে ভুলবেন না বেবন। অর্থাৎ সারা সপ্তাহের বাঁধ তালিকা নতুনস্বের ব্যবস্থা করতে হবে। শীতের সময় সবজি বেশী পাওয়া যায় বলে সবজির হুঁ হায়া করা যেতে পারে। তারকারী লেঙ্ক করে অন্ন দিও ভেলে কলে নিয়ে একটু হুন মরিচ মরিচ গুড়ো আঁচ পেঁয়াজ ছাড়ানো এগুলো ঘিরে অন্ন মলে লেঙ্ক করে নাখাওয়ার সময় একটু আটা গুলে উপরে ঘিরে একটু পরম মশলায় গুড়ো ছড়িয়ে বেবেন। এইভাবে মুচ, হাংসের ও করা যায়।

উত্তরভারতে সবজির চাশাটি একটি উপাধের বাঁধ। পাক, দুগো, বীট, আশু, কশি, কাঁচালতা এগুলো কুঁচো করে কেটে লেঙ্ক করে বেবেন (লতা ছাড়া) এখানে একটি পায়ে সবজিগুলো রেখে তাতে লতা কুঁচো, হুন, অন্ন মরিচ, একটু লেন্দু রস, কিছু ধনে পাতার কুঁচো ঘিনিয়ে বেখে নিন। এরপর আটার ময়ান ঘিরে বেখে কটির মত গোল সেটি করে তাতে এ সবজির খুব ঘিরে ঘুণটি বন্ধ করে, গোল আকারে গড়ে নিয়ে ঘিরে চেখে নিতে পারেন। অন্ন ঘিরেও ভেজে নেওয়া যায়। এই চাশাটী খেতে খুব হুম্বর। তবে সবজি চাশাটীর তরকারীগুলো কিছু খুব লেঙ্ক হওয়া চাই, না হলে কাঁচা থাকবে। এইভাবে উত্তর-ভারতে মিলি চাশাটীও করা হয়। শুঁ সবজির বহলে চাশাটী বেলবার সময় ভর হওয়া চায়ের চামচের এক চামচ চিনি হিতে হয়। শীতকালে পালংশাক বেশ পাওয়া যায়। পালং শাক, আশু, বেগুন, পেঁয়াজ, কাঁচা-লতা, একটু তেঁতুল, আঁচ, বহুন, চামাটো আঁচ ছোলায় ভাল ঘিরে খুব হুম্বর রান্না করা যায়। অন্ন ঘিরে আঁচ, বহুন, কাঁচালতা বেশ লাল করে ভেজে আশু জুয়ে জুয়ে করে কেটে এবং স্বস্ত্রাজ জিনিষ সব করে নিয়ে একটি পায়ে ঢেলে অন্ন ঝাঁচে বসিয়ে ঘিন, ভলটা করে গেলে পালং শাক এতে বেবেন। গুণিকে ভাল লেঙ্ক আর তরকারী হুঁ করে কাটা ঘিরে বেঁটে একটু তেঁতুলের অন্ন দিয়ে নাখিয়ে নিলেই হবে। শীতকালের সবজির হুঁ একটি রান্নার প্রণালী এখানে জানিয়ে রাখি। এগুলোও অবশ্য বাঁধ তালিকার মালে মালে তালিকাভুক্ত করতে যেন ভুলবেন না।

বেগুন হলেপাতা। প্রথমে কয়েকটি বেগুন খোঁচা ছাড়িয়ে সল সল করে কেটে দেবেন। কড়াইতে

যি দিগে ঐ বেগম কুঁচো ছেড়ে দেবেন একটু হুন্ ও মিষ্ট দিগে অন্ন খাওে ঢেকে রাখুন। কিছুক্ষণ পরে ঢালা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে হুন্, আদাখাটা কাঁচা-মচা কুঁচো দিগে চালুদার মত থকথকে করে নানিয়ে রাখুন খালার ঢেলে উপরে একটু নারকেল কোরা ছড়িয়ে দেবেন।

জলগোষ্ঠ :—আমাদের খিউলি ডাল দুগে আশ্বাশ্বমত জল দিগে সেদ্ধ করতে দেবেন। সেদ্ধ হলে একটি পাত্রে নানিয়ে রাখুন। এবারে আমাদের আশ্বাশ্ব মাসে সেদ্ধ করে দেবেন। এরপর ঐ ডাল ও মাসে একটু দিগে আশ্বাশ্বমত হুন। মিষ্টি, হুন্হুখাটা লুফাখাটা ও গরমমশলা দিগে বেশ থকথকে রত করে নানিয়ে দেবেন (কথা বাংলার মত)। এতে পেরাজ মরকার হয় না। নানিয়ে উপরে একটু ধনেপাত। কুঁচো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

এইভাবে নিত্য মনুন্ বাগা করে আশ্বাশ্বমতকে তপ্ত করুন। মাট বা এগো বেই চাল পর। কথার বলে গ্রোয়াকনেই আবিষ্কার ঘটে। কথাটি খুব সত্য। আজকের দিনে বিজ্ঞান পাত্ত ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। আগে ছিল ভাতের পরিবর্তে কটি। এখন ভাত কটির পরিবর্তে ভাল তরকারী মাছ মাংসের পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে হবে। হয়তো প্রথম প্রথম অসুবিধা হবে কিন্তু ভবিষ্যতে এটাও অভ্যাসে লাগিয়ে যাবে।

বিফল খাওয়ার যে ভীক এলোছে যে করেই হোক তাকে সতল করতেই হবে এবং সে কালে মেয়েদের ঘুমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

শীতের দিনে খাদ্য সংকটে বিকল্প খাদ্য

অধ্যাপিকা—বীন্দ্রা সেন

বর্তমান খাদ্য সমস্যার দুগে 'কি খাই' 'কি পাই' করে যেমন সকলে অধির হ'য়ে উঠেছেন তদ্রূপে চেরেও বেশী দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছে না পোনদের। প্রতিদিন বাড়ার সন্ধানকার মুখের লায়নে খাবার বরঙে সকাল সন্ধ্যা তাঁরা হিরসিম থেরে যাচ্ছেন। ঘরে বাইরে, হাটে বাজারে, এমন কি সভা-সমিতিতেও এখন কাঁচর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হচ্ছে নবই কেন্দ্রীভূত হয়ে যাচ্ছে এক বিশেষ বিষয়ে। তাঁরা কিন্তু 'কি খাই' ভাবছেন না, 'কি খেতে দিই', এটাই তাঁদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

যেদে খাদ্যমন্ত্র সে সত্যিই অজাব আছে বনৌষা তা হুন্ত বৃত্তে পারছেন না। কালোবাঝারী বাসে সব জিনিষই খুব সহজে না হলেও বোগাড় করা যাচ্ছে। কিন্তু অর্ধের গ্রাহুর্ষ বাফের নেই, অথবা কিছু আদর্শ ঝাঝ বজায় রেখে চলতে চান মুখিল তাঁদেরই বেশী। তাঁরা অথবা যাচ্ছে লায় দিগে কিনতেও চাইছেন না অথবা পারছেন না আবার সহজভাবে হুন্ত দুগো পাওয়াও যাচ্ছে না। কিন্তু খবর বাছবসের খাওয়ার গ্রোয়াকন ত অস্বীকার করা যায় না তাই 'মেয়ে মজলিসে' সর্বদাই এই নিয়ে বিকল্পখাতের বিষয় প্রত্যেকেই নিজের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করে খাদ্যসমস্যার কিছুটা হরহাফ কথা বোঝা চেষ্টা করছেন। 'গর-ভারতী' এদিক থেকে আজকের অত্যন্ত গ্রোয়াকনীয় সমস্যাকে আমাদের লায়নে জুড়ে রেখেছেন।

চালের অভাবে গর বাওয়া প্রতিটি পরিবারেই নিয়মে পাড়িয়ে গেছে। এরই মাঝে বৈচিত্র্য

আনা দায় কিতাবে দেটা অবতাই চিত্তনীর বিবর। আবার বাতুল্য বৈহিক প্রায়কন অতথ্যারী পাচ্ছি কি না। দেটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্তমান কল্পবোধী কতকগুলি বাতবৎ ও প্রকৃত প্রাণী এখানে আলোচনা করছি।

শ্রুতজ্ঞানময় কতকগুলি সৰ্ব্বি এবং ফল বেশ সত্তা হয়। সেগুলো রোজকার খাদ্য তালিকাভুক্ত করলে ব্যবহারও উপকার হবে এবং চালের পরিমাণ কম থাকে। দতেও পেট ভরাবাও ব্যবস্থা করা হবে। যেমন পালংশাক, ফুলশাক, লাউভগা, বিন, জলি, শাকও, মুলো, টম্যাটো ইত্যাদি সবুজ এবং অল্প তরকারী; ফলের মধ্যে লম্বা, পেয়ারা, শাকআলু, কলা ইত্যাদি। অল্পদিনের মধ্যেই কমদামেবু বাজারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া হবে এবং হামও মোটামুটি সস্তাই হবে। এগুলো যদি খুঁরিয়ে কিরিয়ে প্রতিদিন খাওয়া যায়, বিশেষ করে শাক-সবুজ নিয়ম মত খেলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যগ্রাণ এবং কিছুটা যেতলায় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন কোষ্টপরিষ্কারও সাহায্য করে। দিঠি আলু, মেটে আলু, কচু, এবং গোল আলু, যেতলায় বহল বাত। চালের বিকল্প খাদ্য হিসাবে এগুলো প্রতিদিনই পাওয়া চলে। মীচে কয়েকটি দিগ্নিত খাদ্যপ্রকৃত প্রাণী আলোচিত হ'ল সেগুলির সাহায্যে। তাড় ও লটির মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্যতা পাওয়া হবে।

কলাই চালের রুটি।

উপকরণ:

কলাই (বিউলি) ভাল ২২৫, আটা ২২৫, হলের শু'ফো ৫, আধা ১০, হসুফ শু'ফো ১ চা'চামচ, ছন পরিমাণ মত, ঘি ১০ (সমতাই গ্রামের হিসাবে)।

প্রশালী:—কাঁচাই ভাল সাধারণত ভিজিয়ে বেটে নিতে হবে। কড়াতে ঘি ঢালিয়ে সমস্ত মশলা এবং ছন দিয়ে একটু তাঁপা হলে ভাল ছেড়ে দিয়ে বেশ করে নেড়েচেড়ে নামাতে হবে। তাঁপা হয়ে গেলে আটার সঙ্গে মিশিয়ে পক করে আধখটা রেখে দিতে হবে। এবার সমান ভাবে লেচি কেটে নিয়ে একটু মোটা (১/২) রুটির মত বেলে প্রথমে শুকনো তাওয়াতে পরে আগুনে ধরে এপিঠ গপিঠ করে তেজে নিয়ে নামাত কি হুগিটে মাখিরে কীটা দিয়ে ছুটা ছুটা করে ঘিলে রুটি খুব নরম এবং খেতেও স্বাদু হবে।

রুটিগুলি ওরনের খাবার মত হবে।

মিসি রুটি।

উপকরণ:

আটা ২০০ ঘাসন ২০০, পাংগশাক ১০০, পেঁয়াজ ১০০, জল ২০০, ছন ৫, ঘি ১০০ (সমতাই গ্রামের হিসাবে)।

প্রশালী:—আটা এবং ঘাসন ছেকে নিতে হবে। পাংগশাক এবং পেঁয়াজ খুয়ে হুচিয়ে দিয়ে ঘাসন ও আটার সঙ্গে ছন ও জল দিয়ে একসঙ্গে পক করে মেখে নিতে হবে। সমানভাবে লেচি কেটে প্রথমে একটু লম্বা ধরণের বেলে সেটাকে চারটে তাঁপ দিয়ে তিন কোণা পরোটার মত করে বেলে শুকনো তাওয়াতে ভেজে একটু ঘি মাখিরেও খাওয়া চলে।

রুটিগুলি ওরনের খাবার মত হবে।

কুটার কুটি

উপকরণ :

কুটার আটা ২৪০, ছন পরিমাণ মত, জল, চিনি, সামান্য পরিমাণ দি ১০ (সনদ গ্রাহের হিসাবে) ।

প্রণালী :—কুটার আটার সঙ্গে জল, চিনি মিশিয়ে জল দিয়ে বেশ পক্ত করে বেশ নিতে হবে । সমান ভাগে লেচি কেটে নিয়ে হাতেই খেল করে চাট্টা করে নিয়ে তারপর আবার চারটে আঙুলের চাপে আরও একটু বড় করতে হবে । এগুলোর জন্ত বেলুন চাকি ব্যবহার হয় না । তারপর ভকনো ডাওরাতে ভাল করে চেঁচে দি মাখিয়ে নিতে হবে ।

এই কুটিগুলি ২ জনের খাবার উপযোগী হবে ।

আলুর কুটি

উপকরণ :

আলু ২৪০, আটা ২৫০, ছন পরিমাণ মত, লস্কার গুঁড়ো ৪ গ্রাম, দি ১০ ।

প্রণালী :—প্রথমে আলুগুলো সেদ্ধ করে চটকে নিতে হবে । এবার আটারে সামান্য পরিমাণ ঘিয়ের ময়ান এবং ছন মিশিয়ে চটকান আলুর সঙ্গে মেনাতে হবে । লস্কার গুঁড়ো এবং পছন্দ মত একটু আঁচাচিটাও এই সঙ্গে মেশান যায় । প্রয়োজন মত জলও মেশান চলে । লেচি কেটে কটির মত বেলে তেঁকে একটু দি মাখিয়ে রেখে দিলে বেশ নয়ম গু স্বাদ্য হবে ।

সাবুধানার খিচুড়ী—(সাবুধানার অভাবে ট্যানিওকা চলবে)

উপকরণ :—

সাবুধানা ২০০ গ্রাম, মুগডাল ২০০ গ্রাম, জিরে পরিমাণ মত, লস্কার গুঁড়ো ২ চা চামচ, তেজপাতা ২টি, হলুদ গুঁড়ো ২ চা চামচ, আবার কুচি ১ চা চামচ, ছন পরিমাণ মত, আলু ১০০ গ্রাম, কাঁচালস্ক ৬টি, চিনি ২ চা চামচ, দি ২ চা চামচ, ল: তেল ২ চা চামচ ।

প্রণালী :—প্রথম মুগডাল সেদ্ধ করে নিতে হবে । কড়াতে সব্জিয়ার তেল অথবা ভালতা ঘিরে জিরে, তেজপাতা কাঁচালস্ক, আঁচাচি সব ঘিরে সেদ্ধ ভাল (বেশ পাতলা ভাসের মত) ঢেলে ঘিরে তাতে জন্ত মসলার গুঁড়ো এবং ছন, চিনি ঘিরে সাবুধানা ঢেলে দিতে হবে । প্রয়োজন হ'লে আরও বানিকটা পরম জল ঢেলে দিতে হবে, সাবুধানা সেদ্ধ হবার মত । সাবুধানাগুলো সেদ্ধ হয়ে ফুলে উঠলে বেশ পাতলা অবস্থায়ই নানিয়ে দি ঘিরে ঢেকে দিতে হবে । রসমিনিট বাবেই ওটা বেশ বন হয়ে খাবার মত হ'য়ে যাবে । বানিকটা মারকেল হুরিরে এবং গোটা পরম মসলাও বেওয়া চলে । এটি দুপুরে অথবা রাতেও খাওয়া চলে অথবা ছোসেবেরেয়া ফুল কলেজ থেকে এসে বিকেলেও জলখাবার খেতে পারে ।

উপরে বর্ণিত খাণ্ডগুলিতে খাণ্ডমুলাও বধ্যাবধভাবে পাওয়া যাবে । তবে এর সঙ্গে প্রোটিন জাতীয় খাণ্ডও কিছু খেতে হবেই । এগুলো মোটামুটি ভাবে খেতপার জাতীয় এবং উচ্চ প্রোটিন জাতীয় খাণ্ডমুলা বহন করবে ।

বিকল্প খাদ্য

বীরা দাস

বাঙালিদের এই নিঃশব্দ মূর্ত্তি গল্প-ভারতীতে বেশব রচনা প্রকাশিত হচ্ছে তা দৃষ্টিই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই ভাবে দারাহেণে বহি বাঙালি সমাজ। সমাজের একটি সুপরিচিত ব্যবস্থা করা হয় তবে নিঃশব্দে বলা যেতে পারে বাঙালি সমাজে পরিমাণে হ্রাস পাবে। আর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের। বাঙালিদের তীব্রতা সব চাইতে বেশি বাঙালি। কারণ আমরা কালী, ভাত না বলে আমাদের চলে না। ভাত বাঁধ দিয়ে আমাদের কোনদিন চলেনি। কিন্তু অভাবে পড়ে আর আমাদের বাঁধ হয়ে আটা বেতে হচ্ছে। ভারতের অন্ত সব প্রদেশের লোকের ভাতের প্রয়োজন মোটেই নেই বলেই তাদের আমাদের মত অন্ত বিপন্ন হতে হয়নি আর।

বাঙালিদের বিকল্প খাদ্য এই প্রসঙ্গে গত কয়েক মাস ধরে সে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে সেগুলি পড়েছি এবং আমার ধারণা হয়েছে এসব প্রবন্ধে উল্লিখিত বিকল্প খাদ্যের প্রচলনের দ্বারা বাঙালি সমাজ অনেক পরিমাণে সমাধান হতে পারে। হতে পারে কেন বলবো হবেই, বহি দারাহা—মেয়েরা প্রতি পরিবারে এইসব বিকল্প খাদ্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করি এবং যুগে যুগে ও পাত্র পত্রিকা দ্বারা সেগুলি প্রচার করি। এই প্রচার কার্যে রেশিও আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারে। দারাহা বহি অধ্যবসায় সহকারে ও বহু করে বিকল্প খাদ্য ব্যবহার করার সুচক্রটিই হই তাহলে অল্প তবিলিতে আমাদের বাঙালিদের বিকল্প খাদ্যে হ্রাস পাবে এবং কালে হয়তো একেবারেই থাকবে না।

তা না করে গল্প-ভারতীর পাতায় পড়লাম আর খেলাম বলে দুই একটি রান্নাও হয়তো কখনও কখনো তাতে কোন ফলই হবে না।

সকল দেশে সকল কালে মেয়েরাই এগিয়ে এসেছে এই বাঙালিদের সমাধান। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় পন্ডিতের বেশগুলিতে বাঙালিদের কি সন্ধানই না দেখা গিয়েছিলো। মেয়েরাই তো তার সমাধান করেছে।

তাই আর আমি একান্তভাবে বাংলার মেয়েদের আন্তরিক অনাই তীরা এগিয়ে আসুন আত্মীয় এই সন্ধান দুইতে।

আর একটি কথা। আমরা বাঙালি সমাজে অত্যন্ত conservative। যা যথাস্থানে চিরকাল থেকে এসেছি তাছাড়া নতুন কিছু খেতে আমরা রাজি নই, তা না খেলে বেন আমাদের চলবেই না। এ দাবী সম্পূর্ণ ভুল। সময়ের ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিবর্তন যেনে নিতেই হবে। এই যে আর বাঁধ হয়ে আমরা আটা বেতে আরও করেছি এতে তো আমাদের কতি হয়নি বহু অনেক ভালোই হয়েছে। অত্যাগ করলে সমস্যাই হয়। কালেই এই যে বিকল্প খাদ্যের তালিকা গল্প-ভারতীতে বাসে বাসে প্রকাশিত হচ্ছে তা বহি আদর্শ গ্রহণ করি এবং প্রতি পরিবারে সেইভাবে বাঙালিদের ব্যবস্থা করি তা হলে আর দিনের মধ্যে আমরা তাতে অভ্যস্ত হব। এবং ক্রমে তার ব্যাপক প্রচলনের দ্বারা বাঙালিদের সমাধান করতেও পারবো।

খেলাধুলা



শ্রীযোতির্কর

আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ইহা নিম্ন অসম্ভব আর অসম্ভব। আমাদের খেলার ক্ষেত্রেও সেই চিহ্ন আর প্রকট। দলবলি, রেবারেবি, আটম-নকু, হোপ, যদি না চাডার জন্তে সর্বস্বকার বড়বড় ও তবির। ফলে ইংলও সফরে দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের শোচনীয় দুর্গতি।

সবাইকে টেকা দিলে এখার বাংলা বেশ। ভারতীয় ক্রিকেট খেলার অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল উঠেছিল। কিন্তু শেষ খেলার মাইনোরের কাছে হেরে গেল। খেলার হার খিঁচ আছে। সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু সে কি জব্বার খেলার বাংলাদেশ খেললো ক্রিকেট? বেশ মনে হয়েছে, খেলোয়াড়দের খেলার প্রাণ নেই এবং নিশ্চয়ই হেরে গেল। কিন্তু খেলার শেষে একি কথলে বাংলায় খেলোয়াড়রা? প্রকারীকে অসম্ভব, গলোয়াল বন্ধ, উজ্জ্বল জাগরণ। সবস কটক লহর ছিঃ ছিঃ করল। এবং শেষ পর্যন্ত বাংলার খেলোয়াড়রা যখন ফেরার জন্তে কটক টেনে এল তখন কটকের ছাত্ররা এসে তাদের দিকার দিয়ে গেল, ধূ ধু ছিটিয়ে দিয়ে গেল। তারপর কাগজে কেছা বেললো। বাংলার ম্যানেজার এবং প্রশিক্ষকের বিচ্ছেদ লেখালেখি এখনও চলছে, হুতরাং সে সবচে অধিক হাকবিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই। শুধু তাইখি খেলার ক্ষেত্রে এ কোথায় তুলিয়ে গেল বাংলা বেশ।

পাকিস্তানে বাংলার কথা। সারা ভারতের খেলার ক্ষেত্রে যে ভাঙন ঘটেছে তা আর আর কাকর কাছে অজানা নেই। খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের লোক দিয়ে ডোটেইর কোরে কয়েকজন স্বাধীনবদ ব্যক্তি যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন তার বিচ্ছেদ প্রবল বিক্ষোভ উঠেছে। কলকাতার একটি বড় ক্লাবের এক কর্তা এই ব্যাপার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছেন। খেলাধুলি খেলব অভিযোগ তিনি করেছেন তা সত্য বা অসত্য নয়। সেই অভিযোগগুলির মর্মার্থ এই বক্য :—

(১) অল ইন্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলে নতুন নির্বাচন ও ত্বরিত-কৃষি অবস্থা টাকা বরচের কথা।
(২) অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলেব কোথাথাক নির্বাচনের ব্যাপারে শ্রীএম দত্তরায়ের বিপক্ষে অভিযোগের কথা।

(৩) আসল অস্ট্রেলিয়া সফরে বেহু অধিকারীর পরিবর্তে গোলায় আমেরকে ভারতীয় দলের ম্যানেজার করা।

(৪) বর্তমানে ক্রিকেট, ফুটবল, অ্যাথলেটিকস্ ও হকিতে ভারতের মান কোথায় নেমেছে তার বিচার করার কথা।

(৫) গত ইংলন্ড দলের ভারতীয় ক্রিকেটের সমাধি হয়েছে, কিন্তু কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাতিল হয়নি। আবার অস্ট্রেলিয়া দলের ইংলন্ডের চিমই দেখব আশা করছি।

(৬) বিশ্ব ফুটবলে আমাদের স্থান নেই, এশিয়ান ফুটবলে আমরা শকর অথবা ঘাঁট।

(৭) অ্যাথলেটিকসে আমরা পাঁজাই পাই না।

(৮) প্রাক-মলিম্পিকে হকিতে আমাদের স্থান তৃতীয়। যদি উপযুক্ত ট্রেনিং না হয়, তাহলে আমরা আগামী অলিম্পিকে রৌপ্য মেডেল পাব কি না সন্দেহ আছে।

(৯) ভারতীয় ক্রিকেট দলে শ্রীমন্ত বোমকে অস্ট্রেলিয়া দলের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এম হস্তারের কলকাতা ভ্রাতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে শ্রীমন্তর ও শ্রীমন্ত বোম বেন ক্রীড়াঙ্গণের ‘বমজডাই’। তাই শ্রীমন্তর কোষাধ্যক্ষ ‘পোন্ডা’ তৈরী করে শ্রীমন্ত বোমকে চুকিয়েছেন।” মানেভার ও কোচ কি অস্ট্রেলিয়া দলের টাকা পরদার সামান্য হিচাব-নিকাশ রাখতে পারতেন না?

(১০) সেন কমিশনের মাননীয় বিচারপতি শ্রী কে সি সেনের রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় এই ‘দুর্ঘটনা’ই শ্রীমন্তর ও শ্রীমন্ত দত্ত ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ম্যাচে সি এ বি-র শক থেকে ইজেনে অব্যবহার চেষ্টা পরিচালিত হয়েছিলেন। তাইই কলে বিকট বিশৃঙ্খলা সোনি ইজেনের মুখে ক্রিকেট ইতিহাসে এক কলঙ্কর অধ্যায় রচনা করে ছিল। এছাড়া ১৯৬৪ সালে আই এক এর তত্ববিল তদ্বক্ষণর ব্যাপারে তখনকার বেডনভাস্ত্রী সম্পাদক শ্রী এম হস্তারের বিলম্ব কোর্ট যে মন্তব্য করেছিলেন, তাইই কলে শ্রীমন্তর আই এক এর সম্পাদকের পর ত্যাগ করেছিলেন। এবার আবার সেই ব্যাপার পুনরায় অহলস্থানের জট হাইকোর্ট অরডার দিয়েছেন।

যে অভিযোগগুলির কথা উপরে দেয়া হল তার প্রত্যেকটি মুক্তিবহু ও অহলস্থান সাপেক্ষ। ব্যাপার যা ধাক্কিয়েছে তাতে একেবারে আশ্রয় পরিবর্তন প্রকার। বকে বলে বেঁটিয়ে বিবরণ করা—ভাড়াটা আর উপায় নেই।

* * * *

বববটা পড়ে মন বিচল হল। গত ৩১শে অক্টোবর পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত খেঁচ ক্রিকেট খেলোয়াড় কর্ণেল সি, কে, নায়ডু ৭০ বছরে পর্যাপন করলেন, কিন্তু তিনি কঠিন পক্ষাঘাত রোগে শয্যাপাশী, হাঁটা চলা করতে পারেন না, কথাও ভাল করে বলতে পারেন না, তাই তাঁর অসহন থর থর মধ্যে নিত্যক নিরাসার উদ্বেগান্বিত হয়। বাইরের কোন লোকের ভিতরে বাবার নির্দেশ ছিলনা—ডাক্তারের হুকুমে।

একদা লক লক লোক ঝাঁকে বেধবার জন্তে দুর্দৃষ্টাভ্যম থেকে ক্রিকেট মাঠে ছুটে আসতো আশা তিনি কত আনন্দ, কীভাবে দোষে বন্ধী। ভাবতেও কষ্ট হয়।

কোটাখি কাংকাইয়া নায়ডু। জন্ম ৩১শে অক্টোবর ১৮৯৫, নাপগুরে।

ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি প্রবল অনুরাগ। চৌদ্দ বছর বয়সে ছুলের তরফে এক সহজতম পনেরটি সেটুই করে সমাইকে অবাক করে দিলেন।

তারপর বোম্বাইএর কোরাডাঃগুলার পরে পেন্‌টোঃগুলার ক্রিকেট-প্রতিযোগিতায় যেন একচ্ছত্র সম্রাট। প্রতি বছরই হিন্দু ভিক্ষাবান। পরে হিন্দু ধর্মের হয়ে রেকর্ড সংখ্যক রান।

"নায়ডু বখন খেলতে নামেন তখন যেন রানের বান ঢাকে।" লিখলেন সেই সময়কার এক অজিঃ সমালোচক।

প্রথম বখন ইংলেণ্ডে খেলতে গেলেন, তখন তখন বরেন্দ্র ক্রিকেটার জ্যাক হবল বলেছিলেন—লোকটির হাঠে নেবে একটি বল বহবার কাছাকাছি দেখেই বুঝেছিলাম ইনি জাত ক্রিকেটার—You have only to see him pick up a ball to know he is a born cricketer!

ইন্ডিয়ান-ক্যান্টন হাউস বের, আত্মহুলনিত বৃষ্ট বাত, তাঁক হুঁচোখের আয়ত দুটি, হুঠাম হুগঠিত শরীর, হাঠের দরো হাঁটা, বোড, ফিল্ডিং, লাফানো, সাঁরা আচরণে আভিলাভের ছাপ। তাঁকে দেখলেই সময় ছাপতো র্পকের মনে। চল্লিশ বছর ধরে এই বাহুবলি ভারতীয় ক্রিকেটে র্পকের বোডাবে সম্বোধিত করেছেন এমন আর কেউ পারেন নি। আর কেউ পারছেন কি না সম্বোধ।

১৯০২ সালে ইংলেণ্ডে গিয়ে বখন তিনি প্রথম সরকারী টেস্ট খেলার অংশ গ্রহণ করলেন তখন তাঁর বয়স ৩৭—কোন ক্রিকেটারের প্রথম টেস্ট খেলার যোগদানের পক্ষে অনেক বেশি বয়স সম্বোধ নেই—এ বয়সে তো অনেকের টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেবার কথা চিন্তা করে। কিন্তু বয়স তাঁকে কান্ন করতে পারে নি কোন দিন। ৫০ বছর বয়সেও হাঠে নেমে ২০০ রান করেছেন।

বিলাতে সেবছর তাঁর খেলা দেখে খেলোয়াড় ও সমালোচক সি বি স্ট্রাই বলেছিলেন—One of the greatest living Cricketers। ইংলেণ্ডের সময়কার ক্রিকেট র্পকের কাছে সেবছর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে অনগ্রিয়। এই অনগ্রিয়তার মূলে ছিল না তাঁর কোন একটি বিশেষ বিভাগের উৎকর্ষশীল শৈলী, ছিল সময় নিলিয়ে তাঁর চৌখল খেলার উৎকর্ষ। সে বছর তিনি ইংলেণ্ডে ৬টি সেফ্রি করেছিলেন। সর্বমুখ হাঠে প্রথম নেমেই করেছিলেন অপরাজিত ১১৮ রান। যেটি রান সংখ্যা ছিল ১৯১৮, সপ্তপঞ্চতা ২৫ রানে ৬০টি উইকেট পেয়েছিলেন বোলিং—এ। ফিল্ডিং দেখিয়েছেন অবিদ্বান, উইকেটের খুব কাছে ঠাড়িয়ে বোডাবে ক্যাচ লুচ্কেছেন বহবার, তা যেন আদৌলিক ব্যাণ্ডার বলে মনে হয়েছে। এবং সর্বোপরি ছিল তাঁর নির্ভীক বৃদ্ধিরূপ কাগ্রেণি। এইসব নিলিয়ে তিনি সে বছর, সে মূগের, অথবা সবমূগের—একজন জেষ্ঠ চৌখোল খেলোয়াড় রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

ব্যাটিংএর ষ্টাইল ছিল অপরূপ মনোহর। এক পা এগিয়ে দিয়ে যে কোন বলকে এমনভাবে মাছড়েন বা বেখে র্পক তো বটেই, সমালোচকরাও অবাক হোয়ে যেত। স্পিন বোলিং—এ অস্ত্র বড় বড় ব্যাটসম্যানরা খায়েল হোতেন। কিন্তু নায়ডু কখন না। বল ব্রেক খাবার আগেই তিনি এগিয়ে দিয়ে সেই বলকে



ঠেঁয়ালেন। ফুটবল ফিল নিখুঁত। তাই তিনি কোন স্পিন বোলিংকেই পরোয়া করতেন না। তাঁর সেই এদিয়ে খেলার প্রবণতা সেপে সেই বঙ্কর ইংলণ্ডের স্পিন বোলাররা স্থির করলে মোড় কেবিরে এদিয়ে খেলতে প্রস্তুত করে তাঁকে কাৎ করতে হবে। কিন্তু তাঁর বল কি হল? সে বছর (১৯০২) ইংলণ্ডে তিনি সর্বমুখে ৩৬টি ছক্কা মারলেন। লর্ডস মাঠে তাঁর একটি প্রচণ্ড ছাঁয়ের মার বেধে একজন ইংরাজ লম্বাটোচক লিখলেন—The ball was last seen sailing in an easterly direction। সে বলটিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

১৯০৩ সালে ক্রিকেট মহাপণ্ডিত উইজডেন তাঁকে বছরের শাছতম সেরা ক্রিকেটারদের তালিকাভুক্ত করে তাঁকে যে সম্মান দিলেন তা বিশেষভাবে মনোহর।

পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারত সরকার তাঁকে পদ্মকুশণ উপাধি দিয়ে নিকেরাই সম্মানিত হয়েছেন।

নাথুকে প্রথম বেধি, ১৯২৬ সালে কলকাতার ইডেনের মাঠে। স্বাধীন দিল্লিগানের টিমের বিরুদ্ধে খেলেছেন। ফুটি খেলার রান বেশি করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর ক্লিভিং এখনো মনে আছে। ঐ বলের ১নং খেলোয়াড় দুর্ধ্ব ত্রানভহারকে তিনি যে ভাবে রান আউট করেছিলেন তা যেন এখনো চোখের সামনে জাগছে। একটি বল লেটকাট মেরে ত্রানভহার ক্রিম থেকে হাত ধানেক ঘেরিয়ে এসে বলের গতি বেরাছিলেন। নাথু ছিলেন ক্লিভ দুয়ে তৃতীয় রিপে। হঠাৎ বাথের মতো ক্লিভ গতিতে ছুটে এসে সেই বল তুলে নিয়ে বিচ্ছিন্ন বেধে ছুঁড়লেন। উটকেট ভেঙে গেল। হতচকিত ত্রানভহার রান আউট হোরে গেলেন। ব্যাপারটা এমন চকিতের মতো ঘটে গেল যে নাথু মাঠে বিন্মরে যেন তক্ত হোরে গেল। তারপর পড়ল হাততালি।

ভাবপর তাঁকে বেধি ১৯০৪ সালে ইডেনের মাঠে দুর্ধ্ব জাভিনের দলের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার কাগেনে রূপে। সেই খেলার আগে একটি অল ইণ্ডিয়া কল বনাম এম সি সি দলের খেলা হয়েছিল। তাতেও বেলেছিলেন তিনি। এবং মনে পড়ছে সেই খেলার বিপক্ষ দলের এক ব্যাটলম্যান একটি বল মারলেন মতোরে উপর বিকে। নাথু কাছেই ঠাড়িয়ে ক্লিভিং করছিলেন। লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে নিতান্ত অবহেলায় সবেই সেই বলটা নুকে নিলেন—অসম্ভব একটি ক্যাচ। স্টেটলম্যান পরের দিন সেই ক্যাচ ধরা প্রদক্ষে লিখলেন—An impossible catch, but Nayudu held it disdainfully !

সেই টেস্ট খেলার তাঁর কাগেনির কথাও মনে পড়ছে। প্রচণ্ড বতি লাইন বোলিং-এ মন্থন নিসারের মাঝায় চোট লাগার পর তাঁকে বৃকে ভড়িয়ে ধরে প্যাতিলিয়নে নিয়ে যাওয়া, খেলোয়াড়দের সর্ব মন্থরে অগ্রপ্রাণিত করা এবং খেলাটাকে বাঁচাবার জন্যে নিম্নের বক্তাবস্থলত হিট করবার প্রবৃত্তিকে হমন করে তিন ঘটায় উপর খেলে মাত্র ৩২টি রান করা, এবং শেষ পর্বন্ত খেলাটিকে সমান সমান করা—এই সমস্ত মতো ফুটে উঠেছিল—এক মহান নেতার অজডেবী ব্যক্তিব, বণকৌশল আর নিম্নের দলের খেলোয়াড়দের প্রতি অদ্বীয় মন্থ।

ক্রিকেট-নাথকরুণে সি, কে, নাথু মন্থীর হয়ে থাকবেন চিরকাল।

আউট

তার অশ্বদিন উপলক্ষে তার প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষাপক লেখাটি প্রেমে গেছে এমন সময় খবর এলো সোমবার ১০ই নভেম্বর রাত পৌনে দুটায় সি, কে, নায়ডু পরলোকগমন করেছেন। ক্রিকেট মাঠে বহু দুর্ধর্ষ বিপক্ষের সঙ্গে যেমন লড়েছেন তুর্কি ভাবে, গত ছ'মাস রোগ আর মৃত্যুর সঙ্গেও তেমনি লড়েছেন প্রাণের অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে। কয়েকমাস আগে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েন তখন তাঁকে একটি নাসি হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাঁর প্রথম উক্তি : আমি এখনো আউট হই নি। আউট তিনি শেষ পর্যন্ত হলেন, জীবনের মার্চ থেকে সকলকেই একদিন না একদিন চলে যেতে হবে, কিন্তু সারা দেশের, শুধু দেশের কেন, সারা পৃথিবীর ক্রিকেটরসিকদের মনের আলিনা থেকে তিনি কোন দিন আউট হবেন না।

অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল

বোম্বিৎ নামের ভারতীয় খেলার পুরানো খুঁট খুঁট। নবাবত কেবলমাত্র কলকাতা এবং আবিহ আলি। ইংলও সফরে ধারা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বাই পড়েছেন হরত গুচ, এল বোহল, হুই হুয়েরণ, হুহুহু সিং এবং ডেকটারাবন। অনেকদিনের অনেক খেলার হিরো পুরানো নামকানি এবং বেশাই ক্রি়ে এসেছেন বলে। গত ইংলও সফরে নামকানিকে বাই বেওয়ার অনেকই হুহু হয়েছিলেন। এবারকার বলে দেগরেক খেলার হীপহর লুকাবকে অস্বত্ব না করা নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে অবিস্ময়করিতার পরিচায়ক বলে অনেক মনে করেছেন। হীপহর একাধিকবার নিজের খোলাতা প্রমাণ করেছে। বাই হোক, নতুন পুরানো খেলোয়াড় মিলিয়ে ধলের নামা বজায় আছে বলেই মনে হয়। অস্ট্রেলিয়াকে 'বাই বেওয়ার অনেকই প্রের করেছেন। নির্বাচকবা মনে করেন, ধলের ব্যাটিং ভুল করার খোলাতা তাঁর আর নেই। নামের ব্যাটসম্যান হিসাবে হরত তিনি ভাল। কিন্তু নামের ব্যাটসম্যান বলে অনেক আছে।

ভারতীয় দলকে ২২শে নভেম্বর খেলা শুরু করতে হবে। আগামী বছর ১২ই মার্চ সফর শেষ হবে। ঐদিন নিউজিল্যান্ড-এর অকল্যাও মাঠে ভারত-নিউজিল্যান্ডএর চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ শেষ হবে। ভারতীয় দলকে সর্বশেষে ২৩টি ম্যাচ খেলতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পাঁচটি টেস্ট ও নিউজিল্যান্ডএর সঙ্গে চারটি টেস্ট।

ধলের প্রতি আমরা আশ্বিনিক শুভেচ্ছা জানাই। বর্তমান এই সফরে ভারতীয় দল তার নই মর্যাদা পুনরুদ্ধার করুক, এই কামনা করি।

নির্বাচিত খেলো আন ভারতীয় খেলোয়াড়দের নাম।

পতৌদ্বিহ নবাব (অবিনায়ক)

এক এর ইনজিনিয়ার (উইকেট রক্ষক)

এ এল গুয়াসেকার

রহেশ শাকসেনা

আর জি নামকানি

নৈরব আবিহ আলি

ই এ এল প্রসন্ন

আর বি বেশাই

দি জি বোরগে (লং অবিনায়ক)

ইপ্রভিৎ শিংজি (উইকেট রক্ষক)

ডি এন সারগেশাট

ডি হুহুহুনিচা

আর এক হুতি

বি এল খেদী

বি এল চন্দ্রশেখর

ইউ এন কলকারদি

শীতকালে রূপচর্চা

(সেবাল ও একাল)



[সচিত্র সশযোজিত]

শীতে রূপচর্চা

সৌন্দর্য চর্চার প্রথম সময় শীতকাল, শুধু সৌন্দর্য নয় শরীর চর্চাও। এই সময় সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য এই দুই চর্চাই চলে অল্প সব ক্ষতের চেয়ে ভাল ভাবে। আর স্বাস্থ্য হারা সৌন্দর্য তো লাভ করা যায় না, কাজেই দুয়েরই প্রয়োজন সমান তালে। আত্মকাল যেতেরা অনেকেই ভুলে যান যে স্বাস্থ্য হচ্ছে সৌন্দর্যের ভিত্তি অর্থাৎ Base। কাজেই আগে স্বাস্থ্য তারপর আসবে সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের অধিকারিণী হতে হলে আগে স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হতে হবে। "Health is Beauty" "স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য।" একথা অতি সত্য।

আমাদের ঠাট্টা বিদ্রোহ আমলে বেবেছি ঠাট্টা এমন ভাবে জীবনযাত্রা করতেন যে স্বাস্থ্য তাঁদের অটুট থাকতো। আর তা থাকতো বলে, অনেক বেশী বয়সেও তাঁদের রূপ ও লাবণ্য অটুট হুও রান হতোনা। সেকালের রূপচর্চার উপাধান ছিল সবই প্রকৃতিজাত। আমকের মত Laboratory বা Factoryতে তা তৈরী হতো না। সরষে তেল, ভাল বাঁটা, হলুদ বাটা, দুধের সর, দুধ কমলাসবুর ছাল, ফুল ও ফলের রস, চন্দন গুঁড়া, শাঁকের গুঁড়া, মিশারিন প্রভৃতি। এই সব ছিল সেদিনের সৌন্দর্যের সহায়ক Beauty aids। এইসব ব্যবহার করেই ঠাট্টা স্মৃতি সৌন্দর্যকে জাণিয়ে তুলতেন। তাঁদের সৌন্দর্য ছিল স্বাস্থ্য-ভিত্তিক, কাজেই তা ছিল অটুট অরান ও উজ্জ্বল সব বয়সেই। সংসারের কাজে সারা দিন যে বৈধিক পরিচ্ছন্ন ঠাট্টা করতেন তার ফলেই তাঁদের স্বাস্থ্য চর্চার কাজ হতো। ঠাট্টা সব সময়ই স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে পর আলো করে থাকতেন এবং তাই তাঁদের বলা হত "পুলকী"।

আর আমকালকার দিনে হাজার রকমের প্রসাধন সামগ্রী বাজার ছেয়ে ফেলেছে। অসংখ্য রকমের ক্রীম, স্ক্রো, ভ্যানিলা ক্রীম, বিউটি ক্রিম, লোসান, পাউডার, লিপস্টিক, আরো কত কি বলে শেষ করা যায়না। সেদিন পর্যন্ত বিশেষ খেঁচেই এইসব প্রসাধনজাত্য আসতো। দেশের অবস্থা ব্যাপন হওয়ার, বৈদেশিক দ্রব্যের অভাবে, এখন তা আসা বন্ধ হয়েছে। তবে, বেশে আমকাল সবই তৈরী হচ্ছে কাষখানায় ও ঘরানাপায়ে। অভাব কোনটিরই নেই। চাইলেই পাওয়া যায়, আর তার অল্প পরিচ্ছন্ন করতে হয়না—সবই একবারে তৈরী। বাটা, ঘণা, গুঁড়োকাষ কোন কিছুই বালাই নেই। বসে বসে শুধু মাখতে ও লাগাতে হবে। আধুনিক মেয়েদেরও তা ব্যবহারে কোন বিরক্তি নেই। যিনি রাত, সকাল সন্ধ্যা, বসে বসে শুধু প্রসাধনই চলেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে অনেকেই সত্যিকার সৌন্দর্যের অধিকারিণী এখন আর হতে পাচ্ছেন না। স্বাভাবিক সৌন্দর্যের বিকাশ অনেক ক্ষেত্রেই আজ আর হয় না। কাজেই আধুনিক মেয়েদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে স্বাস্থ্য চর্চা আগে তার পর রূপচর্চা। Health first then Beauty। আর এই নীতিবাক্য যদি অঙ্গসরণ করেন, তবে শুধু সৌন্দর্য নয় অসংখ্য আনন্দের অধিকারিণীও হতে পারবেন তারা।

শীতকালে রূপচর্চা

মক্কা মুখোপাধ্যায়

তপচর্চা, প্রসাধনের দ্বারা সৌন্দর্যকে অটুট রাখার প্রয়াস সব কতৃতেই যেরেয়া করে থাকেন বিভিন্ন উপাধানে সহযোগে। তবে বেশা পেছে, সেকালে এবং একালেও, মেরেয়া বিশেষ করে শীতকালেই যুগ্মী ও বেহ-সৌন্দর্যের প্রতি বেশী লক্ষ্য দেন। তার কারণ সহজেই অগ্রহের। শীতের প্রকোপে যুগের শ্রী ও লাবণ্য বেশিমানায় নষ্ট হয়, তা সকলেরই জানা। তাই শীতকালে এই বিষয়ে বেশী যত্ন নিতে হয় অভাবতই। বর্তমান সংখ্যাটি যখন বেতবে তখন “এলো যে শীতের বেশা।” তাই এই সংখ্যার “শীতকালে তপচর্চা” শিরক নিবন্ধটির মধ্যে সেকালের এবং একালের শীতকালীন প্রসাধন লক্ষ্যে কিছু সমগ্রোপযোগী আলোচনা করা হল।

তপচর্চা আবারের বেশে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। সেই বৈদিকযুগ থেকে তার বর্ণনা আমরা যুগে যুগে বহু গ্রন্থে পেয়েছি। এখানে যে-সেকালের কথা বলছি তা আমাদের ঠাঁহুয়া বিধিয়ার আলোর কথা। সে সব যিনের তপচর্চা আজ যুগবধলের সঙ্গে বিলীন চয়েছে। তখন বিবিধা-ঠাঁহুয়ারা অনুচা নাত-নিহের নিয়ে সকালবেলার ঘোরে শিঠ মেলে যিরে এই চর্চা শুরু করতেন। একই সন্ধ্যা Sunbath ও প্রসাধন দুইই চলত। তার মধ্যে বিশেষ থেকে জানা কোন প্রসাধন লাগায়ের লক্ষ্যন পাওয়া যেত না। সবই বেশভাষা সহজে হলেতে পাওয়া যিনিব।



যেনন, কিছু দরখের তেল তার লবে কিছু হালুয়াটা মিশিয়ে যে গ্রেলেন তৈরী হ'ত, ফকের উপর তার ক্রিয়া লব্ধে বুঝার বিশেষ অবহিত ছিলেন। এই গ্রেলেন শুককে শুধু সর্বপ্রকার মালিগ থেকে মুক্ত করত তাই নয়, ফকের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করত, তাকে উজ্জ্বল করত। তারপর হানের পেয়ে ব্যবহৃত হত সব-ময়রা। যুগের সরের সঙ্গে ময়রা মিশিয়ে সেই গ্রেলেন যুগে হাতে লাগায়ের পর আন্তে আন্তে খলে বসে যখন ময়রার আত্মগণকে তুলে ফেলা হত তখন সেই অল্প-তৈলাক ফকের যে স্ববুধা পরিপূর্ণ হ'ত তা হালুয়াফলের কোন সৌন্দর্য-স্বাভাবিক স্বাভাবিক দ্বারা লভ্য নয়। তখন পাউডার ছিলনা। তার পরিবর্তে ছিল পাউডারের মতোই মিঠি শাঁখের গুড়োর সঙ্গে তেমনি মিঠি চন্দনকাঠের গুড়োর সম্মিশ্রণে এক অপরূপ এবং উপকারী চূর্ণ। রাত্রিকালে বিতীয়াবার পর-ময়রা লাগায়ের পর সেই চূর্ণের গ্রেলেন দিতেই যেরেয়া

অপরূপ এবং উপকারী চূর্ণ।

মুখে এবং হাতে। বিপ্রববে বা অশুভকে দূরবের তেল দিয়ে অল্প সংযোজনও ছিল আর একটি নিত্যকর্ম। সন্দের প্রলোপ-আর মুহুরির ভাল বাটাও ছিল আর দুটি উপকরণ।

এখন মূগ বললেছে। কর্মব্যস্ততার মূগে বাস করছি আমরা। দেখিবার মতো ঐন্ডেল সময় বেয়েযের নেই। তাঁদের হাতে অনেক কাজ। অনেকটাই চাকুরীজীবী। কাজেই অল্প সময়ে প্রসাধন



সাধতে হয়। - অল্প কতৃতে যেমন তেমন করে তপচর্চা চলে। কিন্তু ঐতকালে একটু বেশি সময় দিতে হয় এদিকে। ঐত এলো কি না এলো, হাতের ও মুখের চামড়ায় চান ধরতে লাগল, টোট ফাটতে শুরু করল, সকালবেলা মুখের কৃষ্ণ বিবর্ণ দেখাতে লাগল। কাজেই একটু বিশেষ স্বত্ন নিতে হবে বৈকি এবং এ মূগে তাতে সাহায্য করছে বাজারের প্রচলিত নানাবকসের সৌন্দর্যবৎক তপচর্চার উপাদান। সকালবেলা মূগ হাতে গোবার গবে লাগাতে হবে তৈলাক্ত কোন ক্রীম। তারপর মিলিবিধি সাবান বেখে গান দেবে প্রয়োজন হবে প্রথমত কউনভেশন ক্রীমের, তারপর জ্যানিশিং ক্রীম এবং সর্বশেষে ফেস পাউডারের। যিনের শেষে কর্মের অবসানে মূগ মূগে ফেসে লাগানো হবে কোন্ড ক্রীম, রাজে শোবার সময় কিছুটা নিক বা সাবা রাতে ধরে অকের উপর ক্রিয়া করে তাকে সন্তোষ ও সজীব করে রাখবে।

উপরে যে সব উপায়ানের কথা বলা হল, সেগুলি ভালো কোয়ালিটির যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে স্কল পাওয়া যাবে সুনিশ্চিত। কিন্তু রূপের চর্চা যতটাই হোক তার ভিত্তি যদি ভাল না হয়; অর্থাৎ বাহ্য যদি ভাল না থাকে তাহলে কোন চর্চাই সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হবে না। কথায় বলে বাতাই সৌন্দর্য। আবারো ঠাঁহুমা-বিদিসার। এ ততটি ভাল করাই জানতেন। তাই পাওয়া-পাওয়া লম-বিহার অবসর বাপন সবতই তাঁরা করতেন গেইদিকে লক্ষ্য রেখে। শরীর যাতে নিক থাকে, ছলম যাতে ঠিক মতো হয়, সুনিহার বাবাত যাতে না হয়, আস্তে যাতে শরীরের বেহ বুঝি না পায়—

এ সব বিষয়ে তাঁদের সর্বনা সজ্ঞান দৃষ্টি থাকতো। তাঁরা পরিচয় করতেন নিয়মিত। তাতে করে তাঁদের বাহ্য ভাল থাকতো। সেই পরিচয় ব্যাভাবের কাজ করত। ফলে তাঁদের শরীর থাকতো প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত অটুট, সৌন্দর্য লাভ্য থাকত অবলিন। এবং তাঁদের কালে তাঁদের মাতনি, কড়া ও গুরুবদ্রাও ঠাঁহুমা-বিদিসার নির্দেশ অঙ্গরণ করে নয়নানন্দকর বাহ্য ও সৌন্দর্যের অধিকারিইরূপে থাকে বলে ঘর আলো করে থাকতেন।

সুতরাং ঐতকালে তপ চর্চার প্রদর্শক বাহ্য চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে ফুসলে চলেবে না।

যুগে যুগে কালে কালে প্রসাধন

জ্যোতির্ষটী ভেদী

“মুখে তার লোহরেনু হৃৎকতে মাথে” কালিদাসের কালের মেয়েদের সাজসজ্জা প্রসাধনের কথাই কবি বলেছেন। এবং তাতে তাতে সৌন্দর্যমল্লও। (লোহরেনু হ’ল কোনো পাছের ছালের ভাঁড়ো) সেকালের পাউডার, বকবক চ’ল সঁজিকুল

এ চ’ল চুতাকার বছর আগের প্রসাধন। পুরান, আমায়ে, মহাভারতেও মহানাদীর নানাবস্তু প্রসাধন সামগ্রীর নাম পাওয়া যাবে। কিন্তু সে কথা ব্যাক। আসলে মানব ও মানবী চিরকালই সাজতে ও বেহুকে সাজতে ভালবাসে। এই ক্যাটাগরি চিহ্নিত নয়। পছন্দা ‘অলতার’ ‘অলতা-চন্দনে’ রেল-সিঁড়ির ফুলের মালায় পাখির পালকে পুঁথি পাখরের মালায়—কিসে নয়? আবার কালে কালে কচিও বহলায়।

তেল হুঁচুতে মূখ ও মাথার চুল একালের মাজলের অঙ্গুষ্ঠ। এখন সূত সূত পসপসে চামড়া কপু কপু ফুটো ঝাপা চুলের কান্না। এই হল অকতঃসকার তাগড়া।

অবচ আমায়ের শিতামতীয়া তেলে কলেই চুল এবং পরীরের শোভা দেখতেন। চুল তেল দ্বিতেন ভাতের পানাতো না, তখন মোম দিয়ে পেটো পড়ে আট বাঁট করে চুল বাঁধতেন সিঁথিকটে। উৎসাহে কতুমাথা হ’ল ‘অলসী ছিঁচি’। চুল হবে তেলো, খোঁপা হবে মগ, তাতে বেগুয়া হবে শুঁকিকাটি,



(কাটা) সোনা ও রপার ফুল। এবং বাহিরেও ফুল ও মালা। এই হ’ল চুলের সাজ। সাধনের ফুলে লতা-পাতায় বাহারের ভাবনা ঠাৱা ভাবতেন না। সেখানে তো আবাক ঘোমটা। যত খোঁপাই হ’ল আগল বন্ধ।

ভীষের সময়ে সাধনের খুব চলন ছিল না এবং সাধনে চবি থাকে তাই সাধনটা অস্তিত্ব যেনে করা হত। বিশেষ করে বিধবা, অসচ্চারিত, নিষ্ঠাবতী সাধবাও সাধনকে অশুভ পর্গায় রাখতেন। এখানে পূজা বাহ রক্ত পালনের দিনে ঠাৱা অনেকটাই সাধন হৌন না। তাইলে কি ছিল ভীষের বেহ ও চুল পরিচ্ছদের উপাধান? ছিল সরিষার গোল, বেশম, রিটার ফেনা, সা মাথা ঘলতে। এই গুলিই ভীষের সানের ঘরে, (না সেকালে বর কোথা) পুস্ক-বাট কুয়োতলায় বা নদীতীরে সানের পরিচ্ছদতার উপকরণ। কখনো কখনো গল্যায়িত্তিকা সাবহার করতেন

ধাৱা শুচিগ্রস্ত বেশী। মাথার আটা তুলতে পছন্দাটি খোল সাবজত হত। রিটা কলের অলেও খুব

সাবানের দড় খেনা হয়। সেও ময়লা ছাড়ায়। পারে খোল ও পেরে মেনে তার তেলও ছাড়িয়ে।
কর্নাও হতেন নাকি।

যত কৃষ্ণ খবল ও মুকু। জ্যেষ্ঠ মত গীতের কথা-কাথ্য থাকনা চার পুরুষ (চার নারী ?) আগের গৃহিণী
এক জাভা কস্তার গীত শালা পছন্দ করতেন না, গীত শালা ফ্যাঙ্কেকে খেন মজার গীত। তাই গীতে মিশি
বেওয়া হ'ত। মিশিটা হ'ল স্যাক লোকা ও হুগু অল্প মশলা মিশানো কিছু গুঁড়ো। এখনো হিন্দুস্থানী অনেক
জ্যেষ্ঠ ও কিছু বারনারীলের মধ্যে ঐ মিশি ব্যবহারের চলন আছে। আর ছিল পান পাওরা। পান খেয়ে টোট
হাটা করার নিয়ম। অবশ্য টোটে আলতা রাখের চেয়ে পানের রসটাই খুব চলন এবং সহজ, সব সময়ের জিনিষ
ছিল। গৃহিণীরা কম বয়সের বড় কস্তারের অহুযোগ করে বলতেন, 'বাছা পান খেলে তো টোট লাগ হয়নি
কেন?' পানে টোট বাটা হওয়া চাই তাঁদের। গীতা মিশি ব্যবহার করতেন না, পান নিচ্চাই খেতেন।

আলতা চিরকালের (কতকালের জানিনা) প্রসাধন হাত পা রান্নাতে। 'সিপটিক' বা 'নেল-গালিনে'র
পূর্বপুরুষ। ভারতের দবইই নামটা আছে। কিন্তু পারে আলতাপত্র সৌভাগ্য ও প্রসাধন হিসাবে বাংলা
বিহার উড়িষ্যা প্রদেশেই চলে। কিছু উত্তর প্রদেশেও ব্যবহার আছে। বেশী শীতের বেশে পাঠাবে হালফানে
আলতার চেয়ে যেহেতুই পাকা রং ব্যবহারের চলন। দেটাও সৌভাগ্যবতীর প্রসাধন।

চন্দন কুন্দমাদির ব্যবহার শুণু দেবকাথেই বেশী।

হুগু তেলের ব্যবহার একালে যত চলেছে সেকালে তা ছিলনা। "রাবা ঘসা" নামের মান্যরক্ষ
বেনে মশলা দিয়ে মাখিয়েল তেল হুগু করা হত। এবং সেটা আবার সৌভাগ্যের মাহলিক অম্ববস্তও হ'ত।
তবে এখনো তব-ভাব্যালে সিধুর আলতা, 'রাবা ঘসা'র পাভা রান্নাকড় বা লালা শাঁবা নাহলে মাহলিকী
সম্পূর্ণ হয় না; যতইনা বোতলে শিশিতে হুগুনী লবাহুহু শেখরজন বেওয়া হোক। তরল আলতাও
সেদিনের জিনিষ।

যে বেশে নারিকেল তেল না চলে সেখানে তুলে তেল নামে হুগু তেল চলত তিলের তেল
তুলের আভরের পক্ষ মিশিরে। কিন্তু এতে তুল শৈল্প শেকে যায়।

কাঁচল বা হুম্বা। চোখের প্রসাধন। এত চিরকালের। পূর্ণাঙ্গের কাল থেকে আছে। নানা
নাম, নানা প্রয়োগন নিয়ে।

কাঁচল

বৈজ্ঞানিক কাঁচল অনেক রকমের—বহু-কর্ণ-তেল দিয়ের ডুবতে মনসা পাভা পানের দি ও তেলে
মিশিরে করে। পড়িতে বলে, কাঁচল পরাটা চোখের দৃষ্টির উৎকর্ষও বাড়াই। আবার সেকালের মতে চোখের
রূপও বাড়াই। কাঁচল মরনকে আরো কাম্বলিত করে। চোখের পলকও গভীর কালো দেখানোর যন্ত্র।
লোকের জ্ঞতেও কাঁচলের রেখা থাকে। চোখের পারিপার্শ্বিক শোভা বাড়ে তাতে।

উজী

উজীও একসময়ে অনেক ছাত্রগার প্রসাধনের অঙ্গ ছিল। কপালে উজীর টিপটা চিরস্থায়ী। কাঁচলের
টিপের হত করে টীপ থাকবে। হাতে পারেও উজীর পহনা থাকা হত। এগুলি সর্বত্র নয় প্রায় নিয় জ্যেষ্ঠ
করা সৌখীনতার ব্যাপার।

কাটাচটা

হাত পা শীতের দিনে কেটেচটে গেলে তাঁরা শীতকালে সরমরসা রাখতেন। সেটা এখনো লোকে মাখেন। গো ফিরটাও। আর ঘরে একটা ভিনিশ তাঁরা করতেন মোম পলিয়ে তেল যিশিরে একটু বৃণক করা নাম "মোমফুলল"। মারিকেল তেলও কাটা করায়।

শীতকালের দিনে সেদিনের মেয়েরা শীতের প্রকোপ থেকে নিষেধের সৌন্দর্যকে কি ভাবে রক্ষা করতেন তা আজকালকার মেয়েরা অনেকই জানেন না। শীতের প্রায়ক্ষেই তাঁরা হুক করতেন বেশ করে দারা পরীরে পাঁচি পরিবার তেল রাখত। বেশ ভাল করে ধরে ধরে তেল মালিশ করতেন এমন করে যে বুক দুধর বসন ও ডেলডেলেই থাকতো। কেউ কেউ মারিকেল তেল বা জলশাইর তেলও মালিশ করতেন। অকের সম্মীষতা ও কম্বীষতা মতটুকুও নষ্ট হতো হবেনা বয়ঃ বাড়বে।

মটর বা মুহুরীর ভাল অনেককণ ধরে ভিজিয়ে রেখে পরে বেটে মুখে ও মেহের অক বিশেষে বেশ ভাল করে প্রলেপের মত মেখে রাখতো তারপর পরিষ্কার করে মুখে ধোলে দিতো। এতে মুখশী তব্বমামিত হতো, অক তক্তকে ও উজ্জল হত।

মরিষার তেলের সঙ্গে কাঁচা হলুদ বাটাও রাখতেন সেদিনের মেয়েরা। তাতে করে অক যেচতা মলিনতা বা কক্ষতা বা বন্ধিরথা থেকে মুক্ত থাকতো। মুখে ও দারা বেহে সৌন্দর্য ফুটে উঠতো।

সেদিনের মেয়েদের স্বাস্থ্যও ছিল সৌন্দর্যও ছিল। সংসারের কাজে সব সময়ই ব্যস্ত থাকার দরুন যে দৈনিক পরিশ্রম করতেন তাঁরা তাতে তাঁদের শরীর শক্ত থাকতো। সহজে কোন ব্যাধি আক্রমণ করতে পারতোনা। কাজেকাছেই স্বাস্থ্যবিক সৌন্দর্যও অটুট থাকতো।

এছাড়া রয়েছে গহনার প্রসাধন।

এরও রূপ এবং কতি বদলেছে। নাক জান বি'ধিয়ে গহনা পরার ফাপান উঠে আসছে। সোনার দার বাড়ার সঙ্গে গহনার ওজনের হালকা কতি এসেছে। পায়ে গহনার চলন বাংলা বেশে প্রায় নেই। জু' যিহের কবের পায়ে মল-লাগে। কোমরের গহনা সেই সব চম্ভহার ঘর্ষহার শোটি মেঘলা আধি সেকলে পথারের গহনা। গিঠে 'পিঠ কাঁপা' নামে একটা গহনা ছিল। সেটাতে অনেক সুমকো এবং বাধি থাকত ঘোয়েরা নড়লে চড়লে বাজত। সেটার নামই এখন অনেক লোকে জানেন না।

ওপর হাতের তারিখ বাচ্চ লখন অনেক ভাগাআধিও চল ও অচলের ঘবের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতিবার মত মুঠু প্রায় অচল। মোপল বেগববের মত কাঁপটাও অচলের পথারে। সি'খি কপাল পাটীও অপাক্ষের।



চন্দ্রকান্ত সাতনরী সাতলহরী হার বৃক্ণ ভরা। অশ্বর সরস্বতী হার দেবী প্রতিহার কর্তার মত অবলুপ্ত হয়েছে। বড় বড় গহ্বরীহ কোকানো আর খোঁজ মিলবেনা তার।

প্রলাপনের অলসারের লাগ সন্ধ্যায় কচি বহলেছে, বাঁহের কালের কথা লিখলাম তাঁরা এখন মিউজিয়মে বহীর হলে।

'গরমহা' 'মোম ফুল' 'মিশি' এখন প্রায় মিউজিয়মের বস্তু। কামল আসতা এখনো আছে অল্প নামে আর নিক বাদেও।

এছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা ধরনের প্রসাধন অথবা আছে আবহাওয়া ভেবে।

শীতে জ্বরের যত্ন

মহুতী বন্দ্যোপাধ্যায়

এ সেল সেল শীতের হাতছানি নতুন উত্তরে হাওরার সাথে সাথে। অজ্ঞান বাস এল প্রথম পর্ব হিসেবে। শিষ্ণু শিষ্ণু আসবে গৌর আর মাথ।

দূর থেকে সাবনা সামনি হতেই হুরমা একমুখ বেলে বললে, "কি রে জ্বা, তোর গালে রং লেগেছে : চেহারাটাও, বলতে নেই, ভালই দেখছি—আগের চাইতে সেয়েছিল অনেক—কিয়ে, বাইরে কোথাও গিয়েছিলিস না কি পুড়োয়?"

"হ্যা, অনেক দূর। হুহুর উত্তরে—হাঙ্গিঙ্গি, শিলিগুড়ি, কাশিয়ার—চন্দ্রহটা একটু দূরে এলাম। কিন্তু তাই তুই একটু কুল করেছিল—গালে রং লেগেছে বলি না? সেটা কিন্তু বায়োর কারণে নয়। শীত এসে পড়ল তো : গাল কেটেছে। বাচ্চাদের দেখিস না—শীতকালে টুকটুকে গাল হয়ে যায় চামড়া কেটে—বাবাও সেই বকম হয়।"

হুরমা বললে, "তা তেলঝাড়ীয় কিছু লাগান না? ক্রীম-ট্রীম?"

"লাগাই। লাগাতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু তার আগেই গালের ত্বক লাগতে হয়ে বদখন্দে হয়ে গেছে। আমার ঐরকমই হয়।"

হুয়নার এখিক থেকে বাঁচোয়া। ওয়া মা'র ও হুয়নেই ফসী—গ্রাষ সনান সনান—কিছু শিত এলেই ওর গাল কেটে লাগ হুয় না জ্ঞার মত। বেহের চামড়াটাই ওর একটু তেল দাখনের। তার ওপর অবত বস্তুও বেহ দে ককর।

ওসবের বার বারে না হুয়নার সহকর্মী, একই-অকিনে-কাক-করা অহুতা। হুয়নার চেয়ে অহুতার হুয় আরো উকটকে, বাহা আরো উকত। কিন্তু হলে যবে কী, অহুতার সৌন্দর্য অনেকখানি রুক্ষ, এবং ঐ রুক্ষতার কারণে অনেকখানি বেদ চাপা। আপিসে কাক করে, গাঙ্গারে বাটে—সবর ওর কম। হুয়না থেকে অনেকখানি যোঝাতে গেছে : “তুই বাহু মাহুয় স্বীকার করি, কিন্তু তা হলে শরীরের যাইবোটার একটু বস্তু নিবিনা? কতটুকু সময় লাগে এতে?”

বাতবিত, কতটুকুইবা সময় লাগে? বর্তমান হুগে সময় আদ্যের অনেকেরই কম ঠিকই, কিন্তু এটা তো জনে চাখা রকম, বেহেরের সৌন্দর্য শু নিম্নের কাছেই নয়, অগবের কাছেও। সৌন্দর্য শু সৌন্দর্যের অধিকারীকেই আনন্দ দেয় তা নয়, পরকেও আনন্দে তরিযে তোলে। তবে হ্যা, সেদিকে একটু নরঃ দিতে হবে। বৈদম্বিন কামেনা, কাক, অহুবিধে বিটিয়ে ও কাটির বতটুকু পাড়া বার নিম্নেরের শরীরের, স্বকম বস্তু দিতে হলে বৈকি।

আদ্যের স্বক পোখাক পরিচ্ছদ অনেকখানি ঢাকা থাকলেও খানিকটা খোলা থাকেই। বিভিন্ন কল্প বিভিন্ন প্রভাব পড়ে—সেই খোলা অংশের ওপর তো বটেই, এমন কি ঢাকা অংশের ওপরও। তাছাড়া পাড়া যিনে রোখুয়, ধূলা প্রকৃতিতেও বেহককর কমকতি হয়। সেই কারণে স্বকের বস্তু সবসময়েই চাই।

বর্ষাকালে হাওরাটাই থাকে খানিকটা জিহে, আর্দ্র। তার রক্ত গায়ের স্বকও কিছুটা জিহে, নরম থাকে। বর্ষার পর শ্রীতকালে হাওরায় আর্দ্রতা খুব কমে যায়, হাওরায় ঠান হয়ে—তারও প্রকোপ পড়ে গায়ের স্বকে। চামড়াতেও ঠান হয়, গা চকচক করে, স্বকের আর্দ্রতা কমে গিয়ে কাটিতে হুক করে। মাহবের বেহের বে বাতাবিত তেলো তাই—অবত প্রকৃতিগত কারণে এর পরিমাণটা কামো কম, কামো বেশি, কামো বাস্তবিক দাখনের দ্বঃ—তা অনেক সময়ই শ্রীতের প্রভাব কাটির বেহকককে নরম রাখতে পারে না।

তাই, শ্রীতকালে শু নয়, শ্রীতের গোড়া থেকেই রকম স্বক বোদায়ের রাখবার প্রচেষ্টা। দাখনাও বলতে পারেন। ওদিকে শ্রীত চোঁটা করবে আপনাকে রুক্ষ ক'রে তুলতে—এদিকে আপনার থাকবে সেই চোঁটা প্রতিরোধ করবার সাধনা। আর এ দাখনার আপনাই নয় হুগা চাই।

কেননা নারী যান্নেই কোমলতা, নারী যান্নেই ত্রিভুতা। নারীকে কেবল পূর্ববৎ বে এই রূপ বেখতে চায় তা নয়, নারী নিম্নেও চায়। এবং নারীস্বককে দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বী ও দ্বন্দ্ব ক'রে তুলতে ও সেইভাবে রাখতে খুব বেশি একটা চোঁটার দরকার হয় না।

বদহিন্দার শ্রীতের প্রভাব কাটিয়ে বেহকককে নরম রাখবার কথা। এটা হল প্রাধান্যেরও একটা



বল, বাহ্যচর্য্যও একটা অব্য। দুই বেশি তৈলশিখিল বা বর্ষনিক বক (বোটা সাধারণত বেশি বেশা যায় গ্রীষ্মকাল প্রভাব) যেমন বাহ্যের বিকটচর্য্য করে, তেমনি তৈলবিক্রিত শুকনো খাদ্যের অব্যও অপ্রাণ্যকর। মাত্রাটা ঠিক থাকে চাই। আমাদের বেহের তৈলগ্রন্থিগোষ্ঠের নিঃসরণক্রিয়া শীতকালে বাতাবিকভাবেই কম থাকে, তাই বাইরে থেকে তৈলাক্ত পদার্থের গ্রাসেণে বক নরম লাগতে হবে।

এটা হুভাবে করতে পারেন। যেমন দুই ক'রে থাকে। সাধারণ প্রচলিত-বিদেশী প্রাণ্য তৈলাক্ত ক্রীম, ভেঙ্গলীন ব্যবহার করতে পারেন। বক খোলায়ের থাকবে, শিঙের খাঁড়ের অটুট থাকবে। আর করতে পারেন সাবেকি দেশী প্রাণ্য—দুধের সর (একালে দুধে সর পড়া বহিঃ প্রাণ্য মজাবনীর ব্যাপার) এবং তেল পায়ে মেখে, কাঁচা দুধ পায়ে মাখলেও বেহের চামড়া নরম হয়। সর বা দুধ মাখতে হয় মালিন করার মত হীরে হীরে ঘষে ঘষে, তবেই দরজের বেশি উপকার। ঐ সঙ্গে হলুদ বাটা মিশিয়ে বেন যদি একটু তাহলে বক আরো বেশি উজ্জল আর চকচকে হয়ে উঠবে।

কাঁচা দুধ বা দধের সঙ্গে আর সরবা মিশিয়ে মাখলেও উপকার। মওটা বেহে শুকিয়ে বাবার পর আভে আভে সর্ষের তেল দিয়ে উত্তিরে ফেলা যায়—ময়দার সঙ্গে কেকের গুণরকার ও বোম্বুণের সরলা উঠে আসবে, বকও খোলায়েন হবে।

ভাল ঘি আমকাল পাওয়া দুতর, কিন্তু তবু ঘি যোগাড় করা সম্ভব হয়,—অথবা মাখন ব্যবহারও চলতে পারে—তাহলে তির-ফোটানর মত আচ্ছা ক'রে ফেটিয়ে নিয়ে দুখে, গলায়, হাতে ও অস্ত্রার স্থানে লাগান যেতে পারে ক্রীমের মত। কচি অস্থায়ী ভাবে এসল ছিটিয়ে দিতে পারেন।

অস্থতাকে ছাড়াও চেমে, আদাপও আছে, বহিঃ এরা দুইভাবে সম্বন্ধীয় নয়। দুইবার কাছে করা—আক্ষেপ করে, "ওর এত ভাল বাবা, ইকটুকে ম, কিন্তু একটুও তেল কোনদিন মাখে বলে বেখে মনে হয়না—বহি নিরমিত মাখত তাহলে বা মেজা হত না ওর পরীরের!"

সত্যি কথা—পরীরে মেজা আনতে নিরমিত সর্ষের তেল মাখা অমিতীর। অস্থতার অব্য সর্ষের তেলে ভাষি বিড়কা, সর্ষের তেলের গছটাকে ও বোঝা করে। দুইবার ঘি ওকে কখনো বলতে যায় যে, ঘবে ঘবে সর্ষের তেল মাখলে রোমন্থণ আর বক দুইই গভেষ্ট্র মজাবিত হয়ে ওঠে, আর ভাত্তে বাবা আরো ভাল হয়ে ওঠে, তাহলে অস্থতা বেখে বলে, "বা আছে বাবা তাইতেই অস্থকার, আরো ভাল হয়ে কাঁধ নেই।" দুইবার জানে, এটা স্বেক এড়িয়ে বাবার ছুতো, তবু বলে, "সর্ষের তেলের গছটা কোন সম্ভা নয়; বেশ ক'রে ভলে ভলে তেল বেখে পরে চানের সর মাখন দিয়ে সে তেল তুলে ফেলা যায়, গছও থাকে না, বকও নরম থাকে।"

বিবর্ষ বকে গতি কোটা—বিপদত বেহেরের বেলায়—সৌম্বর্ষক জীবনভাবে নষ্ট করে। অগ্রাণের গোড়া থেকেই ঘি নিরমিত তেল-ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় সাথে, তাহলে পৌষ-মাখে আর আক্ষেপ বা হুচিন্তা করতে হয় না। দুই-পরের মত সর্ষের তেলের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে মাখা উপকারী—আনের আগে। হলুদের আরেকটা বিপদ গুণও আছে—গোলা, পাঁচড়া, চুলকানি ইত্যাদি নিবারণ করে।

ছায়া নাকি সরষের তেল বেখে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয়না। অস্থত ও তো তাই বলে! দুইবার প্রক বলেছে, "ওরকম কারো কারো হয় শুনেছি। আবার পিসিমা বলেন, সর্ষের তেলেও বাহের পা কাটে, তাহলে নারকোল তেলে উপকার হয়। পিসিমা সেখানে রাহুদ, তার কণ্ঠাটা হুঁকিহুঁকি বলেই বরা উচিত। দুই বেশনা নারকোল তেল পায়ে কিছুদিন বেখে। নিত্যর কাণ হবে, বেশি।"

অনিত অয়েলে খরচ বেশি, কিন্তু স্বচ্ছ ময়ূর হাতে এর উপকারিতা হ্রাসহীন। তাছাড়া অনিচ্ছা অয়েল স্বচ্ছ এবং হালকাশ্রীতে অনেকটা টনিকের মত কাজ করে।

আর একটি চমৎকার হিলি হল গ্লিয়ারিন। পরিমাপবদ্ধ অয়েল লকে দিলে পাতলা ঝরে নিজে মূখে, গলায়, হাতে, দুই বাহ ও পায়ে পাতলা রাগা বাগ দিনেগতে যে কোন সময়—স্বচ্ছ নবমু খাতে চামড়া। অল্পটা আর ঘাই করুক-না-করুক, গ্লিয়ারিনটি ব্যবহার করে প্রায় নিশ্চিত (ওর ভাষায় “নিশ্চি পদ্ধ” কিছু ছড়ায় না এ থেকে, তাই)। আর একটা জিনিস ও করে—জন্ম আর যুগ্মায়ই মত—সেটা হল শ্রীতে তিনটে হাস গ্লিয়ারিন সূগান ছাড়া কোন গায়েরাখা সাবান ব্যবহার করে না। এই সাবানটি তৈলাক্ত সাবান হিসেবেই তৈরি করা হয়, সেই কারণে শ্রীতকালে ব্যবহারের পক্ষে সাধারণ গায়েরাখা সাবানের চেয়ে গ্লিয়ারিন সোপই উপযুক্ত।

পায়ের গোড়ালি অনেকরই বেশি করে কাটে শ্রীতের সময়। হেমন্তের শেষভাগ থেকে এদিকে নবমু হিলে বেশি শ্রীতে বেশি করে আর গোড়ালি ফাটে না। মারকোল তেল খুব ভাল করে গোড়ালিতে মাখান উচিত, তাতে ওখানকার মোটা চামড়া নরম থাকে। রাতিয়ে শোবার আগে গ্লিয়ারিন লাগিয়ে পোন লাগারাত—গোড়ালি নরম থাকবে, বিছানায়ও নোংরা হবার ভয় নেই।

শ্রীতের হাওয়া হতেই পিরিয়ারিনি আগাক না বেছে, এতগুলি প্রতিবেদক নিলে—অস্বস্তি: এর মধ্যে কতগুলি নিলেও—আগনি হরকিত থাকছেন: আগনির আর ভয় কি? উত্তরে হাওয়া আগনাকে কল্প নির্ব ক’রতে পারবে না এখন—আগনি শ্রীতের প্রকোপ জ্বল করে নিশ্চেষ্ট লাগানারী করে তুলতে পারবেন।

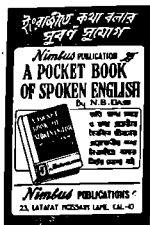
"I honestly think it is every woman's business to seem beautiful—to create the illusion of, to move in an aura of beauty. It can be done by any one. It is being done every day, by women with nothing extraordinary in the way of faces and bodies. There aren't many "born beauties"—most of them are developed. If you have the determination and will power you can achieve a glow, a freshness, a charm that will very well attract people around you.

—Anita Colby—A renowned Hollywood Beauty expert

শ্রীহৃদয় হুমায় রাগ চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

২১৩বি, চিত্তব্রজ এভিনিউ, কলিকাতা-৯ হাটে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রা: দি:

১, বিনোদবিহারী রাস সেন, কলিকাতা-৯ হাটে মুদ্রিত।



Anglo-Bengali Rs. 3'25
Anglo-Hindi Rs. 5'25

সম্ভব প্রকাশিত

- বাংলা শ্রুতিভাষা-সাহিত্যের এক অপূর্ণ সংযোজন
- প্রাথমিকপূর্ণ বৈঠকী-গল্পের সমারোহ

সাহিত্যস্রষ্টা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ঔর বাক্তি জীবনকে ঘিরে করেকল্পনের সমাবেশ
যদি কাহিনীতে উদ্ভাসিত বহু কাহিনী, বহু চিত্র,
বহু দুর্গত সাহিত্য সন্দের বিবরণ

অমিতকুমার ভট্টাচার্যের

একজন আর করেকল্পন

বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের বাস্তব এনেছে।
প্রত্যেক লাইব্রেরী এবং সাহিত্য বসিক পাঠকের
গকে অপরিহার্য। দাম : চার টাকা।

ডি. এম. লাইব্রেরী

৫২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বহু প্রকাশিত রচনাবলী

॥ সম্ভব প্রকাশিত ॥

চার্লি চ্যাপলিন (আশ্চর্য আত্মকাহিনী) ৩'০০
গল্প-ভারতীতে প্রকাশকালে যে রচনা পাঠক-
মহলে বিপুল ঔনুসংকার সৃষ্টি করেছিল।

অন্যান্য গ্রন্থ :

বাক্সা হ'ল স্তম্ভ (উপভাস : চলচ্চিত্র উপস্থাপিত :
৩য় সংস্করণ) ৩'১৫

মহা মহা রূপে (মুখোপাধ্যায় রচনা কাহিনী) ৩'৪০

বীরবল রত্ন (আত্মবাদের দর্শনীয় বীরবলের
বিশ্বকর বৃদ্ধিসংসার কাহিনী) ৩'০০

জাগ্রতের পরশমণি (উপভাস) ৩'০০

হে মহাজীবন (মনোবীরের গল্প) ৩'০০

স্মৃতির প্রদীপ (বহু উপভাস) ২'৫০

ভারতীয় বুদ্ধ ও কালরাত্রি (দুটি বহু উপভাস
একত্রে) ২'০০

দাদাভাল ও মরণভিনায় (.) ২'০০

কালো কল্লা ছাত্র (বহু উপভাস) ১'৫০

ডিম সর্গ (শিরামবেলো, মল্লার, স্ট্রুট হার্মি)
(নাটক) ২'০০

মহাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের দাদাভাল (নাটক) ২'৫০

মহাট্যরূপে ফিল্ডেলান রায়ের দাদাভাল (.) ৩'০০

Carey's Good Old Days (মহাভাষা) ১৫'০০

Glimpses of the Olden Times (.) ১০'০০

: অন্যান্য :

কেরী সাহেবের কলকাতা (কোণারী নামের
কাহিনী-রূপ গল্প-ভারতীতে কথায় প্রকাশিত)

Echoes from Old Calcutta (মহাভাষা)

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্ধাঙ্গ পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি তৎপন্নতার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে।

স্বপ্ন
মৃত্যু
হলো



এখন তিনি জননী। গ্লোহাংগে অমৃত কুলা
'সাধনা অশোকারিষ্ট' তার অটুট স্বাস্থ্য
কিভাবে এমন তাকে আজ জননীর গৌরবে
বিস্তৃত করেছে।

সাধনা অশোকারিষ্ট



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৩৮

অধ্যক্ষ: যোগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ,
এম. এ. ডিপ্লোমা (সি. এম. সি. এস.)
(লন্ডন), এম. বি. এ. (অক্সফোর্ড),
হায়ল্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল
কলিকাতা-৩৮।

কনিষ্ঠকর্তা: কে.এ.
ডাঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিকাতা)
আনুগোষ্ঠীভাষী।

একটি সুপরিচিত
নাম

লক্ষ্মী ঘি



এই নাম-ই
বিশুদ্ধতা ও
উৎকৃষ্টতার
নিদর্শন

তাই প্রতি ঘরে
এর এত সমাদর